ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা

(১৭৬৩-১৯৪৫ খ্রীঃ)

অধ্যাপক প্রভাতাংশু মাইতি, এম. এ.
কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক
'Studies in Ancient India', 'A Historyof Europe',
'ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা', 'ভারত ইতিহাস পরিক্রমা',
'আধুনিক ভারত', 'ভারতের ইতিহাস' (নবম ও দশম)
প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

শ্রীধর প্রকাশনী
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
২০৩/৪ডি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

REVISED SYLLABUS IN HISTORY IN EUROPE AND THE WORLD (1763-1945)

SECTION—1 **Page**

Europe in 1763 15

(a) Impact of the Seven Years War.
(b) Rise and fall of "Enlightened Despotism" in Prussia, Austria and Russia—its nature and limitations.
(c) The Industrial Revolution in England.
(d) The American War of Independence—causes and results.

SECTION—2

The French Revolution (1789-1814) 15

(a) The social and economic causes of the Revolution—role of the "Philosophers"—responsibility of the French Monarchy(1774-1789)—attempts at sloving the financial difficulties of the Monarchy—"Aristocratic Revolt"— Summoning of the Estates General—fall of Bastille (July 14, 1789)— the spread of rural unrest—extent of the success of the Constituent Assembly in solving the political and economic problems—achievements of the Revolution— 1789-1793—nature of foreign intervention— The "Reign of Terror"— political parties— clubs, Associaticns— Moderate and Radical opinions till 1799— Rise of Napoleon to power— causes of his success— an estimate of Napoleon's internal reforms— growth of the empire till the Treaty of Tilsit— Decline of Napoleon— the role of the Continental System in his downfall (military details to be omitted) :— Causes of the downfall of Napoleon.

SECTION—3

Revolution—(1815-1848) 15

(a) The Vienna Settlement—1815—the Metterich System.
(b) The Revolution of 1820—in the Spanish colonies of Latin America—The Greek War of Independence 1827-29.
(c) The July Revolution of 1830 and the February Revolution of 1848—their impact on Europe— the fall of the Metternich System—the rise of the Second Empire in France—Louis Napoleon.

SECTION—4

The Industrial Revolution—Phase II 15

(a) Consolidation in Britain—industrialisation in the Continent of Europe—special reference to France, Germany and Russia— Rise of the working class— the working class movement— growth of socialist thoughts— till the death of Marx.

SECTION—5

Rising tide of nationalism 10

(a) The Unification of Italy—the roles of Victor Emmanuel, Mazzini, Cavour and Garibaldi.
(b) The Unification of Germany—the role of Bismark.
(c) The Polish nationalism—kept alive by the Polish Revolts of 1830, 1846 and 1863.

SECTION—6

The American Civil War 10

(a) Causes :—Slavery and secessation issue—the South versus the North (b) the role of Abraham Lincoln.

SECTION—7

The Eastern Question—as a whole—from the end of the Crimean War to the First World War— factors in the Eastern Question— decay of the Ottoman Empire— the attitudes of the European Powers— The Rumanian Question— The Treaty of Berlin— Bagdad Railway Project— The Armenian Question— The 'Young Turk' movement— the Balkan wars— World War I and the disintegration of the Ottoman Empire.

SECTION—8

World War I

(a) As a whole—Causes—Colonial ambitions of the European Powers— formation of the Tripple Alliance and the Tripple Entente— the Maroccan crisis— the Agadir crisis— the Balkan crisis— the Serajevo murder and the outbreak of the World War.
(b) The Versailles Settlement of 1919.
(c) The League of Nations—its aims and its failure.

SECTION—9 10

Arab nationalism—Rise of Modern Turkey—Kamal Ataturk modernisation of Turkey.

SECTION—10

Reforms and Revolutions in Russia—1861-1928 30

(a) The Emancipationof the serfs—1861—effects— the Revolution of 1905.
(b) The Bolshevik Revolution— the new government— and the First World War—international significance of the Revolution of 1917.
(c) The Civil War 1918—1921.
(d) A critical estimate of Lenin and his ecnomic policy.
(e) Death of Lenin—Stalin.

SECTION—11

Far East 15

(a) China—The Opium War—the "Cutting off of the Chinese melon"— Chinese reaction— Taipeng— Buxar— Sunyat Sen— Revolution of 1911— the May 4th Movement— the growth of the Communist movement— Chiang Kisekh— Sino-Japanese War— Mao-tse-tung and the birth of Republic of China.
(b) Japan—before Perry's arrival (1854) opening up of Japan— the Restoration— the structure of the new Government— internal reconstruction and Westernisation— initial phase of Japan's imperial expansion— Japan and the First World War— domination of the army over politics— Japanese militarism— Japan and the Second World War.

..ECTION—12

Rise of Facism—in Europe 20

(a) Mussolini in Italy—dictatorship at home—expansion in Africa.

(b) Hitler in Germany—rise of Nazi Party—Nazi Party— its organization— offensive against the Versailles Settlement— German rearmament since 1933, Herrenvolk theory— the Barlin-Rome Axis 1936— Japan joins the Axis— Anti Cominterm Pact (Nov. 1936)— the non-aggression pact with Russia— the attitude of the leading powers of Europe— particularly France and England to Nazi Germany— German attack on Poland--Sept. 1, 1939— beginning of the Second World War.

(c) The Spanish Civil War 1936-39.

SECTION—13

The Second World War 15

(a) Causes (in brief)—Spread of the War—involvement of Soviet Russia—of Japan— of U.S.A.

(b) Defeat of Italy—Mussolini's fall— Allied invasion of Italy.

(c) Allied invasion of Europe on D. Day (6 June, 1944)

(d) Hitler commits suicide—30 April, 1945. Nazi Germany surrenders—on 8 May, 1945.

(e) Japan surrenders on Sept. 2, 1945.

SECTION—14

Results 15

(a) The Yalta Agreement 1945—Division of Germany and of Berlin—the Postsdam Agreement of Aug. 1945—its secrect clause relating to Russian entry in the Far Eastern War against Japan.

(b) Economic rehabilitation—the UNRRA; the Truman Doctrine, the Marshall Aid—the beginning of Cold War from 1947.

(c) Spread of nationalism and unrest in subject countries— winding up of empires under the impact of anti-colonial movements. British, Dutch, French and Portuguese (briefly).

(d) Triumph of socialistc forces and their consolidation in Europe and in South East Asia.

SECTION—15

The United nation 10

(a) The Atlantic Charter—1941 : The affirmation of the principle of self-determination; the San Fransisco Conference—1955 on the U.N. Charter— the foundation of the U. N. O. on Oct. 24, 1945— its organs and objectives— its differences from the League of Nations— its success and failures.

N.B. : The authors and Publishers will take note of the following :

1. That the number of pages excluding exercises and illustrations should not in any case exceed the total number Pages as mentioned in syllabus (2nd Paper—225 Pages) + Exercises and illustrations—25 pages.
2. That exercises should be given at the end of each chapter.
3. That a Bibliography is appended to the book.
4. That the precises of each chapter should be given at the end of the chapter.

সূচীপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

প্রথম অধ্যায়

১৭৬৩ খ্রীঃ ইওরোপ : সপ্তবর্ষের যুদ্ধের প্রভাব : জ্ঞানদীপ্ত শিল্প-বিপ্লব : আমেরিকার বিপ্লব : সপ্তবর্ষের যুদ্ধের প্রভাব : আলোকিত বা জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারের উদ্ভব : বৈশিষ্ট্য; ইওরোপের বিভিন্ন দেশে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারীদের শাসন; জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্রের দুর্বলতা : ব্যর্থতার কারণ; ইংলন্ডে শিল্প-বিপ্লবের উদ্ভব ও তার কারণ; আমেরিকার বিপ্লব বা স্বাধীনতার যুদ্ধের কারণ, ১৭৭৬ খ্রীঃ; আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলাফল ১—১৯

দ্বিতীয় অধ্যায় [ক]

ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯—১৮১৪) : ভূমিকা; ফরাসী বিপ্লবের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ; ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাতে দার্শনিকদের ভূমিকা; ফরাসী বিপ্লব ঘটার জন্যে বুরবোঁ রাজবংশের দায়িত্ব; রাজকীয় অর্থ সংকট; অভিজাত বিদ্রোহ; জাতীয় সভার অধিবেশন; বুর্জোয়া বিদ্রোহ; প্যারিসের বিপ্লব : বাস্তিলের পতন : কৃষক বিপ্লব; ফ্রান্সের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে সংবিধান সভার ভূমিকা; বিপ্লবের অগ্রগতি, ১৭৮৯-১৭৯৩ খ্রীঃ; ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল; বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ও তার প্রকৃতি; সন্ত্রাসের রাজত্ব; বিপ্লবী রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী ২০—৪১

দ্বিতীয় অধ্যায় [খ]

নেপোলিয়নের উত্থান; নেপোলিয়নের উত্থানের কারণ; নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও তার প্রকৃতি; নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিস্তার : টিলসিটের সন্ধি; নেপোলিয়নের পতন; নেপোলিয়নের পতনে মহাদেশীয় অবরোধের ভূমিকা; নেপোলিয়নের পতনের কারণ ১—৫৪

তৃতীয় অধ্যায়

ভিয়েনা কংগ্রেস : জুলাই ও ফেব্রুয়ারী বিপ্লব : মেটারনিখ্‌তন্ত্র : ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা : ভিয়েনা চুক্তি, ১৮১৫ খ্রীঃ; মেটারনিখ্‌তন্ত্র; ১৮২০ খ্রীঃ বিদ্রোহ; ল্যাটিন আমেরিকা; গ্রীসের স্বাধীনতার যুদ্ধ, ১৮২৭-১৮২৯ খ্রীঃ; ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লব ও ইওরোপে তার প্রভাব; ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের কারণ; ইওরোপে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রভাব : মেটারনিখ্‌তন্ত্রের পতন; ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্য : লুই নেপোলিয়ন ৫৫—৭৫

চতুর্থ অধ্যায়

শিল্প-বিপ্লব : ইংলন্ডে শিল্প-বিপ্লবের অগ্রগতি; ইওরোপ মহাদেশে শিল্প-বিপ্লব; শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ও শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল; শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন; সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি; আদি সমাজতন্ত্র; কার্ল মার্কস ও মার্কসীয় সমাজতন্ত্র ৭৬—৯৪

পঞ্চম অধ্যায়

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন : ইতালী ও জার্মানীর ঐক্য আন্দোলন : ইতালীর ঐক্য স্থাপন; ইতালীর মুক্তি আন্দোলনে তার নেতৃবৃন্দের ভূমিকা : মাৎসিনী, কাভুর প্রভৃতি : জার্মানীর ঐক্য আন্দোলন; বিসমার্কের কৃতিত্ব; পোলিশ জাতীয়তাবাদ : পোল্যান্ডের বিদ্রোহ ৯৫—১০৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ : ক্রীতদাস প্রথা বিলোপ : আব্রাহাম লিঙ্কন : আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কারণ : দাসপ্রথা ও বিচ্ছিন্নতার দাবী; আব্রাহাম লিঙ্কনের ভূমিকা ১০৯—১১৬

সপ্তম অধ্যায়

পূর্বাঞ্চল সমস্যা ঃ পূর্বাঞ্চল সমস্যার প্রকৃতি; ক্রিমিয়ার যুদ্ধ; রুমানিয় সমস্যা; বার্লিনের সন্ধি, ১৮৭৮ খ্রীঃ; বুলগেরিয়ার সমস্যা ঃ তুর্কী সাম্রাজ্যে জার্মানীর বিস্তৃতি ঃ বার্লিন-বাগদাদ রেলপথ পরিকল্পনা; আর্মেনিয় সমস্যা, তরুণ তুর্কী আন্দোলন, দুইটি বলকান যুদ্ধ; প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তুর্কী সাম্রাজ্যের পতন ১১৭—১৩০

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঃ ভার্সাইয়ের সন্ধি ঃ জাতিসঙ্ঘ ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য কাইজারের জার্মানীর দায়িত্ব; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গতি; প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের কারণ; প্যারিসের শান্তি সম্মেলন; ভার্সাইয়ের সন্ধি, ১৯১৯ খ্রীঃ; অন্যান্য শান্তি চুক্তিসমূহ; জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা ঃ জাতিসংঘের লক্ষ্য; লীগের সংগঠন; জাতিসংঘের কার্যকলাপ ও বিফলতার কারণ ১৩১—১৪৭

নবম অধ্যায়

আরব জাতীয়তাবাদ ও তুরস্কের জাগরণ ঃ কামাল পাশা ঃ আরব জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও প্রসার; আধুনিক তুরস্কের উত্থান ঃ মুস্তাফা কামাল পাশা; তুরস্কের আধুনিকীকরণ ১৪৮—১৫৮

দশম অধ্যায়

রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের সংস্কার নীতি ঃ রুশ বিপ্লব (১৮৬১-১৯২৮ খ্রীঃ) ঃ জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের ভূমিদাস মুক্তির আইন. ১৮৬১ খ্রীঃ; ভূমিদাস মুক্তি আইনের ফলাফল; জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের রাজনৈতিক ও অন্যান্য সংস্কার; ১৯০৫-এর বিপ্লব; ১৯১৭ খ্রীঃ বলশেভিক বা রুশ বিপ্লবের কারণ; অক্টোবর বিপ্লবে বলশেভিকদের জয়লাভের কারণ ঃ রুশ প্রজাতন্ত্রের পতনের কারণ; নব-প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত সরকার ঃ প্রথম-বিশ্বযুদ্ধ; ১৯১৭ খ্রীঃ বলশেভিক বিপ্লবের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব; সমাজতান্ত্রিক রুশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতি বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধ, ১৯১৮-১৯২১ খ্রীঃ; লেনিনের নব অর্থনীতি; লেনিনের কৃতিত্ব; লেনিনের মৃত্যু ঃ নব নেতা যোসেফ স্ট্যালিন ১৫৯—১৮৮

একাদশ অধ্যায়

দূর প্রাচ্যের কথা ঃ চীন ও জাপান ঃ চীনের বিচ্ছিন্নতাবাদ বা অবরুদ্ধ দ্বার প্রথা বা ক্যান্টন প্রথা; অহিফেন যুদ্ধ ঃ ইঙ্গ-চীন যুদ্ধ ঃ চীনে ইওরোপীয় অনুপ্রবেশ; চীনে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবচ্ছেদের প্রয়াস ঃ চীনা তরমুজের বাটোয়ারা; চীনের প্রতিক্রিয়া ঃ তাই-পিং বিপ্লব; বক্সার বিদ্রোহ, ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের অভ্যুদয়; ১৯১১ খ্রীঃ-এর প্রজাতন্ত্রী বিপ্লব; ৪ঠা মে-র আন্দোলন; চীনে কমিউনিস্ট আন্দোলন ঃ চিয়াং-কাই-শেখ ও কুয়ো মিন তাং দল ঃ চীন-জাপান যুদ্ধ; মাও-সে-তুং ও চীনে সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র স্থাপন; জাপান ও তার বিচ্ছিন্নতা ঃ জাপানে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ; সম্রাটের ক্ষমতায় পুনঃ-প্রতিষ্ঠা ঃ নূতন সরকারের সংগঠন ঃ জাপানের আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও সংগঠন; জাপানের সাম্রাজ্যবাদী প্রসারণ নীতি; জাপান ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তার নীতি এবং ওয়াশিংটন চুক্তি; জাপানের রাজনীতিতে জাপানের সামরিক নেতাদের হস্তক্ষেপ ও তার প্রভাব ঃ মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ ঃ দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান ১৮৯—২২০

দ্বাদশ অধ্যায়

ইওরোপে ফ্যাসিবাদের উত্থান ঃ নাৎসী জার্মানী ঃ ফ্যাসিষ্ট ইতালী ঃ স্পেনের গৃহযুদ্ধ ঃ

ইতালীতে মুসোলিনীর উত্থান, ফ্যাসিষ্ট একনায়কতন্ত্রের সংগঠন : ফ্যাসিষ্ট ইতালীর আভ্যন্তরীণ সংগঠন; মুসোলিনীর অবিসিনিয়া আক্রমণ : আফ্রিকা নীতি; জার্মানীতে নাৎসী দলের উত্থান ও নাৎসী সংগঠন : নাৎসী দলের সংগঠন নীতি ও জার্মানীর নাৎসীকরণ; নাৎসী জার্মানীর ভার্সাই সন্ধি ভঙ্গ : জার্মানীর অস্ত্রসজ্জা; রোম-বার্লিন অক্ষচুক্তি : জাপানের যোগদান, ১৯৩৬ খ্রীঃ; ইঙ্গ-ফরাসী ও ইওরোপের অন্যান্য শক্তিগুলির নাৎসী জার্মানী সম্পর্কে নীতি : নাৎসী-তোষণ নীতি; রুশ-জার্মানীর অনাক্রমণ চুক্তি; জার্মানীর পোল্যান্ড আক্রমণ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা, ১লা—৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ খ্রীঃ; স্পেনের গৃহযুদ্ধ ২২১—২৩৮

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : কারণ; যুদ্ধের বিবরণ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিস্তৃতি; সোভিয়েত রাশিয়া, জাপান ও মার্কিন দেশের যোগদান; ফ্যাসিষ্ট ইতালীর পতন : মিত্রশক্তির ইতালী আক্রমণ ও ইতালী অধিকার; "ডি" দিবস : মিত্র শক্তির পশ্চিম ইওরোপে অবতরণ; জার্মানীর আত্মসমর্পণ, ৮ই মে, ১৯৪৫ খ্রীঃ; হিটলারের আত্মহত্যা; নাৎসী জার্মানীর পতনের কারণ; জাপানের আত্মসমর্পণ ২৩৯—২৫১

চতুর্দশ অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী চুক্তিগুলি ও তার সমস্যা : ঠাণ্ডা লড়াই : সাম্রাজ্যবাদের পতন : সমাজতন্ত্রবাদের জয় : ইয়াল্টা চুক্তি, ১৯৪৫ খ্রীঃ পটসডাম চুক্তি, ১৯৪৫ খ্রীঃ; অর্থনৈতিক পুনর্বাসন, ট্রুম্যান নীতি : মার্শাল পরিকল্পনা, পূর্ব-পশ্চিম ঠাণ্ডা লড়াই; জাতীয়তাবাদের জয় : সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে অধীন জাতিগুলির মুক্তি; ইওরোপ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সমাজতন্ত্রবাদের জয় এবং স্থিতিলাভ ২৫২—২৬৯

পঞ্চদশ অধ্যায়

জাতিপুঞ্জ : আটলান্টিক সনদ : সান-ফ্রানসিস্কো সম্মেলন : জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা; জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন এবং জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য : জাতিপুঞ্জের সঙ্গে জাতিসংঘের প্রভেদ : জাতিপুঞ্জের সাফল্য ও ব্যর্থতা ২৭০—২৭৫

ইওরোপ

ও

বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা

সূচনা
(Introduction)

ইতিহাস প্রবহমান। কোন নির্দিষ্ট কাল ও স্থানের গণ্ডীর মধ্যে ইতিহাসকে আবদ্ধ করা যায় না। ভলতেয়ার এজন্যে universal history বা সর্বজনীন, বিশ্বজনীন ইতিহাসের কথা বলেছেন। ইতিহাসের মধ্যে যুগোত্তর, সর্বকালীন দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসন্ধান এখন অনেক ঐতিহাসিকের লক্ষ্য। এই সর্বকালীন প্রবহমান ইতিহাসের বিপুল স্রোতের একটু দিক উদ্‌ঘাটন করে মানুষ কিভাবে তার সমাজ, রাষ্ট্র, সভ্যতাকে যুগে যুগে গড়ে চলেছে তা উপলব্ধি করা যায়।

ইতিহাসের ধারা অবিচ্ছিন্ন ও প্রবহমান হলেও তার গতিপথে বিশেষ ধারা বিশেষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি, চিন্তাধারার পরিবর্তন, অর্থনৈতিক কাঠামো ও উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন ইতিহাসের কালের মন্দিরায় নতুন সুরে ঝঙ্কার তোলে। তাতে ইতিহাসের তাল ভঙ্গ হয় না। কারণ এই সামগ্রিক সর্বব্যাপী গতির ধারাই তো ইতিহাস। এভাবে নতুন ভাবধারা, নতুন অর্থনৈতিক কাঠামো, নতুন উৎপাদন-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রচিন্তার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে আধুনিক যুগের ইতিহাস। রেনেসাঁস বা জাগৃতি আন্দোলনের যুক্তিবাদ ও মুক্ত মানসিকতায় তার আবির্ভাবের শঙ্খধ্বনি বেজে ওঠে। মধ্যযুগের গীর্জা-শাসিত ইওরোপের অন্ধবিশ্বাসের তমসা দূর করে রেনেসাঁসের যুক্তিবাদ, আত্মবিশ্বাস ব্যক্তির মনের ও চিন্তার স্বাধীন বিকাশ ঘটায়। এই যুক্তিবাদকে আশ্রয় করে যে মুক্তির হাওয়া বইতে থাকে, তার ফলে সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন ও ভৌগোলিক আবিষ্কার প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইওরোপীয় জাতিগুলির প্রতিভা ও উদ্যম ছড়িয়ে পড়ে। পেত্রার্ক, বোকাচ্চিও, ইরাসমাস, বেকন প্রভৃতি মনীষীর দানে ইওরোপীয় সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, মাইকেল এ্যাঞ্জেলো, রাফায়েল প্রভৃতি চিত্রশিল্পীর শিল্পরচনায় নতুন যুগের সূচনা হয়।

আধুনিক যুগের প্রধান ঘটনা হল জাতীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি। মধ্যযুগের পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের আদর্শের স্থলে ফ্রান্স, জার্মানী, ইংলন্ড, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে জাতীয় রাজতন্ত্রের বিকাশ হয়। ফ্রান্সে বুরবোঁ, অস্ট্রিয়ায় হ্যাপসবার্গ, প্রাশিয়ায় হোহেনজোলার্ন, রাশিয়ায় রোমানভ এবং ইংলণ্ডে হ্যানোভার রাজবংশের নেতৃত্বে জাতীয় রাষ্ট্রের অগ্রগতি হয়।

আধুনিক যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ দখলের জন্যে ইওরোপীয় জাতিগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অষ্টাদশ শতকের মার্কান্টাইলবাদী অর্থনীতি এবং তারপর শিল্প-বিপ্লব এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে জোরদার করে। উপনিবেশ দখলের জন্যে ইংলন্ডের সঙ্গে ফ্রান্স ও স্পেনের দীর্ঘকাল লড়াই চলে। শেষ পর্যন্ত ইংলন্ড তার নৌবলের সাহায্যে জয়লাভ করে শ্রেষ্ঠ ঔপনিবেশিক শক্তিতে পরিণত হয়।

আধুনিক যুগে শিল্প-বিপ্লবের ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থায় বিপুল পরিবর্তন ঘটে। কুটিরশিল্পের স্থলে বড় বড় কল-কারখানায় শিল্প উৎপাদন আরম্ভ হয়। এক শ্রেণীর লোক এই কল-কারখানা ও উৎপাদন-ব্যবস্থাকে তাদের একচেটিয়া অধিকারে এনে মুনাফার পাহাড় জমায়। সমাজে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রসার হয় এবং রাষ্ট্রের উপরও তার প্রভাব পড়ে। সামন্তশ্রেণী একদা যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ভোগ করত, তা ধীরে ধীরে এই নবোদিত পুঁজিবাদী শ্রেণী অধিকার করে। এই শ্রেণীকে বলা হয় বুর্জোয়া। কল-কারখানায় বহু শ্রমিক কাজ করে জীবনধারণ করে। শ্রমিকেরা যৎসামান্য পারিশ্রমিক ও অস্বাস্থ্যকর বাসস্থানে বাস করতে বাধ্য হয়। এর ফলে শ্রমিক-সমস্যা দেখা দেয়। কল-কারখানাকে কেন্দ্র করে বড় বড় শিল্প-শহর গড়ে ওঠে গ্রাম

হতে লোক শহরে জীবিকার জন্যে চলে আসতে থাকে। এর ফলে গ্রামীণ জীবনের পরিবর্তন হয়। শহরগুলি জনসংখ্যার চাপে ধুঁকতে থাকে।

অষ্টাদশ শতক ছিল "বিপ্লবের যুগ" (Age of Revolution)। এই শতকে আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ বা আমেরিকার বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব এবং শিল্পবিপ্লব ঘটে। এই তিন বিপ্লবের রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। আমেরিকার বিপ্লবকে কেন্দ্র করে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ, গণতন্ত্রবাদ ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার আদর্শ বিকশিত হয়। ফরাসী বিপ্লব ইওরোপের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রবাদ, স্বর্গীয় অধিকারবাদ, সামন্ত-প্রথার শিকড় উপড়ে ফেলে। ইওরোপে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্রবাদ ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার আদর্শকে ছড়িয়ে দেয়। শিল্প-বিপ্লব কৃষি-নির্ভর সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিকে ধ্বংস করে শিল্প-নির্ভর নাগর অর্থনীতির জন্ম দেয় এবং মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রতিপত্তির পথ তৈরি করে।

প্রথম অধ্যায়

১৭৬৩ খ্রীঃ ইওরোপ ঃ সপ্তবর্ষের যুদ্ধের প্রভাব ঃ জ্ঞানদীপ্তি ঃ শিল্প-বিপ্লব ঃ আমেরিকার বিপ্লব

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ সপ্তবর্ষের যুদ্ধের প্রভাব (Impact of the Seven Years War) ঃ সপ্তবর্ষের যুদ্ধ ১৭৫৬-১৭৬৩ খ্রীঃ এই সাত বছর চলে। এই যুদ্ধে এক পক্ষে ছিল ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া ও তাদের মিত্রশক্তিরা। অন্যদিকে ছিল প্রাশিয়া, ব্রিটেন ও অন্যান্য মিত্রশক্তি। আসলে সপ্তবর্ষের যুদ্ধে দুই প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল, যথা, ইওরোপ মহাদেশে প্রাশিয়া ও তার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্স; ইওরোপের বাইরে ভারত ও আমেরিকায় উপনিবেশ দখলের জন্যে ইংলন্ড বনাম ফ্রান্স যুদ্ধে রত ছিল। ১৭৬৩ খ্রীঃ ১৫ই ফেব্রুয়ারি হিউবার্টসবার্গের সন্ধির দ্বারা অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও স্যাক্সনীর মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। একই বছরে ১০ই ফেব্রুয়ারি প্যারিসের সন্ধির দ্বারা ইংলন্ড, স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। এই দুই সন্ধির দ্বারা ১৭৬৩ খ্রীঃ সপ্তবর্ষের যুদ্ধের কার্যত অবসান হয়। হিউবার্টসবার্গের সন্ধির দ্বারা অস্ট্রিয়ার রানী মেরিয়া থেরেসা সাইলেশিয়া ও গ্লাৎস প্রদেশের উপর তাঁর অধিকার প্রাশিয়ার অনুকূলে ত্যাগ করেন। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে অন্যান্য ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা স্থাপিত হয়। প্যারিসের সন্ধির দ্বারা ইংলন্ড উত্তর আমেরিকার কানাডা, নোভাস্কোশিয়া, কেপ-ব্রিটন প্রভৃতি অঞ্চল ফ্রান্সের কাছ থেকে পায়। উত্তর আমেরিকার মিসিসিপি নদী পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল থেকে ফ্রান্স সরে যায় এবং এই অঞ্চলে ইংলন্ডের উপনিবেশবিস্তারের পথ প্রস্তুত হয়। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত গ্রানাডা, সেন্ট ভিনসেন্ট, টোব্যাগো, ডোমিনিকা প্রভৃতি স্থানগুলি যা ফ্রান্স ইংলন্ডের কাছ থেকে যুদ্ধের সময় দখল করে, তা এখন ফিরিয়ে দেয়।

হিউবার্টসবার্গের ও প্যারিসের সন্ধি, ১৭৬৩ খ্রীঃ

উপরের শর্তগুলির বিনিময়ে ইংলন্ড গুয়াদালোপ, মার্তিনিখ, সেন্ট লুসিয়া প্রভৃতি স্থান ফ্রান্সকে ফিরিয়ে দেয়। ভারতবর্ষে ভবিষ্যতে সাম্রাজ্যস্থাপনের কোন চেষ্টা না করতে এবং ভারতীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ না করতে ফ্রান্স প্রতিশ্রুতি দেয়। ইংলন্ড ফ্রান্সকে ভারতে তার বাণিজ্যকেন্দ্র চন্দননগর (অথবা চন্দরনগর), পণ্ডিচেরী, মাহে প্রভৃতি ফিরিয়ে দেয়।

প্যারিসের সন্ধির অন্যান্য শর্ত

স্পেন মধ্য আমেরিকায় ফ্লোরিডা অঞ্চল ইংলন্ডকে হস্তান্তর করে। এর বিনিময়ে ইংলন্ড কিউবা, ম্যানিলা ও ফিলিপিন স্পেনকে ফিরিয়ে দেয়। ফ্রান্স ও স্পেন উভয়ে পর্তুগালের স্বাধীনতা স্বীকার করে।

স্পেনের সম্পর্কিত শর্ত

সপ্তবর্ষের যুদ্ধের ফল ইংলন্ডের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী ছিল বলা যায়। প্যারিসের সন্ধির ফলে ইংলন্ড বিশ্বের সর্বপ্রধান ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ভারতবর্ষ ও উত্তর আমেরিকায় ফরাসী শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা চূর্ণ হয় এবং ইংলন্ডের একচ্ছত্র উপনিবেশ স্থাপনের পথ প্রস্তুত হয়। কানাডা ইংরাজ উপনিবেশে পরিণত হয়। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেও ইংরাজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষ থেকে ফরাসী শক্তি হটে গেলে ইংরাজের একচেটিয়া বাণিজ্য ও রাজ্যবিস্তারের সূত্রপাত হয়। ইংলন্ডের দুই প্রধান নৌ-প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্স ও স্পেন এই যুদ্ধে হীনবল হয়ে পড়লে ইংলন্ড সমুদ্রপথে একক প্রাধান্য পায়। নৌশক্তির সাহায্যে ইংলন্ড তার বাণিজ্য ও

সপ্তবর্ষের যুদ্ধের ফলে ইংলন্ডের বিরাট সাফল্য

উপনিবেশকে ইওরোপের বাইরে ছড়িয়ে দেয়। এই কারণে ঐতিহাসিক ফিশার মন্তব্য করেছেন যে, "১৭৬৩ খ্রীঃ ইংরাজজাতি সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক সন্ধি লাভ করে।"

ডেভিড ওগ প্রভৃতি ঐতিহাসিক প্যারিসের সন্ধিকে ইংলন্ডের পক্ষে "অপ্রচুর ও নিরাপত্তাহীন" বলেন। তাঁদের মতে, ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট মনে করতেন যে, প্যারিসের সন্ধির শর্ত ইংলন্ডের প্রত্যাশা পূরণ করে নাই। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে ঐতিহাসিক ফিশার এই অভিমতকে অগ্রাহ্য করেছেন। কারণ ইংলন্ড সপ্তবর্ষের যুদ্ধে সর্বাপেক্ষা কম লোকক্ষয় করে সর্বাপেক্ষা বেশী লাভবান হয়। এই যুদ্ধে ইংলন্ড যে অর্থ ব্যয় করে, বাণিজ্য ও উপনিবেশ থেকে শীঘ্রই তার বহু গুণ বেশী অর্থ ইংলন্ড পায়। সপ্তবর্ষের যুদ্ধে ইংলন্ডের লোকক্ষয় বেশী হয়নি। ভারতে পলাশীর যুদ্ধে মাত্র ২০ জন ইংরাজ সৈন্য, হায়দার আলীর বিরুদ্ধে বন্দীবাসের যুদ্ধে ১৯০ জন ও কানাডার যুদ্ধে ১৫০০ জন ইংরাজ সৈন্য মারা পড়ে। অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ বলেন যে, ইংলন্ড এই যুদ্ধের পর ভারত ও আমেরিকার উপনিবেশ শোষণ করে তার অর্থনৈতিক শক্তি বাড়ায়। ফিশার আরও বলেছেন যে, "আমেরিকা ছিল ইংলন্ডের সম্পদের উৎস, ইংলন্ডের শক্তির স্নায়ু এবং ইংলন্ডের নৌশক্তির প্রধান পালনকারী।"[১]

বিরুদ্ধ মত ও তার সমালোচনা

সপ্তবর্ষের যুদ্ধের পরোক্ষ ফলের দিক হতে ইংলণ্ডের ক্ষতিও কম হয় নাই। কানাডায় ফরাসী প্রতিপত্তি নষ্ট হলে আমেরিকার ত্রয়োদশ ইংরাজ উপনিবেশে ফরাসী আক্রমণের সম্ভাবনা দূর হয়। এই উপনিবেশগুলির আত্মরক্ষার জন্যে আর মাতৃভূমি ইংলন্ডের আশ্রয় নেওয়ার দরকার হয় নাই। ফলে এই উপনিবেশগুলি ইংলণ্ডের অধীনতা ছিন্ন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সপ্তবর্ষের যুদ্ধ আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের বীজ বপন করে।

আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের বীজ বপন

ইওরোপের ক্ষেত্রে সপ্তবর্ষের যুদ্ধ কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। প্রথমতঃ, ফ্রান্স ইওরোপে বৃহৎ শক্তিগুলিব মধ্যে যে মর্যাদা ভোগ করত, সপ্তবর্ষের যুদ্ধের পর তা হারিয়ে ফেলে। ইংলণ্ডের হাতে পরাজিত হয়ে ফ্রান্স ভারত, কানাডা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়; সমুদ্রপথে ও ইওরোপের বাইরে ফ্রান্স তার আধিপত্য হারায়। সপ্তবর্ষের যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের মিত্রতা জোট ফরাসী জনগণের নিকট ভ্রান্ত নীতি রূপে প্রমাণিত হয়। লোকে মনে করে যে, অস্ট্রিয়ার মিত্রতার জন্যেই এই যুদ্ধে ফ্রান্সের এত ক্ষয়-ক্ষতি হয়। বুরবোঁ রাজবংশ জনপ্রিয়তা হারায়। দ্বিতীয়তঃ, প্রাশিয়া সপ্তবর্ষের যুদ্ধে জয়লাভ করে ইওরোপে বৃহৎ শক্তি হিসাবে স্থায়ী আসন পায়। প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফেড্রারিক তাঁর রণকুশলতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার জন্যে ইওরোপে বিশেষ মর্যাদা পান। প্রাশিয়ার জনগণ তাঁকে The Great বা 'মহান ফ্রেডারিক' নামে অভিহিত করে। প্রাশিয়াকে এই মর্যাদালাভের জন্যে সপ্তবর্ষের যুদ্ধে কম মূল্য দিতে হয়নি। প্রাশিয়ার ৪৫ লক্ষ লোকের মধ্যে ৫ লক্ষ লোক এই যুদ্ধে নিহত হয়। গ্রামগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। কৃষির প্রচুর ক্ষতি হয়। কিন্তু এই বিপর্যয়ের অগ্নিপরীক্ষায় প্রাশিয়ার জনগণ তাদের ইস্পাতেব মত দৃঢ় মনোবল ও সহনশক্তি দেখায়। এজন্য প্রাশিয়া ইওরোপে সকলের শ্রদ্ধা পায়। প্রাশিয়ার এই জয়ের মূলে ছিল দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের নেতৃত্ব ও রণকৌশল। তৃতীয়তঃ, সপ্তবর্ষের যুদ্ধের পর রুশ-প্রাশিয় মৈত্রী স্থাপিত হয় এবং এর ফলে উভয় রাষ্ট্র পোল্যান্ড গ্রাস করে। চতুর্থতঃ, সপ্তবর্ষের যুদ্ধে জয়লাভের ফলে প্রাশিয়া জার্মানীর অন্যতম নেতায় পরিণত হয়। এর ফলে জার্মানীর উপর আধিপত্যের জন্যে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার দীর্ঘস্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। সবশেষে, স্পেন সপ্তবর্ষের যুদ্ধে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ইওরোপের রাজনীতিতে তার প্রভাব হারিয়ে ফেলে।

ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক ক্ষয়-ক্ষতি, প্রাশিয়ার বৃহৎ শক্তির মর্যাদা লাভ: অন্যান্য ফল

১· "It (America) was the fountain of our wealth, the nerve of our strength, the nursery and basis of our royal power—Fisher. P. 762.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ [ক] : আলোকিত বা জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারের উদ্ভব : বৈশিষ্ট্য (Rise of Enlightened Despotism : Its characteristics) : সপ্তদশ শতকের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ছিল স্বর্গীয় অধিকারমূলক রাজতন্ত্র। ইওরোপের রাজারা মনে করতেন যে, তাঁরা ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত এবং তাঁদের কর্তব্যকর্মের জন্যে তাঁরা একমাত্র ঈশ্বরের নিকট দায়বদ্ধ। প্রজাদের মঙ্গলের জন্যে কাজ করতে তাঁদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই ছিলেন এই স্বর্গীয় অধিকারযুক্ত স্বৈরতন্ত্রের প্রধান প্রবক্তা। তিনি রাজার ক্ষমতাকে এত বড় ভাবতেন যে, তিনি বলেন—"আমিই হলাম রাষ্ট্র" (I am the state)।

সপ্তদশ শতকের স্বর্গীয় অধিকারের আদর্শ

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি এই নির্জলা স্বর্গীয় অধিকারবাদী স্বৈরতন্ত্রের দুর্বলতা ধরা পড়ে। অষ্টাদশ শতকে ইওরোপে বহু দার্শনিকের উদ্ভব হয়। তাঁরা তাঁদের চিন্তাধারার আলোকে যে যুক্তিবাদ প্রবর্তন করেন,—তা সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি সকল কিছুকেই আলোকিত করে। অষ্টাদশ শতকের দার্শনিকরা প্রমাণ করেন যে, বিশ্বে সকল কিছুই নিয়মের অধীন। প্রকৃতি নিয়ম মেনে চলে। তাহলে রাষ্ট্রেরও নিয়ম মেনে চলা উচিত। যুক্তি হল নিয়মের উৎসভূমি। যুক্তি এই শিক্ষা দেয় যে, রাজারা শুধুমাত্র অধিকার ভোগ করতে পারেন না। অধিকারের সঙ্গে কর্তব্য জড়িত। অধিকার ভোগ করতে হলে কিছু কর্তব্য করতে হয়। কর্তব্যহীন অধিকারবাদ যুক্তিসম্মত নয়। রাজাদের উচিত তাঁদের স্বৈরতান্ত্রিক অধিকারের সঙ্গে প্রজাকল্যাণের জন্যে কর্তব্য পালন করা। দার্শনিকদের এই আলোকিত মতবাদকে ইওরোপের বহু রাজা গ্রহণ করে কার্যকরী করার চেষ্টা করেন। এভাবে আলোকিত স্বৈরতন্ত্র বা জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভব হয়।

অধিকারের সঙ্গে কর্তব্যের সমন্বয়

অধ্যাপক জে· এম· রবার্টস ও অধ্যাপক হাবাকুকের মতে, আলোকিত স্বৈরাচারের ভাবাদর্শ গঠনে দুই দার্শনিকের মতবাদ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে, যথা জন লকের মতবাদ এবং ফিজিওক্র্যাটবাদী দর্শন। জন লকের চুক্তিতত্ত্বে বলা হয় যে একটি সামাজিক চুক্তির ফলে জনসাধারণ রাজাকে শাসনক্ষমতা দেয়। লকের এই মত প্রাশিয়ার ফ্রেডারিক দি গ্রেট সহ অনেক রাজাকে প্রভাবিত করে। এর ফলে ফ্রেডারিক বলেন যে, তিনি প্রজাদের কল্যাণ-সাধনের জন্যে দায়িত্ববদ্ধ। তিনি নিজেকে রাষ্ট্রের প্রধান ভৃত্য বলে বর্ণনা করেন। ফিজিওক্র্যাট-দর্শনের অনুরাগীরা বলেন যে, প্রজাদের স্বাধীনতা ও সম্পত্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে রাজা স্বৈরতন্ত্র ব্যবহার করতে পারেন। এইভাবে দুই দার্শনিক মতবাদ আলোকিত স্বৈরতন্ত্রগঠনে সাহায্য করে।[১]

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। (১) জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকেরা যুক্তিবাদের প্রভাবে প্রজাদের কল্যাণের জন্যে সংস্কার চালু করলেও, তাঁরা তাঁদের স্বৈর-ক্ষমতাকে ছাড়তে রাজী ছিলেন না। সুতরাং রাজকীয় স্বৈর-ক্ষমতা সঙ্কোচনের জন্যে তাঁরা কোন সংস্কার বা আইন রচনায় রাজী ছিলেন না। (২) তবে এই স্বৈরাচারী শাসকেরা জ্ঞানদীপ্তির ফলে মনে করতেন যে, তাঁদের অধিকারের সমর্থনে প্রজাদের স্বার্থে কিছু সংস্কার করা দরকার। (৩) কিন্তু রাজা যেহেতু রাষ্ট্রের মস্তিষ্ক, যেহেতু মস্তিষ্ক যেমন দেহকে চালনা করে, রাজাও তেমনি রাষ্ট্রকে চালাবেন ও সংস্কার প্রবর্তন করবেন। অর্থাৎ প্রজাদের জন্যে রাজা সংস্কার করলেও, প্রজাদের দ্বারা এই সংস্কারের কাজ চালু করা হবে না (Everything for the people; but nothing by the people). (৪) রাষ্ট্র হল সকলের ওপরে এবং সর্বশক্তির আধার। রাজা-প্রজা সকলেই রাষ্ট্রের অধীন। প্রাশিয়ার রাজা

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি

১· Now Cambridge Modern History. Vol. VIII.

তিনি আইন কমিশন বসিয়ে আইনের সঙ্কলন করেন একথা সত্য। কিন্তু পক্ষপাতহীন ন্যায়-বিচারমূলক আইন তিনি চাইতেন না। তিনি দরকার হলে আইনকে মানতেন না। ঐতিহাসিক হ্যাবাকুকের মতে, ফ্রেডারিকের জ্ঞানদীপ্তিমূলক শাসন ছিল অনেকটা লোকদেখানো আড়ম্বর। মানসিক দিক থেকে তিনি ছিলেন ঘোর স্বৈরাচারী। তিনি তাঁর স্বৈরাচারকে তত্ত্বের দ্বারা বৈধ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন মাত্র। দ্বিতীয় যোসেফের তুলনায় তিনি ছিলেন কম আদর্শবাদী। তিনি ছিলেন অত্যধিক সুযোগবাদী ও বাস্তববাদী।

অস্ট্রিয়া ঃ জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী দ্বিতীয় যোসেফের কৃতিত্ব ঃ অস্ট্রিয়ার রাজা দ্বিতীয় যোসেফ ছিলেন জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরশাসকদের শীর্ষস্থানীয়। "যুক্তিবাদের যুগে যুক্তিবাদে প্রভাবিত রাষ্ট্র-নেতাদের মধ্যে তিনি চরম উৎকর্ষতা লাভ করেন" (A statesman par-excellence in the Age of Reason)। তিনি বলেন যে, "আমি দর্শনশাস্ত্রকে আমার রাজ্যের আইন রচনার ভার দিয়েছি। তার যুক্তিবাদী নীতি অস্ট্রিয়ার জীবনধারাকে বদলিয়ে দেবে।" দ্বিতীয় যোসেফ প্রাদেশিক সভাগুলির ক্ষমতা খর্ব করে কেন্দ্রীকরণ-নীতিকে তীব্রতর করেন। তিনি গোটা সাম্রাজ্যকে ১৩টি সার্কেল বা অঞ্চলে ভাগ করেন। প্রতি সার্কেলকে কয়েকটি জেলায় এবং প্রতি জেলাকে কতকগুলি পৌরঅঞ্চলে ভাগ করা হয়। তিনি বহুভাষী অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের ঐক্যবৃদ্ধির জন্যে জার্মানভাষাকে সরকারী ভাষার মর্যাদা দেন। তিনি ফৌজদারী আইনের সংস্কার করে গুরুতর অপরাধ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড রহিত করেন। তিনি ১৭৮৬ খ্রীঃ দেওয়ানী আইনবিধি প্রবর্তন করেন। এর ফলে জ্যেষ্ঠপুত্রের পিতার সম্পত্তিতে একমাত্র উত্তরাধিকারপ্রাপ্তির প্রথা লোপ করা হয়। সকল সন্তানকে পিতার সম্পত্তিতে সমান অধিকার দান করা হয়। এতদিন ধরে গীর্জার সম্মতিক্রমে গীর্জায় শুল্ক দিয়ে লোককে বিবাহ করতে হত। যোসেফ এই প্রথা লোপ করে সরকারী অফিসে নাম রেজেস্ট্রি করে বিবাহদানের আদেশ জারী করেন। তাঁর এই সংস্কারগুলি ছিল যুক্তিবাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণাকে তিনি হটিয়ে দিতে চেষ্টা করেন।

দ্বিতীয় যোসেফ অস্ট্রিয়ার শিক্ষাব্যবস্থাকে বিশেষভাবে সংস্কারের উদ্যোগ নেন। তিনি ধর্মীয় সংগঠনগুলির আয়কে বাজেয়াপ্ত করে সেই টাকা শিক্ষাখাতে খরচ করেন। তিনি প্রাশিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের মতই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার চেষ্টা করেন। তিনি সাম্রাজ্যের সকল অঞ্চলে জার্মান ভাষাশিক্ষা বাধ্যতামূলক করেন। যোসেফ ব্যয়সংকোচের উদ্দেশ্যে উচ্চতর শিক্ষাকে উৎসাহ দেননি। তিনি উপযোগবাদী, কার্যকরী শিক্ষার উপরে জোর দেন। সরকারের পদগুলিতে নূতন কর্মচারী নিয়োগের জন্যে যতজন প্রার্থী দরকার, ঠিক তত সংখ্যক ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হত। এর ফলে তারা পাস করে চাকুরি পেত।

১৭৮০ খ্রীঃ তার মাতা সাম্রাজ্ঞী মারিয়া থেরেসার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসে যোসেফ ব্যয়সংকোচের দিকে বিশেষ নজর দেন। তিনি রাজপরিবারের খরচা কমান। রাজসভায়, আড়ম্বর বাদ দেন। তিনি ব্যয়সংকোচের জন্যে তাঁর নিজের সিংহাসনে অভিষেকের উৎসব নাকচ করেন। সরকারী কর্মচারীদের ব্যয় কমাতে বাধ্য করেন। তাঁর ব্যয়সংকোচের ফলে সর্বকালের বিখ্যাত সুরকার মোভসর্টের সঙ্গীত-অনুষ্ঠানগুলি ছাঁটাই করা হয়। দ্বিতীয় যোসেফের কর-নীতি ছিল প্রগতিশীল। এতদিন ধরে অস্ট্রিয়ার অভিজাতশ্রেণী বেশী জমি ভোগ করলেও। খুব কম কর দিত। তা ছাড়া তারা ভূমিদাস ও কৃষকের কাছ থেকে বিরাট অঙ্কের সামন্ত-কর আদায় করে তা বিলাস-ব্যসনে খরচা করত। যোসেফ যুক্তিবাদী দর্শনের প্রভাবে অভিজাতদের এই সকল বিশেষ সুবিধা ভোগের অধিকার লোপ করেন। তিনি বলেন যে, "আমি একজন কর্মহীন সামন্ত

প্রভুর স্বার্থরক্ষার জন্যে ২০০ জন সৎ কৃষককে শোষিত হতে দিতে পারি না"। যোসেফ একটি ঘোষণা দ্বারা আয়ের অনুপাতে কর ধার্য করেন। সামন্ত-প্রভুদের তীব্র বাধা সত্ত্বেও যোসেফ জমি জরীপ আয়ের ও আদমশুমারির ভিত্তিতে সরকারী খতিয়ান তৈরি করেন। এর ফলে সামন্ত-প্রভুদের দ্বারা কর এড়াবার জন্যে প্রচুর লুকানো জমি ধরা পড়ে। এই খতিয়ানের ভিত্তিতে যোসেফ ঘোষণা করেন যে, সাম্রাজ্যের সর্বত্র কৃষক ও অভিজাতরা ফসলের ১২$\frac{২}{৯}$% কর সরকারকে আদায় দিতে বাধ্য থাকবে। এর ফলে সামন্তরা জমি জরীপ আয়ের ১২$\frac{২}{৯}$% দিতে বাধ্য হয়। কৃষকরা তাদের প্রদেয় সামন্ত-কর ১৭$\frac{৭}{৯}$% হারে দিবে বলা হয়। এর বেশী কোন কর সামন্তরা পাবে না বলে ঘোষণা করা হয়। কৃষকরা তাদের ফসলের ১২$\frac{২}{৯}$% সরকারকে এবং ১৭$\frac{৭}{৯}$% সামন্ত-প্রভুদের দিয়ে ১২$\frac{২}{৯}$%+১৭$\frac{৭}{৯}$%=৩০ ভাগ ফসল কর হিসাবে দেয়। বাকী ৭০ ভাগ ফসল তারা ভোগ করতে পারে। তবে এর দশ ভাগ থেকে ফ্রান্সের বিদ্যালয়ের খরচ, গীর্জার খরচ বাবদ কিছু দিতে হত। বাকী সমুদয় ফসল কৃষক তার ভরণপোষণের জন্য ব্যয় করতে পারত। যোসেফ ভূমিদাস-প্রথা লোপ করেন।

যোসেফের উদ্দেশ্য ছিল উপরোক্ত কর-নীতির দ্বারা একদিকে কৃষকের প্রতি ন্যায়বিচার করা, অপরদিকে সরকারের রাজস্ববৃদ্ধি করা। তাঁর উদ্দেশ্য বিফল হয়নি। ১৭৮১ খ্রীঃ তাঁর রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৬৫,৭৭৭,৭৮০ ফ্লোরিণ। ১৭৮৮ খ্রীঃ তা দাঁড়ায় ৮৭,৪০৩,৭৪০ ফ্লোরিণে। তিনি অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে নানাবিধ ব্যবস্থা নেন। (১) ক্যাথলিক গীর্জার আপত্তি অগ্রাহ্য করে তিনি প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বী বণিক, কারিগর ও দক্ষ শিল্পীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দেন। এজন্য তিনি ১৭৮১ খ্রীঃ তাঁর ধর্মমতসহিষ্ণুতামূলক আদেশনামা জারী করেন। (২) তিনি গিল্ড বা শিল্পী-বণিক সঙ্ঘগুলির ক্ষমতা সংকুচিত করে দেন। এর ফলে যে-কোন দক্ষ কারিগর তার কারখানা গঠন করতে সুযোগ পায়।(৩) তিনি সংরক্ষণ-প্রথা দ্বারা দেশীয় শিল্পকে রক্ষার চেষ্টা করেন। বিদেশ থেকে শিল্পদ্রব্য আমদানি তিনি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করেন। দেশীয় শিল্পকে উৎসাহ দেন। (৪) তিনি ক্যাথলিক মঠগুলি উচ্ছেদ করে মঠের জমি অধিগ্রহণ করেন। মঠগুলিকে বিদ্যালয় বা কারখানায় রূপান্তরিত করেন।

যোসেফের সংস্কার সাম্রাজ্যের সর্বত্র গভীর আলোড়ন ও বিদ্রোহ সৃষ্টি করে। তাঁর ভাষা-নীতি, কর-নীতি, ভূমি-রাজস্ব নীতির বিরুদ্ধে জমিদারশ্রেণী তাদের স্বার্থরক্ষার জন্যে বিদ্রোহ করে। যোসেফের সংস্কারের ফলে সুবিধাহীন শোষিত শ্রেণীর মধ্যে জাগরণ ঘটে। জার্মান ঐতিহাসিক ভ্যাঙ্গারম্যানের মতে, অভিজাতদের বিরুদ্ধে সংস্কারগুলি কার্যকরী করার জন্যে যোসেফ জনমতের সাহায্য নেন। এর ফলে নবোদিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর মনে আশা দেখা দেয় যে, যোসেফ সাংবিধানিক সংস্কার দ্বারা প্রজাদের হাতে ক্ষমতা দিবেন। কিন্তু যোসেফ আসলে ছিলেন স্বৈরাচারী। তিনি প্রজাদের হাতে ক্ষমতা দিতে রাজী ছিলেন না। এজন্য তিনি দ্রুত জনসমর্থন হারান। কৃষকশ্রেণী অনেকটা সুবিধা পাওয়ার পর সামন্ত-কর লোপের জন্যে দাবি জানালে যোসেফ তাতে রাজী হননি। এজন্য কৃষক-বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং মধ্যবিত্তশ্রেণী তাতে নেতৃত্ব দেয়। আসলে যোসেফ সীমাবদ্ধ সংস্কারে আগ্রহী ছিলেন। জার্মানভাষা বাধ্যতামূলক করায় অ-জার্মান অঞ্চলে নেদারল্যান্ডে বিদ্রোহ দেখা দেয়। গীর্জাও তাঁর বিরুদ্ধে যায়। যোসেফ হতাশ হয়ে অধিকাংশ সংস্কার বাতিল করেন। যোসেফ ক্ষোভের সঙ্গে নির্দেশ দেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কবরস্থানের ওপর যেন লেখা থাকে, "এখানে যে ব্যক্তি চির-নিদ্রায় শায়িত, সে যে কাজগুলি সম্পন্ন করার চেষ্টা করে তাতে সফল হয় নাই।" দ্বিতীয় যোসেফের মধ্যে অত্যধিক আদর্শবাদ, দ্রুত-সংস্কারের আগ্রহ,

প্রতিক্রিয়া ও বিফলতা

বাস্তববুদ্ধির অভাব এবং জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্রের ত্রুটিগুলির সমন্বয় দেখা যায়। অধ্যাপক হেইজের মতে, "দ্বিতীয় যোসেফের শাসনের মধ্যে আলোক-প্রাপ্ত স্বৈরশাসনের গুণ ও দোষগুলি প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।"

রাশিয়া ঃ দ্বিতীয় ক্যাথারিন ঃ রাশিয়ার জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথারিন (১৭৬২—৯৬ খ্রীঃ) ছিলেন অপর এক বিখ্যাত জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরশাসিকা। ক্যাথারিন রাশিয়াকে জ্ঞানদীপ্ত শাসনের পরীক্ষাগারে পরিণত করেন। পিটার-দি-গ্রেট রাশিয়ার আধুনিকীকরণের যে সূচনা করেন, দ্বিতীয় ক্যাথারিন সেই কাজকে এগিয়ে দেন। দ্বিতীয় ক্যাথারিন জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরশাসিকা হিসাবে সর্বদা মনে রাখতেন যে, প্রজার জন্যে রাজা কাজ করলেও, রাজা তাদের অভিভাবক হিসাবে যা ভাল মনে করবেন তাই করবেন। সুতরাং তিনি স্বৈরক্ষমতাকে আরও কেন্দ্রীভূত করেন। রুশ-অভিজাতরা যাতে তাঁর প্রতি অনুগত থাকে, এজন্য তিনি ১৭৬৪ খ্রীঃ এক আইন দ্বারা রাজকীয় খাসজমি ছাড়া সকল জমির মালিকানা তাদের দেন। ১৭৬৫ খ্রীঃ এক আইন দ্বারা তিনি ভূমিদাসদের বাধ্যতামূলকভাবে জমিদারের জমিতে কাজ করার আদেশ দেন। তিনি ১৭৬৭ খ্রীঃ সংবিধান সংস্কারের জন্যে এক পরিষদ গঠন করেন। এই পরিষদে ভূমিদাস ব্যতীত আর সকল শ্রেণীর প্রতিনিধি নেওয়া হয়। তবে এই পরিষদের সুপারিশগুলিকে তিনি কার্যকরী করেন নাই। তিনি জ্ঞানোদীপ্তির দ্বারা প্রভাবিত হলেও ভূমিদাসদের উন্নতির জন্যে আগ্রহ দেখান নাই। অথচ রাশিয়ার শতকরা ৯০ ভাগ লোক ছিল কৃষক ও ভূমিদাস। ক্যাথারিন জিমন্যাসিয়াম নামে এক ধরনের আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অভিজাতপরিবারের সন্তানেরা এখানে পাঠাভ্যাস করত। তিনি অভিজাত মহিলাদের শিক্ষাদানের চেষ্টা করেন। সর্বসাধারণের শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি তিনি বিশেষ উদ্যম দেখান নাই।

দ্বিতীয় ক্যাথারিনের সংস্কার সমূহ

ক্যাথারিনের জ্ঞানদীপ্তির পশ্চাতে প্রত্যয়ের গভীরতা কম ছিল। তিনি তাঁর স্বৈরতন্ত্র অক্ষুণ্ণ রেখে যতটা সম্ভব সংস্কার প্রবর্তন করেন। তিনি আশঙ্কা করতেন যে, রাশিয়ায় উদারনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করলে স্বৈরতন্ত্র ভেঙে পড়বে। তিনি ফরাসী বিপ্লবকে সন্দেহের চক্ষে দেখতেন। তিনি নাভিকোভের মত প্রকৃত দেশপ্রেমিককে কারারুদ্ধ করেন। তিনি পুগাচেভের কৃষক-বিদ্রোহ কঠোর হাতে দমন করেন। তাঁর সংস্কার ছিল অগভীর, "চলতি হাওয়ার" (fashion) প্রভাবে প্রভাবিত। ঐতিহাসিক কোচানের (Lionel Kochan) মতে, ক্যাথারিন ছিলেন শৌখিন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সভ্যা। জ্ঞানদীপ্তি ছিল তাঁর শখের ব্যাপার মাত্র।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ [গ] ঃ জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্রের দুর্বলতা ঃ ব্যর্থতার কারণ (Limitation of Enlightened Despotism) ঃ জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্রের ব্যর্থতার কারণগুলি এই মতবাদের মধ্যেই নিহিত ছিল। (১) এই স্বৈরতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী রাজারা এই নীতি নেন যে, "প্রজাদের জন্যে সংস্কার করা হলেও প্রজাদের দ্বারা সংস্কার করা হবে না।" সর্বসাধারণের মতামত না নিয়ে তাদের উপর সংস্কার চাপিয়ে দেওয়ার ফলে এই সংস্কারগুলি জনসাধারণের সহযোগিতা পায় নাই। কেবলমাত্র সরকারের শাসনযন্ত্রের দ্বারা সংস্কারগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করা সম্ভব ছিল না। (২) দীর্ঘ দিন স্বৈরশাসনে পিষ্ট থাকার ফলে প্রজাদের স্বৈরশাসকদের সম্পর্কে কোন উচ্চ ধারণা ছিল না। তারা একথা বিশ্বাস করত না যে, "রাজারা যুক্তিবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সত্যই সংস্কার করতে চান।" "স্বৈরতন্ত্রের এই অনুতাপের" কাজকে তারা সন্দেহের চোখে দেখত। (৩) উদারপন্থী রাজারা তাঁদের নূতন আদর্শবাদ ও সংস্কার-নীতি সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষিত করেন নাই। দীর্ঘ দিন স্বৈরশাসনের আওতায় থাকায় জনসাধারণের উদ্যম, উৎসাহ নষ্ট হয়ে যায়। (৪) অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় যোসেফের মত

আদর্শবাদী স্বৈরশাসকেরা বাস্তববুদ্ধির অভাবে বিফলতা বরণ করেন। বাস্তব অবস্থা ও জনমতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাঁর মত সংস্কারকেরা কাজ করার চেষ্টা করেন নাই। (৫) জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকেরা ছিলেন বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের অনুরাগী। কিন্তু উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাবে তাঁদের সংস্কারগুলি চালু থাকে নাই। (৬) জ্ঞানদীপ্ত শাসকদের মধ্যে কেহ কেহ যথা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক ও দ্বিতীয় ক্যাথারিন প্রভৃতি প্রধানতঃ যুদ্ধের জন্যে তাঁদের উদ্যম ও শক্তি ব্যয় করেন। এই সকল যুদ্ধের ফলে লোকক্ষয় হয়, রাজকোষ শূন্য হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের উদ্ভব ও তার কারণ (The Industrial Revolution in England : Its Causes) ঃ 'শিল্প-বিপ্লব' কথাটি এখন বহুপ্রচলিত কথা। ফরাসী সমাজবিদ্ অগাস্ত ব্ল্যাঙ্কি (August Blanqui) সর্বপ্রথম ১৮৩৭ খ্রীঃ শিল্প-বিপ্লব কথাটি ব্যবহার করেন। তাঁর পরে ইংরাজ ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি (Arnold Toynbee) তাঁর অক্সফোর্ড বক্তৃতামালায় 'শিল্প-বিপ্লব' কথাটিকে জনপ্রিয় করেন। শিল্প-বিপ্লব বলতে সঠিক কি বুঝায়,—এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিস্তর বিতর্ক আছে। ফিশার প্রভৃতি ঐতিহাসিকের মতে, "কায়িক শ্রমের স্থলে যন্ত্র দ্বারা শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন ও তজ্জনিত উৎপাদনবৃদ্ধিকে 'শিল্প-বিপ্লব' বলা যায়।" ফিলিস ডীন এ বিষয়ে একটি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, কেবলমাত্র যন্ত্রের দ্বারা উৎপাদন হলেই শিল্প-বিপ্লব হয় না, এই সঙ্গে আরও কতকগুলি সহকারী পরিবর্তন ঘটলে তবেই শিল্প-বিপ্লব ঘটে; যথা—(১) দৈহিক শ্রমের স্থলে বড় বড় কলকারখানায় যন্ত্র দ্বারা শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন। অর্থাৎ মূলধন বিনিয়োগ দ্বারা কারখানা স্থাপন এবং সেই কারখানায় যন্ত্রের দ্বারা উৎপাদন; (২) উৎপাদিত মাল বাজারে মুনাফার ভিত্তিতে বিক্রির ব্যবস্থা করা; (৩) কল-কারখানায় শ্রমিকের সাহায্যে মাল উৎপাদন করা; (৪) উৎপাদনের জন্যে কাঁচামাল ও শ্রমিক যোগাড় করা; মূলধন সরবরাহের জন্যে ব্যাঙ্ক প্রভৃতির ব্যবস্থা করা; (৫) মাল পরিবহণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এই সকল ব্যবস্থার একত্র সমন্বয় ঘটলে তবেই শিল্প-বিপ্লব ঘটে।

শিল্প-বিপ্লব কাকে বলে?

শিল্প-বিপ্লব সর্বপ্রথম ইংলণ্ডেই সূচিত হয়। শিল্প-বিপ্লবের আগে ইংলণ্ডে কুটিরশিল্প প্রচলিত ছিল। এই কুটিরশিল্পের স্থলে ইংলণ্ডে যন্ত্রচালিত কারখানাভিত্তিক শিল্প গড়ে ওঠে। আর্নল্ড টয়েনবির মতে, ১৭৪০-১৭৬০ খ্রীঃ নাগাদ ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের 'উড্ডয়ন' (Take off) বা গতিশীলতা প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়। ফিলিস ডীন প্রভৃতির মতে, ১৭৬০-১৭৮০-কেই ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের 'উড্ডয়ন' বা গতিশীলতার যুগ বলা উচিত। এই কাল-সীমাকেই এখন বেশির ভাগ ঐতিহাসিক সমর্থন করেন।

ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব কেন প্রথম ঘটে তার ব্যাখ্যা হিসাবে কোন কোন ঐতিহাসিক ইংলণ্ডের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক সুযোগ-সুবিধাগুলির উল্লেখ করেন। তাঁদের মতে, ইংলণ্ডের ভেজা, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া বস্ত্রশিল্পের বিস্তারে বিশেষ সহায়ক ছিল। ইংলণ্ডের খরস্রোতা নদী ও জলপ্রপাতগুলি জলশক্তির দ্বারা যন্ত্রকে চালাতে সাহায্য করে। দক্ষিণ-পূর্ব ইংলণ্ডের প্রবল সমুদ্রবাহিত বায়ুর দ্বারা বায়ুকলগুলি চালিত হত। এই বায়ুচালিত কলে নানা কাজ করা সম্ভব হত। ইংলণ্ডের মাটির নিচে প্রচুর কয়লা ও লোহা থাকায় ভারী শিল্প গড়ার সুবিধা হয়। ইংলণ্ডের ক্যানাল-পথে বন্দরে এবং ক্যানাল-পথে কারখানায় কয়লা বহন করা যেত। সঙ্গে

ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের কারণ সম্পর্কে প্রচলিত মত

ইংলন্ডে ধর্ম-বিপ্লবের প্রভাব ও ঘন ঘন যুদ্ধের ফলাফল

স্কটল্যান্ডের সংযুক্তির ফলে উভয় দেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য বাড়ে। ফলে মালের চাহিদা বাড়ে এবং শিল্পের উন্নতি হয়। তা ছাড়া ইংলন্ডের পিউরিটান সম্প্রদায় ছিল কঠোর পরিশ্রমী। ইংলন্ডে এক সময় আইন দ্বারা পিউরিটানদের চাকুরি ও সরকারী পদ থেকে বঞ্চিত করা হত। এজন্যে এই সম্প্রদায় রাজনীতি ও চাকুরি হতে মুখ ফিরিয়ে শিল্প-বাণিজ্যের দ্বারা নিজ-সম্প্রদায়ের আর্থিক বিকাশে আত্মনিয়োগ করে। তারা অলসতাকে পাপ মনে করত। এই উদ্যমী, উদ্ভাবনশীল পিউরিটান সম্প্রদায় ছিল ইংলন্ডে শিল্প-বিপ্লবের অগ্রদূত।

হবস বম (Hobs Bawm) প্রভৃতি অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকেরা উপরের ব্যাখ্যাকে অগ্রাহ্য করেন। তাঁরা বলেন যে, ইংলন্ডের সঙ্গে স্কটল্যান্ডের সপ্তদশ শতকে সংযুক্তি হয়। তা হলে সপ্তদশ শতকে শিল্প-বিপ্লব না হয়ে ১৭৬০-৮০ খ্রীঃ শিল্প-বিপ্লব হয় কেন। যদি ভেজা, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া বস্ত্রশিল্পের কারণ হয়, তবে এরকম আবহাওয়া স্কটল্যান্ডে ছিল। ইংলন্ডের মত খরস্রোতা নদী বা জলশক্তি স্কটল্যান্ডে ছিল। কিন্তু সেখানে শিল্পের বিকাশ অনেক

হবস বম কর্তৃক প্রচলিত মতের সমালোচনা

পরে হয়। হল্যান্ডে ইংলন্ডের মতোই ঝোড়ো বাতাস বইত, কিন্তু সেখানে প্রথমে শিল্প-বিপ্লব হয় নাই। ইংলন্ডের মতই জার্মানীর সাইলেসিয়া অঞ্চলে বহু লোহার খনি ছিল। কিন্তু জার্মানীতে শিল্পের বিকাশ বহু পরে ঘটে। ইংলন্ডে ধর্ম-বিপ্লব ১৭শ শতকে ঘটেছিল। আর শিল্প-বিপ্লবের উড্ডয়ন ঘটে ১৭৬০-৮০ খ্রীঃ-এ। যদি পিউরিটানদের প্রভাবে শিল্প-বিপ্লব হয়, তবে সপ্তদশ শতকেই শিল্প-বিপ্লব ঘটা উচিত ছিল।

ইংলন্ডে শিল্প-বিপ্লব সর্বপ্রথমে ঘটার জন্যে কতকগুলি বিশেষ কারণ ছিল। (১) ইংলন্ডে অষ্টাদশ শতকে লোকসংখ্যা বিশেষ বাড়ে। ১৭৪১-৫১ খ্রীঃ এই বৃদ্ধির হার ছিল ৩$\frac{১}{২}$%।

অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা

১৭৭০ খ্রীঃ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৭%। লোকসংখ্যা বাড়ার ফলে শিল্পদ্রব্যের চাহিদা বাড়ে। শিল্পদ্রব্যের একটি ভাল বাজার এজন্যে দেশে গড়ে ওঠে। লোকসংখ্যা বাড়ায় খাদ্য ও কৃষিজাত মালের উৎপাদন ১০% বাড়ে। গ্রামের বাড়তি লোকের কাজ না থাকায় তারা শহরে চলে এসে শিল্প-শ্রমিকে পরিণত হয়। এর ফলে কল-কারখানায় শ্রমিকের সরবরাহ বাড়ে। (২) ইংলন্ডে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কৃষির বিশেষতঃ খাদ্য-উৎপাদনে উন্নতি ঘটে। কৃষিজাত মালের এত উৎপাদন বাড়ে যে, একে কৃষি-বিপ্লব বলা হয়। ১৭৩০-৭০ খ্রীঃ খাদ্য ও কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন ১০% বাড়ে। এই উদ্বৃত্ত খাদ্য বাড়তি জনসংখ্যার খাদ্যসমস্যার সমাধান করে। কল-কারখানার শ্রমিক ও শহরবাসীরা সস্তা দরের খাদ্য পেয়ে কম মজুরিতে কারখানায়, অফিসে কাজ করতে সক্ষম হয়। খামার-মালিকেরা ও কৃষকেরা উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য বিক্রি করে যে অর্থ পায়, তার দ্বারা শিল্প-সামগ্রী কিনে। এজন্য শিল্পদ্রব্যের চাহিদা বাড়ে এবং শিল্পের বিস্তার ঘটে।

হবস বম প্রভৃতির মতে, ইংলন্ডে মূলধনের যোগান থাকায় শিল্পস্থাপনের কাজ সহজতর হয়। ইংলন্ডের বণিকেরা ইওরোপের বাজারে পশম ও পশমের কাপড় রপ্তানি করে প্রভূত মুনাফা করে। ভারত, চীন প্রভৃতি দেশ থেকে ইংরাজ বণিক কোম্পানিগুলি কাপড়, নীল,

মূলধনের সরবরাহ

গন্ধক, রেশম, সবুজ চা প্রভৃতি ইওরোপের বাজারে বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা পায়। আমেরিকার উপনিবেশের সঙ্গে বাণিজ্যের দ্বারাও প্রচুর লাভ হয়। এই সকল মুনাফা ব্যাঙ্কে মূলধন হিসেবে জমা রাখা হয় এবং ব্যাঙ্কগুলি তা দীর্ঘ মেয়াদী শর্তে শিল্পে লগ্নী করে। তা ছাড়া কৃষিজাত উদ্বৃত্ত মাল বিক্রি করে যে অর্থ খামার-মালিকের হাতে জমা হয়, তা ব্যাঙ্কে লগ্নী করা হয় এবং ব্যাঙ্ক সেই অর্থ শিল্পে সরবরাহ

দেয়। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, পলাশীর যুদ্ধের পর (১৭৫৭ খ্রীঃ) ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ও তার কর্মচারীরা ভারত থেকে প্রচুর ধনরত্ন ও সম্পদ লুঠ করে নিয়ে যায়। এই অর্থ দ্বারা শিল্প-বিপ্লবের মূলধনের যোগান দেওয়া হয়।

কারিগরী ব্যবস্থার বিপ্লব। যন্ত্রের আবিষ্কার

ইংলন্ডে কারিগরী বিদ্যার প্রসার এবং শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের জন্যে যন্ত্রের আবিষ্কার শিল্প-বিপ্লবের পথ তৈরি করে। ইংলন্ডে বস্ত্রশিল্পের উৎপাদনের ক্ষেত্রেই প্রথম যন্ত্রের ব্যবহার হয়। ১৭৩৩ খ্রীঃ জন কে "উড়ন্ত মাকু" বা 'ফ্লাইয়িং শাটল' নামে কাপড়-বোনার এক যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ১৭৬৫ খ্রীঃ হারগ্রীভস নামে এক ব্যক্তি স্পিনিং জেনি নামে একটি সুতা-তৈরির যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এরপর আর্করাইট নামে এক ব্যক্তি 'ওয়াটার ফ্রেম' নামে একটি কাপড় বোনার যন্ত্র আবিষ্কার করেন যা জলশক্তির সাহায্যে চলত। জন কার্টরাইট মিউল নামে এক উন্নতধরনের কাপড় বোনার যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

বাষ্পীয় ইঞ্জিন

যন্ত্র আবিষ্কার হলেও যতদিন না বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার হয় ততদিন এই যন্ত্রগুলিকে হয় লোক দ্বারা অথবা জলশক্তির দ্বারা চালাতে হত। সকল সময় জল বা বায়ুর সাহায্য পাওয়া সম্ভব ছিল না। এজন্য উৎপাদন তেমন বাড়ত না। ১৭৬৯ খ্রীঃ জেমস ওয়াট বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার করলে শিল্প-উৎপাদনে বিপ্লব ঘটে। এখন থেকে ইঞ্জিন দ্বারা যন্ত্রগুলিকে ইচ্ছামত চালিয়ে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয়। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের সাহায্যে বড় বড় কলকারখানা চালু করা সম্ভব হয়। ম্যাথু বোল্টন জেমস ওয়াটের তৈরি বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরি করে বাজারে বিক্রি করতে থাকেন। এই ইঞ্জিনের নাম হয় 'বোল্টন ইঞ্জিন'। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের সাহায্যে যন্ত্রগুলিকে যত খুশি সময় চালিয়ে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয়।

ভারী শিল্পের উদ্ভব

ইঞ্জিন, বয়লার ও অন্যান্য যন্ত্র তৈরি করতে প্রচুর লোহার দরকার হয়। ১৭৬০ খ্রীঃ জন স্মীটন লোহা গালাবার চুল্লী বা ব্ল্যাস্ট ফার্নেস আবিষ্কার করেন। বেসামার প্রথার দ্বারা আকরিক লোহাকে শোধন করে উৎকৃষ্ট লোহা প্রস্তুত করা সম্ভব হয়। নিউকোমেন ইঞ্জিন নামে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের দ্বারা খনির নিচ থেকে কয়লা মাটির উপরে টেনে তোলার ব্যবস্থা হলে কয়লা উৎপাদন বাড়ে। লোহা গালাবার জন্যে ও ইঞ্জিনে ব্যবহারের জন্যে খনিজ কয়লার ব্যবহার আরম্ভ হয়। অন্ধকার খনিগর্ভে শ্রমিকেরা যাতে নিরাপদে দুর্ঘটনা এড়িয়ে আলোর নিচে কাজ করতে পারে, এজন্য হামফ্রে ডেভি নিরাপদ বাতি বা 'সেফটি ল্যাম্প' আবিষ্কার করেন।

পরিবহন ব্যবস্থায় বিপ্লব

এইসঙ্গে মাল পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় নূতন আবিষ্কারের ফলে বিপ্লব ঘটে। ১৮১৪ খ্রীঃ জর্জ স্টিফেনসন বাষ্পচালিত রেল-ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। এই ইঞ্জিন লোহার পাতের উপর ঘন্টায় ৩০ মাইল বেগে দৌড়াত। রেলপথে মাল-বহনের কাজ সহজ হয়। ১৮৬৭ খ্রীঃ ফুলটন বাষ্পচালিত নৌকা বা জাহাজ নির্মাণ করেন। টেলফোর্ড ও ম্যাকাডাম নামে দুই ব্যক্তি পিচের রাস্তা নির্মাণের কৌশল আবিষ্কার করেন।

শিল্প-বিপ্লবের ভাবধারা

শিল্প-কারখানাগুলিকে মূলধন সরবরাহের জন্যে ইংলন্ডে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রসার হয়। ঐতিহাসিক উডওয়ার্ডসের মতে, চারটি ধারায় ইংলন্ডে শিল্প-বিপ্লব প্রসারিত হয়; যথা—(১) বাষ্পচালিত যন্ত্রের দ্বারা শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন; (২) মাল পরিবহণের উন্নত ব্যবস্থা গঠন; (৩) তৈরী মাল বিক্রির বাজার গঠন; (৪) মূলধন যোগাড়ের জন্যে ব্যাপক ব্যবস্থার প্রসার। এভাবে ইংলন্ডে শিল্প-বিপ্লব ঘটে। (শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল ও ইওরোপে শিল্প-বিপ্লব—চতুর্থ অধ্যায় তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ [ক] ঃ আমেরিকার বিপ্লব বা স্বাধীনতার যুদ্ধের কারণ, ১৭৭৬ খ্রীঃ (Causes of the American Revolution or American War of Independence) ঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স, জার্মানীর মত প্রাচীন রাষ্ট্র নয়। ১৭৮৩ খ্রীঃ এই যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। এর আগে এই দেশ ছিল ইংলন্ডের একটি উপনিবেশ। ১৩টি রাজ্য নিয়ে ইংলন্ডের আমেরিকার উপনিবেশ গড়ে ওঠে। এজন্য এর নাম ছিল ত্রয়োদশ উপনিবেশ। এই উপনিবেশগুলি শাসনের জন্যে ইংলন্ডীয় সরকার প্রতি উপনিবেশে একজন গভর্নর বা শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন। এই শাসনকর্তা স্থানীয় প্রতিনিধিসভার সহযোগিতা নিয়ে শাসনকাজ চালাতেন। আমেরিকার উপনিবেশবাসীরা মনে করত যে ইংলন্ডের প্রজারা যেমন তাদের রাজা ও পার্লামেন্টের দ্বারা শাসিত হয়, আমেরিকার প্রজারা সেইরূপ রাজার প্রতিনিধি গভর্নর ও স্থানীয় প্রতিনিধিসভার দ্বারা শাসিত হয়। তারা ইংলন্ডে পার্লামেন্টের অধীন নয়। কারণ ইংলন্ডে পার্লামেন্ট কেবলমাত্র ইংলন্ডের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত। দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকাবাসীদের মনে এই ধারণা অস্পষ্টরূপে গড়ে উঠেছিল। এইভাবে উপনিবেশগুলি কার্যতঃ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করত। ঐতিহাসিক হেফ্‌নারের মতে, ব্রিটিশ সরকার আমেরিকার উপনিবেশগুলির শাসনের ব্যাপারে "হিতকর উদাসীনতা" (Salutary neglect) নীতি গ্রহণ করেন। ১৭২১-১৭৪২ খ্রীঃ পর্যন্ত ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা আমেরিকার উপনিবেশগুলির এই অর্ধ-স্বাধীনতাকে ভেঙ্গে ফেলার কোন চেষ্টা করেন নি। এজন্য উপনিবেশগুলির আত্মবিশ্বাস ও অধিকারবাদ মজবুত হয়ে যায়।

আমেরিকার উপনিবেশের শাসন ব্যবস্থা

আমেরিকার ত্রয়োদশ উপনিবেশ ১৭৭৬ খ্রীঃ ইংলন্ডের অধীনতাপাশ ছিঁড়ে তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এজন্যে ইংলন্ডের সঙ্গে এই ত্রয়োদশ উপনিবেশের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধকে সাধারণভাবে 'আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ' বলা হয়। কিন্তু লর্ড এ্যাক্টন ও ম্যাক্স বেলফ প্রভৃতি প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এই সংঘর্ষকে "আমেরিকার বিপ্লব" (American Revolution) আখ্যা দিয়েছেন।

আমেরিকার বিপ্লব

আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ একদিক থেকে অনিবার্য ছিল। দীর্ঘকাল ধরে পাশাপাশি বাস করার ফলে, পুরুষের পর পুরুষ একই গীর্জায় উপাসনা করার জন্যে, নিষ্ঠুর প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আত্মরক্ষা এই উপনিবেশবাসীদের মধ্যে এক গভীর একাত্মবোধ সৃষ্টি করে। "আমেরিকার নতুন ভূ-প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যে তারা এক নতুন মিলনের সূত্র খুঁজে পায়" (জেফারসন)। আমেরিকার উপনিবেশগুলি ছিল ইংলন্ড হতে বহু দূরে, আটলান্টিক সমুদ্রের অপর পারে। তখনকার যুগে ইংলন্ডের সঙ্গে আমেরিকার যোগাযোগ ছিল ক্ষীণ ও দুর্বল। সপ্তবর্ষের যুদ্ধ পর্যন্ত আমেরিকার উপনিবেশগুলিকে ইংলন্ডের সরকার দরিদ্র ও লোভহীন বলে মনে করত। এই কারণে ইংরাজ সরকার এই উপনিবেশগুলির উপর প্রত্যক্ষ দৃঢ়নিয়ন্ত্রণ চাপায় নি। এর ফলে আমেরিকানদের মনে স্বাধীনতাবোধ জেগে ওঠে। এই ঔপনিবেশিকদের পূর্বপুরুষের বড় অংশ ইংলন্ড হতে এলেও, দীর্ঘকাল আমেরিকায় বাস করে তারা নিজেদের ইংরাজজাতি হতে পৃথক জাতি বলে মনে করে। ইংলন্ড হতে যারা আমেরিকায় আসে, তাদের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে ইংলন্ডের এ্যাংলিক্যান ধর্মমতের পার্থক্য ছিল। আমেরিকার অনেকেই ছিল পিউরিট্যান মতাবলম্বী। ইংলন্ডের বিশপ-নিয়ন্ত্রিত গীর্জাকে এরা ঘৃণা করত। আবার অনেকে ছিল কায়েকার অথবা ব্যাপ্টিস্ট খ্রীষ্টান। মোট কথা বেশির ভাগ আমেরিকাবাসীর ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে ইংলন্ডের এ্যাংলিক্যান ধর্মমতের সম্পর্ক না থাকায়, দুই দেশের মানসিকতা আলাদা ছিল। তাদের মধ্যে

আমেরিকান জাতীয়তাবাদের প্রভাব

ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববোধ একেবারেই ছিল না। সামাজিক দিক হতে ইংলন্ডের সঙ্গে আমেরিকার লোকেদের দুস্তর ব্যবধান ছিল। ইংলন্ডের মত আমেরিকায় কোনো অভিজাত বা লর্ড বাস করতেন না। ইংলন্ডের জনসমাজে অভিজাতশ্রেণীর যে প্রভাব ছিল. আমেরিকায় আদপেই তা ছিল না। আমেরিকার প্রজারা ছিল আদিতে নিম্নশ্রেণীর বা মধ্যবিত্তশ্রেণীর ইংরাজদের বংশধর। আমেরিকায় এসে তাবা বণিক বা নাবিক, বা কৃষকের বৃত্তি নিয়ে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করে। তারা নিজেদের আলাদা সমাজ গড়ে তোলে। আমেরিকার প্রতি কৃষক ছিল স্বাধীন, নিজজমির মালিক। ইংলন্ডের কৃষকের মত তারা সামন্ত-প্রভুদের অধীন ছিল না। আমেরিকার খামার-মালিকরা ছিল প্রভুত্বপরায়ণ, স্বাবলম্বী, গর্বিত লোক। মোট কথা, আমেরিকার সমাজের জীবনধারা ও মানসিকতা ছিল ইংলন্ড থেকে আলাদা। এর ফলে আমেরিকাবাসীদের মনে স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। ইংলন্ডের সঙ্গে এই ভৌগোলিক. ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবধান আমেরিকানদের জাতীয়তাবাদ গঠনে সাহায্য করে। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কর উপলক্ষে বিরোধ দেখা দিলে আমেরিকানদের এই জাতীয়তাবাদ তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে। জন এ্যাডাম্‌স এজন্য বলেছেন যে, "আমেরিকার বিপ্লব হল উপনিবেশবাসীদের মানসিকতার প্রকাশমাত্র।"

আমেরিকার সকল শ্রেণীর অধিবাসীদের মধ্যে হয়ত এই জাতীয়তাবাদ অঙ্কুরিত হয় নাই। কিছু লোক ইংলন্ডের প্রতি অনুগত ছিল। কিন্তু আমেরিকার বৃহত্তর জনসাধারণ ও নেতারা অনেকদিন ধরে ইংলন্ডের দমনমূলক নীতির বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আমেরিকার অধিকাংশ অধিবাসী ছিল মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক। এই শ্রেণীর আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মবিশ্বাস খুবই প্রখর ছিল। সপ্তবর্ষের যুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার উপনিবেশগুলি থেকে নিয়মিত কর আদায়ের চেষ্টা করলে তারা রুষ্ট হয়। দীর্ঘদিন নিয়মিত কর আদায় দিতে অভ্যস্ত না থাকায় তারা সপ্তবর্ষের যুদ্ধের পর নিয়মিত ব্রিটিশ সরকারের করের দাবিকে অন্যায় বলে মনে করে।

আমেরিকান মধ্য-বিত্তদের শিথিল শাসনে অভ্যস্ততা তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায়

অষ্টাদশ শতকে মার্কান্টাইলবাদ নামে এক অর্থনৈতিক মতবাদ. ইংলন্ডের ঔপনিবেশিক নীতিকে প্রভাবিত করে। এই নীতি অনুসারে উপনিবেশগুলিকে শোষণ করে ইংলন্ড তার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বাড়াবার লক্ষ্য নেয়। ফলে আমেরিকার উপনিবেশগুলির উপর নেভিগেশন আইন দ্বারা নির্দেশ হয় যে, এই উপনিবেশে যে পরিমাণ তামাক, নীল ও চিনি উৎপন্ন হয়, তার সবটাই ইংলন্ডের বণিকদের কাছে বিক্রি করতে হবে। অন্য কোন দেশ বেশী দাম দিলেও তা বিক্রি করা যাবে না। অপর একটি আইনে আমেরিকানদের কেবলমাত্র ইংলন্ড থেকে মাল কিনতে বাধ্য করা হয়। অন্য দেশ থেকে মাল কিনলে বাড়তি-কর ইংলন্ডকে দিতে বলা হয়। আমেরিকায় আমেরিকানদের নিজস্ব কোন কল-কারখানা স্থাপন নিষিদ্ধ হয়। এই শোষণমূলক আইনগুলি আমেরিকানদের মধ্যে ঘোর অসন্তোষ সৃষ্টি করে। সপ্তবর্ষের যুদ্ধের পর এই আইনগুলির প্রয়োগে কড়াকড়ি হলে এবং কয়েকটি আইন নতুন করে চাপানো হলে আমেরিকানরা বিদ্রোহ করে।

আমেরিকার ব্রিটিশ সরকারের অর্থনৈতিক শোষণ

সপ্তবর্ষের যুদ্ধ পর্যন্ত কানাডা থেকে ফরাসী আক্রমণের ভয়ে আমেরিকার ঔপনিবেশিকরা ভীত ছিল। এজন্যে তারা বাধ্য হয়ে মাতৃভূমি ইংলন্ডের সামরিক সাহায্যের উপর নির্ভর করত। সপ্তবর্ষের যুদ্ধে কানাডায় ইংরাজের জয় হলে আমেরিকায় ফরাসী আক্রমণের ভয় দূর হয়। ফরাসী আক্রমণের ভয় না থাকায় আর ইংলন্ডের উপর আমেরিকার উপনিবেশগুলিকে নির্ভর

সপ্তবর্ষের যুদ্ধের পর আমেরিকাবাসীর নিরাপত্তা বৃদ্ধি

করতে হত না। এখন তারা স্বাধীনতালাভের জন্যে বিদ্রোহের পথে পা বাড়ায়। ঐতিহাসিক এডমন্ড রাইট মন্তব্য করেছেন যে, "ফরাসী-ভীতি দূর হওয়ায় আমেরিকার বিপ্লব অনিবার্য হয়ে পড়ে।"

সপ্তবর্ষের যুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার আমেরিকার উপনিবেশগুলির উপর তাঁদের আইনগুলিকে দৃঢ়ভাবে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেন।[১] ইংলন্ডের টোরী দল উপনিবেশের শাসনে কড়া-নীতি গ্রহণের পক্ষপাতী ছিল। ইংলন্ডের উদারপন্থী নেতা এডমন্ড বার্ক, এ্যাডাম স্মিথ, ডিনটাকার প্রভৃতি এই উপনিবেশগুলিতে জবরদস্তি নীতির বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেও রাজা তৃতীয় জর্জ, তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলী ও পার্লামেন্ট তাতে কান দেন নাই। সপ্তবর্ষের যুদ্ধে ব্রিটেনের যে অর্থ ব্যয় হয়, ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা সেই অর্থ আমেরিকার উপনিবেশগুলির উপর কর স্থাপন করে তুলে নিতে সিদ্ধান্ত নেন। তা ছাড়া তাঁরা স্থির করেন যে, আমেরিকাকে রক্ষার জন্যে এখন থেকে যে খরচ হবে, তা-ও কর দ্বারা তুলে নেওয়া হবে। এই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা কয়েকটি কর ধার্য করেন।

সপ্তবর্ষের যুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকারের কর নীতি

(১) ইংলন্ডের গ্রেনভিল মন্ত্রিসভা আমেরিকার উপনিবেশে নেভিগেশন আইনের প্রয়োগ কড়াকড়ি আরম্ভ করেন।[২] তিনি Writs of Assistance বা "সহায়তার পরোয়ানা" জারী করে এই আইনের সাহায্যে যে-কোন আমেরিকানের ঘরবাড়ী অতর্কিতভাবে খানাতল্লাশীর ব্যবস্থা চালু করেন।

নেভিগেশন আইন

(২) গ্রেনভিল মন্ত্রিসভা আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের উপর Stamp Act বা টিকিট-কর এবং Sugar Act বা চিনি-কর স্থাপন করেন। এই করস্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল সপ্তবর্ষের যুদ্ধের খরচা আদায় করা। চিনি-কর দ্বারা আমেরিকানদের ফরাসী উপনিবেশ হতে সস্তা দরে ঝোলা গুড় ও চিনি খরিদ বন্ধ করা হয়। ইংলন্ড থেকে বেশি দরে এই সকল জিনিস কিনতে বাধ্য করা হয়। সস্তা ফরাসী ঝোলা গুড়ের সরবরাহ বন্ধ হলে আমেরিকায় মদের দাম বেড়ে যায় এবং আমেরিকানরা এজন্যে ভীষণ চটে যায়। স্ট্যাম্প-আইন দ্বারা ব্রিটিশ সরকার আমেরিকা থেকে বছরে $১\frac{১}{২}$ লক্ষ পাউন্ড আদায় করার সিদ্ধান্ত নেন। যে-কোন দলিল, সংবাদপত্র ও ইস্তাহার সম্পাদন করতে হলে স্ট্যাম্প-কর দিতে আদেশ দেওয়া হয়। এই করের ফলে বণিক, ব্যাঙ্ক-মালিক, সংবাদপত্রগুলি ও আইনজীবীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য তারা স্ট্যাম্প-আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

দলিল ও চিনি কর

আমেরিকার আইনজীবীরা এই নূতন করগুলির সাংগঠনিক বৈধতার প্রশ্ন তোলেন। তাঁরা যুক্তি দেখান যে:—(১) আমেরিকার বিভিন্ন উপনিবেশের প্রতিনিধিসভার সম্মতি ছাড়া কোন কর ধার্য হতে পারে না। কারণ এতদিন ধরে এই নিয়ম চালু আছে। (২) ইংলন্ড তার পার্লামেন্টের আইন দ্বারা শাসিত হয়। আমেরিকা তার প্রচলিত আইন বা 'কমন ল' এবং প্রাকৃতিক আইন বা 'ন্যাচারাল ল' দ্বারা শাসিত হয়। আমেরিকাবাসীর উপর পার্লামেন্টের আইনের কোন এক্তিয়ার নেই। কারণ এই পার্লামেন্টে আমেরিকার কোন প্রতিনিধি নেই।

জেমস ওটিস (James Otis) নামে এক বিজ্ঞ আমেরিকান যুক্তি দেখান যে, "যেহেতু ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আমেরিকানদের কোন প্রতিনিধি নেই, সেহেতু এই পার্লামেন্টের ধার্য-করা ট্যাক্স বা কর দিতে আমেরিকানরা বাধ্য নন" (No taxation without represen-

১· Lord Acton—Factors of Modern History.
২· New Cambridge History. Vol VII.

tation)। এরপর "বিষয়টি ইংলন্ডের দিক হতে পার্লামেন্টের অধিকারের প্রশ্ন, আমেরিকানদের দিক হতে স্বাধীনতার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়।"[১] ইংলন্ডের নেতারা মনে করেন যে, আমেরিকানরা পার্লামেন্টকে অস্বীকার করছে। আমেরিকানরা মনে করেন যে, ইংলন্ডের পার্লামেন্টে তাদের প্রতিনিধি নেই বলে এই পার্লামেন্ট তাদের স্বাধীনতা খর্ব করছে। (৩) আমেরিকানরা সাংবিধানিক প্রশ্ন তুলে যে, আমেরিকার উপনিবেশগুলির স্থাপনের সময় ইংলন্ডের রাজা তাদের যে সনদ দেন, তারা সেই সনদ অনুযায়ী শাসিত হতে পারে। এই সনদে পার্লামেন্টের আইনের কোন উল্লেখ ছিল না। সুতরাং ইংলন্ডের পার্লামেন্টের আইন তারা মানতে বাধ্য নয়। (৪) ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যে খরচ হবে, তা ইংলন্ডের লোকেরা দিতে বাধ্য। এজন্য আমেরিকার উপনিবেশগুলি কর দিতে বাধ্য নয়। (৫) পার্লামেন্টে দল বা পার্টিগুলির প্রভাব আছে। মন্ত্রিসভা সেই দলগুলির মত অনুযায়ী চলে। এই ধরনের দলীয় সিদ্ধান্ত মানতে আমেরিকাকে বাধ্য করা যায় না। (৬) স্ট্যাম্প-আইন বা দলিল-করের প্রতিবাদে আমেরিকায় নয়টি উপনিবেশের প্রতিনিধিরা নিউইয়র্কে মিলিত হন। এই সভা দলিল-করকে বে-আইনী ঘোষণা করে। একটি ঘোষণাপত্রে বলা হয় যে, আমেরিকাবাসী স্বেচ্ছা-কর ছাড়া আর কোন চাপিয়ে দেওয়া কর দেবে না। ব্রিটিশ মাল বয়কট আরম্ভ হয়।

দলিল করের প্রতিবাদ

ইতিমধ্যে গ্রেনভিল মন্ত্রিসভার পতন হয়। রকিংহ্যাম মন্ত্রিসভা "ঘোষণামূলক আইন" (Declaratory Act) পাস করে আপাততঃ দলিল-কর রদ করেন। ঘোষণামূলক আইনে বলা হয় যে, আপাততঃ দলিল-কর রহিত হল। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আইন দ্বারা আমেরিকার উপর কর ধার্য করার অধিকার বহাল থাকল। এর ফলে সমস্যাটির সমাধান হয় নি।

১৭৬৫ খ্রীঃ অর্থমন্ত্রি টাউনসেণ্ড আমেরিকার বাইরে থেকে আমদানি-করা চিনি, কাগজ প্রভৃতির উপর এবং চায়ের উপর তিন পেনি হারে কর ধার্য করেন। টাউনসেণ্ড বলেন যে, এই শুল্ক থেকে যে আয় হবে, তার দ্বারা আমেরিকার প্রশাসনের জন্যে গভর্নর, বিচারক প্রভৃতির বেতন ও সেনাদলের বেতন নির্বাহ হবে। আমেরিকাবাসী টাউনসেণ্ডের এই করের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায় ও আমদানি-করা মাল বয়কট করে। এর পর মন্ত্রি লর্ড নর্থ আমেরিকাবাসীদের শান্ত করার জন্যে টাউনসেণ্ডের চাপানো অধিকাংশ কর তুলে নেন। পার্লামেন্টের কর স্থাপনের অধিকার রক্ষার জন্য তিনি শুধুমাত্র প্রতি পাউণ্ড চায়ের উপর তিন পেনি কর বহাল রাখেন। লর্ড এ্যাক্টনের মতে, "এই তিন পেনির জন্যে আমেরিকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নষ্ট হয়।"[২] বোস্টন বন্দরে চা-আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ১৭৭৩ খ্রীঃ কয়েকজন দুঃসাহসী আমেরিকান ডার্টমাউথ জাহাজ থেকে আমদানি-করা চায়ের পেটিগুলি জলে ফেলে দেয়। এই ঘটনাকে "বোস্টনের চা-পার্টি" আখ্যা দেওয়া হয়। এই ঔদ্ধত্যের শাস্তি হিসাবে ব্রিটিশ সরকার বোস্টন বন্দর বন্ধ করে দেন এবং মাসাচুসেট্স প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার নাকচ করেন। আমেরিকানদের দমনের জন্যে ৪টি দমনমূলক আইন পাস করা হলে, আমেরিকানরা সেই আইনকে "চার অসহনীয় আইন" আখ্যা দেয়।

ঘোষণা আইন: তিন পেনী কর: বোষ্টন চা পার্টি

এর পর আমেরিকার ১২টি উপনিবেশের প্রতিনিধিরা (জর্জিয়া বাদে) ফিলাডেলফিয়া

১· Lord Acton—Factors of Modern History.

২· Lord Acton.

আমেরিকার উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা ঘোষণা ও যুদ্ধ

কংগ্রেসে (১৭৭৪ খ্রীঃ) সমবেত হয়ে রাজা তৃতীয় জর্জের কাছে তাদের অভিযোগের প্রতিকার চায়। এই আবেদন ব্যর্থ হলে এবং লেক্সিংটনে ইংরেজ সেনা গুলি চালালে ফিলাডেলফিয়ার দ্বিতীয় কংগ্রেস ১৭৭৪ খ্রীঃ এবং তৃতীয় কংগ্রেস ১৭৭৬ খ্রীঃ আহূত হয়। তৃতীয় ফিলাডেলফিয়া কংগ্রেসে ১৭৭৬ খ্রীঃ আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (Declaration of Independence) গৃহীত হয়। টম পেইন তাঁর কমন্‌সেন্স (Common Sense) নামক গ্রন্থে সুচিন্তিত ভাষায় আমেরিকাবাসীর স্বাধীনতার দাবিকে যুক্তিসম্মত ভাবে ব্যাখ্যা করেন। এভাবে জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : [খ] আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের ফলাফল (The Results of the American War of Independence) : আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ ১৭৭৬ খ্রীঃ আরম্ভ হয়। সপ্তবর্ষের যুদ্ধে ইংলন্ডের হাতে ফ্রান্সের পরাজয় ঘটে। সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে ফরাসী রাজা ষোড়শ লুই বিদ্রোহী আমেরিকান উপনিবেশগুলির পক্ষ নিয়ে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামেন। শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধে ইংলন্ডের পরাজয় হয়। ১৭৮৩ খ্রীঃ ভার্সাইয়ের সন্ধির দ্বারা ব্রিটিশ সরকার আমেরিকার উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা স্বীকার করেন। এই সঙ্গে প্যারিসের সন্ধির (১৭৮১ খ্রীঃ) দ্বারা ইংলন্ড আমেরিকার মিত্র ফ্রান্স ও স্পেনের সঙ্গে স্থিতাবস্থার ভিত্তিতে শান্তি স্থাপন করে। যদিও লর্ড এ্যাক্টন আমেরিকার যুদ্ধকে "আমেরিকার বিপ্লব" বলে অভিহিত করেছেন; আমেরিকান ঐতিহাসিক চালর্স বেয়ার্ড বলেন, যে, ফিলাডেলফিয়া কংগ্রেসে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষিত হয় তার ৫৮ জন সদস্যের মধ্যে ৪০ জন ছিলেন বুর্জোয়া বা পুঁজিপতি-শ্রেণীর লোক। তাঁরা নিজ শ্রেণীর স্বার্থ ও সম্পত্তি রক্ষার জন্যে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁরা নিজ শ্রেণীর অধিকার সুরক্ষিত করে এক সংবিধান রচনা করেন। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে বা বিপ্লবে সাধারণ আমেরিকানদের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা আসে নাই। মেরিনে জেনসেন নামে এক ঐতিহাসিক চার্লস বেয়ার্ডের ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে বলেছেন যে, স্বাধীনতা-যুদ্ধের আগে আমেরিকার সমাজ রক্ষণশীল ও চরমপন্থী,—এই দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। বুর্জোয়া,পুঁজিপতি রক্ষণশীলরা ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় তাদের সম্পত্তি রক্ষা করত। স্বাধীনতার যুদ্ধ সফল হলে এই শ্রেণী যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে তাদের সম্পত্তির অধিকারকে সুরক্ষিত করে। সাধারণ আমেরিকানদের হাতে প্রকৃত অধিকার পৌঁছায় নি। আমেরিকার জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা বেয়ার্ডের এই ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য করেন। ঐতিহাসিক এন্ড্রুজ প্রভৃতি বলেন যে, স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় আমেরিকার সকল প্রদেশে যথা, ভার্জিনিয়া প্রদেশে পুঁজিবাদের উদ্ভব হয় নাই। অথচ ভার্জিনিয়া স্বাধীনতা-যুদ্ধে শূন্য স্থান নেয়। দ্বিতীয়তঃ, বেয়ার্ড-তত্ত্বের দুর্বলতা এই যে, স্বাধীনতা-যুদ্ধ শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই আমেরিকার ১৩টি উপনিবেশ নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দাবি উঠেছিল। স্বাধীনতা-যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে পুঁজিপতিরা সম্পত্তি রক্ষার জন্য স্বাধীনতা ঘোষণা ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান রচনা করেন,—একথা ঠিক নয়। আমেরিকার স্বাধীনতার দাবির পশ্চাতে দার্শনিক টম পেইন ও সপ্তদশ শতকের দার্শনিকদের ভাবগত প্রভাব ছিল। ফিলিপ ডেভিডসন এই স্বাধীনতার যুদ্ধে সাধারণ আমেরিকানদের উগ্র দেশপ্রেমের কথা বলেছেন। ৪২টি সংবাদপত্র এই স্বাধীনতার দাবির পক্ষে প্রচার চালায়। এই স্বাধীনতার যুদ্ধকে 'বিপ্লব' বলাই সঙ্গত।

স্বাধীনতালাভের পর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে চলে। আমেরিকা কেবলমাত্র কৃষির উপর নির্ভর না করে দ্রুত শিল্প গঠন করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী রাষ্ট্রে

পরিণত হয়। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে অর্থসম্পদে আমেরিকা অল্পকালের মধ্যে পৃথিবীর অন্যতম শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ফিশারের মতে, "আমেরিকা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কারখানা এবং অর্থসম্পদের কেন্দ্রে পরিণত হয়।"

আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্বাধীনতালাভের পর আমেরিকার প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়। অষ্টাদশ শতকে এই প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ছিল এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। রাজতন্ত্রের যুগে আমেরিকায় সর্বপ্রথম জনগণের প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হলে এক নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব হয়। অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্তির প্রভাব এই প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্যে বিকশিত হয়। ইওরোপের জনসাধারণের উপর এই প্রজাতন্ত্রের প্রভাব বিশেষভাবে পড়ে।

ফ্রান্সের ইতিহাসের উপর আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের গভীর প্রভাব দেখা যায়। আমেরিকার প্রজাতন্ত্রবাদ ফরাসী চিন্তাবিদ্ টুরগো, মিরাব্যু প্রভৃতিকে প্রভাবিত করে। ফ্রান্সের চিন্তাশীল লোকেরা আমেরিকার শাসনতন্ত্র সম্পর্কে গবেষণা করেন। তাঁরা ফ্রান্সের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের স্থলে আমেরিকার মত এক গণতান্ত্রিক শাসনের কথা বলেন। যে সকল ফরাসী স্বেচ্ছাসেবক, যথা লাফায়েৎ প্রভৃতি আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধে যোগ দেন, তাঁরা স্বদেশে ফিরে এসে ফ্রান্সের পুরাতনতন্ত্র ধ্বংস করে আমেরিকার মত প্রগতিশীল সমাজস্থাপনের জন্যে দাবি জানান। ফরাসীরাজ ষোড়শ লুই আমেরিকার যুদ্ধে যোগ দিয়ে প্রভূত অর্থ ব্যয় করার ফলে ফ্রান্সের রাজকোষ শূন্য করে ফেলেন। দারুণ অর্থসঙ্কটবশতঃ তিনি শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সের জাতীয় সভা বা স্টেট্স জেনারেলের অধিবেশন ডাকেন। এর ফলে ফ্রান্সে বিপ্লব আরম্ভ হয়।

ইংলন্ডের উপর আমেরিকার বিপ্লবের প্রভাব ছিল গভীর। (১) আমেরিকার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলে ইওরোপে ইংলন্ডের মর্যাদা নষ্ট হয়। ঐতিহাসিক কার্লটন হেইজের মতে, ফ্রেডারিক দি গ্রেট, ক্যাথারিন প্রভৃতি শাসক-শাসিকা মনে করেন যে, ইংলন্ড রাজ্যরক্ষায় এমন কি আত্মরক্ষায় অক্ষম। (২) আমেরিকার যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে শাসক টোরীদলের জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়। টোরীদলের পতন হলে হুইগদল ক্ষমতা অধিকার করে। (৩) আমেরিকার বিপ্লবের পর ইংলন্ডের সংবিধানে পরিবর্তন ঘটে। হুইগদলের ধারণা হয় যে, রাজা তৃতীয় জর্জের হস্তক্ষেপের ফলে আমেরিকায় ইংলন্ডের পরাজয় ঘটেছে। সুতরাং নূতন নিয়ম করা হয় যে, রাজা সাংবিধানিক প্রধান হিসাবে থাকবেন, শাসনকার্যে হাত দিবেন না। "রাজা রাজত্ব করবেন, শাসন করবেন না।"

আমেরিকার যুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকারের ঔপনিবেশিক নীতি বদলায়। ইংলন্ডের বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী লোকেরা বুঝতে পারেন যে, আমেরিকার উপনিবেশের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার খর্ব করায় তারা বিদ্রোহ করে। এই শোষণ-নীতি বজায় রাখলে অন্য উপনিবেশগুলিও বিদ্রোহ করতে পারে। সুতরাং মার্কান্টাইলবাদী শোষণনীতি উপনিবেশের ক্ষেত্রে পরিত্যাগ করা হয়। লর্ড ডারহামের সভাপতিত্বে ঔপনিবেশিক নীতি স্থির করার জন্যে একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। ডারহাম রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্রিটিশ সরকার শ্বেত-জাতির বসতিযুক্ত উপনিবেশগুলিকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেন। এর ফলে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ডের কিছু অংশ স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। ১৭৮২ খ্রীঃ আইরিশ পার্লামেন্ট স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পায়। ভারতের ক্ষেত্রে যাতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ক্ষমতার অপব্যবহার না করে তা দেখার জন্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট একটি নিয়ন্ত্রণ-পরিষদ বা বোর্ড অফ কন্ট্রোল স্থাপন করে।

ইওরোপের অন্যান্য দেশেও আমেরিকার বিপ্লবের ভাবধারা এক তীব্র আবেগ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। (১) হল্যান্ডের দেশপ্রেমীরা (Patriots) সেই দেশের রাজতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ বিফল হলে তারা হল্যান্ড ছেড়ে আমেরিকায় বসবাস করতে

যায়। (২) জার্মানী, আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড হতে বহু স্বাধীনচেতা নাগরিক পুরাতন ইওরোপের রাজতন্ত্র ও ঘুণধরা সমাজের প্রতি ঘৃণাবশতঃ আমেরিকার নূতন সমাজে বাস করতে যায়। (৩) ইওরোপের জনগণের মনে পুরাতনতন্ত্রের প্রতি আস্থা নষ্ট হয়। আমেরিকার বিপ্লবের গণতান্ত্রিক আদর্শ তাদের আকৃষ্ট করে। হাঙ্গেরীতে "আমেরিকান সভা", ইতালীতে "ফিলাডেলফিয়া সমিতি" প্রভৃতি গুপ্তসমিতি স্থাপিত হয়। আমেরিকার বিপ্লবের প্রধান নেতা জর্জ ওয়াশিংটনের জীবনী-পাঠ জনপ্রিয় হয়। এইভাবে ইওরোপে আমেরিকার বিপ্লব এক নূতন বাতাবরণ সৃষ্টি করে।

সারণী

[ক] সপ্তবর্ষের যুদ্ধের (১৭৫৬-৬৩ খ্রীঃ) হিউবার্টস্‌বার্গ ও প্যারিসের সন্ধি (১৭৬৩ খ্রীঃ) দ্বারা অবসান হয়। সপ্তবর্ষের যুদ্ধে ইংলণ্ড ভারত ও কানাডায় ফরাসী শক্তিকে হটিয়ে স্বীয় একাধিপত্য স্থাপন করে। ফ্রান্স ও স্পেন হীনবল হয়ে পড়ে। তবে ইংরাজের এই জয় অবিমিশ্র সফলতা আনে নি। আমেরিকায় ফরাসী আক্রমণের সম্ভাবনা দূর হলে, এই উপনিবেশগুলি ইংলণ্ডের অধীনতা ছিন্ন করার পথে পা বাড়ায়। ফ্রান্স যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাশিয়া এক বৃহৎ শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

[খ] সপ্তদশ শতকের স্বর্গীয় অধিকারতত্ত্ব ও রাজকীয় স্বৈর অধিকার-তন্ত্রের স্থলে এক নব-রাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়। এই নব-মতবাদকে আলোকিত স্বৈরতন্ত্র বলা হয়। এই নব-মতবাদের বৈশিষ্ট্য ছিল যে : (১) রাজকীয় অধিকারের সঙ্গে রাজকীয় কর্তব্যের সংমিশ্রণ করা দরকার। (২) রাজা রাষ্ট্রের মস্তিষ্ক হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন এবং সংস্কার প্রবর্তন করবেন। (৩) রাজা সংস্কারপন্থী হলেও তাঁর স্বৈরক্ষমতা ত্যাগ করবেন না। জনগণের জন্যে সব করা হলেও, জনগণের দ্বারা কিছু করা হবে না।

[গ] প্রাশিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডারিক ছিলেন এক বিখ্যাত জ্ঞানদীপ্ত শাসক। তিনি নিজেকে রাষ্ট্রের প্রধান ভৃত্য বলে ঘোষণা করতেন। তিনি শাসনসংস্কার, অর্থনৈতিক সংস্কার, সামাজিক সংস্কার প্রবর্তন করেন। কিন্তু তিনি প্রজাদের ক্ষমতা ছেড়ে না দিয়ে সকল ক্ষমতা নিজ হাতে রাখেন এবং সামরিক খাতে রাষ্ট্রের সম্পদ ব্যয় করেন। অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় যোসেফ ছিলেন যুক্তিবাদী রাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তিনি শাসনসংস্কার, বিচারবিভাগীয় সংস্কার প্রভৃতি দ্বারা খ্যাতি পান। কিন্তু উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া তাঁর সংস্কার সফল না হলে তিনি হতাশ হন। এছাড়া রাশিয়ার দ্বিতীয় ক্যাথারিনও ছিলেন বিখ্যাত আলোকিত স্বৈরাচারী শাসিকা।

[ঘ] জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্রের বিফলতার বিভিন্ন কারণের মধ্যে জনসাধারণের সহযোগিতা দ্বারা সংস্কার প্রবর্তনের চেষ্টার অভাব, স্বৈর শাসকদের প্রতি প্রজাদের অবিশ্বাস, স্বৈর শাসকদের বাস্তব বুদ্ধির অভাব প্রভৃতি বিশেষ দায়ী ছিল।

[ঙ] শিল্প-বিপ্লব প্রথম ইংলণ্ডেই সূচিত হয়। পুরাতনপন্থী ঐতিহাসিকেরা ইংলণ্ডের জলবায়ুর অনুকূলতা, খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য ও সামুদ্রিক পরিবহণের পটুতাকে ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের কারণ বলেন। হবসবম প্রভৃতি এই মত নস্যাৎ করে বলেন যে, ইংলণ্ডে কৃষি-বিপ্লব, জনসংখ্যার বিস্ফোরণের ফলে নগরের সংখ্যাবৃদ্ধি, মূলধনের প্রাচুর্য ও কারিগরী বিপ্লব প্রভৃতিই ছিল শিল্প-বিপ্লবের আসল কারণ। বিশেষভাবে যন্ত্রের উদ্ভাবনের ফলে কুটিরশিল্পের স্থলে যন্ত্রশিল্পের বিকাশ হয়।

[চ] আমেরিকার ১৩টি উপনিবেশ ইংলণ্ডের অধীনে কার্যতঃ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করত। কিন্তু দীর্ঘকাল মাতৃভূমি ইংলণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় আমেরিকার সঙ্গে এই উপনিবেশের বাসিন্দারা একটি নতুন মিলনের সুর খুজে পায়। স্বায়ত্তশাসন তাদের মনে আনে আত্মবিশ্বাস। আমেরিকার উপর ব্রিটিশ সরকারের অর্থনৈতিক শোষণ তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে। সপ্তবর্ষের যুদ্ধের পর যুদ্ধের খরচা আদায়ের জন্যে ব্রিটিশ সরকার আমেরিকায় কর বৃদ্ধি করলে বিষম গণ্ডগোল দেখা দেয়। ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে তাদের প্রতিনিধি না থাকায় আমেরিকানদের মতে এই সকল ছিল বে-আইনী। চা-আইন উপলক্ষে প্রতিবাদ তীব্র হয় এবং ব্রিটিশের দমননীতির প্রতিবাদে আমেরিকানরা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ১৭৭৬ খ্রীঃ প্রকাশ করে।

[ছ] আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধে ব্রিটেন পরাস্ত হয়ে ১৭৭৬ খ্রীঃ ভার্সাই-সন্ধির দ্বারা আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার করে। বেয়ার্ডের মতে আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ ও নব-সংবিধান দ্বারা আমেরিকার সম্পত্তি-ভোগী বুর্জোয়া শ্রেণীই প্রাধান্য লাভ করে। এই স্বাধীনতা যুদ্ধ ফরাসী বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করে। ব্রিটিশ সরকার এই পরাজয় থেকে শিক্ষা নিয়ে ঔপনিবেশিক নীতি বদলান। ইওরোপের অন্যান্য দেশেও এই বিপ্লব প্রভাব বিস্তার করে।

অনুশীলনী

১। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

(ক) শিল্প-বিপ্লব বলতে কি বুঝায় (খ) স্পিনিং জেনি কে কবে আবিষ্কার করেন? (গ) শিল্পবিপ্লবের উড্ডয়ন' বলতে কি বুঝ? (ঘ) কে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন? (ঙ) কে ব্ল্যাষ্টফার্ণেস আবিষ্কার করেন? (চ) বোষ্টন টি পার্টি কবে কোথায় হয়? (ছ) জর্জ ওয়াশিংটন কে ছিলেন? (জ) দ্বিতীয় ফ্রেডারিক কে ছিলেন? (ঝ) ফিলাডেলফিয়ার তৃতীয় কংগ্রেস কবে কেন হয়? (ঞ) আমেরিকার স্বাধীনতা কবে কীভাবে ঘোষিত হয়? (ট) প্যারিসের সন্ধি ১৭৬৩ খ্রী কোন্ যুদ্ধের পর হয়? (ঠ) কোন্ রাজা নিজেকে 'রাষ্ট্রের প্রধান ভৃত্য' বলে ঘোষণা করেন? (ড) কোন্ রাজা বলেন যে "দর্শন শাস্ত্রকে আমার রাজ্যের আইন রচনার ভার দিয়েছি..."

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

(ক) 'প্রজ্ঞাদীপ্ত স্বৈরাচার' কি? (খ) শিল্প-বিপ্লব কাকে বলে এবং ইংলন্ডে তা কবে হয়? (গ) আমেরিকার বিপ্লবের ফলাফল কি ছিল? (ঘ) টমাস পেইন, জেমস ওটিস, জর্জ ওয়াশিংটন কে ছিলেন? (ঙ) বাষ্পীয় ইঞ্জিন কে নির্মাণ করেন এবং তার কি ফল হয়? (চ) নেভিগশন আইন কি এবং আমেরিকার বিপ্লবের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক ছিল? (ছ) 'অনুতাপময় রাজতন্ত্র' বলতে কি বুঝ? (জ) কে নিজেকে 'রাষ্ট্রের প্রধান সেবক বা ভৃত্য' বলেন? (ঝ) আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মর্ম কি? (ঞ) আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধকে "আমেরিকার বিপ্লব" বলা যায় কি?

৩। সপ্তবর্ষের যুদ্ধের ফলাফল কি ছিল?

৪। জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্রের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

৫। জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী হিসেবে দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৬। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফের সংস্কারগুলি আলোচনা কর। তার ব্যর্থতার কারণ কি?

৭। দ্বিতীয় ক্যাথারিনের সংস্কারগুলি কতদূর জ্ঞানদীপ্ত ছিল তা আলোচনা কর।

৮। ইংলন্ডে শিল্প-বিপ্লব কেন প্রথমে ঘটে তা ব্যাখ্যা কর।

৯। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের কারণগুলি আলোচনা কর।

১০। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের ফলাফল কি ছিল?

দ্বিতীয় অধ্যায় [ক]

ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯—১৮১৪ খ্রীঃ)

ভূমিকা (Introduction) : বিপ্লব কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল—কোন সমাজের অতি দ্রুত আমূল পরিবর্তন। নদী যেমন তার গতির পথে এক কূলকে ভাঙে ও অপর কূলকে গড়ে, বিপ্লব তেমনই দীর্ঘকালের চলে আসা সমাজব্যবস্থা বা পুরাতনতন্ত্রকে ভেঙে দ্রুতবেগে এক নূতন সমাজব্যবস্থার জন্ম দেয়। ফরাসী বিপ্লবের ক্ষেত্রে এইরকম একটি পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের স্রোত শুধুমাত্র ফ্রান্সে সীমাবদ্ধ ছিল না। ফ্রান্সের সীমানা পার হয়ে ইওরোপের দিকে দিকে তা ছড়িয়ে পড়ে।

প্রথম পরিচ্ছেদ : ফরাসী বিপ্লবের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ (The social and economic causes of the French Revolution) : ফরাসী বিপ্লবের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মার্সেল রাইনার-এর মতে—এই বিপ্লবের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি বাদ দিয়ে এই বিপ্লবের কারণ বোঝা যায় না। ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ফরাসী সমাজের সংগঠন ছিল মধ্যযুগের মতই। ফ্রান্সের জনসাধারণকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হত, যথা—যাজকসম্প্রদায় বা প্রথমশ্রেণী। ১৭৮৯ খ্রীঃ এই যাজকদের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ২০ হাজার এবং এদের মধ্যে বিশপদের সংখ্যা ছিল ১৩৯। গীর্জার বাৎসরিক আয় ছিল প্রায় ১০ কোটি লিভ্র। উচ্চ যাজক বা বিশপরাই এই আয়ের সিংহভাগ ভোগ-দখল করত। গীর্জার অধীনে ছিল ফ্রান্সের কৃষিজমির $\frac{১}{৫}$ অংশ। এই জমির জন্যে যাজকরা নিয়মিত কর দিত না। তারা কনট্রাক্ট অফ পোইসি (Contract of Poissey) নামে এক চুক্তি অনুসারে রাজাকে স্বেচ্ছা-কর দিত। উচ্চ যাজকরা ছিল সুবিধাভোগী শ্রেণী। গীর্জা ভূমির আয় ছাড়া টাইদ বা ধর্ম-কর, মৃত্যু-কর, বিবাহ-কর প্রভৃতি আদায় করত। এই অর্থের সিংহভাগ উচ্চ যাজকরা ভোগ করত। নিম্ন যাজক বা গ্রামের পাদরীরা ছিল দরিদ্র ও নিষ্ঠাবান। তারা গীর্জার আয়ের উপস্বত্ব পেত না। এজন্যে তারা উচ্চ যাজকদের প্রতি তীব্র ঘৃণা পোষণ করত। ডেভিড ওগের (David Ogg) মতে নিম্ন যাজকদের মধ্যে উচ্চ যাজকদের প্রতি শ্রেণীগত ঘৃণা ছাড়াও, বিক্ষোভের অন্য কারণ ছিল। নিম্ন যাজকেরা দার্শনিকদের রচনা পড়ে সামাজিক বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন হয়। তারা প্রার্থনাসভার বক্তৃতায় দার্শনিকদের সমালোচনার কথা উল্লেখ করত। মোট কথা গ্রামের যাজকরা সাধারণ লোকের মধ্যে ফরাসী সমাজব্যবস্থার বৈষম্য ও অন্যায় দিকের প্রতি সচেতন হতে সাহায্য করে।

যাজক শ্রেণী

সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল অভিজাতসম্প্রদায়। ১৭৮৯ খ্রীঃ এদের সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৫০ হাজার, দেশের জনসংখ্যার ১$\frac{১}{২}$% ভাগ মাত্র। কিন্তু ফ্রান্সের কৃষিজমির $\frac{১}{৩}$ ভাগ ছিল অভিজাতশ্রেণীর হাতে। তারা ছিল প্রধানতঃ মধ্যযুগের ফ্রাঙ্কিশ বিজেতাদের বংশধর। এই গৌরবে অভিজাতরা নিজেদের সাধারণ লোক হতে স্বতন্ত্র মনে করত। অভিজাতরা তাদের বংশমর্যাদার জোরে নানাবিধ বিশেষ সুবিধা (privilege) ভোগ করত। তারা ফ্রান্সের $\frac{১}{৩}$ অংশ জমি ভোগ করলেও সেজন্যে সরকারকে কোন ভূমি-কর দিত না। তারা তাদের জমিদারিতে নানাপ্রকার সামন্ত-কর বা Champart আদায় করত। তারা সরকারকে অন্যান্য কর প্রদান থেকে অব্যাহতি ভোগ করত। সরকারী চাকুরিগুলি ছিল প্রধানতঃ অভিজাতদের অধিকারে। ফলে সরকারী প্রশাসনযন্ত্র

অভিজাত শ্রেণী : বিশেষ অধিকার

তারাই পরিচালনা করত। বিচারবিভাগের উচ্চপদগুলিও অভিজাতদের হাতে ছিল। অভিজাতরা তাদের এই বিশেষ অধিকার ও মর্যাদা সযত্নে রক্ষা করত। তারা নিজেদের শাসক শ্রেণীর লোক বলে মনে করত। অভিজাতরা শুধু জমিদারি-স্বত্ব ও চাকুরির একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত না। তারা ছিল সমাজের মান্যগণ্য শ্রেণী। যে-কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে তারা বংশ-কৌলীন্যের জোরে সর্বোচ্চ মর্য্যাদা পেত। তারা সর্বত্র তরবারি বহন করত তাদের শ্রেণীর প্রতীক হিসাবে। অভিজাতরা সাধারণ লোকের কাছ থেকে নিজেদের যত্নসহকারে দূরে রাখত। তৃতীয় শ্রেণীর সঙ্গে তারা কখনও বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপন করত না। কারণ তৃতীয় শ্রেণীর বংশ-মর্য্যাদা ছিল না। উচ্চ আভিজাতরা ছিল রাজার পরামর্শদাতা। আভিজাতরা তৃতীয় শ্রেণীকে ঘৃণার চোখে দেখত।

এ ছাড়া ছিল তৃতীয় শ্রেণী। এই তৃতীয় শ্রেণীতে নানা উপ-সম্প্রদায়ের লোক ছিল; যথা—বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্তশ্রেণী, কৃষক, শ্রমিক, চালাচুলোহীন ভবঘুরে বা সাঁকুলেৎ শ্রেণী প্রভৃতি। তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্তশ্রেণীই ছিল বিপ্লবের দূত। ব্যবসা-বাণিজ্যের ও শিক্ষার বিস্তারের ফলে বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্তশ্রেণীর আর্থিক সচ্ছলতা দেখা দেয়। ধনী বুর্জোয়া শিল্পপতি, ব্যাঙ্ক-মালিকরা ছিল প্রচুর অর্থবান এবং অভিজাতশ্রেণী অপেক্ষা অনেক বেশী সম্পদশালী। বংশ-মর্যাদা না থাকায় এই সকল ধনী বুর্জোয়া শিল্পপতিরা নিজেদের সমান মর্যাদা ও অধিকার পেত না। নিম্নবুর্জোয়া বা পাতিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা ছিল আইনজীবী, শিক্ষক, চাকুরে, ছাত্র সম্প্রদায়ের লোক। এরা দার্শনিকদের রচনা পড়ে প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অন্যায়ের দিকটি ভালভাবে বুঝতে পারে। অভিজাতশ্রেণীর বিশেষ অধিকার ও বংশমর্যাদার বড়াইকে বুর্জোয়াশ্রেণী ঘৃণা করত। ঐতিহাসিক হ্যাম্পসনের মতে, "বুর্জোয়াশ্রেণীর সকল শাখাই অভিজাতদের সমালোচনা করত। তারা অভিজাতদের সমান মর্যাদা ও অধিকার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করত।" এই পাওয়া সম্ভব না হলে তারা অভিজাতশ্রেণীর বিশেষ অধিকার ও পুরাতনতন্ত্র ভাঙতে বদ্ধপরিকর হয়।

তৃতীয় শ্রেণী : বুর্জোয়া শ্রেণী

ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা এই বিপ্লবের জন্যে বিশেষভাবে দায়ী ছিল। ফ্রান্সের কৃষকরা ছিল শোষিত শ্রেণী। ফ্রান্সের জমির $\frac{১}{৫}$ অংশ গীর্জার যাজক এবং $\frac{১}{৩}$ অংশ অভিজাতরা ভোগ করত। তারা এত বেশী পরিমাণ জমি ভোগ করলেও টাইলে বা ভূমি-কর দিত না। ভূমি-করের বৃহৎ ভাগ কৃষকদের বইতে হত। স্বাধীন কৃষকদের সংখ্যা ছিল ফ্রান্সে খুবই কম। বেশির ভাগ ছিল মেটায়ার বা বর্গা-চাষী, রেন্টিয়ার বা খাজনা-চাষী এবং সার্ফ বা ভূমিদাস। এ ছাড়া ছিল ভূমিহীন ক্ষেতমজুর। ভাগচাষীরা সকল প্রকার দাবি মিটিয়ে ফসলের মাত্র ২০% হাতে রাখতে পারত। ভূমিদাসদের অবস্থা ছিল সর্বাপেক্ষা শোচনীয়। টাইলে বা ভূমি-কর, সাম্পার্ত বা সামন্ত-কর, টাইদ বা ধর্ম-কর দিয়ে এবং কর্ভি বা বেগার খেটে তাদের উদ্বৃত্ত কিছুই থাকত না। লাব্রুজের মতে, "অষ্টাদশ শতকে ফরাসী কৃষকরা ছিল সর্বাপেক্ষা শোষিত।"

অর্থনৈতিক অবস্থা

শহুরে নিম্নমধ্যবিত্ত ও দিনমজুরদের, সাঁকুলেৎ বা চালচুলোহীন দরিদ্রশ্রেণীর কষ্টের সীমা ছিল না। ১৭৮৯ খ্রীঃ মুদ্রাস্ফীতির দরুন দ্রব্যমূল্য বাড়ে। ১৭৮৮ খ্রীঃ থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে শস্যহানি হলে খাদ্যদ্রব্যের দাম ৬০-৬৫% বাড়ে। সেই তুলনায় মজুরির হার বাড়ে মাত্র ২২%।[১] ফলে খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম শহুরে শ্রমিক ও নিম্নমধ্যবিত্তের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে উঠে যায়। এজন্য দরিদ্র জনতা অসন্তুষ্ট হয় ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ হয়। জর্জ রুডে নামক

[১] George Rude—Revolutionary France.

ঐতিহাসিকের মতে, কৃষক বা সাঁকুলেৎ শ্রেণীর অসন্তোষে নূতন কোন কথা ছিল না। ১৭৮৯ খ্রীঃ আগে এজন্য তারা অনেকবার বিদ্রোহ করে। কিন্তু তাতে সরকারের ক্ষতি হয় নি। কারণ কৃষকরা ছিল অসংগঠিত। তাদের মধ্যে অভিজাত সামন্তশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীগত ক্রোধ ছিল না। ১৭৮৯ খ্রীঃ বুর্জোয়াশ্রেণী সাঁকুলেৎ ও কৃষকদের নেতৃত্ব দিলে পুরাতনতন্ত্রের ভাঙ্গন অবশ্যম্ভাবী হয়। ধনী বুর্জোয়ারা অর্থাৎ শিল্পপতি ও বণিকরা সরকারী শুল্ক-নীতি ও নিয়ন্ত্রণ-নীতির জন্যে স্বাধীনভাবে অবাধে ব্যবসা করতে পারত না। এজন্যে তারা স্থানীয় শুল্কব্যবস্থা লোপ ও শিল্পনিয়ন্ত্রণ লোপ করার দাবি জানায়। নিম্ন বুর্জোয়ারা ছিল অভিজাতদের জন্ম কৌলীন্য ও বিশেষ অধিকার এবং রাজকীয় স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ও সোচ্চার। তাদের নেতৃত্বই সাঁকুলেৎ ও কৃষকদের পুরাতনতন্ত্র ভাঙ্গতে অনুপ্রাণিত করে।[১]

অর্থনৈতিক সঙ্কট ও জাতীয় সভার অধিবেশন

এদিকে সরকার ছিল ঘোর অমিতব্যয়ী। রাজপরিবার দুহাতে সরকারী অর্থ বিলাস-ব্যসনে খরচ করায় ও বিভিন্ন যুদ্ধে অর্থ নষ্ট করায় ১৭৮৯ খ্রীঃ রাজকোষ শূন্য হয়ে যায়। ষোড়শ লুই এই অবস্থায় অভিজাত ও যাজকদের উপর কর ধার্য করে সঙ্কট কাটাতে পারতেন। কিন্তু তাঁর এই সাহস না থাকায় তিনি জাতীয় সভার অধিবেশন ডাকেন। এই সভার অধিবেশন বসলে বুর্জোয়াশ্রেণী এই সভায় বিপ্লব আরম্ভ করে।

মর্স স্টিফেন্স প্রভৃতি ঐতিহাসিকরা ফরাসী বিপ্লবের জন্যে অর্থনৈতিক কারণকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, "এই বিপ্লবের কারণ ছিল প্রধানতঃ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক—দার্শনিক ও সামাজিক নয়।"[২] লেফেভার (Lefebvre) নামে বিখ্যাত ঐতিহাসিকও অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। মিশেল (Michelet) নামে ঐতিহাসিক বলেছেন যে, "পুরাতনতন্ত্রের অন্যায়, অবিচার এবং শোষণ, দারিদ্র্যের প্রতি চরম অবহেলার বিরুদ্ধে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান ছিল ফরাসী বিপ্লবের মূল কারণ।" প্যারিসের জনতা ও সাঁকুলেৎ এই অন্যায় ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘটায়। জর্জ রুডের মতে, অর্থনৈতিক অসন্তোষ, শোষণ, মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে গ্রামের কৃষক ও শহরে কারিগর ও শ্রমিকরা একযোগে বুরবোঁ সরকার, জমিদারশ্রেণী ও ধনী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে যুক্তবিদ্রোহ ঘটায়। তবে একথা ঠিক যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসন্তোষ ফরাসী বিপ্লবের মূল কারণ হলেও একমাত্র কারণ নয়। দার্শনিকদের প্রভাব পুরাতনতন্ত্রের বিরুদ্ধে গভীর অনাস্থা সৃষ্টি করে। বার্নেভ নামে ঐতিহাসিক বলেন যে, কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কারণে ফ্রান্সে বিপ্লব হয় নাই। তাঁর মতে "সভ্যতা, জ্ঞানদীপ্তি ও শিল্পে অগ্রগতির জন্যেই বিপ্লব হয়।" অর্থাৎ বার্নেভের মতে, জ্ঞানদীপ্তির ফলে আলোকিত বুর্জোয়াশ্রেণীই পুরাতনতন্ত্র ভাঙতে অগ্রণী হয়। এই বুর্জোয়াশ্রেণী ছিল সচ্ছল, অর্থবলে সম্পন্ন। তারা অভিজাতদের সমান মর্যাদা চাইত, তার অভাবে তারা অভিজাতদের বিশেষ অধিকার ধ্বংস করে দেয়।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণের গুরুত্ব বিচার

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাতে দার্শনিকদের ভূমিকা (Role of the Philosophers) : বিভিন্ন ঐতিহাসিক ফরাসী বিপ্লবের বিভিন্ন কারণের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। অর্থনীতিবাদী ঐতিহাসিকরা যথা লেফেভার, মর্স স্টিফেন্স, জোয়ারেস প্রভৃতি ফরাসী বিপ্লবের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণকেই বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে

১. Now Cambridge Modern History. Vol. VIII.—George Rude.

২. Morse Stephens—Revolutionary Europe, P. 9. "The causes of the French Revolution were economic and political, not-metaphysical and social."

করেন। অপরদিকে কোন কোন ঐতিহাসিক দার্শনিকদের প্রভাবকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন।

অর্থনীতিবাদী ঐতিহাসিকরা বলেন যে : (১) ফ্রান্সের পুরাতনতন্ত্র অর্থাৎ সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক জীবনে যদি অজস্র ত্রুটি ও অন্যায় না থাকত তবে বিপ্লব আদপেই হত না। বিপ্লব ছিল বাস্তব অবস্থার প্রতিক্রিয়া। এক্ষেত্রে দার্শনিকদের প্রভাব ছিল নগণ্য। (২) দার্শনিকেরা প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তাঁরা বিপ্লবের কথা বলেন নাই। তাঁরা পুরাতনতন্ত্রের দোষ-ত্রুটি দেখালেও, উপর থেকে সংস্কারের কথা বলেন; পুরাতনতন্ত্রকে ভেঙে ফেলার ডাক দেন নাই। (৩) এই যুগে গণশিক্ষা ছিল না। সমাজের বেশির ভাগ লোক ছিল অশিক্ষিত। তারা দার্শনিকদের রচনা পড়ত না এবং দার্শনিকদের মতবাদের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। ফ্রান্সের মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীরাই দার্শনিকদের রচনা পড়ত। সুতরাং ফ্রান্সের সাধারণ লোকের উপর দার্শনিকদের বিশেষ প্রভাব ছিল মনে করা যায় না। (৪) দার্শনিকদের মধ্যে ঐকমত্য ছিল না। রুশো প্রজাতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাস করতেন না। মন্তেস্কু ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের অনুরাগী। ভলতেয়ার মন্তেস্কু বা রুশোর মত মৌলিক চিন্তার অধিকারী ছিলেন না। ফিজিওক্র্যাটরা কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সংস্কারের কথা ভাবতেন। দার্শনিকদের মধ্যে ঐকমত্য না থাকায় তাঁরা জনসাধারণকে বিশেষ অনুপ্রাণিত করেন একথা বলা যায় না। মোট কথা, দার্শনিকেরা পুরাতনতন্ত্রের সমালোচনা করলেও তার অন্যায়ের প্রতিকারের পথ দেখান নাই। ম্যালেট দ্যুপান বলেন যে, দার্শনিকেরা পুরাতন ব্যবস্থার সমালোচনা করলেও, তার জন্যে লোকে বিদ্রোহী হয় এ কথা মনে করার কারণ নেই।

দার্শনিকদের প্রভাবের বিপক্ষে যুক্তি

অপর এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক এই মত অস্বীকার করেন। তাঁরা বলেন যে, কোন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে লোকের অসন্তোষ থাকলেই কেবলমাত্র তার জন্যে বিপ্লব হয় না। অসন্তুষ্ট শ্রেণীগুলিকে যদি প্রচলিত ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি দেখিয়ে সেই ব্যবস্থার প্রতি আস্থাহীন না করা যায়, তবে লোকে সেই ব্যবস্থা ভাঙার জন্যে বিপ্লব করে না। ফ্রান্সের দার্শনিকেরা সরাসরি বিপ্লবের কথা না বললেও তাঁরা প্রচলিত ব্যবস্থার সমালোচনা করে একটি "বিপ্লবী মানসিকতা" (Revolutionary psychology) তৈরি করেন। দার্শনিকরা তাঁদের রচনায় নূতন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা প্রচার করেন। এর ফলে বিভিন্ন বঞ্চিত শ্রেণীর মনে প্রচলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে আস্থা নষ্ট হয়। দার্শনিকদের মতবাদ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে জনমতকে প্রভাবিত করে। জর্জ রুডে বলেন যে—"ফ্রান্সের অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন যে-কোন নাগরিক দার্শনিকদের মতামতের কথা মোটামুটি জানত।" প্যারিসের চা-খানা ও ক্লাবগুলিতে দার্শনিকদের মতামত আলোচিত হত। এই সকল স্থান হতে সাধারণ লোক সেই ভাবধারা গ্রহণ করত। ডেভিড ওগের (David Ogg) মতে, গ্রামের যাজকরা তাদের গীর্জার ভাষণে দার্শনিকদের মতামত প্রচার করত। ফিল্টার বা জল পরিশ্রুতকরণ-যন্ত্রের জল যেমন নিচে চলে যায়, তেমনি দার্শনিকদের মতামত শিক্ষিত লোকদের কাছ থেকে সর্বসাধারণের মধ্যে নানা ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ভলতেয়ারের রচনা শিক্ষিত ফরাসীদের কাছে বেশ জনপ্রিয় ছিল। দার্শনিকেরা প্রত্যেকে ছিলেন মৌলিক চিন্তার ও মতবাদের প্রবর্তক। সুতরাং তাঁরা একমত হবেন না এটাই ছিল স্বাভাবিক। তবে পুরাতনতন্ত্রের দুর্বলতা সম্পর্কে তাঁদেব মধ্যে মতভেদ ছিল না। "দার্শনিকরা যে বীজ রপন করেন তা উপযুক্ত জমিতে অঙ্কুরিত হয়।"

দার্শনিকদের পক্ষে যুক্তি

অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্তির ফলে যে যুক্তিবাদের জাগরণ হয় ফ্রান্সে তার প্রভাব দেখা যায়। ফরাসী দার্শনিকেরা এই যুক্তিবাদের আলোকে প্রচলিত ফরাসী সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতির

যাচাই করেন। মন্তেস্কু তাঁর 'পার্সিয়ার পত্রাবলী' নামে প্রবন্ধমালায় প্রমাণ করেন যে, ফরাসী অভিজাতরা সমাজের অপর সকল শ্রেণীকে বঞ্চিত করে অন্যায়ভাবে বিশেষ সুবিধা ও অধিকার ভোগ করে। আইনের মর্ম বা 'স্পিরিট অফ ল' গ্রন্থে তিনি রাজার স্বৈরাচারী শাসন ও স্বর্গীয় অধিকার নীতির সমালোচনা করেন। মন্তেস্কু ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রবক্তা। তিনি বলেন যে, রাজার ক্ষমতা কখনও সীমাহীন হওয়া উচিত নয়। তিনি সংবিধানকে রাজার ক্ষমতার উর্ধ্বে রাখার কথা বলেন। বিশ্বপ্রকৃতি যেমন নিয়মের অধীন, রাজাও সেরূপ সংবিধানের বা নিয়মের অধীন থাকবেন। তিনি সংবিধান মেনে শাসনকার্য চালাবেন, এটাই ছিল মন্তেস্কুর অভিমত। তিনি ইংলন্ডের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের উদাহরণ দেন। ধনী বুর্জোয়াশ্রেণী ছিল মন্তেস্কুর এই মতবাদের গভীর অনুরাগী। মন্তেস্কু রাজার একচ্ছত্র ক্ষমতা হাতে রাখাকে বিপজ্জনক মনে করতেন। তিনি বলেন যে, যদি রাজার হাতে সরকারের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে, তবে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিনষ্ট হবে। মন্তেস্কু এজন্যে শাসন, বিচার ও আইন বিভাগকে পৃথক করার পরামর্শ দেন।

মন্তেস্কু

ভলতেয়ার ছিলেন অপর চিন্তাবিদ্। তাঁর ক্ষুরধার লেখনীতে তিনি গীর্জার দুর্নীতিগুলিকে আক্রমণ করেন। তিনি ক্যাথলিক গীর্জাকে "বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত উৎপাত বিশেষ" (A privileged nuisance) বলে অভিহিত করেন। ফ্রান্সের সমাজের বৈষম্য ও অন্যায় এবং রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী কাজকেও তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর ব্যঙ্গ-রচনা ছিল বিশেষ জনপ্রিয়। তাঁর 'কাঁদিদ' (Candid) এবং 'দার্শনিক অভিধান' (Philosophical Dictionary) ছিল বিখ্যাত গ্রন্থ। ফরাসী দার্শনিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল এবং যুক্তিবাদী দর্শনের প্রধান পুরোহিত ছিলেন জাঁ-জেকুইস রুশো। তিনি ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের ঝড়ের সামুদ্রিক পাখী। তাঁর "অসাম্যের মূলসূত্র" (Origin of Inequality) গ্রন্থে রুশো দেখান যে, মানুষ সমান অধিকার নিয়ে জন্মায়। কিন্তু লোভী ও স্বার্থপর সমাজব্যবস্থা তাকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। রুশোর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত রচনা ছিল 'সামাজিক চুক্তি' (Social Contract)। এই গ্রন্থে রুশো ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, জনগণই হল রাষ্ট্রের উৎস ও সার্বভৌম শক্তি। সুদূর অতীতে প্রজাসাধারণের ইচ্ছাক্রমে রাজা শাসনক্ষমতা পান। রাজা প্রজাসাধারণের জন্য চুক্তিবদ্ধ ছিলেন। সুতরাং রাজা যদি স্বৈরাচারী হন তবে তিনি চুক্তি খেলাপ করায়, প্রজারা তাদের সঠিক ইচ্ছা দ্বারা তাঁকে পদচ্যুত করতে সক্ষম। এই তত্ত্ব প্রচার করে রুশো এতদিন ধরে-প্রচলিত রাজকীয় স্বর্গীয় অধিকার তত্ত্বের মূলে কুঠারাঘাত করেন। কারণ এতদিন রাজারা সকলকে বুঝিয়েছিলেন যে, তাঁরা ঈশ্বরের কাছ থেকেই ক্ষমতা পেয়েছেন। প্রজাদের কাছে রাজার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। রুশোর সামাজিক চুক্তি-তত্ত্ব এই প্রচলিত মতবাদকে নস্যাৎ করে দেয়। এর ফলে রাজতন্ত্রের স্বর্গীয় মহিমায় মরিচা পড়ে। লোকে রাজতন্ত্রের প্রতি আস্থা হারায়। রুশোর এই মতবাদ আধুনিক গণতন্ত্রবাদ ও প্রজাতন্ত্রবাদের ভিত্তি স্থাপন করে।

ভলতেয়ার ও রুশো

এছাড়া দেনিস দিদেরো ও দা লেমবেয়ার (D' Alembert) প্রভৃতি দার্শনিক বিশ্বকোষ সম্পাদনা করে এরই মাধ্যমে দার্শনিকদের মতবাদ সঙ্কলন ও সম্পাদনা করে লোকসমাজে ছড়িয়ে দেন। ফিজিওক্র্যাট নামে এক শ্রেণীর অর্থনীতিবিদ প্রচলিত মার্কান্টাইল মতবাদ ও সংরক্ষণ-নীতির তীব্র সমালোচনা করে অবাধ বাণিজ্য ও বেসরকারী শিল্পস্থাপনের দাবি জানান। কুয়েসনে (Quesney) ছিলেন এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা।

বিশ্বকোষ প্রণেতা ও অর্থনীতিবিদগণ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ফরাসী বিপ্লবের রাজনৈতিক কারণ : ফরাসী বিপ্লব ঘটার জন্যে বুরবোঁ রাজবংশের দায়িত্ব (Responsibility of the French Monarchy) : সপ্তদশ শতক ছিল ইওরোপে স্বৈরতন্ত্রী শাসনের যুগ। রেনেসাঁসের আমল থেকে ইওরোপে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের পত্তন হয়। সপ্তদশ শতকে তা চরম সীমায় উঠে। ফ্রান্সেও বুরবোঁ (Bourbon) রাজবংশ ১৬১৪ খ্রীঃ থেকে স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে। ফ্রান্সের তিনটি সামাজিক শ্রেণীর প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত জাতীয় সভার নাম ছিল স্টেটস জেনারেল। ১৬১৪ খ্রীঃ থেকে ১৭৫ বছর ধরে বুরবোঁ রাজারা জাতীয় সভার অধিবেশনও ডাকা বন্ধ করে দেন। তাঁরা নিজ ইচ্ছামত দেশ শাসন করতে থাকেন। জাতীয় সভা না থাকায় জনগণের মতামতকে তাঁরা গ্রাহ্য করতেন না। কাহারও কাছে তাঁবা নিজ কৃতকর্মের জন্যে জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিলেন না।

ফ্রান্সের বুরবোঁ রাজবংশ স্বর্গীয় অধিকার নীতিতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত। এই নীতি অনুসারে মনে করা হয় যে, রাজা হলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি তাঁর শাসনক্ষমতা ঈশ্বরের কাছ থেকে লাভ করেছেন। তিনি তাঁর কৃতকর্মের জন্যে একমাত্র ঈশ্বরের কাছে দায়ী। স্বর্গীয় অধিকার বলে বুরবোঁ রাজারা বংশানুক্রমিক ভাবে সিংহাসনে বসতেন। তাঁরা প্রজাদের মতামতকে কোন মূল্য দিতেন না। স্বর্গীয় অধিকারবাদের উগ্র প্রবক্তা ছিলেন সপ্তদশ শতকের বুরবোঁ রাজা চতুর্দ্দশ লুই। তিনি তাঁর ক্ষমতাকে সীমাহীন বলে মনে করতেন। তিনি রাজা ও রাষ্ট্রকে আলাদা না ভেবে রাজাকেই রাষ্ট্র বলে মনে করতেন। তিনি তাঁর সিংহাসনের ক্ষমতা জাহির করে বলেন যে—"আমি অর্থাৎ রাজা হলেন রাষ্ট্র" (The State! It is myself)। সুতরাং ফ্রান্সের বুরবোঁ রাজারা প্রতিনিধি সভাকে স্বীকার করতেন না। জাতীয় সভা না থাকায় জনসাধারণের অভাব-অভিযোগের কথা রাজাকে জানান যেত না। রাজা জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। দ্বিতীয়তঃ, ইওরোপের অন্যান্য দেশে অষ্টাদশ শতকে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্র প্রচলিত থাকায় এই সকল দেশের রাজারা স্বৈরাচারী হলেও কিছু কিছু প্রজা-হিতকর সংস্কার করতেন। কিন্তু ফ্রান্সের বুরবোঁ রাজারা স্বর্গীয় অধিকারে বিশ্বাস করায় নির্জলা স্বৈরতন্ত্র চালু রাখেন। কিন্তু স্বৈরতন্ত্রকে কার্যকরী করতে হলে স্বৈর শাসককে দক্ষ, পরিশ্রমী ও যোগ্য হতে হয়। পঞ্চদশ লুই ছিলেন "প্রজাপতি রাজা" (Butterfly monarch—Schevill)। তাঁর প্রধান উপপত্নী মাদাম দ্যু পম্পাদ্যুরের দ্বারা তিনি প্রভাবিত ছিলেন। এর ফলে শাসন ব্যবস্থায় অবাঞ্ছিত লোকেরা হস্তক্ষেপ করে। তিনি ছিলেন অলস ও পরিশ্রমবিমুখ। এর ফলে প্রশাসনের দায়িত্ব তাঁর অনুগত অভিভাবকদের হাতে বর্তায়। তিনি ছিলেন চিরাচরিত স্বৈরাচারী শাসনের নিয়মে বন্দী। যদিও তিনি বুঝতেন যে এই ব্যবস্থা পরিবর্তনের দরকার। চিরাচরিত স্বৈরাচারী শাসন ভেঙ্গে নূতন প্রথা চালু করার সাহস ও ক্ষমতা তাঁর ছিলনা। তাঁর মৃত্যুকালে তিনি বলেন, "আমার পরে মহাপ্রলয় আসছে।" (Apre me l'deluge) ষোড়শ লুই ছিলেন নিরীহ ভালো মানুষ। তিনি বহুল পরিমাণে তাঁর পত্নী মারিয়া এ্যান্টোনেটের দ্বারা পরিচালিত হতেন। ফলে রাজ্য শাসন ব্যবস্থা প্রধানতঃ অভিজাতদের হাতে চলে যায়। যদিও তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র ছিল নির্মল এবং তিনি দেশকে ভালবাসতেন, কিন্তু কোন বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি ছিলেন অক্ষম। তিনি ছিলেন ঘোর অব্যবস্থিত চিত্ত। হ্যাম্পসন তাঁর সোস্যাল হিষ্ট্রি অফ ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশন গ্রন্থে বলেছেন যে, "শাসন ব্যবস্থায় অভিজাত শ্রেণীর প্রভাব অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।" ফরাসী শাসন ব্যবস্থার মূল ক্ষমতা ছিল 'ইন্টেন্ডেন্ট' (Intendent) নামে কর্মচারীর হাতে। ইন্টেন্ডেন্টরা ছিল জেলাস্তরে প্রশাসন ও রাজস্বের হর্তাকর্তা। দুর্নীতি-পরায়ণ অভিজাতরা এইপদ অধিকার করে

স্বৈরতন্ত্র

রাজকীয় স্বৈরশাসন ও শাসন ব্যবস্থায় দুর্নীতি

জনসাধারণকে শোষণ করত। তৃতীয়তঃ, ফ্রান্সের বিচার ও শাসন ব্যবস্থায় দুর্নীতি দেখা দেয়। পঞ্চদশ লুই বা ষোড়শ লুই তা নিবারণ করার কোন চেষ্টা করেন নাই। বিচারকরা ছিল সাধারণতঃ অভিজাত শ্রেণীর। ন্যায় বিচার করার স্থলে তারা নিজ শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্যে চেষ্টা করত। নাগরিকদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ছিল না। লত্র দ্য কেশে (Letters de Cachet) নামে পরোয়ানার বলে যে কোন লোককে বিনা বিচারে আটক রাখা যেত। চতুর্থতঃ, ১৭৭৬ খ্রীঃ থেকে ষোড়শ লুই-এর প্রগতিশীল মন্ত্রী টুর্গো ও তারপরে ক্যালোন্নে ষোড়শ লুইকে পরামর্শ দেন যে, তাঁর উচিত কিছু মৌলিক সংস্কার দ্বারা সরকারের আর্থিক ও অন্যান্য সঙ্কটকে দূর করা। ষোড়শ লুই এই পরামর্শের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। অভিজাত ভূমিমালিক শ্রেণী যারা এতকাল করমুক্ত ছিল তাদের ওপর কর স্থাপনের যৌক্তিকতা তিনি বুঝেন। কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে এই নীতিকে তিনি রূপায়িত করতে সক্ষম ছিলেন না। তাঁর দুর্বলতার জন্যই অভিজাত শ্রেণী এই প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রবর্তনে তাঁকে বাধা দিতে সাহস করে। ঐতিহাসিক গুডউইন এজন্য রাজার দুর্বলতাকেই দায়ী করেছেন। পঞ্চমতঃ, বুরবোঁ রাজাদের বৈদেশিক নীতি ছিল ভ্রান্ত ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী। পঞ্চদশ লুইয়ের আমলে অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধে (১৭৪০-৪৮ খ্রীঃ) এবং সপ্তবর্ষের যুদ্ধে (১৭৫৬-৬৩ খ্রীঃ) ফ্রান্সের পরাজয়ের ফলে ফরাসী দেশ, ভারত ও আমেরিকায় তার সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য বিস্তারের সুযোগ হারায়। ইওরোপে ফ্রান্সের মর্যাদা নষ্ট হয়। ষোড়শ লুই আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দিয়ে ফ্রান্সের হৃত-মর্যাদা পুনরুদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। এই যুদ্ধে ফ্রান্সের রাজকোষের অর্থ ব্যয় হয়ে গেলে ষোড়শ লুই নিদারুণ অর্থসঙ্কটে পড়েন এবং অভিজাতদের কাছে অর্থ বরাদ্দ চান। অভিজাতরা অর্থবরাদ্দ না দিয়ে রাজাকে জাতীয় সভার অধিবেশন ১৭৫ বছর পরে ডাকতে বাধ্য করে। জাতীয় সভার অধিবেশনকালে অসন্তুষ্ট বুর্জোয়া শ্রেণী পুরাতনতন্ত্রের ধ্বংসের ব্যবস্থা করলে বিপ্লব আরম্ভ হয়।

বিপ্লবের জন্যে ষোড়শ লুইয়ের দায়িত্ব

এখানে একটি প্রশ্ন আসে যে, ষোড়শ লুই বিপ্লব পরিহার করতে পারতেন কিনা। ফিশার নামে ঐতিহাসিক বলেন যে, "ফ্রান্সের রাজা অভিজাতদের বিশেষ অধিকারগুলি লোপ করতে অসমর্থ হলে বিপ্লব ঘটে।" ফিশারের মত হল যে বিদ্রোহী বুর্জোয়াশ্রেণী গোড়ায় জাতীয় সভায় প্রধানতঃ অভিজাতদের বিশেষ অধিকার, করমুক্তি প্রভৃতি অধিকারকে আক্রমণ করে। যদি রাজা যুগের হাওয়া বুঝে বুর্জোয়া-শ্রেণীর এই দাবি মেনে নিতেন, তবে তিনি বিপ্লব এড়াতে পারতেন। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন এই মতের বিরোধিতা করেছেন। কেবলমাত্র সামন্তশ্রেণীর বিশেষ অধিকার লোপ করে বিপ্লব এড়ানো সম্ভব ছিল না। একই টাকার যেমন দুপিঠে দুরকম ছাপ থাকলেও মূলত তা একই টাকা, তেমন পুরাতনতন্ত্রের একপিঠে ছিল সামন্তশ্রেণীর বিশেষ অধিকার ও বৈষম্য, অপর পিঠে ছিল রাজকীয় স্বৈরশাসন, দুর্নীতি ও বিচারব্যবস্থায় বৈষম্য। একটিকে লোপ করে অন্যটিকে রক্ষা করা মোটেই সম্ভব ছিল না। রাজকীয় শাসনের দুর্নীতি, বিচারের দুর্নীতি এবং স্বৈর-ক্ষমতাও দূর করা দরকার ছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : রাজকীয় অর্থসংকট : অভিজাত বিদ্রোহ (Financial Crisis of the Monarchy : The Aristocratic Revolt) : ঐতিহাসিক লেফেভার (Lefebvre) এই যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন যে—"ফরাসী বিপ্লবের প্রাথমিক পর্যায়ে ফরাসী অভিজাতরাই বিপ্লব ঘটাবার জন্যে দায়ী ছিল।" ফ্রান্সের রাজকোষে রাজ-পরিবারের অমিতব্যয়িতা, ভ্রান্ত কর-নীতির জন্যে অর্থ সঞ্চয় হচ্ছিল না। ইতিমধ্যে আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগদানের ফলে ষোড়শ লুইয়ের রাজকোষ শূন্য হয়ে যায়। বাজেটে প্রভূত ঘাটতি দেখা

দেয়। প্রচলিত কর বাড়িয়ে সেই ঘাটতি পূরণ করার উপায় ছিল না। এমতাবস্থায় শাসনের খরচা নির্বাহের জন্যে রাজা প্রচুর জাতীয় ঋণ গ্রহণ করেন। এই ঋণ বাবদ রাজসরকারকে সুদের টাকা দিতে হত। তদুপরি ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব ছিল। শেষ পর্যন্ত ১৭৮৮ খ্রীঃ সরকারের ঋণ বাবদ প্রদেয় বার্ষিক সুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১৮,৮০০,০০০ ফ্রাঁ। এই অর্থসহ, ১৭৮৮ খ্রীঃ সরকারের মোট বার্ষিক খরচা ছিল ৬৩০,০০০,০০০ ফ্রাঁ। এই বিপুল অর্থ আর তৃতীয় শ্রেণীর ওপর কর আদায় করে যোগাড় করা সম্ভবপর ছিল না। জনসাধারণের কাছ থেকে আর ঋণ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। কারণ সরকারের আর্থিক অবস্থা খারাপ দেখে লোকে ঋণপত্র কিনতে আগ্রহ হারায়। এদিকে রাজকোষ শূন্য হলে সরকারের দৈনন্দিন খরচা নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ষোড়শ লুই টুর্গো নামে এক মধ্যবিত্তশ্রেণীর অর্থনীতিবিদকে অর্থমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। টুর্গো সমগ্র অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে ষোড়শ লুইকে “কর-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার” (Structural Reform)-এর সুপারিশ করেন। তিনি সরকারী ব্যয়সঙ্কোচের ও রাজ-পরিবারের অমিতব্যয়িতা কমাবার পরামর্শ দেন। তিনি বেগার বা কর্ভি লোপ করার পরামর্শ দেন। তিনি আন্তঃশুল্ক-ব্যবস্থা লোপ করে অবাধে মাল চলাচলের ব্যবস্থা করার সুপারিশও করেন। তাহলে বাণিজ্য বাড়বে এবং সরকারী বাণিজ্য-শুল্ক বাবদ আয় বাড়বে। টুর্গো বিশেষভাবে সুপারিশ করেন যে, অভিজাতদের কর প্রদান থেকে অব্যাহতির নিয়মকে লোপ করে জমির অনুপাতে কর ধার্য করা হোক। টুর্গোর সুপারিশে ফরাসী অভিজাতরা চটে যান। এই শ্রেণীর ও রানী মারিয়া এ্যান্টোনেটের চাপে ষোড়শ লুই টুর্গোকে পদচ্যুত করেন। ষোড়শ লুই টুর্গোর প্রস্তাবের যৌক্তিকতা বুঝতেন। এজন্যে তিনি ম্রেষের সঙ্গে মন্তব্য করেন, “কেবলমাত্র টুর্গো ও আমি ফ্রান্সকে ভালবাসি।” টুর্গোর পতন এই ইঙ্গিত দেয় যে, ফ্রান্সে সংস্কারের দ্বারা পরিবর্তন আনা কষ্টকর।

রাজকীয় অর্থসঙ্কট
টুর্গোর সংস্কার প্রস্তাব

টুর্গোর পতনের পর ষোড়শ লুই কিছুকাল মন্ত্রী নেকারের সাহায্যে পুনরায় ঋণ যোগাড় করে সরকারী ব্যয় নির্বাহ করেন। শেষ পর্যন্ত ঋণ পাওয়া সম্ভব না হলে নেকার পদত্যাগ করেন। ষোড়শ লুই ১৭৮৬ খ্রীঃ ক্যালোন্নেকে মন্ত্রী-পদে নিযুক্ত করেন। ক্যালোন্নে হিসাব করে দেখেন যে, সরকারী বাজেটে ১১২,৬০০,০০০ লিভ্র ঘাটতি দাঁড়িয়েছে। ফলে ক্যালোন্নে প্রস্তাব দেন যে ঃ—(১) অভিজাত ও যাজক শ্রেণীর করমুক্তি-প্রথা রদ করা হোক। (২) সকল কৃষি-জমির উপর জমির উৎপাদন অনুসারে ২$\frac{১}{২}$—৫% হারে ভূমিকর ধার্য করা হোক। (৩) সকল শ্রেণীকে গ্যাবালে বা লবণ-কর দানে বাধ্য করা হোক। ক্যালোন্নে বলেন যে, “অভিজাত ও যাজক শ্রেণী কর আদায় না দিয়ে যে অর্থ আহরণ করেছে, সামাজিক স্বার্থে রাষ্ট্র তা এখন দাবি করতে পারে।”

ক্যালোন্নের নূতন কর-প্রস্তাব অভিজাতশ্রেণী বিনা প্রতিবাদে মেনে নেবে তার সম্ভাবনা কম ছিল। বহুশত বৎসর ধরে করমুক্তির অধিকার ভোগ করার পর তারা তাদের অধীনস্থ জমিদারিগুলির জন্যে কর দিতে হঠাৎ রাজী হয়নি। তৃতীয় শ্রেণীর সমান হারে কর দিতে বাধ্য হলে অভিজাতদের বংশকৌলীন্যের দাম থাকবে না। তারা সকলের সমান হয়ে যাবে। এই আশঙ্কায় অভিজাতরা নূতন কর-প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। ক্যালোন্নের পরামর্শে ষোড়শ লুই অভিজাতদের মধ্যে মুখ্য ব্যক্তিদের একটি পরিষদ (Council of Notables) ডেকে তাঁর নূতন কর-প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। ঐতিহাসিক লেফেভারের মতে, “অভিজাত পরিষদ আহ্বানের অর্থই ছিল অভিজাতদের কাছে ষোড়শ লুইয়ের আত্মসমর্পণ। রাজা তাঁর নূতন

ক্যালোন্নের মন্ত্রীত্ব ও
সংস্কার প্রস্তাব

কর-প্রস্তাব অভিজাতদের মান্য করার আদেশ না দিয়ে রাজা তাদের অনুমোদন চান।" অভিজাত পরিষদ নিজশ্রেণীর বিশেষ অধিকার রক্ষার জন্যে সচেতন ছিল। রাজার অর্থসাহায্যের আবেদনে কর্ণপাত না করে, এই সভা ক্যালোন্নের পদত্যাগ দাবি করে। ক্যালোন্নের অপরাধ ছিল যে, তিনি অভিজাতদের উপর কর বসাতে রাজাকে পরামর্শ দিয়েছেন। দুর্বলচিত্ত ষোড়শ লুই সেই অভিজাত-পরিষদের চাপে ক্যালোন্নেকে পদচ্যুত করেন। পরবর্তী মন্ত্রী ব্রিয়াঁর পরামর্শে ষোড়শ লুই অভিজাত-পরিষদ বা মুখ্য ব্যক্তিদের পরিষদ ২৫শে মে, ১৭৮৭ খ্রীঃ ভেঙে দেন।

ব্রিয়াঁ পূর্ববর্তী মন্ত্রীদের মতই কাঠামোগত বা মৌলিক সংস্কারের সুপারিশ করেন। তিনি এই সুপারিশগুলি অনুমোদনের জন্যে পার্লামেন্ট অফ প্যারিস (Parlement of Paris) নামে এক অভিজাত বিচারসভার কাছে পাঠান। যেহেতু এই সভার সদস্যরা ছিল অভিজাতশ্রেণীর লোক, সেহেতু তারাও নিজশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্যে চেষ্টা চালায়। পার্লামেন্ট অফ প্যারিস জানায় যে, রাজার নূতন কর-প্রস্তাব প্রচলিত সংবিধানবিরোধী। কারণ অভিজাতশ্রেণীর করমুক্তির অধিকার একটি দীর্ঘকালের স্বীকৃত নীতি। পার্লেমেন্ট এই নূতন কর-প্রস্তাব অনুমোদন করতে রাজী হয়নি। ষোড়শ লুই অনুমোদন দানের জন্য চাপ দিলে এই অভিজাত বিচারসভা মৌলিক আইনবিধি নামে এক পাল্টা প্রস্তাব রচনা করে রাজাকে তা অনুমোদনের জন্যে চাপ দেয়। "মৌলিক আইন বিধি"র দ্বারা পার্লেমেন্ট অফ প্যারিস রাজার স্বৈরাচারী ক্ষমতাকে খর্ব করার চেষ্টা করে। ষোড়শ লুই পার্লেমেন্ট অফ প্যারিসকে রাজধানী থেকে বহিষ্কারের চেষ্টা করলে, এই সভার সমর্থনে অভিজাতরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ করে। এতে রাজা ভয় পেয়ে যান। তিনি সেনাদলের সাহায্য না নিয়ে, পার্লেমেন্ট অফ প্যারিসের দাবি মেনে নিয়ে জাতীয় সভা বা স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন ১লা মে, ১৭৮৯ খ্রীঃ ডাকতে রাজী হয়ে যান। অভিজাতদের চাপে ১৭৫ বছর পরে রাজা জাতীয় সভার অধিবেশন ডাকতে বাধ্য হন। অভিজাত বিদ্রোহ তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। জাতীয় সভার অধিবেশন ডাকার অর্থ ছিল রাজা আর স্বৈরাচারী শাসন চালাতে পারবেন না। এতদিন জাতীয় সভা ছাড়া তিনি যে শাসন চালাচ্ছিলেন, তার অবসান হয়। দ্বিতীয়তঃ, বুর্জোয়াশ্রেণী পুরাতন তন্ত্র ভেঙ্গে ফেলার জন্যে এতদিন অপেক্ষায় ছিল। জাতীয় সভা ডাকা হলে তারা সমবেত হয়ে বিদ্রোহ ঘটাবার সুযোগ পায়। ফরাসী বিপ্লব শুরু হয়ে যায়। অভিজাতশ্রেণী ভেবেছিল যে, জাতীয় সভা ডাকা হলে তারা এই সভার সাহায্যে তাদের চিরাচরিত সুযোগসুবিধাগুলি ও করমুক্তির অধিকারকে রক্ষা করতে পারবে। এখানেই তাদের বিরাট ভুল হয়। জাতীয় সভায় তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে বুর্জোয়া-প্রতিনিধিরা অভিজাতদের বিশেষ অধিকারকে আক্রমণ করে। এজন্য তারা অনেক দিন অপেক্ষা করেছিল। জাতীয় সভার অধিবেশন ডাকতে রাজাকে বাধ্য করে, ফরাসী অভিজাতরা তাদের নিজেদের কবর খুঁড়ে। ফলে এইসঙ্গে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের পতন হয়। এজন্য সেতোব্রিয়াঁ নামক ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন যে, "অভিজাতরা বিপ্লবের সূচনা করে, তৃতীয় শ্রেণী তাকে সম্পূর্ণতা দেয়।"[১]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : জাতীয় সভার অধিবেশন : বুর্জোয়া বিদ্রোহ (Summoning of the States General : The Bourgeois Revolution) : ষোড়শ লুই ফরাসী অভিজাতশ্রেণীব চিরাচরিত প্রত্যক্ষ কর-প্রদানের দায়িত্ব হতে মুক্তির অধিকার লোপ করতে উদ্যত হন। এজন্যে ক্রুদ্ধ অভিজাতরা তাঁকে জাতীয় সভার অধিবেশন ডাকতে বাধ্য করে। ১৬১৪ খ্রীঃ পর আর জাতীয় সভার অধিবেশন বসে নাই।

১· "The Patricians began the Revolution, the Plebians completed it."

এখন ১৭৫ বছর পরে ১৭৮৯ খ্রীঃ ১লা মে জাতীয় সভার অধিবেশন ডাকা হয়। অভিজাতদের আশা ছিল যে, জাতীয় সভায় তারা তাদের বিশেষ অব্যাহতির অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখে বাড়তি করের বোঝা তৃতীয় শ্রেণী বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত ও কৃষকদের উপর চাপিয়ে দিতে পারবে। কারণ পুরাতন নিয়ম অনুসারে জাতীয় সভায় তিন শ্রেণীর প্রতিনিধিরা (যাজক, অভিজাত, তৃতীয় শ্রেণী) আলাদাভাবে শ্রেণী-পিছু ভোট দিত। সুতরাং প্রতি শ্রেণীর পৃথক ভোট থাকার ফলে তৃতীয় শ্রেণীর গৃহীত প্রস্তাব অভিজাতরা নাকচ করতে পারত।

জাতীয় সভায় ১২১৪ জন প্রতিনিধির মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি ছিল ৬২১ জন। অভিজাতদের মধ্য থেকে মিরাব্যু, লাফায়েৎ, এ্যাবে সিয়েস প্রভৃতি কিছুসংখ্যক সদস্য নিজ শ্রেণী ত্যাগ করে তৃতীয় শ্রেণীতে যোগ দেন। ফলে তৃতীয় শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এদিকে তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিদের মধ্যে আইনজীবী ছিল ২৫%, চাকুরীজীবী ছিল ৫%, কৃষক প্রতিনিধি ছিল ৭—৯%। সুতরাং এই প্রতিনিধিদের মধ্যে শহুরে বুর্জোয়ারাই ছিল প্রধান। তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত মুখপাত্ররা দাবি করেন যে, জাতীয় সভায় শ্রেণী-পিছু আলাদা ভোটের পরিবর্তে একত্রে মাথাপিছু ভোটদান ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এই ব্যবস্থা চালু হলে সংখ্যাগুরু তৃতীয় শ্রেণী ভোটের জোরে অভিজাত ও যাজকদের পরাস্ত করত। সকল শ্রেণী একত্র হয়ে মাথাপিছু ভোট দিলে অভিজাতরা তৃতীয় শ্রেণীর সমান মর্যাদায় নেমে যেত। তারা তাদের জন্ম-কৌলীন্য ও বিশেষ মর্যাদা হারাত।

জাতীয় সভা আহ্বান

জাতীয় সভায় তৃতীয় শ্রেণীর বুর্জোয়া প্রতিনিধিরা পেট্রিয়টিক পার্টি বা দেশপ্রেমিক সঙ্ঘ নামে একটি গোষ্ঠী গঠন করে তাঁদের বক্তব্যকে জোরদার করেন। তাঁরা ছিলেন সমাজের সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত শ্রেণী। তাঁদের হাতে ছিল প্রচুর অবসর। এই অবসরকে তাঁরা জাতীয় সঙ্ঘের বিতর্কে ব্যবহার করেন। পুস্তক, পুস্তিকা, ইস্তেহার প্রচার করে তাঁরা সমান সেই অধিকারের সংস্কারের যৌক্তিকতা দেখান। পেট্রিয়টিক পার্টির অন্যতম নেতা তাত্ত্বিক এ্যাবেসিয়েস। ভোটাধিকারের দাবির তাঁর বিখ্যাত পুস্তিকা "বিশেষ অধিকার-বিষয়ক প্রবন্ধ" (Essay on Privileges) প্রকাশ করেন। এই রচনায় তিনি "নিয়োগকারী ক্ষমতাতত্ত্ব" (Constituent Power Theory) ব্যাখ্যা করে বলেন যে ঃ-(১) সমাজের প্রথম শ্রেণী বা যাজকরা হলেন বৃত্তিধারী, চাকুরীজীবী। যাজকের পদ বংশানুক্রমিকও নয়। সুতরাং যাজকরা কোন শ্রেণী হতে পারে না। অভিজাতরা বিশেষ সুবিধা ভোগ করায় ও জাতীয় জীবনপ্রবাহ হতে স্বতন্ত্র থাকায় তাঁরা জাতি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। তাঁদের জাতির তরফে কথা বলার অধিকার নেই। সুতরাং তৃতীয় শ্রেণীই হল জাতি। যেহেতু রাষ্ট্র জনগণের ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত, জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। সুতরাং তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিরাই জনগণের প্রতিনিধি এবং তাঁরাই প্রকৃত জাতীয় সভা। এ্যাবে সিয়েসের নিয়োগকারী ক্ষমতাতত্ত্ব তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ষোড়শ লুই তৃতীয় শ্রেণীর মাথাপিছু ভোটের দাবি অগ্রাহ্য করে শ্রেণীপিছু ভোটদানের আদেশ দিলে বুর্জোয়া প্রতিনিধিরা এই আদেশ অগ্রাহ্য করে।

বুর্জোয়া প্রতিবাদ

এজন্য ষোড়শ লুই জাতীয় সভার অধিবেশন বন্ধ করে দেন। এর ফলে ক্রুদ্ধ তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিরা নিকটস্থ রাজকীয় টেনিস মাঠে সমবেত হয়ে বিখ্যাত 'টেনিস কোর্টের' শপথনামা (২০শে জুন, ১৭৮৯ খ্রীঃ) গ্রহণ করে। এই শপথনামায় সদস্যরা প্রতিজ্ঞা করে যে ঃ (১)

ফ্রান্সের জন্যে একটি নূতন সংবিধান রচনা না করে সদস্যরা জাতীয় সভা ত্যাগ করবে না। (২) রাজা জাতীয় সভা রদ করলেও তা স্বীকার করা হবে না। এই সদস্যরা যেখানে সমবেত হবে সেটাই জাতীয় সভার মর্যাদা পাবে। (৩) তৃতীয় শ্রেণীর সদস্যরা বেইলী নামে সদস্যকে স্পিকার বা সভাপতি নির্বাচন করে সভার কাজ চালাবার ব্যবস্থা করে। এই পরিস্থিতিতে যাজকশ্রেণীর ১৫০ জন প্রতিনিধি ও ২ ভাগ আর্কবিশপ তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগ দিলে তৃতীয় শ্রেণীর হাত শক্ত হয়। অভিজাতরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিরা তাদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করতে পারেন এই আশঙ্কা করে। এজন্য তারা প্যারিসের বুর্জোয়া যুবকদের দ্বারা ন্যাশন্যাল গার্ড বা জাতীয় রক্ষীবাহিনী গড়ে। টেনিস কোর্টের শপথনামার দ্বারা বুর্জোয়াশ্রেণী বিপ্লবের পথে পা বাড়ায়। রাজা ষোড়শ লুই কিছুকাল ইতস্ততঃ করার পর ২৭শে জুন, ১৭৮৯ খ্রীঃ জাতীয় সভার অধিবেশন পুনরায় ডাকেন এবং সদস্যদের একত্রে বসে মাথাপিছু ভোটদানের আদেশ দেন। এই সভায় বুর্জোয়া নেতারা নূতন সংবিধান রচনা করেন। এই সংবিধান দ্বারা স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ও সামন্তশ্রেণীর বিশেষ অধিকারের মৃত্যুর ঘণ্টা বাজানো হয়। অভিজাতদের বিশেষ ক্ষমতা লোপের পর, এই সংবিধান দ্বারা, বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেদের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত করে। এজন্যে এই পর্যায়ের বিপ্লবকে "বুর্জোয়া বিপ্লব" বলা হয়।

বুর্জোয়া বিদ্রোহ : টেনিস কোর্টের শপথনামা

প্যারিসের বিপ্লব : বাস্তিলের পতন : কৃষক বিপ্লব (Revolt of Paris : Fall of Bastille : Peasants' Revolt) : ঐতিহাসিক লেফেভারের (Lefebvre) মতে, "জাতীয় সভা আহ্বানের ফলে ফ্রান্সের সাধারণ লোকের মনে এক বিরাট আশাবাদের সৃষ্টি হয়।" প্যারিসের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৭ লক্ষ। এদের মধ্যে এক বিরাটসংখ্যক লোক ছিল দরিদ্র, সর্বহারাশ্রেণী, যাদের সাঁ-কুলেৎ (Sans culottes) বলা হয়। এদের সঙ্গে যোগ দেয় গ্রাম থেকে আগত দরিদ্র, চালচুলোহীন লোকেরা। এর ফলে প্যারিসে এক বিশৃঙ্খল উত্তেজিত অবস্থা দেখা দেয়। ইতিমধ্যে গুজব ছড়ায় যে, জাতীয় সভা ভাঙার জন্যে রাজা সেনা মজুদ করেছেন। বুর্জোয়া নেতারা যে জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন করে তার হাতে উপযুক্ত অস্ত্র ছিল না। প্যারিসের জনতাও সংঘাতের সম্ভাবনা দেখে অস্ত্রযোগাড়ের চেষ্টা করে। এই সময় ক্যামিল ডেসমোলিন, জাঁ পল ম্যারাট প্রভৃতি বুর্জোয়া নেতা আগুনঝরা বক্তৃতায় জনতাকে উত্তেজিত করেন। এই উত্তেজিত প্যারিসের জনতা বা "পারিসিয়ান মব". ১৭৮৯ খ্রীঃ ১৪ই জুলাই বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ করে। বাস্তিল ছিল স্বৈরশাসনের প্রতীক। কারণ বিনাবিচারে বহুলোককে এই দুর্গে বন্দী করে রাখা হত। বাস্তিলদুর্গে সরকারের অস্ত্র মজুত থাকত। অস্ত্র যোগাড় করাও ছিল বাস্তিল আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য।[১] সরকারী সেনার সঙ্গে এক খণ্ডযুদ্ধের পর জনতা এই দুর্গ অধিকার করে। বাস্তিলের পতনের পর রাজা ও অভিজাতরা তাদের মনোবল হারিয়ে ফেলে। প্যারিসের নিয়ন্ত্রণ বুর্জোয়া নেতাদের হাতে চলে যায়। তাঁরা জাতীয় রক্ষীবাহিনী বা ন্যাশনাল গার্ড দ্বারা প্যারিস কমিউন গঠন করে প্যারিসে আইন-শৃঙ্খলা স্থাপন ও শাসন পরিচালনার ব্যবস্থা করেন। প্যারিসের বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া গ্রামাঞ্চলেও দেখা দেয়। "বাস্তিলের পতনের ফল ছিল বহুমুখী।"

জর্জ রুডে নামক ঐতিহাসিকের মতে, গ্রামাঞ্চলে নির্যাতিত ও শোষিত কৃষকেরা এতকাল

অভিজাত ও সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও ঘৃণা পোষণ করত। গ্রামের শোষিত কৃষকের কাছে রাজকীয় স্বৈরাচার অপেক্ষা সামন্ত-প্রভুদের শোষণ ও অত্যাচার ছিল অনেক বেশী জরুরী বিষয়। এতদিন তারা সামন্ত-প্রভুদের বিরুদ্ধে সফল হয় নি। প্যারিসে জনতার অভ্যুত্থান ও বাস্তিলদুর্গের পতনের কাহিনী গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লে, গ্রামাঞ্চলে শোষণের যন্ত্রকে ভেঙে ফেলতে কৃষকেরা তৎপর হয়। জমিদারদের শাতো (Chateau) বা পল্লীভবন পুড়িয়ে, খামারবাড়ীগুলি ধ্বংস করে, হিসাবের খাতাগুলি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। জমির বেষ্টনীগুলি ভেঙে দিয়ে, পশুচারণভূমি অধিকাব কবে, জমিমালিক ও তাদের কর্মচারীদের গ্রাম থেকে বিতাড়িত করা হয়। গ্রামাঞ্চলে গুজব রটে যায় যে, সামন্ত অভিজাতরা বিদ্রোহী কৃষকদের শায়েস্তা করতে ভাড়াটে গুণ্ডা ও সেনা পাঠাচ্ছে। তারা কৃষকদের ক্ষেতের ফসল জ্বালিয়ে দিবে। এই গুজবকে "মহা আতঙ্ক" (Great Fear) বলা হয়। এতে কৃষকরা আরও ক্ষেপে যায় এবং জমিদারদের ঘরবাড়ী, কাছারী পুড়িয়ে সর্বকিছু ধ্বংস করে। সামন্ততন্ত্র এর ফলে ভেঙে পড়ে।

কৃষক বিদ্রোহ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ ফ্রান্সের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে সংবিধান-সভার ভূমিকা (Achievements of the Constituent Assembly in solving the political and economic problems) ঃ

টেনিস কোর্টের শপথনামার পর জাতীয় সভা সংবিধান রচনার কাজে হাত দিলে. এই সভা সংবিধান-সভায় রূপান্তরিত হয়। গ্রামাঞ্চলে কৃষক-বিদ্রোহ দেখা দেওয়ায় সলোমন ও রোবসপিয়ার নামে দুই সদস্যের পরামর্শে সংবিধান-সভা সামন্ত-প্রথার অবসান ও পুরাতনতন্ত্রের কতকগুলি ব্যবস্থাকে লোপ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ৪ঠা আগস্ট, ১৭৮৯-এর এক ঘোষণার দ্বারা নিম্নলিখিত ব্যবস্থা সংবিধান-সভা নেয়। এই ঘোষণায় বলা হয় যে, (১)সামন্ত-প্রথা লোপ করা হল। (২) ভূমিদাস বা সার্ফ-প্রথা, সামন্ত-কর, বেগার বা কর্ভি প্রথা প্রভৃতি লোপ করা হল। (৩) সামন্তশ্রেণীর বিশেষ অধিকার, সামাজিক মর্যাদা পাওয়ার অগ্রাধিকার লোপ করা হল। (৪) টাইদ বা ধর্ম-কর লোপ করা হল। ৪ঠা আগস্টের ঘোষণা দ্বাবা সামন্তপ্রথা পুরোপুরি লোপ পায়নি। তখনও সামন্ত-প্রভুদের কিছু কিছু অধিকার অবশিষ্ট ছিল। তবে সামন্তপ্রথার বেশির ভাগ অংশ এই ঘোষণার দ্বারা লুপ্ত হয়। দরিদ্র কৃষক, ভাগচাষী প্রভৃতি বহুল পরিমাণে অধিকার পায়।

সামন্ত প্রথা প্রভৃতি লোপ

এর পর সংবিধান-সভা ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার (Declaration of the Rights of Man and Citizen) ঘোষণা করে। এই ঘোষণাপত্রে বলা হয় যে, (১) মানুষ মাত্রেই কতকগুলি পবিত্র অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই অধিকারগুলি হল স্বাধীনভাবে বাঁচার, সম্পত্তি অর্জন ও ভোগ করার অধিকার। (২) আইনের চক্ষে সকল নাগরিক সমান। বিনা বিচারে কাহাকেও শাস্তি দেওয়া যায় না। (৩) জনমত হল আইনের উৎস। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র জাতির মধ্যেই নিহিত আছে। (৪) সম্পত্তির অধিকার একটি পবিত্র অধিকার। (৫) স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ ও ধর্মপালনের অধিকারও মৌলিক অধিকার। ব্যক্তি ও নাগরিকের ঘোষণাপত্র দ্বারা ফরাসী বিপ্লবের তিনটি বিখ্যাত আদর্শ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ফ্রান্স ও ইওরোপের সর্বত্র এই ঘোষণাপত্র এক প্রবল আশাবাদ সৃষ্টি করে। লেফেভারের মতে, "ইওরোপের সর্বত্র একটি নবযুগের আগমনী সূচিত হয়।" ঐতিহাসিক ওগারের মতে,

ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার ঘোষণা

"পুরাতনতন্ত্রের মৃত্যুর দলিল (death certificate) ছিল এই ঘোষণাপত্র।"

সংবিধান-সভা ৪ঠা ও ১১ই আগস্টের ঘোষণার দ্বারা ফ্রান্সের রাজার স্বৈরাচারী ক্ষমতা, স্বর্গীয় অধিকার লোপ করে। রাজার নিজস্ব খাসজমি বাজেয়াপ্ত করা হয়। রাজাকে সংবিধান মেনে চলতে বাধ্য করা হয়। রাজা আইন রচনা, আইনসভার উপর নিয়ন্ত্রণ এবং রাজ্যের সকল কর্মচারী ও বিচারকদের নিয়োগ করার অধিকার এবং রাজকোষের আয় ইচ্ছামত ব্যয় করার অধিকার হারান। তাঁর স্বর্গীয় অধিকারের দাবি নাকচ করা হয়। তাঁকে এখন থেকে ফরাসী জাতির রাজা (King of the French) বলা হয়। তাঁর ব্যয়নির্বাহের জন্যে ভাতা নির্দেশ করা হয়। মন্তেস্কুর ক্ষমতাবিভাজন নীতি অনুসারে তাঁকে শাসনবিভাগের প্রধান হিসাবে গণ্য করা হয়। তিনি তাঁর মন্ত্রীদের ও রাষ্ট্রদূতদের নিয়োগ করতে পারতেন। কিন্তু আইনসভায় তিনি বা তাঁর মন্ত্রীরা যোগ দিতে পারতেন না। আইনসভার পাস-করা আইনগুলি কার্যকরী করতে তিনি সংবিধান অনুযায়ী বাধ্য ছিলেন। যদি কোন বিশেষ আইনকে তিনি অনুমোদনের অযোগ্য মনে করতেন তবে তিনি "মুলতবীনামা" বা Suspensive veto দ্বারা তা কিছুদিন মুলতবী রাখতে পারতেন। শাসনবিভাগের প্রধান হিসাবে তিনি স্বীকৃতি পেলেও, এক্ষেত্রে তাঁর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা হয়। তিনি কর্মচারীদের নির্দেশ ও আনুগত্য লাভের অধিকার হারান। শাসনবিভাগের প্রধান কর্মচারীরা এবং প্রাদেশিক শাসনের কর্মচারীরা ও বিচারপতিরা ভোটের বা নির্বাচনের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। শাসনবিভাগের কর্মচারীরা ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ায় তারা জাতির প্রতি আনুগত্য জানায়। রাজা তাদের আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না। যেসকল অভিজাত বংশানুক্রমিক ভাবে শাসনবিভাগের কর্মচারীর পদ ভোগ করত,—তাদের সেই অধিকার ও পদ লোপ করা হয়।

সাংবিধানিক সংস্কার

সংবিধান-সভা মন্তেস্কুর ক্ষমতাবিভাজন তত্ত্ব অনুযায়ী আইনসভাকে আইন রচনার সার্বভৌম ক্ষমতা দেয়। আইনসভা এককক্ষবিশিষ্ট সভা হিসাবে গঠিত হয়। এই সভার কর ধার্য করার পূর্ণক্ষমতা ছিল। এই সভার সদস্যরা ২ বছরের মেয়াদে নির্বাচিত হত। সদস্যরা পুনর্নির্বাচিত হতে পারত না। এই সভায় পাস-করা আইন রাজা এবং নির্বাচিত কর্মচারীরা মান্য করতে বাধ্য ছিলেন। কারণ সংবিধান অনুযায়ী আইনসভা ছিল জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতীক। আইনসভার সদস্য নির্বাচনের জন্যে ভোটাধিকার আইন রচিত হয়। এই ভোটাধিকার আইনে ফ্রান্সের নাগরিকদের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এই দুভাগে ভাগ করা হয়। যারা অন্ততঃপক্ষে ৩ দিনের আয় সরকারকে কর হিসাবে দিত এবং ২৫ বছর বয়স ছিল, তারা সক্রিয় নাগরিকরূপে চিহ্নিত হয় এবং ভোটদানের অধিকার পায়। নিষ্ক্রিয় নাগরিকদের সেই মানের অধিকার ছিল না।

আইন সভা ঃ ভোটাধিকার আইন

প্রাদেশিক শাসন পরিচালনার জন্যে আগে ফ্রান্সে যেরূপ বিভিন্ন সামন্ত-জমিদারিতে বিভক্ত ছিল তা লোপ করা হয়। ফ্রান্সকে সমান মাপের ৮৩টি প্রদেশে বা ডিপার্টমেন্টে ভাগ করা হয়। প্রদেশগুলিকে ৫৪৭টি জেলায় ভাগ করা হয়। ফ্রান্সকে মোট ৪৪ হাজার কমিউন বা স্বয়ংশাসিত গ্রাম ও নগর সংগঠনে ভাগ করা হয়। প্রদেশের শাসনের জন্যে পূর্ব-প্রচলিত ইন্টেন্ডেন্টদের পদ লোপ করা হয়। প্রদেশ হতে ক্যান্টন ও গ্রাম সকল স্তরে সক্রিয় নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত স্থানীয় কমিউন সভা ও তার মেয়র দ্বারা শাসনের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রাদেশিক শাসন

সংবিধান-সভা ফরাসী গীর্জার উপর পোপের নিয়ন্ত্রণ লোপ করে জাতীয় গীর্জা বা

গ্যালিক্যান গীর্জা স্থাপন করে। "ধর্মযাজকদের সংবিধান" বা সিভিল কনস্টিটিউশন অফ ক্লার্জি (Civil Constitution of Clergy) দ্বারা ফরাসী গীর্জাকে রাষ্ট্রের অধীন করা হয়। ধর্মযাজকদের পোপের দ্বারা নিযুক্তির পরিবর্তে স্থানীয় ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার নিয়ম করা হয়। গীর্জার ভূসম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হয়। যাজকদের সরকার থেকে নিয়মিত মাহিনা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। ফরাসী সরকারের অর্থ-সঙ্কট মোচনের জন্যে গীর্জার সম্পত্তির যা মূল্য ছিল, তার সমান মূল্যের কাগজের মুদ্রা চালু করা হয়। এই কাগজের মুদ্রার নাম ছিল এ্যাসাইন্যাট। বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্যে অবাধ বাণিজ্য-সংরক্ষণ শুল্ক চালু করা হয়। লা শেপালিয়ার আইন দ্বারা শ্রমিকদের ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার হরণ করা হয়। বিচার-বিভাগে নির্বাচন দ্বারা বিচারক নিয়োগ করার নিয়ম চালু করা হয়।

গীর্জা সংস্কার : মুদ্রা, বিচার বিভাগীয় ও অন্যান্য সংস্কার

সংবিধান-সভার কার্যাবলী পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এই সভা ফ্রান্সে পুরাতনতন্ত্রের ব্যবস্থাগুলি যথা স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র, সামন্ত-প্রথা, অভিজাতশ্রেণীর বিশেষ অধিকার, ক্যাথলিক গীর্জার ক্ষমতা লোপ করে। তথাপি এই সংবিধানে বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থকে রক্ষার সকল প্রকার চেষ্টা করা হয়। মোট কথা এই সংবিধান দ্বারা বুর্জোয়াশ্রেণী অভিজাত ও রাজার হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়। সেই ক্ষমতা তারা নিজশ্রেণীর হাতে রক্ষা করে। সর্বসাধারণ অর্থাৎ কৃষক, সাঁকুলেৎ প্রভৃতি শ্রেণীকে ক্ষমতা ও সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়। যদিও এই শ্রেণীর সাহায্যে পুরাতনতন্ত্র ধ্বংস করা হয়, কাজ শেষ হলে তাদের কথা প্রতিনিধিরা ভুলে যান। নাগরিকের অধিকারের ঘোষণাপত্রে যদিও সকল শ্রেণীর সমান অধিকারের কথা বলা হয়, ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে বহু নাগরিককে নিষ্ক্রিয় চিহ্নিত করে তাদের ভোটাধিকারে বঞ্চিত করা হয়। শাসনবিভাগকে আইনবিভাগ হতে সম্পূর্ণ পৃথক করায় শাসনবিভাগ অচল হয়ে পড়ে। আইনসভার হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা দেওয়া হয়। এর ফলে আইনসভা দায়িত্বহীন ক্ষমতার অপব্যবহার করে। প্রদেশ, জেলা ও কমিউনগুলির শাসনের দায়িত্ব স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত শাসক ও নির্বাচিত সভার হাতে দেওয়ার ফল ছিল ভয়াবহ। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা ভোটে নির্বাচিত হওয়ায় কেন্দ্রে রাজাকে আনুগত্য দিত না। তারা নিজ নিজ এলাকায় স্বয়ং স্বাধীন হয়; ফলে দেশের ঐক্য বিপন্ন হয়। মিরাব্যু ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, "দেশকে ভেঙ্গে ফেলার জন্যে এর অপেক্ষা আর কোন ভাল ব্যবস্থা হতে পারে না।" গীর্জার জাতীয়করণ করায় ধর্মপ্রাণ লোকেরা অসন্তুষ্ট হয়। হ্যাম্পসনের মতে, সামন্ত-প্রথা লোপ করা হলেও সামন্তদের সকল অধিকার লোপ করা হয় নাই।

সমালোচনা

সপ্তম পরিচ্ছেদ : বিপ্লবের অগ্রগতি, ১৭৮৯-১৭৯৩ খ্রীঃ (The Progress of the Revolution, 1789—1793) : সংবিধান-সভা নূতন বিপ্লবী সংবিধান রচনা করলে তা ১৭৯১ খ্রীঃ চালু হয়। এই সংবিধান অনুসারে যে এককক্ষ-বিশিষ্ট আইনসভা গড়া হয়, তার নাম ছিল লেজিস্‌লেটিভ এ্যাসেম্বলী। এই সভায় জিরান্ডিন, জ্যাকোবিন ও মডারেট নামে তিনটি প্রধান গোষ্ঠী ছিল। (বিশদ বিবরণ পৃঃ ৩৯ দ্রষ্টব্য)। লেজিস্‌লেটিভ এ্যাসেম্বলীর সঙ্গে রাজা ষোড়শ লুইয়ের বিরোধ আরম্ভ হয়। তিনি সংবিধান-সভার গীর্জার জাতীয়করণ আইনের বিরুদ্ধে তাঁর বিশেষ ক্ষমতা বলে সাস্‌পেন্‌সিভ ভিটো বা মুলতুবীনামা জারী করেন। সেজন্য রাজার সঙ্গে জ্যাকোবিন নেতাদের বিরোধ বাধে। উগ্রপন্থীদের জ্যাকোবিন প্ররোচনায় প্যারিসের জনতা টুইলারিজ রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে রাজাকে অপদস্থ করে।

রাজার সঙ্গে বিধানসভার বিরোধ

ষোড়শ লুই, তাঁর পত্নী ও বালক পুত্র প্রাণভয়ে ছদ্মবেশে ফ্রান্স ছেড়ে অস্ট্রিয়ার দিকে

পালাবার সময় ভেরেন্নে গ্রামে ধরা পড়েন। বহু অপমান ভোগ করে তিনি রাজধানীতে ফিরে আসেন। ষোড়শ লুইয়ের পলায়নের চেষ্টায় বিপ্লবী নেতাদের সন্দেহ হয় যে, তাঁর সঙ্গে বৈদেশিক শক্তির গোপন যোগ আছে। এদিকে অস্ট্রিয়ার সেনাপতি ব্রান্সউইক ম্যানিফেস্টো দ্বারা ফরাসী জাতিকে সতর্ক করেন যে, বিপ্লবীরা যেন রাজপরিবারের কোন ক্ষতি না করে। এই ঘোষণার ফলে উগ্রপন্থীদের রাজার প্রতি সন্দেহ বাড়ে। প্যারিসের বিপ্লবী কমিউন ও

দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লব : রাজতন্ত্রের পতন

জ্যাকোবিনদের নেতৃত্বে প্যারিসের সাঁ-কুলেৎ জনতা পুনরায় টুইলারিজ প্রাসাদ আক্রমণ করে রাজকীয় দেহরক্ষীদের নিহত করে। রাজা-রানী প্রাণভয়ে আইনসভার আশ্রয় নেন। জনতা আইনসভাকে ঘেরাও করে, আইনসভাকে রাজতন্ত্র মুলতবী করতে বাধ্য করে। রাজা কারাগারে বন্দী হন। রাজা বন্দী হলে, রাজতন্ত্র ভেঙ্গে পড়ে। ১৭৯১ খ্রীঃ সংবিধান কার্যতঃ নাকচ হয়ে যায়। ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়। এই ঘটনাকে ঐতিহাসিক লেফেভার দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লব (Second French Revolution) আখ্যা দিয়েছেন। প্রথমটি ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর বিপ্লব। এখন বিপ্লব জনগণের হাতে যায়।

১৭৯১ খ্রীঃ-এর সংবিধান রদ হলে ১৭৯১ খ্রীঃ ভোটাধিকার আইন নাকচ হয়ে যায়। এই ভোটাধিকার আইনে যারা সম্পত্তিভোগী ছিল, যারা আয়কর দিত, তাদের ভোটাধিকার ছিল। এর ফলে একমাত্র বুর্জোয়াশ্রেণী ভোটাধিকার পায়। এখন ১৭৯২ খ্রীঃ দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লবে গণভোট প্রথা চালু হয়। প্রতি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ নাগরিক যাদের বয়স ছিল ২৫ বছর, তারা ভোটাধিকার লাভ করে। এই গণভোটের ভিত্তিতে নূতন আইনসভা ১৭৯২ খ্রীঃ গঠিত হয়। এই আইনসভার নাম ছিল ন্যাশনাল কন্‌ভেন্‌শন বা জাতীয় সম্মেলন। এই সম্মেলন নূতন সংবিধান

প্রজাতন্ত্র ঘোষণা : জাতীয় প্রতিনিধি সভা গঠন

রচনার কাজে হাত দেয়। এই সংবিধান ১৭৯৩ খ্রীঃ গৃহীত হয়। এই সংবিধানে ফ্রান্সকে একটি প্রজাতন্ত্র বলা হয়। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা এক কক্ষ-বিশিষ্ট আইনসভার ব্যবস্থা এই সংবিধানে করা হয়। কিন্তু এই সংবিধান পুরা কার্যকরী করার আগে ফ্রান্সে অরাজকতা দেখা দিলে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে সন্ত্রাসের রাজত্ব (Reign of Terror) চালু করা হয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল (Achievements of the Revolution) : ফরাসী বিপ্লব ফ্রান্সের এবং ইওরোপের ইতিহাসে বহু সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটায়। "দানবীয় ঝাঁটার" দ্বারা এই বিপ্লব বহু জীর্ণ, পুরাতন ব্যবস্থাকে ঝেঁটিয়ে ফেলে

জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা : প্রজাতন্ত্রবাদের উদ্ভব

এবং নূতন সমাজব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে। ফ্রান্সে বুরবোঁ রাজবংশের স্বৈরতন্ত্র ও স্বর্গীয় অধিকার-মূলক শাসন লুপ্ত হয়। রাষ্ট্র জনসাধারণের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল,—রুশোর এই মতবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে প্রজাতন্ত্রবাদের প্রতি জনসাধারণের আস্থা দেখা দেয়। এই প্রজাতন্ত্রের আদর্শ ফরাসী বিপ্লবের অবসান হলেও ফরাসী জাতির মনে স্থায়ী আসন পায়। ১৮৭১ খ্রীঃ ফ্রান্সে তৃতীয় প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হলে ফ্রান্স চিরতরে রাজতন্ত্রের পথ পরিত্যাগ করে।

ফরাসী বিপ্লব ফ্রান্সে এক নব সংস্কৃতির জন্ম দেয়। ফরাসী বিপ্লবের যুগে কঁদরসেৎ (Condorset) সর্বপ্রথম সর্বজনীন শিক্ষার পরিকল্পনা তৈরি করেন। নাগরিকরা রাষ্ট্রকে প্রদেয় করের মতই, জনশিক্ষার ব্যয়নির্বাহের জন্যে করপ্রদানে বাধ্য এই মতবাদ চালু হয়। কমিউনগুলির মাধ্যমে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-প্রবর্তনের কথা ভাবা হয়। এই শিক্ষা ছিল গীর্জার নিয়ন্ত্রণমুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা। এই শিক্ষায় যুক্তিবাদ প্রাধান্য পায়। যেহেতু ফরাসী

বিপ্লবের অন্যতম ধ্বনি ছিল সাম্য, সকল মানুষ সমান বলে বিপ্লবের সময় থেকে ঘোষণা করা হয়। এজন্য সমাজে যোগ্যতাহীন লোকেরা 'কেবলমাত্র বংশমর্যাদার জোরে সকলের কাছে মর্যাদা পাওয়ার অধিকার হারায়। একমাত্র দেশসেবক কর্মী ও বিদ্বান লোকেরাই শ্রদ্ধার পাত্র হিসাবে বিবেচিত হন। ফ্রান্সের উপনিবেশ থেকে দাসপ্রথা লোপ করা হয়।

ফরাসী বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের সমাজ ও অর্থনীতিতে গভীর পরিবর্তন ঘটে। মধ্যযুগ থেকে ফ্রান্সে সামন্ত-প্রথা ও অভিজাততন্ত্রের প্রচলন ছিল। ফরাসী বিপ্লবে সামন্ত-প্রথা ধ্বংস হয় এবং অভিজাতশ্রেণীর "বিশেষ অধিকার" বিলুপ্ত হয়। লোকে যোগ্যতার ভিত্তিতে কাজ পায়। জন্মকৌলীন্য লোপ পায়। সামাজিক সাম্য স্থাপিত হয়। সকল নাগরিকের সমান অধিকারের দাবি স্বীকৃত হয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সামন্ত-প্রথা ধ্বংস হলে জমিগুলি সাধারণ লোকের হাতে চলে যায়। আইনের চোখে সকল নাগরিক সমান,—এই আদর্শ চালু হয়।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফলাফল

ফরাসী বিপ্লব ছিল প্রধানতঃ বুর্জোয়া-বিপ্লব। এই বিপ্লবে বুর্জোয়াশ্রেণী প্রধান নেতৃত্ব দেয় এবং বিপ্লবের ফসল তারাই ঘরে তোলে। এই বিপ্লবে সাঁ কুলেৎ বা সর্বহারাশ্রেণী, দিনমজুর, ভূমিহীনদের বিশেষ কোন উপকার হয় নাই। বুর্জোয়া শাসকশ্রেণী আইনগুলি প্রধানতঃ নিজ শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্যে রচনা করে। জ্যাকোবিন দল কিছু পরিমাণ জনকল্যাণমূলক আইন করলেও তা বেশীদূর আগায় নাই। কার্ল মার্ক্স তাঁর 'ক্যাপিট্যাল' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে ফরাসী বিপ্লবের মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর মতে সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে পৌঁছাবার ঐতিহাসিক সূত্র ফরাসী বিপ্লবে দেখা যায়।

বুর্জোয়াশ্রেণীর আধিপত্য লাভ

তবে ফরাসী বিপ্লবের জঠর হতে লিবার্টি বা স্বাধীনতা বা গণতন্ত্রবাদের নবজন্ম হয়। বাক্-স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার, কোড নেপোলিয়ন বা নেপোলিয়নের আইনাবলী, বিচারবিভাগের স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রভৃতি আদর্শ হল ফরাসী বিপ্লবের অবদান।

গণতন্ত্রবাদ

দেবতা জুপিটারের মস্তক থেকে যেমন দেবী মিনার্ভার জন্ম হয়, সেরূপ ফরাসী দার্শনিকদের মস্তক বা বুদ্ধি-বিভাসা থেকে উদ্ভূত হয়ে ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা সারা ইওরোপে ছড়িয়ে পড়ে। উনবিংশ শতকের ইওরোপের ইতিহাস এর ফলে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। ইতালী, জার্মানীতে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বিকাশ হয়।

ইওরোপে বিপ্লবের প্রভাব

নবম পরিচ্ছেদ : বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ও তার প্রকৃতি (Nature of the Foreign Intervention) : ১৭৯২ খ্রীঃ জানুয়ারি মাসে ফ্রান্সের বিপ্লবী সরকার অস্ট্রিয়াকে এক চরমপত্র দিলে অস্ট্রিয়া তা অগ্রাহ্য করে। ফলে ফ্রান্সের বিধানসভা বা লেজিস্লেটিভ এ্যাসেম্বলী অস্ট্রিয়া ও তার মিত্র প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে বিপ্লবী ফ্রান্স ইওরোপীয় রাজশক্তিগুলির সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ডেভিড টমসনের মতে, "এই যুদ্ধে বিপ্লবী ফ্রান্স ইওরোপকে আক্রমণ করে অথবা ইওরোপ বিপ্লবী ফ্রান্সকে আক্রমণ করে এই প্রশ্নের মীমাংসা করা সম্ভবপর নয়।" কারণ "এই যুদ্ধ ছিল বিপ্লবী ফ্রান্সের আদর্শবাদের সঙ্গে রাজতন্ত্রবাদী ইওরোপীয় শক্তিগুলির আদর্শবাদের সংঘাত" (ফিলিপ গডেলা)। বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে পুরাতনতন্ত্র ভেঙে যে নূতন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠে তা ইওরোপের রাজশক্তিগুলির আতঙ্ক সৃষ্টি করে। ইওরোপের অভিজাত ও সামন্তশ্রেণী ভয় পায় যে, ফরাসী বিপ্লবের তরঙ্গ

বৈদেশিক যুদ্ধের প্রকৃতি : বিপ্লব বনাম প্রতিক্রিয়াশীলতার দ্বন্দ্ব

তাদের দেশে ছড়িয়ে পড়লে তাদের দেশেও অনুরূপ অবস্থা দেখা দিবে। সুতরাং তার আগেই ফরাসী বিপ্লবকে ফ্রান্সের সীমান্তের মধ্যেই ধ্বংসের চেষ্টা করা হয়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক সোরেল (Sorel) এজন্যে বলেছেন যে, "মূলতঃ এই দ্বন্দ্ব ছিল বিপ্লব বনাম প্রতিক্রিয়াশীলতার ঘাত-প্রতিঘাত।"

ফ্রান্সের জিরন্ডিস্ট দল মনে করত যে, ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ভাবধারাকে কেবলমাত্র ফ্রান্সের মধ্যে আবদ্ধ রাখা উচিত নয়। ইওরোপীয় স্বৈরাচারী রাজবংশগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধের দ্বারা এই ভাবধারা ইওরোপে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। কারণ কেবলমাত্র ফরাসী জনগণের স্বৈরতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র ও গঠনতন্ত্র থেকে মুক্তি হলে বিপ্লব সম্পূর্ণ হবে না। প্রতিবেশী দেশের জনগণের সমান মুক্তি হল বিপ্লবের আন্তর্জাতিক লক্ষ্য। মৈত্রী কথাটির আদর্শ হল এই সকল দেশের নিপীড়িত জনগণের মৈত্রী। নতুবা রাজতান্ত্রিক ইওরোপ জোট বেঁধে ফ্রান্সের বিপ্লবী সরকারকে ধ্বংস করে ফেলবে। ১৭৯২ খ্রীঃ এক ঘোষণাপত্রে সারা ইওরোপে রাজতন্ত্রকে ধ্বংস করে ইওরোপীয় জনগণের স্বাধীনতা ও সাম্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য জাতীয় কনভেনশন ঘোষণা করে। অস্ট্রিয়া ছিল ইওরোপের সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল, স্বৈরাচারী রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের দর্প চূর্ণ করলে বিপ্লবের আদর্শ সফল হবে। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রগুলিকে আক্রমণ করলে সেই দেশের নিপীড়িত জনগণ তাদের স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।

ইওরোপে স্বৈরতন্ত্র ধ্বংসের চেষ্টা

বৈদেশিক যুদ্ধের অপর কারণ ছিল যে, কোন কোন বিপ্লবী নেতা সন্দেহ করতেন যে, রাজা ষোড়শ লুইয়ের সঙ্গে দেশত্যাগী ফরাসী অভিজাত বা এমিগ্রিদের গোপন যোগ আছে। এই অভিজাতরা রাইনল্যান্ড বা রাইন অঞ্চল হতে ফ্রান্স আক্রমণের উদ্যোগ করে। তারা ফ্রান্সের ভিতরের বিপ্লববিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে বিদ্রোহের জন্যে প্ররোচনা দিতে থাকে। এই দেশত্যাগী অভিজাতদের অস্ট্রিয়ার রাজতন্ত্র সাহায্য দেয়। এজন্য ফ্রান্সের বিপ্লবী সরকার অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় উৎসাহ দেখায়। যুদ্ধের দ্বারা এমিগ্রিদের বা দেশত্যাগী অভিজাতদের বিতাড়িত করার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয়। কোন কোন বিপ্লবী নেতা মনে করেন, ফ্রান্সের সীমান্ত যথেষ্ট সুরক্ষিত নয়। বিপ্লবের সুযোগে ইওরোপের প্রতিক্রিয়াশীল রাজাদের রাজ্য আক্রমণ করে ফ্রান্সের সীমান্তকে বিস্তার করে প্রাকৃতিক সীমারেখায় স্থাপন করা উচিত। এজন্যে উত্তর-পূর্বে বেলজিয়াম, পূর্বে রাইন নদী এবং দক্ষিণ-পূর্বে স্যাভয় ও নীস দখল করে ফ্রান্সের সীমান্তকে সুরক্ষিত করার পরিকল্পনা করা হয়। ঐতিহাসিক ফিশার এজন্য মন্তব্য করেছেন যে. "ফ্রান্স একাধারে যুদ্ধের মাধ্যমে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শের প্রচারক এবং অপরের রাজ্য অপহরণকারী দস্যু এই উভয় ভূমিকায় কাজ করে।"

এমিগ্রি সমস্যা ও বিদেশী ষড়যন্ত্র

ফ্রান্সের জ্যাকোবিন দল অবশ্য যুদ্ধ-নীতির বিরোধিতা করে। রোবসপিয়ার সতর্ক করে বলেন যে, যুদ্ধ বাধলে গণতন্ত্র বিপন্ন হতে পারে। যুদ্ধে জয়লাভ হলে কোন কোন সেনাপতি জনপ্রিয়তা পেতে পারে। অধীনস্থ সৈন্যও জনপ্রিয়তার সুযোগে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারে। এই আশঙ্কা রোবসপিয়ার প্রকাশ করেন। সম্ভবতঃ প্রাচীন রোমের ইতিহাসে জুলিয়াস সীজারের দৃষ্টান্ত তাঁর মনে ছিল। তা ছাড়া যুদ্ধের জন্যে বেশী অর্থের দরকার হলে, জনগণের ওপর করের বোঝা বাড়ার আশঙ্কা পুরোমাত্রায় ছিল। রোবসপিয়ারের এ সতর্কবাণীতে জিরণ্ডিন দল কান দেয় নি।

যুদ্ধে জ্যাকোবিন বিরোধিতা

অস্ট্রিয়ার হ্যাবসবার্গ সম্রাট, সার্ডিনিয়ার রাজা, স্পেন ও নেপলসের রাজারা সকলেই ছিলেন ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুইয়ের কুটম্ব অথবা জ্ঞাতি। তাঁরা আশঙ্কা করেন যে, প্যারিসের গণ-বিদ্রোহের ফলে ষোড়শ লুই, তাঁর রানী এবং যুবরাজ্যের প্রাণ বিপন্ন হয়েছে। এজন্যেও তাঁরা বিপ্লবী ফ্রান্সকে আক্রমণের সংকল্প করেন। এই পটভূমিকায় অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুগ্মবাহিনীর সেনাপতি ডিউক অব ব্রান্সউইক, ব্রান্সউইক ম্যানিফেস্টো দ্বারা বিপ্লবী নেতাদের সতর্ক করে দেন যে, রাজা ও তাঁর পরিবারবর্গের যেন কোন ক্ষতি না হয়।

রাজতান্ত্রিক ইওরোপের আগ্রাসন নীতি

দশম পরিচ্ছেদ : সন্ত্রাসের রাজত্ব (The Reign of Terror) : ন্যাশনাল কন্‌ভেন্‌শন বা জাতীয় সম্মেলনের রাজত্বকালে (১৭৯২—৯৪ খ্রীঃ) বিপ্লবী ফ্রান্স এক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। ইওরোপের প্রধান রাজতান্ত্রিক শক্তিগুলি ফ্রান্সের বিপ্লবী সরকারকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে এক শক্তিজোট গড়ে। বিপ্লবী ফ্রান্সের সেনাপতি ডুমারিয়েৎস আক্রমণকারী রাজতান্ত্রিক সেনাদলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে যোগ দেন। এর ফলে শত্রুপক্ষের সেনারা ফ্রান্সের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত দিয়ে ঢুকে পড়ে। তারা রাজধানী প্যারিসের দিকে এগিয়ে আসে। যদি এই আক্রমণ দ্রুত প্রতিহত না করা হত, তবে ফ্রান্সের বিপ্লবী প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটত। এই সঙ্কট সময়ে দেশরক্ষার জন্যে ফ্রান্সের জনগণের মধ্যে কোন জাগরণ দেখা যায় নাই। ফরাসী জনসাধারণের একাংশ প্রজাতন্ত্রী সরকারের বিরোধিতা করে। বাকী সকলে এই সরকারের আইনপত্র ও আদেশকে অবহেলা করে। এই সরকারকে মান্য করার কোন ইচ্ছা তারা দেখায় নি। দেশরক্ষার জন্যে সেনাদলে যোগ দিতে লোকে অস্বীকৃতি জানায়। সরকারকে করপ্রদান বহু লোক রদ করে। দক্ষিণ ফ্রান্সের লাভাঁদ বা লা ভিন্ডি প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষকবিদ্রোহ দেখা দেয়। ফ্রান্সের ক্যাথলিক গীর্জার জাতীয়করণের ফলে যে সকল যাজক অসন্তুষ্ট ছিল, তারা দক্ষিণ ফ্রান্সের কৃষকদের বিদ্রোহে প্ররোচনা দেয়। ফরাসী প্রজাতন্ত্র এভাবে বিপন্ন হয়ে পড়লে জাতীয় সম্মেলন প্রজাতন্ত্র রক্ষার জন্যে এক আপৎকালীন জরুরী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এই শাসনব্যবস্থার নাম ছিল 'সন্ত্রাসের রাজত্ব' (Reign of Terror)। প্রজাতন্ত্রের নেতারা মনে করেন যে, দেশে শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্যে কঠোরতা অনুসরণ করা দরকার। রাষ্ট্রের আইনবিধি যাতে জনগণ মেনে চলে, রাষ্ট্রকে যাতে নিয়মিত কর দেয়, এজন্য প্রয়োজনমত বলপ্রয়োগ বা সন্ত্রাস প্রদর্শন করার জন্যে সরকারী প্রশাসনকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৭৯২-৯৪ খ্রীঃ পর্যন্ত সন্ত্রাসের শাসন চলে।

সন্ত্রাসের রাজত্বের কারণ

সন্ত্রাসের শাসনকে কার্যকরী করার জন্যে নিয়মিত সংবিধানকে মুলতবী রাখা হয়। জাতীয় প্রতিনিধিসভার (জাতীয় কন্‌ভেন্‌শনের) হাতে আইনতঃ চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকলেও এই সভা কয়েকটি কমিটি বা সমিতির হাতে সকল ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেয়। এই সমিতিগুলি ছিল জন-নিরাপত্তা সমিতি (Committee of Public Safety)। নয় হতে বার জন সদস্য নিয়ে জন নিরাপত্তা সমিতি গড়া হয়। এই সমিতির সদস্যদের প্রতি মাসে জাতীয় প্রতিনিধিসভার দ্বারা নির্বাচিত করার নিয়ম করা হলেও কার্যতঃ একই সদস্যরা নির্বাচিত হয়। এই সমিতির সন্ত্রাসের রাজত্ব পরিচালনার জন্যে মূল নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা ছিল। সাধারণ নিরাপত্তা সমিতি (Committee of General Security) নামে অপর এক সমিতিকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, পুলিশবিভাগ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি দায়িত্ব দেওয়া হয়। সাধারণ নিরাপত্তা সমিতি কমিউনগুলি সাহায্যে সন্দেহভাজন লোকদের তালিকা তৈরি করত। বিপ্লবী বিচারালয় (Revolutionary Tribunal) নামে এক বিচারালয়ে তাদের বিচারের

সন্ত্রাসের ব্যবস্থা

জন্যে অভিযুক্ত করত। এই শেষের দুটি সংস্থা জননিরাপত্তা সমিতির অধীনে কাজ করত। 'সন্দেহের আইন' (Law of Suspects) অনুসারে রাজতন্ত্রের প্রতি অনুগত এই সন্দেহে যে কোন নাগরিককে গ্রেপ্তার করা যেত।

১৭৯২-১৭৯৩ খ্রীঃ জিরন্ডিস্ট ও জ্যাকোবিন দল একযোগে সন্ত্রাসকে কার্যকরী করে। ক্রমে জিরন্ডিস্ট ও জ্যাকোবিনদের মধ্যে তীব্র মতপার্থক্য দেখা দেয়। এই মতপার্থক্যের মূলে ছিল দুই দলের আদর্শবাদের সংঘাত, দুই দলের নেতাদের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্যে কলহ। যদিও জাতীয় কনভেনশন সভায় জিরন্ডিস্টরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, যুদ্ধে পরাজয়ের জন্যে জিরন্ডিস্টদের জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়। খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে প্যারিসে খাদ্যসঙ্কট ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা হতে থাকে। সাঁ-কুলেৎ শ্রেণী খাদ্যশস্যের মজুতদারদের আড়তে হামলা চালায় ও ১৭৯০ সালের দামে খাদ্য বিক্রির দাবি করে। সম্পত্তিশালী ধনী বুর্জোয়াদের বাড়ী আক্রান্ত হয়। জ্যাকোবিন দল জনসাধারণের অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্যে জিরন্ডিস্টদের দায়ী করে। শেষ পর্যন্ত ১৭৯৩ খ্রীঃ গোড়ার দিকে সন্ত্রাসের সাহায্যে জ্যাকোবিন দল জিরন্ডিস্টদের দমিয়ে ফেলে।

জিরন্ডিস্টদের পতন : সন্ত্রাসের শাসন

বিপ্লব-বিরোধীরাও এই সময় সন্ত্রাসের চাপে দমিত হয়। আইন-শৃঙ্খলা ফিরে আসে। সরকার নিয়মিত কর আদায়ে সক্ষম হয়। লোকে সেনাদলে যোগ দিতে থাকে। সাঁ-কুলেৎদের সন্তুষ্ট রাখার জন্যেএই সময় সর্বোচ্চ দ্রব্যমূল্য বেঁধে দেওয়া হয় এবং সর্বনিম্ন মজুরি স্থির করে আইন রচনা করা হয়। এই দুটি আইনকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করার ফলে সাধারণ লোকের বহু সুবিধা হয়। কমিউনগুলির সভায় নাগরিকরা হাজিরা দিলে মাথাপিছু ৪০ স্যু ভাতাদানের আইন করা হয়। লা ভেন্ডি, লায়নস, বোর্দো প্রভৃতি স্থানের প্রতি-বিপ্লব বা বিদ্রোহ দমিত হয়।

ক্রমে সন্ত্রাস ভয়াবহ রূপ নেয়। সন্ত্রাসের নেতারা যেন রক্ত-পিপাসায় মেতে উঠেন। রানী মারিয়া এ্যান্টোনেট, মাদাম রোল্যান্ড ও বহু জিরন্ডিস্ট নেতা সন্ত্রাসের বলি হন। লায়ন্স শহরে বহু লোককে লয়ার নদীর জলে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়। ড্যান্টন নামে এক বিখ্যাত বিপ্লবী নেতাকে রোবসপিয়ার গিলোটিনে হত্যা করেন। ড্যান্টনের মৃত্যুর পর রোবসপিয়ার তাঁর স্বৈরতন্ত্র ও সন্ত্রাস কিছুকাল চালান। অবশেষে বিরোধীদের নির্দেশে রোবসপিয়ারের প্রাণদন্ড হলে সন্ত্রাসের অবসান হয়।

সন্ত্রাসের ভয়াবহতা

সন্ত্রাসের রাজত্বের বিপক্ষে বলা হয় যে, সন্ত্রাসের রাজত্ব ছিল ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও আইনের শাসনের বিরোধী। সন্দেহের আইন বা 'ল অব সাস্‌পেক্টস্‌-এর সাহায্যে যে-কোন লোককে ইচ্ছেমত গ্রেপ্তার করা হয়। নামেমাত্র বিচার করে বহু লোককে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। কয়েকজন লোকের ইচ্ছার উপরে ফ্রান্সের জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা নির্ভর করে। এই ব্যবস্থা আদপেই গণতন্ত্র-সম্মত ছিল না। সন্ত্রাসের সময় সংবিধান অকেজো হয়ে যায়। অনেকক্ষেত্রে নির্দোষ লোকদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। সন্ত্রাসের সুযোগে একশ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খল জনতা প্যারিসে ও গ্রামাঞ্চলে নিজহাতে আইন তুলে নেয়। ফ্রান্সে মানুষের মৃত্যুর উৎসব চলতে থাকে। সন্ত্রাসের রাজত্ব বুরবোঁ সরকারের স্বৈরতন্ত্রের তুলনায় কম অত্যাচারী ছিল না। ১৭৯৩ খ্রীঃ সন্ত্রাসের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলেও রোবসপিয়ার তাঁর উদ্ভট আদর্শবাদ চরিতার্থ করার জন্যে অকারণ সন্ত্রাস চালান ও লোকক্ষয় করেন। সর্বোপরি, সন্ত্রাসের বলি হয় বিশেষভাবে গরীব কৃষক ও খেটে-খাওয়া লোকেরা। সন্ত্রাসের সুযোগে রোবসপিয়ার জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাসের উপর আঘাত হানেন। তিনি নোতারদাম গীর্জায় উপাসনা রদ করে যুক্তির দেবীর পুজা প্রচলন করেন। ফ্রান্সের বিভিন্ন গীর্জায় উপাসনা বন্ধ করা হয়।

সন্ত্রাসের বিপক্ষে যুক্তি

সন্ত্রাসের রাজত্বের স্বপক্ষে বলা হয় যে, এটি ছিল একটি "আপাতকালীন স্বৈরশাসন"। বৈদেশিক আক্রমণ ও আন্তর্জাতিক বিদ্রোহের ফলে ফরাসী প্রজাতন্ত্র দারুন সঙ্কটে পড়ে। ডান্টনের মতে, "যদি লোকে স্বতঃ-প্রণোদিত ভাবে সরকারের প্রতি আনুগত্য না জানায়, তবে তাদের ভয় দেখিয়ে আনুগত্যদানে বাধ্য করা ছাড়া পথ ছিল না।" সন্ত্রাসের ফলে রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা ফিরে আসে, অরাজকতা দূর হয় এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। মোট কথা, সন্ত্রাসের দ্বারা "বিপ্লব রক্ষা পায়।" মাতিয়ে নামে ঐতিহাসিকের মতে, সমাজে বিপ্লবের আদর্শকে প্রতিষ্ঠার জন্যে এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্যে সন্ত্রাসের উপযোগিতা ছিল। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ আইন প্রয়োগ, কালোবাজারী দমন, নিম্নতম মজুরির হার প্রবর্তন, ভূমিহীনদের ভূমিবন্টন, নায্য হারে করপ্রদানে সকলকে বাধ্য করার কাজ সন্ত্রাস ছাড়া সফল হত না। ডিকেন্স প্রভৃতি সাহিত্যিক সন্ত্রাসের রাজত্বের ভয়াবহতা সম্পর্কে অতিশয়োক্তি করেছেন। সাধারণ লোকের জীবনযাত্রায় সন্ত্রাসের কোন প্রভাব ছিল না। রবিনসন ও বিয়ার্ডের মতে, সন্ত্রাসের সময় সাধারণ ফরাসীরা আমোদ-আহ্লাদেই দিন কাটাত। থিয়েটার ও অপেরা হলগুলি পূর্ণ থাকত। তবে সন্ত্রাসের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার পর তা চালানো উচিত হয় নাই। এর ফলে থার্মিডোরীয় প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

সন্ত্রাসের পক্ষে যুক্তি

একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ বিপ্লবী রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী (The Political Parties) ঃ ফ্রান্সে জাতীয় সভা আহূত হলে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত বুর্জোয়া প্রতিনিধিরা পেট্রিয়টিক পার্টি বা ন্যাশনাল পার্টি গড়ে। এই দলের মাধ্যমে ফরাসী বিপ্লবের উদীয়মান নেতারা সঙ্ঘবদ্ধ হন। পেট্রিয়টিক পার্টির পরিকল্পনা অনুযায়ী বুর্জোয়া নেতারা মাথাপিছু ভোট দাবি করে। শেষ পর্যন্ত টেনিস কোর্টের শপথনামা দ্বারা ফ্রান্সের প্রথম বিপ্লবী সংবিধান তৈরির শপথ নেওয়া হয়।

পেট্রিয়টিক পার্টি

প্রথম বিপ্লবী সংবিধান বা ১৭৯১ খ্রীঃ সংবিধান অনুসারে নির্বাচনের ফলে যে বিধানসভা গঠিত হয় সেই বিধানসভার সদস্যরা তাদের নিজ নিজ আদর্শ অনুযায়ী চারটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়; যথা ঃ (১) নিয়মতান্ত্রিক গোষ্ঠী বা ফিউল্যান্ট। এঁরা বিধানসভায় স্পিকারের ডানদিকে বসতেন। (২) জিরন্ডিস্ট গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর নেতারা ফ্রান্সের জিরঁদ বা জিরন্ড প্রদেশ থেকে আসেন। এঁরা স্পিকারের বামদিকে বসতেন। এঁরা ছিলেন প্রজাতন্ত্রবাদী। (৩) জ্যাকোবিন বা মাউন্টেন গোষ্ঠী। এঁরাই ছিলেন উগ্র বামপন্থী ও প্রজাতন্ত্রবাদী। (৪) মধ্যপন্থী বা মডারেট গোষ্ঠী। এঁরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। নিয়মতান্ত্রিক ও মডারেট গোষ্ঠীতে ছিল প্রধানতঃ সচ্ছল বুর্জোয়াশ্রেণীর লোক। লাফায়েৎ ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক নেতা। বিপ্লবকে আর আগাতে না দিয়ে সংবিধান অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করা ছিল নিয়মতান্ত্রিকদের লক্ষ্য। নিয়মতান্ত্রিকরা মনে করতেন যে ১৭৯১ খ্রীঃ সংবিধান দ্বারা বিপ্লবের লক্ষ্য পূর্ণ হয়েছে। জিরন্ডিস্ট ও জ্যাকোবিনরা ছিল প্রজাতন্ত্রবাদী ও পরিবর্তনপন্থী। তাঁরা মনে করতেন যে, বিপ্লবের লক্ষ্য এখনও পূর্ণ হয় নি। ফ্রান্সকে রাজতান্ত্রিক শাসন থেকে মুক্ত করে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা দরকার বলে তাঁরা বিশ্বাস করতেন। ফলে জিরন্ডিস্ট ও জ্যাকোবিনদের মিলিত বিদ্রোহে ১৭৯২ খ্রীঃ বিধানসভার পতন হয় এবং রাজতন্ত্রের অবসান হয়। ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয। ফ্রান্সে জাতীয় সম্মেলন-সভা গঠিত হয়।প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মাথা পিছু ভোটে জাতীয় সম্মেলন-সভা গঠিত হয়।

বিধানসভায় দল ও গোষ্ঠী

জাতীয় সম্মেলনের (National Convention)-এর প্রজাতান্ত্রিক যুগে জিরন্ডিস্টগোষ্ঠী একটি প্রধান রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। জিরন্ডিস্টরা ছিল বুর্জোয়াতন্ত্রের সমর্থক। তারা

ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে পবিত্র মনে করত। তারা সংবিধান ও আইনের পথে পরিবর্তন চাইত। অর্থাৎ যদি কিছু পরিবর্তন দরকার হয় তা আইনসভায় আলোচনার পর আইন পাস করে করা উচিত বলে তারা মনে করত। আইনসভাকেই তারা জনগণের সার্বভৌম প্রতিনিধি-সভা বলে দাবি করত। যেহেতু ন্যাশনাল কন্‌ভেন্‌শনের সভায় তারাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেহেতু জিরন্ডিস্টরা আইনসভাকে নিয়ন্ত্রণ করত। উগ্র বিপ্লবের পন্থায় তারা পরিবর্তনের বিরোধী ছিল। এজন্যে তারা সাঁ কুলেৎ বা সর্বহারা, দরিদ্রশ্রেণীর সমর্থন হারায়। তারা বিশ্বাস করত যে, বৈদেশিক যুদ্ধের দ্বারা সারা ইওরোপে বিপ্লবের আদর্শ প্রচার করা উচিত। জাতীয় সম্মেলনের ৭৮২ জন সদস্যের মধ্যে ১২০ জন ছিল জিরন্ডিস্ট। মধ্যপন্থী বা মডারেটদের সঙ্গে কোয়ালিশন দ্বারা তারা সরকারে নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের চেষ্টা করে। জিরন্ডিস্টদের প্রভাব ছিল গ্রামাঞ্চলে। কিন্তু প্যারিসের কমিউন ও জনতার মধ্যে জিরন্ডিস্টদের সমর্থক না থাকায়, সংখ্যালঘু জ্যাকোবিনরা প্যারিসের জনতার সাহায্যে তাদের দ্বারা বিতাড়িত করে।

জিরন্ডিস্ট দল

শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী ফ্রান্সের প্রধান নেতৃত্ব জ্যাকোবিন দলের হাতে আসে। আইনসভায় এই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলেও প্যারিসের বিপ্লবী জনতার সাহায্যে আইনসভাকে ঘেরাও করে তারা স্বমতে আনে। জিরন্ডিস্টদের বহিষ্কার করে, তারা জ্যাকোবিনতন্ত্র স্থাপন করে। এই কাজের সমর্থনে জ্যাকোবিনরা "জনগণের সার্বভৌম শক্তিতত্ত্বে"র এক বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা দেয়। তারা বলে যে, আইনসভা দেশের বৃহত্তম জনসাধারণের স্বার্থবিরোধী হলে এই আইনসভাকে মানার দরকার নেই। সেক্ষেত্রে তারা জনগণের সাহায্যে আইনসভাকে হয় তাদের মতে আসতে বাধ্য করবে নতুবা অগ্রাহ্য করবে নতুবা শায়েস্তা করবে।

চরমপন্থী জ্যাকোবিন দল

স্টেটস জেনারেল বা জাতীয় সভায় ব্রিটানী প্রদেশের সদস্যদের নেতৃত্বে ব্রেটন ক্লাব গঠিত হয়। এই ক্লাবের অপর নাম ছিল "সংবিধান সমর্থক সমিতি" (Society of the friends of the Constitution)। জ্যাকোবিন খ্রীস্টীয় সম্প্রদায়ের এক গীর্জায় এই সমিতির সভা হত বলে এই সমিতির নাম হয় জ্যাকোবিন দল। এই দল প্যারিসের সাঁ কুলেৎ ও দরিদ্রশ্রেণীকে সদস্য করে জনপ্রিয়তা বাড়ায়। ক্রমে গ্রামাঞ্চলে এই দলের শাখা স্থাপিত হয়। জ্যাকোবিন দলের নেতারা মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক হলেও তাঁরা মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্ধ সমর্থক ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন উগ্রপন্থী প্রজাতন্ত্রী। রুশোর প্রজাতান্ত্রিক মতবাদে তাঁরা বিশ্বাস করতেন। ১৭৯২ খ্রীঃ প্যারিসের জনতাকে জ্যাকোবিনরা উত্তেজিত করে টুইলারিজ প্রাসাদ আক্রমণ করে এবং রাজতন্ত্রের পতন ঘটান। জ্যাকোবিন নেতা সাঁজুসত, জাঁ পল মারাত ও রোবসপিয়ার প্রভৃতি এই কাজে নেতৃত্ব দেন। জ্যাকোবিন দল ছিল বৈদেশিক যুদ্ধের বিরোধী। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হলে তাঁরা দেশপ্রেমিকের মতই যুদ্ধে জয়লাভের জন্যে কাজ করেন। সন্ত্রাসের রাজত্বের সময় তাঁরা সর্বনিম্ন মজুরি আইন, দ্রব্যমূল্য আইন, জমি বন্টন আইন প্রভৃতি কার্যকরী করেন। জ্যাকোবিন দল রুশোর সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাস করত। জ্যাকোবিন নেতারা সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকারে বিশ্বাস করলেও, সম্পত্তিকে দরকার হলে রাষ্ট্রের ও জনসাধারণের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করার পক্ষপাতী ছিলেন।

জ্যাকোবিন দলের আদর্শ

জ্যাকোবিন নেতা রোবসপিয়ার ছিলেন গভীর সমুদ্রের জলের মতই সৎ ও পবিত্র, সততা ও ন্যায়নীতিতে আস্থাশীল। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন প্রায় সন্ন্যাসীর মতই সৎ ও নিষ্ঠাবান। তিনি ছিলেন রুশোর মানসপুত্র। জাতির সম্মিলিত ইচ্ছা সকল কিছুর উর্ধ্বে বলে তিনি মনে

করতেন। এই শিক্ষা তিনি রুশোর দর্শন থেকে পান। তিনি রুশোর কাছ থেকেই শিক্ষা নেন কিভাবে ধর্মকে আবেগ ও কুসংস্কারমুক্ত করে সমাজের উন্নতি করে ব্যবহার করা যায়। রোবসপিয়ার ছিলেন দরিদ্র মানুষের বন্ধু। তিনি এমন একটি প্রজাতন্ত্র চান যেখানে বুর্জোয়ার ধনবৈভব ও অভিজাতের বংশবিভ্রম থাকবে না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ধনের আধিক্য আনে দুর্নীতি, দারিদ্র্য আনে লোভ ও হতাশা। এজন্য তিনি নিম্নমধ্যবিত্তের শাসিত প্রজাতন্ত্রের কথা ভাবেন। এই প্রজাতন্ত্রে ব্যক্তির সম্পত্তি হবে সীমাবদ্ধ। রোবসপিয়ার সন্ত্রাসের রাজত্বের মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারও দ্রব্যমূল্য আইন, মজুরি আইন, নূতন মাপ ও দশমিক মুদ্রা ব্যবস্থা প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক আইন প্রচলনের জন্যে প্রযত্ন করেন। তিনি সন্ত্রাসের দ্বারা বিপ্লব-বিরোধী শক্তিকে ধ্বংস করেন। ডেভিড টমসনের মতে, "রোবসপিয়ারের মধ্যেই বিপ্লব প্রকৃতপক্ষে রূপায়িত হয়।" রোবসপিয়ারের কৃতিত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তীব্র বিতর্ক দেখা যায়। লর্ড এ্যাক্টনের মতে, "ম্যাকিয়াভেলীর পরে ইতিহাসের পাদপ্রদীপের সামনে রোবসপিয়ারের মত ঘৃণ্যচরিত্র আর আসে নাই। তিনি এই নিয়ম প্রবর্তন করেন যে, পাপাচার রাষ্ট্রপরিচালকদের নীতি হওয়া উচিত।" তিনি ছিলেন সন্ত্রাসের রাজত্বের সর্বাপেক্ষা রক্তপাতকারী। তাঁর হৃদয় ছিল পাথরের মত নিষ্ঠুর। আলবেয়াক মাতিয়ে প্রভৃতি গবেষক এই মতকে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে ফরাসী বিপ্লবের প্রকৃত নায়ক ছিলেন রোবসপিয়ার; ড্যান্টন ছিলেন খলনায়ক।

এছাড়া হেবার্টিস্ট নামে এক সমাজতন্ত্রীদের দলও ছিল। হেবার্ট সন্ত্রাসের আরও তীব্র প্রয়োগ দাবি করেন। মজুদদার, কালোবাজারী ও ফাটকাবাজদের গিলোটিনে পাঠাবার কথা তিনি বলেন। হেবার্টের অনুগামীদের হেবার্টিস্ট বলা হয়। তাঁরা খ্রীষ্টীয় গীর্জা বন্ধ করার দাবী জানান এবং যুক্তিবাদের দেবীর উপাসনা দাবী করেন। ডাইরেক্টরীর শাসনকালে ফ্রান্সে সমাজতন্ত্রবাদী ব্যাবেয়ুফের আবির্ভাব হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকলে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের প্রভেদ থাকবেই। এজন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ করে সম্পত্তি রাষ্ট্রের মালিকানায় আনার জন্যে ব্যাবেয়ুফ বলেন। তিনি সকল লোকের সমান অধিকারের কথা প্রচার করেন। সর্বসাধারণের ভোটাধিকার দাবি করেন। ব্যাবেয়ুফ শ্রেণীবিদ্রোহ বা কৃষক-বিদ্রোহ দ্বারা বুর্জোয়াসমাজকে ভাঙার চেষ্টা করলে, ডারেক্টরীর নির্দেশে তাঁর আন্দোলনকে দমিয়ে ফেলা যায়।

অন্যান্য ক্লাব বা দল

দ্বিতীয় অধ্যায় [খ]

প্রথম পরিচ্ছেদ : নেপোলিয়নের উত্থান (Rise of Napoleon) : রোবসপিয়ারের পতনের পর সন্ত্রাসের রাজত্ব রদ করা হয়। জাতীয় সম্মেলন (National Convention) এই সময় ১৭৯৫ খ্রীঃ একটি নূতন সংবিধান গ্রহণ করে। এই সংবিধান বলে পাঁচজন ডাইরেক্টর বা পরিচালকের হাতে ফ্রান্সের শাসনভার দেওয়া হয়। এই পাঁচ পরিচালক আইনসভা দ্বারা ৫ বছরের জন্যে নির্বাচিত হন। ফ্রান্সে দুই কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার ব্যবস্থা করা হয়। ডাইরেক্টরী বা পরিচালক সমিতির শাসন কালে ফ্রান্সে বিপ্লবীদের প্রভাব লোপ পায়। ধনী বুর্জোয়াশ্রেণী সকল ক্ষমতা, সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। সন্ত্রাসের বাড়াবাড়ির পর ফ্রান্সে দক্ষিণপন্থী বা থার্মিডোরীয়দের প্রভাব বাড়ে। আশা করা হয় যে, অতি বাম ও অতি দক্ষিণ এই দুইয়ের মধ্যে ডাইরেক্টররা শক্তিসাম্য রক্ষা করবেন। এই শক্তিসাম্যকে "বাসকুল" (Bascule) নীতি বলা হয়।

ডাইরেক্টরীর কুশাসন

কিন্তু ডাইরেক্টররা দক্ষিণপন্থী ও বুর্জোয়াদেরই পক্ষ নেন। ডাইরেক্টররা ছিলেন দুর্নীতিগ্রস্ত, নৈতিক চরিত্রহীন। ডাইরেক্টরীর শাসনে ঠিকাদার, ফাটকাবাজ ও বণিকেরা আরও ধনী হয়ে উঠে। এদিকে মুদ্রাস্ফীতির জন্যে দ্রব্যমূল্য বাড়ে। সাধারণ লোকের দুঃখ-দুর্দশা বাড়ে। ডাইরেক্টরী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থ হয়। ব্যাবেযুফের বিদ্রোহ ও ক্লিশিয়ান দলের বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

বৈদেশিক যুদ্ধ ও ক্ষমতা গ্রহণ

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে প্রথম শক্তিজোটের বিরুদ্ধে প্রাথমিক বিফলতার পর, নবীন সেনাপতি নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ইতালীতে লোদী, আর্কোলা, রিভোলীর যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে পর্যুদস্ত করে ১৭৯৭ খ্রীঃ ক্যাম্পো-ফোর্মিও সন্ধি-স্বাক্ষরে বাধ্য করেন। ফ্রান্সে নেপোলিয়নের অসাধারণ জনপ্রিয়তা দেখা গেলে, ঈর্ষাকাতর ডাইরেক্টররা তাঁকে ভূমধ্যসাগরের অপর পারে মিশর অভিযানে পাঠান। নেপোলিয়ন মিশরে পিরামিডের যুদ্ধে জয়লাভ করলেও ইংরাজ নৌ-সেনাপতি নেলসন নীলনদের যুদ্ধে ফরাসী নৌ-বহর ধ্বংস করেন। এর ফলে নেপোলিয়ন মিশরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। নেপোলিয়ন মিশর অভিযান ত্যাগ করে ফ্রান্সে ফিরে আসেন এবং ১৭৯৯ খ্রীঃ ডাইরেক্টরীর দুর্নীতিপূর্ণ শাসন ভেঙে দিয়ে নিজহাতে ক্ষমতা নেন। এরপর Age of Napoleon বা নেপোলিয়নের যুগ আরম্ভ হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নেপোলিয়নের উত্থানের কারণ (Causes of the rise of Napoleon) : ১৭৯৯ খ্রীঃ নেপোলিয়ন ডাইরেক্টরীর শাসনের অবসান ঘটিয়ে তাঁর সামরিক ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তার প্রভাবে সর্বময় ক্ষমতা লাভ করেন। ফিলিপ গডেলা মন্তব্য করেছেন যে, "নেপোলিয়নের উত্থানের ফলে ফ্রান্সের ইতিহাস হয় ইওরোপের ইতিহাস এবং নেপোলিয়নের ইতিহাস হয় ফ্রান্সের ইতিহাস।" নেপোলিয়ন ১৭৯৯ খ্রীঃ প্রথমে কন্‌সাল হিসাবে সংবিধান রচনা করে শাসনভার গ্রহণ করেন। সংবিধান অনুসারে তিনি দশ বৎসরের জন্যে কন্‌সাল হিসাবে দায়িত্ব পান। কিন্তু সংবিধান সংশোধন করে ১৮০২ খ্রীঃ তিনি যাবজ্জীবন কন্‌সাল পদ লাভ করেন। ১৮০৪ খ্রীঃ তিনি সংবিধান পরিবর্তন করে 'সম্রাট' খেতাব নেন এবং এই পদের স্বপক্ষে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ লোকের ভোটের দ্বারা সমর্থিত হন। এভাবে বিপ্লবের সেনাপতি নেপোলিয়ন ক্রমে স্বৈরতন্ত্রী সম্রাট নেপোলিয়নে পরিণত হন।

সন্ত্রাসের রাজত্বের আতিশয্য : বিপ্লব সম্পর্কে মোহভঙ্গ

নেপোলিয়নকে কেন ফরাসী জাতি ডাইরেক্টরীর শাসনের স্থলে বরণ করে নেয়, তার নানা প্রকার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। প্রথমতঃ, সন্ত্রাসের রাজত্বের আতিশয্য ও রক্তপাত বেশির ভাগ ফরাসীর মনে বিপ্লবের প্রতি বিরাগ ও ঘৃণা সৃষ্টি করে। বিপ্লবের জনকল্যাণমূলক ও প্রগতিশীল সংস্কারগুলির কথা ভুলে তারা সন্ত্রাসের জন্যে বামপন্থী বিপ্লবী নেতাদের প্রতি বিরাগ দেখায়। লোকে ভাবতে আরম্ভ করে যে, নেপোলিয়নের মত সেনাপতির শক্ত শাসনে ফ্রান্সের জনজীবনে আইনের শাসন, সম্পত্তির নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। স্বাধীনতা বা গণতন্ত্র অপেক্ষা আইনের শাসন তারা অধিকতর কাম্য বলে মনে করে। বিশেষভাবে ফ্রান্সের সম্পত্তিভোগী বুর্জোয়াশ্রেণী নেপোলিয়নের শাসনকে বরণ করে নেয়। দ্বিতীয়তঃ, ডাইরেক্টরী বা পরিচালক সভার দুর্নীতিপূর্ণ শাসন জনসাধারণকে হতাশ করে। নেপোলিয়ন ডাইরেক্টরীর দুর্নীতির সুযোগে ক্ষমতা দখল করেন।

নেপোলিয়নের শাসনে অতি বামপন্থা এবং ডাইরেক্টরীর মত অতি দক্ষিণপন্থা উভয় পন্থার স্থলে অন্ততঃ মধ্যপন্থা রক্ষা পাবে বলে আশা করা হয়। যে মধ্যপন্থা বা "বাসকুল" ডাইরেক্টরী

দিতে পারে নাই নেপোলিয়ন তা দিতে সক্ষম বলে মনে করা হয়। নেপোলিয়ন সামাজিক সাম্য রক্ষা করেন এবং যোগ্যতাকেই বংশমর্যাদার বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি "বিপ্লবের সন্তান" রূপে পরিচিত হন। বিপ্লবের যুগের কৃষিব্যবস্থা, আইনের চক্ষে সমতা, কর্মে যোগ্যতা প্রভৃতি তিনি রক্ষা করেন। অপরদিকে তিনি দৃঢ়তা, শৃঙ্খলাকে গুরুত্ব দেন। তাঁর আমলে কন্সুলেটের সংবিধানের নীতি ছিল "উপর থেকে কর্তৃত্ব স্থাপন এবং নিচ থেকে প্রজাদের আস্থা জ্ঞাপন" (Authority from above, confidence from below)।

নেপোলিয়নের মধ্যপন্থা ও দৃঢ়তাপূর্ণ শাসন নীতি

নেপোলিয়নের সামরিক গৌরব, ইতালীর যুদ্ধে তাঁর অসাধারণ সাফল্য তাঁর জনপ্রিয়তাকে সীমাহীন করে। ফরাসী জাতি নেপোলিয়নের স্বৈরতন্ত্রকে তাদের প্রিয় গণতন্ত্র অপেক্ষাও সাময়িকভাবে বরণীয় মনে করে। বিপ্লবী ফ্রান্সের যুদ্ধে নামার সময় দূরদর্শী রোবসপিয়ার এরূপ জনপ্রিয় সামরিক ডিরেক্টরের উদ্ভবের সম্ভাবনা সম্পর্কে জাতিকে সতর্ক করেছিলেন। তাঁর পতনের পরে তাঁর আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হয়। নেপোলিয়নের উচ্চাকাঙ্ক্ষার যূপকাঠে বিপ্লবকে বলিদান করা হয়। রাইকার মন্তব্য করেছেন যে, "নেপোলিয়নের স্বৈরতন্ত্রের রথে বিপ্লবের অশ্বকে বাহন হিসাবে বেঁধে দেওয়া হয়।"

সামরিক গৌরব ও জনপ্রিয়তা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও তার প্রকৃতি (An estimate of Napoleonic internal reforms) : নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কেবলমাত্র প্রতিভাবান সমর-বিশারদ হিসাবে ইতিহাসে তাঁর কীর্তি স্থাপন করেন নাই। সংস্কারক ও সংগঠক রূপে তিনি তাঁর অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। ঐতিহাসিক ফিশার মন্তব্য করেছেন যে, "যদিও নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ছিল অস্থায়ী, তাঁর অসামরিক সংস্কারগুলি গ্রানাইট পাথরের স্থায়ী ভিত্তির উপর তৈরী হয়" (Though Napoleon's empire was transitory his civilian reforms were built on granite)। ঐতিহাসিক ফিশারের মতে, ফরাসী বিপ্লবের তিন আদর্শ—সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মধ্যে নেপোলিয়ন সাম্য নীতিকে কার্যকর করার চেষ্টা করেন। তিনি Liberty বা গণতন্ত্র বা স্বাধীনতাকে বর্জন করেন। Liberty অনুযায়ী ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। কিন্তু প্রজাতন্ত্রের যুগে গণতন্ত্রের অপব্যবহার হওয়ায় ফ্রান্সে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এজন্যে তিনি প্রজাতন্ত্রের স্থলে একটি কেন্দ্রীভূত স্বৈরশাসন স্থাপন করেন। ফিলিপ গডেলার মতে, যদিও তিনি গণতন্ত্র বা লিবার্টি কেড়ে নেন, তিনি সাম্য (Equality) নীতিকে প্রয়োগ করে তার ক্ষতিপূরণ করেন।

সংস্কারের আদর্শ

কেন্দ্রীভূত স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি প্রথমে কন্সুলেটের সংবিধান (১৭৯৯ খ্রীঃ) চালু করেন। প্রথম কন্সাল রূপে তিনি সকল প্রকার কার্যনির্বাহক ক্ষমতা নিজহাতে নেন। ফ্রান্সের কেন্দ্র ও প্রদেশের সকল কর্মচারী তিনিই নিয়োগ করেন। প্রদেশ ও জেলার উপর তিনিই প্রিফেক্ট ও উপ-প্রিফেক্ট নিয়োগ করেন। প্রাদেশিক সভাগুলির স্বায়ত্ত-শাসনের ক্ষমতা হরণ করা হয়। সকল কর্মচারী ও বিচারক প্রথম কন্সাল দ্বারা নিযুক্ত হয়। নির্বাচন দ্বারা সরকারী কর্মচারী নিয়োগ বন্ধ করা হয়। আইনসভাকে চারটি কক্ষে ভাগ করা হয়। নিম্নকক্ষ বা লেজিস্লেটিভ বডির সদস্যরা নির্বাচিত হলেও অপর তিন কক্ষের সদস্যরা প্রথম কন্সাল দ্বারা মনোনীত হত। কিন্তু আইনসভার হাতে আইন-রচনার প্রকৃত ক্ষমতা কন্সুলেটের সংবিধানে দেওয়া হয় নাই। কোন বিল বা আইন বিষয়ক প্রচার

কন্সুলেটের সংবিধান

প্রথম কন্‌সালের বিনা অনুমোদনে আইনসভায় পেশ করা যেত না। আইনসভায় বিল পাস হলেও তা আইনে পরিণত করে কার্যকরী করা বা না-করা ছিল প্রথম কন্‌সালের ইচ্ছাধীন। মোটকথা তিনি একটি সাজানো আইনসভা রাখেন। প্রশাসনিক ও আইন বিভাগীয় সকল ক্ষমতা নিজহাতে নিয়ে গণতন্ত্রের মুখোসে স্বৈরতন্ত্র স্থাপন করেন। এত ক্ষমতা পেয়েও নেপোলিয়নের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নি। তিনি ১৮০৪ খ্রীঃ কন্‌সুলেট পদ লাভ করে 'সম্রাট' উপাধি নেন। সম্রাট উপাধি গ্রহণ করলে তাঁর স্বৈরতন্ত্র চরম উৎকর্ষতা লাভ করে।

নেপোলিয়ন তাঁর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার দ্বারা সাম্য ও স্থিতিকে রক্ষা করেন। (১) বিপ্লবের যুগে সামন্ত-প্রথা লোপ করে কৃষকদের মধ্যে ভূমিবন্টনের যে ব্যবস্থা হয়, তা তিনি বলবৎ করেন। নেপোলিয়নের এই ব্যবস্থার ফলে ১৮০৪ খ্রীঃ কৃষকের হাতে জমির পরিমাণ দাঁড়ায় উত্তর ফ্রান্সের মোট জমির ৫৬·২% জমি চলে আসে। বুর্জোয়াদের হাতে থাকে ২৮·৫% জমি। তবে নেপোলিয়নের ভূমিসংস্কারের ফলে স্বাধীন সম্পন্ন চাষীরাই বেশী লাভবান হয়। (২) সাম্যের প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি বংশকৌলীন্য বাদ দেন এবং যোগ্যতাকেই সরকারী ও সামরিক বিভাগের চাকুরি লাভের একমাত্র মাপকাঠিতে পরিণত করেন। (৩) নেপোলিয়নের অন্যতম বিখ্যাত সংস্কার ছিল 'কোড নেপোলিয়ন' নামে আইনবিধি রচনা। নেপোলিয়ন স্থির করেন যে, বিপ্লবের অন্যতম নীতি সাম্য বা Equality-কে স্বীকার করে ফ্রান্সে নূতন সমাজগঠনের জন্যে আইন বিধির সংস্কার দরকার। অপরদিকে, রোমান আইনের ভাল দিকগুলিকেও গ্রহণ করা দরকার। তাঁর আইনবিধি বা কোড নেপোলিয়নে মোট ২২৮৭টি ধারা রচনা করা হয়। এই আইনবিধির তিনটি ভাগ ছিল যথা, (ক) দেওয়ানী আইন; (খ) ফৌজদারী আইন ও (গ) বাণিজ্যিক আইন। (১) কোড নেপোলিয়নে সাম্য-নীতি অনুসারে আইনের চক্ষে সকলকে সমান মর্যাদা দেওয়া হয়। (২) যোগ্যতার ভিত্তিতে সরকারী চাকুরি দানের ব্যবস্থা করা হয়। (৩) পৈতৃক সম্পত্তিতে সকল সন্তানের সমান অধিকার দেওয়া হয়। (৪) বিপ্লবের আমলের ভূমিব্যবস্থাকে আইনতঃ স্বীকৃতি দেওয়া হয়। (৫) সম্পত্তির অধিকার পবিত্র বলে গণ্য হয়। (৬) রেজিস্ট্রি বিবাহ ও ডাইভোর্স স্বীকৃত হয়। (৭) পারিবারিক শৃঙ্খলাস্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। (৮) ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। কোড নেপোলিয়নের বাণিজ্যিক বিধির দ্বারা যৌথ মূলধনে শিল্পবাণিজ্য গঠনের অধিকার গৃহীত হলে বুর্জোয়াশ্রেণী লাভবান হয়।

সামাজিক ও আইনবিধি বিষয়ক সংস্কার

নেপোলিয়ন ফ্রান্সের অর্থনৈতিক সংস্কার করেন। তিনি ব্যয়সংকোচের জন্যে সরকারী দপ্তরগুলিকে কঠোর নির্দেশ দেন। রাজস্ববিভাগের কাজের তদারকির জন্যে অডিট-প্রথা চালু করেন। তিনি নূতন কর ধার্য না করে প্রচলিত করগুলি জনসাধারণকে আদায় দিতে বাধ্য করেন। বাড়তি সকল প্রকার কর রদ করেন। তিনি পরোক্ষ কর আদায়ের দিকে বেশী গুরুত্ব দেন। তিনি মুদ্রা সংস্কার করেন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্স স্থাপন (১৮০০ খ্রীঃ) করেন।

অর্থনৈতিক সংস্কার

তিনি জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার করেন। প্রতি কমিউনে অন্ততঃ একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় বা নর্ম্যাল স্কুল স্থাপন করা হয়। ফলিত বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহ দেওয়া হয়। ছাত্রদের রাষ্ট্র অর্থাৎ সম্রাটের প্রতি আনুগত্য শিক্ষা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। নেপোলিয়ন ২২৯টি সামরিক রাস্তা ছাড়া আরও বহু রাস্তা, পুল ও আলপস পর্বতের পথে ইতালীর সঙ্গে যোগাযোগের দুটি বিখ্যাত আলপাইন হাইওয়ে নির্মাণ করেন। তিনি বহু উদ্যান,

শিক্ষা ও জনহিতকর সংস্কার

প্রাসাদ নির্মাণ করেন। তিনি রাষ্ট্রের প্রতি সেবার পুরস্কার স্বরূপ 'লিজিন অব্ অনার' খেতাব দানের প্রথা চালু করেন।

নেপোলিয়ন গীর্জা ও ধর্মসংস্কারের কাজেও হাত দেন। প্রথম বিপ্লবী সংবিধান (১৭৯১ খ্রীঃ) দ্বারা গীর্জার রাষ্ট্রায়ত্বকরণ করায় পোপের সঙ্গে বিবাদ বাধে। নেপোলিয়ন ১৮০১ খ্রীঃ কনকর্ড্যাট (Concordat) চুক্তির দ্বারা পোপের সঙ্গে আপস-রফা দ্বারা স্থির করেন যে ঃ—(১) পোপ ফরাসী গীর্জার সম্পত্তির জাতীয়করণ ও গীর্জা জাতীয়করণ মেনে নেবেন। (২) রাষ্ট্র বিশপদের মনোনয়ন করার পর পোপ তাঁদের নিযুক্ত করবেন। (৩) রাষ্ট্র যাজকদের বেতন দিবে। (৪) ক্যাথলিক ধর্মমতকে রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিবে।

ধর্মীয় সংস্কার

নেপোলিয়নের সংস্কারগুলি পর্যালোচনা করে তাঁকে একাধারে "বিপ্লবের সন্তান" (Child of the Revolution) অপরদিকে বিপ্লবের ধ্বংসকারী (Destroyer of the Revolution) বলা হয়ে থাকে। নেপোলিয়ন স্বয়ং তাঁর আত্মজীবনীতেও বলেন যে, "আমিই বিপ্লবের বরপুত্র; আমিই বিপ্লবকে ধ্বংস করেছি।" তিনি যখন স্বাধীনতা বা গণতন্ত্রকে পদানত করে স্বৈরতন্ত্র ও কেন্দ্রীকরণ স্থাপন করেন, তখন তিনি ছিলেন বিপ্লবের ধ্বংসকারী। তিনি যখন বিপ্লবের সাম্যনীতিকে গ্রহণ করে কোড নেপোলিয়ন ও তাঁর শাসনসংস্কার স্থাপন করেন, তখন তিনি ছিলেন 'বিপ্লবের সন্তান'। তাছাড়া তাঁর সংস্কারগুলি তাঁর বিজয়ের ফলে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত হয়। নেপোলিয়ন ছিলেন এই যুগে বিপ্লবের অগ্নিময় তরবারি। যেখানেই তাঁর সেনাদল যায় সেখানেই পুরাতনতন্ত্র ভেঙে পড়ে। সকল কথা বলা হলেও বলা দরকার যে, জর্জ রুডের মতে নেপোলিয়ন প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের সন্তান ছিলেন না। তিনি প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের বাণী গ্রহণ করেন নাই। জ্যাকোবিন বিপ্লবের আদর্শ প্রজাতন্ত্র, গণভোট, মূল্যবৃদ্ধিরোধ আইন, নিম্নতম মজুরি আইন তিনি পরিত্যাগ করেন। প্রকৃত সাম্য-নীতি তিনি নেন নাই। তিনি কিছু পরিমাণে বুরবোঁ শাসনের ও কিছু পরিমাণে ১৭৯৮ খ্রীঃ বুর্জোয়া সংবিধানের আদর্শ নেন। বুর্জোয়া বিপ্লবের আদর্শ (১৭৯১ খ্রীঃ) তিনি গ্রহণ করে কন্‌কর্ডাট চালু করেন, ভূমি সংস্কার করেন কিন্তু সম্পত্তির অধিকার রক্ষা করেন। তিনি বুর্জোয়া স্বার্থই প্রকৃতপক্ষে রক্ষা করেন বলে জর্জ রুডে (George Rude) মনে করেন। তিনি ন্যাশনাল কন্‌ভেন্‌শনের যুগে জ্যাকো-বিন আদর্শকে বর্জন করেন। এজন্য তাঁকে বিপ্লবের সন্তান বলা যায় না।

সমালোচনা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যবিস্তার ঃ টিলসিটের সন্ধি (Growth of Napoleonic Empire : Treaty of Tilsit) ঃ নেপোলিয়ন ছিলেন অসাধারণ রণ-পন্ডিত। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর দুর্বলতা, ভৌগোলিক অবস্থান এবং বৈজ্ঞানিকভাবে কামানের লড়াই চালাতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তদুপরি তাঁর সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তাঁকে অসাধারণ সফলতা দেয়। ডাইরেক্টরীর আমলে তিনি অস্ট্রিয়াকে ইতালীর যুদ্ধে পরাজিত করে ১৭৯৭ খ্রীঃ ক্যাম্পোফোর্মিওর সন্ধি-স্বাক্ষরে বাধ্য করেন। কন্‌সাল পদে বসার পর তিনি ইওরোপীয় শক্তি-জোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। তিনি কূটনীতির দ্বারা রাশিয়াকে যুদ্ধ ত্যাগ করান। ফলে অস্ট্রিয়া ও ইংলন্ড যুদ্ধ চালাতে থাকে। তিনি ম্যারেঙ্গো ও হোহেনলিন্ডেনের যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে পরাস্ত করলে অস্ট্রিয়া ১৮০১ খ্রীঃ লুনভিলের সন্ধি স্বাক্ষর করে। ব্রিটিশ সরকারও এ্যামিয়েন্সের সন্ধির দ্বারা ১৮০২ খ্রীঃ যুদ্ধ ত্যাগ করেন।

এ্যামিয়েন্সের সন্ধি

এর পর নেপোলিয়ন জার্মানী ও ইতালীর পুনর্গঠন করেন। নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়া প্রাশিয়াকে পরাজিত করে ১৭৯৫ খ্রীঃ বাসলের সন্ধি, ১৭৯৭ খ্রীঃ ক্যাম্পোফোর্মিওর সন্ধি, ১৮০১ খ্রীঃ

লুনভিলের সন্ধির দ্বারা যে অধিকার পান, তার বলে তিনি জার্মানীকে পুনর্গঠন করেন। জার্মানীর ৩০০টি রাজ্যকে (মতান্তরে ২৫০টি) ভেঙে ৩৯টি রাজ্যে পরিণত করে তিনি জার্মান-ঐক্যের পথ প্রস্তুত করেন। তবে তাঁর আসল লক্ষ্য ছিল নবগঠিত জার্মানীকে ফ্রান্সের তাঁবেদার রাষ্ট্রে (Clientele) পরিণত করা। তিনি এই ৩৯টি রাজ্য নিয়ে কন্‌ফেডারেশন অব্ রাইন (২৮টি রাজ্য), কিংডম অব্ ওয়েস্টফ্যালিয়া এবং গ্র্যান্ড ডাচি অব্ ওয়ারস নামে তিনটি অঞ্চল গড়েন। প্রথমটির উপর তাঁর ভ্রাতা জেরোমকে স্থাপন করেন এবং শেষেরটির উপর তাঁর অনুগত স্যাক্সনীর রাজাকে বসান। তবে নেপোলিয়ন সর্বত্র তৃতীয় শ্রেণী বা Third Estate-এর বন্ধু হিসাবে কাজ করতেন। এজন্যে তিনি জার্মানীতে কোড নেপোলিয়ন, ভূমিসংস্কার প্রভৃতি চালু করেন।

জার্মানীর পুনর্গঠন

ইতালীতে তিনি ক্যাম্পো-ফোর্মিও ও প্রেসবার্গের সন্ধির অধিকারবলে পুনর্গঠন করেন। তিনি স্বয়ং 'কিং অব্ ইতালী' বা 'ইতালীর রাজা' উপাধি নেন এবং তাঁর সৎপুত্র ইউজিনকে উত্তর ইতালীর, ভ্রাতা জোসেফকে দক্ষিণ ইতালীর শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তিনি ইতালীতেও বহুবিধ সংস্কার প্রবর্তন করেন।

ইতালীর পুনর্গঠন

এদিকে এ্যামিয়েন্সের সন্ধি স্থায়ী হয় নাই। ইংলণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার ফলে সন্ধি ভেঙে যায়। ইংলণ্ড অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, সুইডেনের সঙ্গে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তৃতীয় মিত্র জোট গড়ে। নেপোলিয়ন এই জোট ভাঙার জন্যে বিদ্যুৎগতিতে অস্ট্রিয়াকে আক্রমণ করে উলমের (Ulm) যুদ্ধে পরাস্ত করেন এবং ইংলণ্ড আক্রমণের জন্যে নৌ-প্রস্তুতি চালান। কিন্তু ইংরাজ সেনাপতি নেলসন ট্রাফাল্‌গারের নৌযুদ্ধে ফরাসী নৌবহর ধ্বংস করেন। নেপোলিয়ন তখনও স্থলশক্তিতে বিরাট ছিলেন। অস্তারলিজের বিখ্যাত যুদ্ধে তিনি অস্ট্রিয়াকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করে প্রেসবার্গের সন্ধি (১৮০৫) খ্রীঃ) স্থাপন করেন। এর পর ফ্রিডল্যাণ্ডের যুদ্ধে তিনি রাশিয়াকে পরাস্ত করেন। এর ফলে ইংলণ্ড ছাড়া আর সকল শক্তি নেপোলিয়নের হাতে পরাস্ত হয়।

এ্যামিয়েন্সের সন্ধি ভঙ্গ; তৃতীয় মিত্র জোটের যুদ্ধ ও পরাজয়

রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার ফ্রিডল্যাণ্ডের পরাজয়ের পর নেপোলিয়নের সঙ্গে বিখ্যাত টিলজিটের (মতান্তরে টিলসিট) সন্ধি ১৮০৭ খ্রীঃ স্বাক্ষর করেন। অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়াও যুদ্ধ নিরর্থক দেখে এই সন্ধিতে যোগ দেয়। এই সন্ধির দ্বারা—(১) নেপোলিয়ন জার্মানী, পোল্যাণ্ড ও ইতালীতে যে পুনর্গঠন করেন, রুশ-জার তা মেনে নেন। (২) প্রাশিয়া পোল্যাণ্ডে তার অংশ এবং এলব নদী পর্যন্ত ভূভাগ ফ্রান্সকে ছেড়ে দেয় এবং প্রচুর অর্থ ক্ষতিপূরণ দেয়। (৩) ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে আত্মরক্ষামূলক চুক্তি হয়। (৪) রাশিয়ার সঙ্গে তুরস্কের দ্বন্দ্বে নেপোলিয়ন রাশিয়াকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দেন। (৫) বিনিময়ে ইংলণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের দ্বন্দ্বে জার মধ্যস্থতা করবেন বলেন। ইংলণ্ড রুশ-মধ্যস্থতা অগ্রাহ্য করলে জার রুশ-বন্দরগুলি ও তার মিত্র দেশের বন্দরগুলি ইংলণ্ডের বাণিজ্যের জন্যে মহাদেশীয় অবরোধ অনুযায়ী বন্ধ করতে অঙ্গীকার করেন। টিলজিটের সন্ধির দ্বারা নেপোলিয়ন গৌরবের সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত হন। তৃতীয় শক্তিজোট ধ্বংস হয়। ইংলণ্ড ছাড়া সকল শক্তি তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। তবে টিলজিটের সন্ধিতে নেপোলিয়নের ভাগ্যরবি মধ্যগগনে আসার পর অস্তাচলের দিকে ঢলে পড়ে। টিলজিটের পর থেকে নেপোলিয়নের পতন আরম্ভ হয়।

টিলজিটের সন্ধি

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : নেপোলিয়নের পতন (Decline of Napoleon) : নেপোলিয়ন টিলজিটের (Tilsit) সন্ধির পর অনুভব করেন যে, ইওরোপ মহাদেশের সকল

শক্তি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তাঁর সঙ্গে সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হলেও একমাত্র ইংলন্ড তার সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপময় আসনে নৌবহরের প্রাচীরের আড়ালে তাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি ইংলন্ডের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুদ্ধ বা মহাদেশীয় অবরোধ (Continental System) ঘোষণা করেন। (পরে বিশদ বিবরণ দ্রষ্টব্য)। তিনি ঘোষণা করেন যে, ইওরোপের কোন রাষ্ট্র ইংলন্ড থেকে মাল আমদানি করতে পারবে না।

মহাদেশীয় অবরোধ ঘোষণা

নেপোলিয়ন স্থির করেন যে, ইওরোপের যে সকল দেশ তাঁর এই অবরোধ-নীতি মানবে না, তিনি সেই সকল দেশ অধিকার করে অবরোধ কার্যকরী করবেন। নেপোলিয়নের এই স্বৈরাচারী হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে ইওরোপে জাতীয় প্রতিরোধ জেগে ওঠে। রোমের পোপ এই অবরোধ মানতে অস্বীকার করলে তিনি পোপকে বন্দী করেন। সমগ্র খ্রীষ্ট জগৎ ধর্মগুরু পোপের প্রতি নেপোলিয়নের উদ্ধত আচরণে স্তম্ভিত হয়। ইতিমধ্যে পর্তুগাল অবরোধ অস্বীকার করলে নেপোলিয়ন স্পেনের সম্মতি ছাড়াই স্পেনের মধ্য দিয়ে পর্তুগালে সেনা পাঠান। এজন্য স্পেনবাসীরা বিদ্রোহ করলে নেপোলিয়ন স্পেনরাজ বুরবোঁবংশীয় ফার্দিনান্দকে বিতাড়িত করে স্পেনের সিংহাসনে ভ্রাতা জোসেফকে বসিয়ে দেন। স্পেনবাসী তাদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে নেপোলিয়নের এই সাম্রাজ্যবাদী স্থূল হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে জাতীয় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। নেপোলিয়ন তাঁর শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদের দ্বারাও স্পেনবাসীদের জাতীয় প্রতিরোধ দমনে ব্যর্থ হন। ইতিমধ্যে ইংরাজ সেনাপতি জেনারেল ওয়েলেস্‌লি বা ডিউক অব্ ওয়েলিংটন স্পেনবাসীদের পক্ষে যোগ দেন। তাঁর নেতৃত্বে স্পেনীয় সেনা লাইন অব্ টরেস্‌ভেড্রা নামে এক দুর্ভেদ্য সীমানার আড়ালে আত্মরক্ষা করে। ১৮১৩ খ্রীঃ ভিত্তোরিয়ার যুদ্ধে ফরাসী সেনাপতি মার্শাল জোদাঁকে পরাস্ত করে ডিউক অব্ ওয়েলিংটন ও স্পেনীয়রা স্পেনকে শত্রুমুক্ত করে। স্পেনের যুদ্ধকে পেনিনসুলার যুদ্ধ বা উপদ্বীপের যুদ্ধ বলা হয়। এই যুদ্ধে নেপোলিয়নের প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি হয়, মর্যাদা নষ্ট হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে স্পেনের আদর্শে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ নানা স্থানে দেখা দেয়। তাঁর সাম্রাজ্য এর ফলে ভেঙে যায়।

স্পেনের যুদ্ধ ও ফলাফল

ইতিমধ্যে রাশিয়ার জারের সঙ্গে নেপোলিয়নের টিলজিটের সন্ধি ভেঙে যায়। জার ব্রিটিশ মাল বয়কট করতে রাজী হন নাই। ১৮১২ খ্রীঃ নেপোলিয়ন ৬ লক্ষ সৈন্য সহ নিমেন নদী পার হয়ে রাশিয়া আক্রমণ করেন। সমগ্র ইওরোপ রুদ্ধশ্বাসে তাঁর রুশ অভিযানের ফলাফল লক্ষ্য করে। রুশ সেনাপতি কুটুজফ (Kutu zoff) এক নূতন রণকৌশল দ্বারা রুশ গ্রাম ও নগরগুলির খাদ্যশস্য নষ্ট করে যুদ্ধ এড়িয়ে "পোড়ামাটি নীতি" অবলম্বন করে পিছু হঠতে থাকেন। ক্রমে মস্কোর কাছে এসে কুটুজফ বোরোডিনোতে ফরাসীদের যুদ্ধ দেন এবং যুদ্ধে ফরাসী লোকবল ও রসদের প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি হয়। রুশরা পুনরায় পিছু হঠে; নেপোলিয়ন মস্কো অধিকার করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে রাশিয়ায় শীত আরম্ভ হয় এবং তাঁর সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হয়। অবস্থা খারাপ বুঝতে পেরে নেপোলিয়ন দ্রুত ফেরার চেষ্টা করলে রুশ সেনা ও কসাক গেরিলারা পাল্টা আক্রমণে ফরাসীদের ধ্বংস করে ফেলে। মস্কো অভিযানে পরাজয়ের ফলে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে রুশ জাতীয় প্রতিরোধের আদর্শে জার্মানীতে জাতীয় প্রতিরোধ জেগে উঠে।

রাশিয়া অভিযান ও ফলাফল

ইতিমধ্যে জার্মানীতে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানজাতির মুক্তিসংগ্রাম আরম্ভ হয়। অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া এই সংগ্রামে যোগ দেয়। ১৮১৩ খ্রীঃ অক্টোবর ১৯ তাংএ লাইপজিগের যুদ্ধে নেপোলিয়ন চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন। লাইপজিগের যুদ্ধ ছিল নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জার্মান

গণজাগরণের প্রকাশ। যাজক, শিক্ষক, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, অভিজাত সকলেই নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে অস্ত্র নেয়। রুশ, জার্মান ও অস্ট্রিয় বাহিনীকে জনতা সহায়তা দেয়। এজন্য লাইপজিগের যুদ্ধকে 'ব্যাটল অফ নেশনস' বা জাতিগুলির যুদ্ধ বলা হয়। লাইপজিগের পরাজয়ের খবর ছড়িয়ে পড়লে, নেপোলিয়নের সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতই ভেঙ্গে পড়ে। ফন্টেনব্ল্যুর সন্ধির দ্বারা নেপোলিয়নকে এলবা দ্বীপে পাঠানো হয়। কিন্তু নেপোলিয়ন এলবা দ্বীপে ১০ মাস কাটাবার পর পুনরায় ফ্রান্সে চলে আসেন এবং ভাগ্যপরীক্ষার চেষ্টা করেন। কিন্তু মিত্রশক্তি চতুর্থ শক্তিজোট দ্বারা চারদিক থেকে ফ্রান্সকে বেষ্টন করে এবং বেলজিয়ামের ওয়াটার্লুর যুদ্ধে ১৮১৫ খ্রীঃ নেপোলিয়ন ইংরেজ সেনাপতি ডিউক অব্ ওয়েলিংটন দ্বারা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন। তাঁর অবশিষ্ট জীবন সেন্ট হেলেনা দ্বীপে বন্দীদশায় কাটে।

লাইপজিগ ও ওয়াটার্লুর যুদ্ধ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : নেপোলিয়নের পতনে মহাদেশীয় অবরোধের ভূমিকা (Role of Continental System in Napoleon's downfall) : ১৮০৬ খ্রীঃ নেপোলিয়ন অনুভব করেন যে, ইওরোপের সকল শক্তি তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করে তাঁর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করলেও, ইংলণ্ড একাকী অদম্য তেজে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। যেহেতু ইংলন্ডকে আক্রমণ করার মত উপযুক্ত নৌবল তাঁর ছিল না, সেহেতু নেপোলিয়ন ইংলন্ডকে "হাতে না মেরে ভাতে মারার" পরিকল্পনা করেন। বিভিন্ন উপনিবেশ হতে মাল এনে তা ইওরোপে বিক্রি করে ইংলন্ড ফুলেফেঁপে উঠে। তা ছাড়া ইংলন্ডের কারখানায় তৈয়ারী উদ্বৃত্ত মালও ইওরোপের বাজারে ইংলন্ড বিক্রি করত। এজন্যে তিনি ইংলন্ডকে "দোকানদারের জাতি" বলে ব্যঙ্গ করতেন। নেপোলিয়ন স্থির করেন যে, তিনি ইওরোপের বাজারে ইংলন্ড থেকে মালের আমদানি ও বিক্রি বন্ধ করে দিবেন। এর ফলে ইংলন্ডের শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংস হবে, তার অর্থনীতি ভেঙে পড়বে। মাল বিক্রি না হলে ইংলন্ডের কলকারখানা বন্ধ হবে। শ্রমিকরা কাজ হারিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে চলে যাবে। এছাড়া তাঁর সেনাপতি মন্টজেলার্ড (Montsaillard) একটি পরিকল্পনা দ্বারা তাঁকে বোঝান যে, ইংলন্ডের মাল অবরোধ করলে ইওরোপের বাজারে যে শূন্যতা দেখা দিবে, তা ফরাসী মাল দ্বারা পূরণ করে ফেলা যাবে। ফলে ইওরোপের বাজারে ফ্রান্সই ইংলন্ডের স্থান দখল করে নিবে।[১]

নেপোলিয়ন বার্লিনের ডিক্রী বা হুকুমনামা (১৮০৬ খ্রীঃ) দ্বারা ইংলন্ডে তৈরী কোন জিনিসের ইওরোপের বাজারে প্রবেশ নিষেধ করেন। ১৮০৭ খ্রীঃ মিলানের হুকুমনামা দ্বারা তিনি সমগ্র ইংলন্ডের বিরুদ্ধে অবরোধ ঘোষণা করেন। নিরপেক্ষ দেশগুলিকেও এই অবরোধ মানতে আদেশ দেওয়া হয়। ইংলন্ড বা তা মিত্রদেশ বা তার উপনিবেশের কোন বন্দরে নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ ঢুকতে পারবে না বলা হয়। এই নির্দেশ অমান্য করলে নিরপেক্ষ দেশের মাল বাজেয়াপ্ত করার ভয় দেখানো হয়। ওয়ারশ ও ফন্টেরব্ল্যুর আদেশনামা দ্বারা ইংলন্ডের জাহাজের আটক মাল পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। ব্রিটিশ সরকার এই মহাদেশীয় অবরোধ বা কন্‌টিনেন্টাল সিস্টেমের বিরুদ্ধে অর্ডারস-ইন-কাউন্সিল (১৮০৭ খ্রীঃ) জারী করে বলেন যে, ফ্রান্স ও তার মিত্র-দেশগুলির বন্দরে ইংলন্ড পাল্টা অবরোধ ঘোষণা করল। অন্য কোন দেশ ফ্রান্সে মাল আমদানি করতে পারবে না, অন্যথা সেই দেশের জাহাজ ও মাল বাজেয়াপ্ত হবে। যদি কোন নিরপেক্ষ দেশ নিতান্তই ফ্রান্সে মাল পাঠাতে চায়, তবে সেই দেশের জাহাজকে আগে ইংলন্ডের কোন বন্দরে এসে উপযুক্ত লাইসেন্স-ফি দিয়ে অনুমতিপত্র নিতে হবে।

মহাদেশীয় অবরোধের নীতি

১· Claude Pobba-Fantana—Economic History of Europe.

নেপোলিয়ন যে মহাদেশীয় অবরোধ ঘোষণা করেন তা ছিল কাগুজে অবরোধ। কার্যতঃ তাঁর নৌবল না থাকায় ইংলন্ডের বিরুদ্ধে এই অবরোধ কার্যকরী করা যায় নাই। ফলে ইংলন্ড ইওরোপের উন্মুক্ত সমুদ্র-উপকূলে জাহাজ নোঙর করে নিকটস্থ বন্দরে মাল সরবরাহ করতে থাকে। তুরস্ক ছিল নেপোলিয়নের অবরোধের বাইরে। ব্রিটেনের ব্রিটিশ মাল ইউরোপে ঢুকে পড়ে। মোট কথা, ইংলন্ডের মালের রপ্তানি আটক করা সম্ভব হয় নাই। অপরদিকে, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ অবরোধ ব্রিটেনের নৌবলের জন্যে বিশেষ কার্যকরী হয়। শিল্পদ্রব্য ও প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাবে ফ্রান্স ও তার অধীনস্থ দেশগুলিতে দুর্দশা বাড়ে। ফ্রান্সের শিল্প এত অনুন্নত ছিল যে, তারা উৎপাদন দ্বারা নিজচাহিদা পূরণ এবং ইওরোপের চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় নাই। ফলে নেপোলিয়নের জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়।

নেপোলিয়নের বিফলতা

নেপোলিয়ন স্থির করেন যে, ইওরোপের উপকূল অঞ্চলের দেশগুলিকে দখল করে এই স্থান দিয়ে ব্রিটিশ মালের অনুপ্রবেশ বন্ধ করবেন। এই কাজ করতে গিয়ে তাঁকে বহু শান্তিপ্রিয় নিরপেক্ষ দেশকে দখল করে নিতে হয়। এর ফলে তাঁর জাতীয়তাবাদী ভাবমূর্তি কলঙ্কিত হয়। অন্য ইওরোপে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। পোপ অবরোধ না মানায় তিনি পোপকে বন্দী করেন ও তাঁর রাজ্য দখল করেন। এজন্যে গোটা খ্রীষ্টজগত তাঁকে ধিক্কার জানায়। নেপোলিয়ন পর্তুগাল ও স্পেনকে অবরোধ মানতে বাধ্য করার চেষ্টা করলে পর্তুগাল তা অস্বীকার করে। নেপোলিয়ন স্পেন ও পর্তুগাল আক্রমণ করার ফলে স্পেনের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। স্পেনে নেপোলিয়ন গোটা একটি জাতির প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি ভোগ করেন, মর্যাদা হারান এবং বিফলতা বরণ করেন। এদিকে রুশ জার মহাদেশীয় অবরোধ অগ্রাহ্য করায় নেপোলিয়ন রাশিয়া আক্রমণ করে তাঁর বিখ্যাত "গ্রান্ড আর্মি" বা "মহান সেনাদল" হারান। রাশিয়ায় পরাজয় তাঁর পতনের প্রধান ধাপ ছিল। জার্মানীতেও অবরোধ চালু করায় জনসাধারণ তার বিরুদ্ধে যায়। জার্মানীতে লাইপজিগের যুদ্ধে তাঁর চূড়ান্ত পতন হয়। এইভাবে মহাদেশীয় অবরোধের কারণে নেপোলিয়ন বহু দেশের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। পরিণামে তাঁর পতন হয়। ইংলন্ডকেও পরাজিত করা তার পক্ষে সাধ্যাতীত ছিল। এজন্যে মহাদেশীয় অবরোধকে তাঁর "মহা ভুল" বলা হয়।

অবরোধ উপলক্ষে অন্য রাজ্যের সঙ্গে দ্বন্দ্ব : স্পেন, রাশিয়া, জার্মানী

সপ্তম পরিচ্ছেদ : নেপোলিয়নের পতনের কারণ (Causes of Napoleon's downfall) : নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বিপ্লবের বায়ুপ্রবাহে তাঁর বিজয়-তরণীর পাল খাটিয়ে ইওরোপে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁর এই সাম্রাজ্য স্থায়ী হয় নাই। এ্যামিয়েন্সের সন্ধিভঙ্গের (১৮০২ খ্রীঃ) পর থেকে তাঁর পতন শুরু হয়। টিলজিটের সন্ধি ভেঙে গেলে (১৮০৭ খ্রীঃ) তাঁর পতন তীব্রতর হয়। ডেভিড টমসনের মতে, নেপোলিয়নের শাসন ফ্রান্সকে একটি পুলিশী রাষ্ট্রে পরিণত করে। যতই তিনি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন, ততই ব্যক্তি-স্বাধীনতা, আইনের শাসন লোপ পেতে থাকে। বাক্-স্বাধীনতা নষ্ট হয়। বিনাবিচারে লোকদের কারাগারে পাঠানো হয়। সাম্রাজ্যের সর্বত্র গুপ্তচররা ত্রাস সৃষ্টি করে। একদা তিনি ইওরোপের নিপীড়িত জনগণের পরিত্রাতার যে ভূমিকা নেন, তাঁর সেই মহিমা নষ্ট হয়। যে ফরাসী বুর্জোয়ারা একদা তাঁর প্রধান সমর্থক ছিল, তারা তাঁর পতনের জন্যে চক্রান্তে যোগ দেয়। কারণ নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহের জন্যে তাদের উপর করের চাপ বাড়ে এবং বাণিজ্যের ক্ষতি হয়।

ফ্রান্সে স্বৈরতন্ত্র

ফ্রান্সের বাইরে ইওরোপেও তাঁর সাম্রাজ্যে ভাঙন দেখা দেয়। ডেভিড টমসনের মতে,

"নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের আত্ম-বিনাশী স্ব-বিরোধিতা এবং স্বতঃসিদ্ধ দুর্বলতার জন্যে এই সাম্রাজ্যের পতন অবধারিত ছিল।" নেপোলিয়ন ইওরোপের জনগণকে বংশানুক্রমিক স্বৈরাচারী রাজাদের হাত থেকে মুক্ত করার আশ্বাস দেন। জার্মানী, ইতালী, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে শেষ পর্যন্ত তিনি পুরাতন রাজবংশকে উচ্ছেদ করলেও, জনসাধারণের উপর পুরাতন রাজবংশের শাসন অপেক্ষা অধিক স্বৈরাচারী শাসন স্থাপন করেন। তিনি জাতীয়তাবাদের কথা প্রচার করলেও তাঁর সাম্রাজ্য ও শাসন ছিল জাতীয়তাবাদের পরিপন্থী। তিনি একহাতে জাতিগুলিকে স্বৈরাচারী রাজবংশের শাসন থেকে মুক্ত করেন, অপর হাতে তিনি তাঁর অনুগত লোকদের মাধ্যমে সেই জাতিগুলির ওপর স্বৈরাচারী বৈদেশিক শাসন চাপিয়ে দেন। ইতালীতে তাঁর সৎপুত্র, স্পেনে তাঁর ভ্রাতা জোসেফ, জার্মানীতে তাঁর ভ্রাতা জেরোম, তাঁর নির্দেশে রাজা হয়ে বসেন। তিনি অধিকৃত রাজ্যগুলিকে বাধ্যতামূলক কর, সেনাদলে বাধ্যতামূলক যোগদান প্রভৃতি চালু করে ঘৃণিত হন।

ইওরোপে স্বৈরাচারী শাসন

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের মধ্যেই তাঁর ধ্বংসের বীজ ছিল। কারণ তিনি জার্মানী, পোল্যান্ড, ইতালী প্রভৃতি দেশে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা গোড়ার দিকে প্রচার করে, সেই সকল দেশের স্বৈরাচারী রাজাদের পতন ঘটান। কিন্তু তিনি যে জাতীয়তাবাদী শক্তির জাগরণ ঘটান, তা তাঁর বিনাশ ঘটায়। এই শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। রবার্ট এরগ্যাং-এর মতে "নেপোলিয়ন যে জাতীয়তাবাদী শক্তির জাগরণ ঘটান, তা তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষের সেনাদল অপেক্ষা বহুগুণ শক্তিশালী ছিল"।

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ছিল বিশাল। এই সাম্রাজ্যে ঐক্য রক্ষা করা সহজ কাজ ছিল না। নেপোলিয়ন এই সাম্রাজ্যকে স্থায়ী করার মত কোন সংগঠন গড়তে পারেন নাই। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজভ্রাতা বা আত্মীয়দের বিজিত দেশের সিংহাসনে বসালে বিদ্রোহ দেখা দেয়। নেপোলিয়নের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল গগনচুম্বী ও আত্মবিশ্বাস ছিল সীমাহীন। শত্রুপক্ষকে হেয় জ্ঞান করার ফলে তিনি তাদের শক্তির পরিমাপ করতে পারেন নাই। নিজশক্তির উপর অন্ধ আস্থার ফলে তাঁর বিচারবুদ্ধির ভুল হয়। রাশিয়া অভিযানে তাঁর এই ভুল দেখা যায়।

সাম্রাজ্যের বিশালতা ও নেপোলিয়নের চারিত্রিক দুর্বলতা

মস্কো অভিযান ছিল নেপোলিয়নের গুরুতর ভুল। স্পেনের যুদ্ধ থেকে তিনি কোন শিক্ষা নেন নাই। তিনি পুনরায় রাশিয়া আক্রমণ দ্বারা আর একটি দেশে জাতীয় প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। তাঁর আত্মবিশ্বাস এত বেশী ছিল যে, রাশিয়ার মত বিশাল ও দূরদেশে অভিযানের বিপদকে তিনি অগ্রাহ্য করেন। এই দূরদেশে নিয়মিত খাদ্য ও সেনা সরবরাহ করা সহজ কাজ ছিল না। ইতিমধ্যে তাঁর সৈন্যবলও কমে যায়। মস্কো যুদ্ধে পরাজয়ের পর তাঁর সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ে।

রণকৌশলে নেপোলিয়ন অনেক উদ্ভাবনী শক্তি দেখান একথা সত্য। কিন্তু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটন ও সেনাপতি ব্লুকার তাঁর রণকৌশল শিখে তাঁরই বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেন। তা ছাড়া নেপোলিয়ন ঝটিকা আক্রমণে দক্ষ ছিলেন। স্পেন বা রাশিয়ায় দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে তিনি দক্ষতা দেখাতে পারেন নাই। যতই যুদ্ধ চলতে থাকে নেপোলিয়নের অভিজ্ঞ ও দক্ষ সেনারা অনেকে নিহত হন। অনভিজ্ঞ সেনাদের দ্বারা তাঁকে সেনাদল গঠন করতে হয়। এজন্যে সেনাদল দুর্বল হয়ে পড়ে।

সামরিক দক্ষতার হ্রাস

কন্টিনেন্টাল সিস্টেম বা মহাদেশীয় অবরোধ ও তজ্জনিত সঙ্কট নেপোলিয়নের পতনকে ত্বরান্বিত করে। মহাদেশীয় অবরোধ বলপূর্বক কার্যকরী করার জন্যে তাঁকে ইওরোপের নিরপেক্ষ

দেশ আক্রমণ করতে হয়। এই উপলক্ষে তিনি স্পেনে জাতীয় প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। স্পেনের যুদ্ধে তাঁর প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি ও পরাজয় হয়। রাশিয়া অভিযানেও তিনি জাতীয় প্রতিরোধে ৫½ লক্ষ সেনা হারান এবং শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন। জার্মানীর জাতীয় প্রতিরোধে তাঁর চূড়ান্ত পতন হয়। এই জাতীয় প্রতিরোধগুলি ছিল নেপোলিয়নের পতনের প্রধান কারণ। মহাদেশীয় অবরোধ উপলক্ষে তিনি এই প্রতিরোধের সম্মুখীন হন।

কন্টিনেন্টাল সিস্টেমের কুফল

ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের মতে নেপোলিয়নের পতনের জন্যে ইংলন্ডের ভূমিকা ছিল সর্বাধিক বেশী। ইংলন্ডের নৌশক্তির প্রতাপে তিনি ইংলন্ড আক্রমণ করতে সক্ষম হন নি। অপরদিকে ইংলন্ড তাঁর বিরুদ্ধে ইওরোপের অন্যান্য শক্তিগুলিকে নিয়ে একটির পর একটি শক্তিজোট গড়ে তুলে। তৃতীয় শক্তিজোট ভেঙ্গে গেলে, ইংলন্ড শোমোর চুক্তি (Treaty of Cheaumont) দ্বারা চতুর্থ শক্তিজোট গড়ে তুলে। এই চতুর্থ শক্তিজোটের আক্রমণে নেপোলিয়নের চূড়ান্ত পতন হয়। ইংলন্ড অর্থবল ও লোকবল দ্বারা শক্তিজোটগুলি গঠনে তৎপর ছিল। ইংলন্ডের নৌ-বাহিনীর ভূমিকাও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ট্রাফাল্‌গারের নৌযুদ্ধে বৃটিশ নৌ-সেনাপতি নেলসন ফরাসী নৌবহর ধ্বংস করায় সমুদ্রপথে নেপোলিয়ন অধিকার হারান। তিনি ডেনমার্কের নৌবহরের সাহায্যলাভের চেষ্টা করলে ইংলন্ডের নৌবহর গোলা দেগে ডেনমার্কের নৌবহর ধ্বংস করে দেয়। নৌশক্তির অভাবে নেপোলিয়ন ইংলন্ড আক্রমণ করতে পারেন নাই। তাঁর মহাদেশীয় অবরোধ নীতি ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ ছিল নৌশক্তির অভাব। অপরদিকে ইংলন্ড তার নৌশক্তির জোরে মহাদেশীয় অবরোধ ভেঙ্গে ফেলে। ইংরাজ সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটন স্পেনের যুদ্ধে স্পেনবাসীদের পক্ষ নিয়ে নেপোলিয়নের বাহিনীকে পরাস্ত করেন। সবশেষে ওয়াটার্লুর যুদ্ধে ডিউক অব ওয়েলিংটন নেপোলিয়নের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটান। এইভাবে ইংলন্ডের দৃঢ়, অবিরাম প্রতিরোধ নেপোলিয়নের পতন ঘটায়।

সারণী [ক]

[ক] বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের সমাজে তিনটি শ্রেণী ছিল, যথা, যাজক, অভিজাত ও তৃতীয় শ্রেণী। প্রথম দুই শ্রেণী বিশেষ অধিকার ভোগ করত, বিনা করে জমিদারির উপস্বত্ব ভোগ করত ও সরকারী পদগুলি দখল করত। তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে ছিল বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত, কৃষক, শ্রমিক ও চালচুলোহীন ভবঘুরে বা সাঁকুলেৎ শ্রেণী। এরা ছিল অধিকারহীন, জন্মকৌলীন্যহীন, করভারে জর্জরিত শ্রেণী। তৃতীয় শ্রেণীর অসন্তোষই ছিল ফরাসী বিপ্লবের মূল কারণ। এ ছাড়া কৃষি জমির ⅕ অংশ গীর্জা ও ⅓ অংশ ছিল সামন্তশ্রেণীর হাতে। তারা করহীন সম্পত্তি ভোগ করত। চাষীরা সকল প্রকার কর মিটিয়ে ২০% ফসল হাতে রাখতে পারত। মুদ্রাস্ফীতির জন্যে দ্রব্যমূল্য বাড়ায় মূল্যমান মধ্যবিত্তের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। ষোড়শ লুই-এর রাজকোষ শূন্য হলে তিনি অভিজাতদের উপর করস্থাপনের ব্যর্থ চেষ্টার পর জাতীয় সভার অধিবেশন ডাকতে বাধ্য হন। বিপ্লবের কারণ ছিল প্রধানতঃ অর্থনৈতিক ও সামাজিক।

[খ] অর্থনীতিবিদ ঐতিহাসিকরা ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাতে দার্শনিকদের প্রভাব বিশেষ ছিল না বলে মনে করেন। দার্শনিকদের রচনা বেশিরভাগ লোক পড়ত না, মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীই তা পড়েন। অপরদিকে বলা হয় যে দার্শনিকরা চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে বিপ্লবী মানসিকতা তৈরি করেন এবং তাঁদের মতবাদ পরোক্ষভাবে সাধারণ লোকের মধ্যে ছড়ায়। মন্তেস্কু তাঁর পারস্যের পত্রাবলীতে সমাজে বিশেষ সুবিধাভোগী অভিজাত ও গীর্জার নিন্দা করেন। তিনি 'স্পিরিট অব লজ' গ্রন্থে ক্ষমতা-বিভাজন তত্ত্ব ও সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের তত্ত্ব প্রচার করেন। রুশো "অসাম্যের মূলসূত্র" এবং সামাজিক চুক্তিতত্ত্ব দ্বারা প্রচলিত সমাজব্যবস্থার অন্যায় দিক এবং স্বর্গীয় অধিকারভোগী রাজতন্ত্রের তত্ত্বকে নস্যাৎ করেন। ভল্‌তেয়ার গীর্জার দুর্নীতিকে আক্রমণ করেন। এছাড়া বিশ্বকোষ-প্রণেতাগণ এবং ফিজিওক্র্যাটবাদী অর্থনীতিবিদরা প্রচলিত অর্থনৈতিক মতবাদের সমালোচনা করেন।

[গ] ফরাসী বিপ্লবের রাজনৈতিক কারণের মধ্যে বুরবোঁ রাজবংশের স্বৈরাচারী শাসন ও শাসনব্যবস্থায় দুর্নীতি ছিল গুরুত্বপূর্ণ কারণ। লেত্রে দে কেশে ও ইন্টেণ্ডেন্ট প্রথার জন্যে জনসাধারণের দুর্দশা ঘটে। ষোড়শ লুইয়ের দুর্বলতার ফলে তিনি জাতীয় সভার অধিবেশন ডাকতে বাধ্য হন।

[ঘ] ষোড়শ লুই তাঁর অর্থসঙ্কট দূর করার জন্যে তুর্গোর পরামর্শ অনুযায়ী করব্যবস্থার আমূল সংস্কারের উদ্যোগ নিলে অভিজাতদের প্রতিবাদে তিনি তুর্গোকে পদচ্যুত করতে বাধ্য হন। পরবর্তী মন্ত্রী ক্যালোনেও রাজাকে পরামর্শ দেন যে, অভিজাতদের উপর করস্থাপন ছাড়া পথ নেই। ষোড়শ লুই অভিজাত পরিষদের কাছে নূতন করপ্রস্তাব অনুমোদনের দাবি করলে তা অগ্রাহ্য হয়। পরবর্তী মন্ত্রী ব্রিঁয়া পার্লামেন্ট অব প্যারিসের কাছে করস্থাপনের জন্যে সম্মতি চাইলে তা অগ্রাহ্য হয়। রাজা জাতীয় সভা ডাকতে বাধ্য হন। এই ঘটনাকে অভিজাত বিদ্রোহ বলা হয়।

[ঙ] জাতীয় সভা আহূত হলে তৃতীয় শ্রেণীর মুখপাত্র বুর্জোয়া প্রতিনিধিরা প্রতি সদস্যের মাথাপিছু ভোট গ্রহণের অধিকার দাবি করেন। অভিজাতশ্রেণী চিরাচরিত শ্রেণীপিছু ভোটের দাবিতে অটল থাকে। তৃতীয় শ্রেণীর উপরোক্ত দাবির সমর্থনে তাঁরা "নিয়োগকারী ক্ষমতাতত্ত্ব" ব্যাখ্যা করেন। ষোড়শ লুই অভিজাতদের দাবি সমর্থন করে জাতীয় সভার অধিবেশন রদ করলে তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিরা টেনিস কোর্টের শপথনামা দ্বারা জাতীয় সভা চালিয়ে যেতে ও ফ্রান্সের নূতন বিপ্লবী সংবিধান রচনার জন্যে প্রতিজ্ঞা নিলে ষোড়শ লুই জাতীয় সভার মাথাপিছু ভোট স্বীকার করে জাতীয় সভা পুনরায় বসিয়ে দেন।

[চ] প্যারিসের জনতা, সাঁকুলেৎশ্রেণী ১৭৮৯ খ্রীঃ বাস্তিলদুর্গ ধ্বংস করে পুরাতনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। বাস্তিলের পতনের পর গ্রামাঞ্চলে কৃষক-বিদ্রোহ ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। জমিবেষ্টনী, অভিজাতদের পল্লীভবন ধ্বংস করা হয়।

[ছ] জাতীয় সভা সংবিধান রচনার কাজে হাত দিলে তার নাম হয় সংবিধানসভা। ৪ঠা আগস্টের ঘোষণা দ্বারা সংবিধানসভা সামন্তপ্রথা, দৈবাধিকার স্বত্বযুক্ত রাজতন্ত্র, ভূমিদাস-প্রথা ও অভিজাতদের বিশেষ অধিকার প্রভৃতি পুরাতনতন্ত্রের বিভিন্ন দিকগুলি লোপ করে। ব্যক্তি ও নাগরিকের ঘোষণাপত্র ২৬শে আগস্ট দ্বারা সকল মানুষের সমান অধিকার ঘোষণা করে। ফ্রান্সের নূতন সংবিধানে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র চালু করা হয় ও ক্ষমতাবিভাজন নীতি অনুসারে রাজাকে আইনসভা থেকে পৃথক করা হয়। রাজার হাতে বিশেষ ক্ষমতা হিসাবে মুলতুবীনামা ব্যবহারের অধিকার দেওয়া হয়। ভোটাধিকার আইন দ্বারা কেবলমাত্র সক্রিয় নাগরিকদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়; বাকী সকলকে ভোটাধিকারে বঞ্চিত করা হয়। আইনসভাকে আইনরচনার সার্বভৌম ক্ষমতা দেওয়া হয়। প্রদেশের সকল কর্মচারীকে সক্রিয় নাগরিকের ভোটে নির্বাচনের মাধ্যমে নিয়োগের নিয়ম করা হয়। গীর্জার জাতীয়করণ করা হয়।

[জ] ফ্রান্সের ১৭৯১ খ্রীঃ প্রথম বিপ্লবী সংবিধানে বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতা লাভ করায় ১৭৯২ খ্রীঃ এই সংবিধানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ফরাসী-বিপ্লব দেখা দেয়। উন্মত্ত জনতার আক্রমণে এই সংবিধান নাকচ করে ন্যাশন্যাল কন্‌ভেন্‌শন দ্বারা সর্বসাধারণের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়।

[ঝ] ফরাসী বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে স্বর্গীয় অধিকারবাদী বুরবোঁবংশের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান হয়। প্রজাতন্ত্রের আদর্শ জন্মলাভ করে। সামন্তপ্রথা ও অভিজাতশ্রেণীর বিশেষ অধিকার লুপ্ত হয়। তবে এই বিপ্লবের প্রধান ফসল বুর্জোয়াশ্রেণী ঘরে তোলে। ইওরোপে ফরাসী-বিপ্লবের আদর্শ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা ছড়িয়ে পড়ে।

[ঞ] ফরাসী-বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্রী সরকার গঠিত হলে ইওরোপের রাজতন্ত্রগুলি ভয় পায়। তারা এই বিপ্লবকে ধ্বংসের জন্যে যুদ্ধঘোষণা করে। জ্যাকোবিন দল বৈদেশিক যুদ্ধের বিরোধী হলেও জিরণ্ডিস্ট দল যুদ্ধের মাধ্যমে ইওরোপে বিপ্লবের আদর্শ ছড়িয়ে দিতে চায়। প্রথমে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে।

[ট] ফ্রান্সের ভিতরে বিপ্লবী প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে রাজতান্ত্রিক প্রতিবিপ্লব দেখা দেয়। সরকারের প্রতি জনসাধারণের আনুগত্যের অভাব হয়। এমতাবস্থায় সরকারকে প্রতিক্রিয়াশীল বিদ্রোহ থেকে রক্ষার জন্যে এক জরুরী শাসন বা সন্ত্রাসের রাজত্ব ঘোষণা করা হয়। ৯—১২ জন নির্বাচিত সদস্যের একজন নিরাপত্তা-সমিতির হাতে সকল ক্ষমতা দেওয়া হয়। সন্ত্রাসের দ্বারা এই সমিতি প্রথমে প্রতিবিপ্লবীদের দমন করে। পরে প্রতিদ্বন্দ্বী জিরণ্ডিস্ট দলের নেতা ও জ্যাকোবিন দলের কিছু নেতাকেও হত্যা করা হয়। রোবস্‌পিয়ার নিহত হলে সন্ত্রাসের অবসান হয়। সন্ত্রাসের পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয় যে সন্ত্রাস বিপ্লবকে রক্ষা করে। বিপক্ষে যুক্তি দেখানো হয় যে, সন্ত্রাসের আতিশয্য ঘটে এবং জনসাধারণের জীবনে আতঙ্ক দেখা দেয়।

[ঠ] ফরাসী বিপ্লবের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গড়ে উঠে। যথা জিরণ্ডিস্ট, জ্যাকোবিন, মডারেট প্রভৃতি। জ্যাকোবিন দল ছিল চরমপন্থী এবং এই দলের নেতা রোবস্‌পিয়ার ছিলেন রুশোর মানস-সন্তান। তিনি বহু প্রগতিশীল সংস্কার প্রবর্তন করেন।

সারণী [খ]

[ক] ন্যাশন্যাল কন্‌ভেন্‌শনের পতনের পর ১৭৯৫ খ্রীঃ ডাইরেক্টরীর শাসন আরম্ভ হয়। ডাইরেক্টরীর আভ্যন্তরীণ শাসন ছিল দুর্নীতিপূর্ণ ও প্রতিক্রিয়াশীল। ডাইরেক্টরীর আমলে নবীন সেনাপতি নেপোলিয়ন জনপ্রিয়তা লাভ করেন এবং ডাইরেক্টরীকে ধ্বংস করে কন্‌সুলেটের শাসন প্রবর্তন করেন।

[খ] নেপোলিয়ন তাঁর সামরিক সাফল্যজনিত জনপ্রিয়তার সুযোগে কন্‌সাল পদ গ্রহণ করেন। তিনি যে সংবিধান প্রবর্তন করেন, তার ফলে প্রথম কন্‌সাল অর্থাৎ নেপোলিয়নের হাতেই সকল ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। তিনি যাবজ্জীবন কন্‌সালের পদ নিয়ে সন্তুষ্ট না থেকে ১৮০৪ খ্রীঃ প্রজাতন্ত্রকে লোপ করে 'সম্রাট' খেতাব নেন। নেপোলিয়নের এই স্বৈরতন্ত্রকে ফরাসীজাতি মেনে নেয়; তার কারণ তিনি বিপ্লবের মূল্যবান উত্তরাধিকারগুলি রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন এবং তিনি এক মজবুত, স্থিতিশীল মধ্যপন্থী সরকার গঠনে সক্ষম বলে লোকে মনে করে।

[গ] কন্‌স্যাল ও সম্রাট হিসাবে নেপোলিয়ন বহু উল্লেখযোগ্য সংস্কার প্রবর্তন করেন। তিনি কন্‌সুলেটের সংবিধান দ্বারা শৃঙ্খলার সঙ্গে স্বাধীনতার সমন্বয় করেন। তাঁর অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে সাম্যের নীতি বলবতী হয়। কোড্ নেপোলিয়ন দ্বারা ফ্রান্সে বিপ্লবী ভাবধারার সঙ্গে রোমান আইনবিধি সমন্বয় করেন। তিনি শিক্ষা ও জনহিতকর সংস্কার ও কন্‌কর্ডাট বা ধর্মীয় সংস্কার প্রবর্তন করেন। তাঁর সংস্কারের প্রধান দিক ছিল যে গণতন্ত্রকে বর্জন করলেও তিনি বিপ্লবের ভূমিসংস্কার, সামাজিক সাম্য প্রভৃতি রক্ষা করেন। তবে তিনি বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থই প্রকৃত রক্ষা করেন।

[ঘ] নেপোলিয়ন তাঁর সামরিক প্রতিভার দ্বারা ইওরোপের প্রধান রাজশক্তিগুলিকে পরাজিত করে ইওরোপে তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আধিপত্য স্থাপন করেন। তিনি ১৭৯৭ খ্রীঃ অস্ট্রিয়াকে ক্যাম্পোফোর্মিওর সন্ধি এবং প্রাশিয়াকে ব্যাসলের সন্ধি এবং ব্রিটেনকে এ্যামিয়েন্সের সন্ধিস্বাক্ষরে বাধ্য করেন। তিনি ইতালী ও জার্মানীর পুনর্গঠন দ্বারা এই দুই দেশে তাঁর আধিপত্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্থাপন করেন। তাছাড়া বেলজিয়াম, হল্যাণ্ডও তাঁর পদানত হয়। ইংলণ্ড নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে তৃতীয় মিত্রজোট গড়ে। কিন্তু উলমের যুদ্ধে এই জোটকে নেপোলিয়ন পরাজিত করেন। ট্রাফাল্‌গারের নৌযুদ্ধে ইংলণ্ডের হাতে ফরাসী নৌবহর ধ্বংস হয়। ১৮০৭ খ্রীঃ জার নেপোলিয়নের সঙ্গে টিল্‌জিটের সন্ধি স্বাক্ষর করলে নেপোলিয়ন তাঁর গৌরবের ঊর্ধ্বতম চূড়ায় পৌঁছান।

[ঙ] নৌবাহিনীর অভাবে দ্বীপভূমি ইংলণ্ডকে আক্রমণে বিফল হয়ে নেপোলিয়ন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুদ্ধ বা মহাদেশীয় অবরোধ ঘোষণা করেন। তিনি ইওরোপের বন্দরে ব্রিটেনের জাহাজের অনুপ্রবেশ এবং ব্রিটেনের বন্দরে অন্য দেশের জাহাজের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন। ব্রিটেন এর প্রতিবাদে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অবরোধ ঘোষণা করে। নৌবহর না থাকায় নেপোলিয়নের ঘোষিত অবরোধ কার্যকরী করা যায় নি। স্পেন এই অবরোধ মানতে রাজী না হলে নেপোলিয়ন স্পেন ও পর্তুগাল আক্রমণ করেন। স্পেনবাসী অদম্য উৎসাহে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধ চালায়। এই যুদ্ধে নেপোলিয়নের বহু লোকক্ষয় হলেও তিনি জয়লাভ করতে পারেন নি। অতঃপর রাশিয়া মহাদেশীয় অবরোধ অগ্রাহ্য করায় নেপোলিয়ন রাশিয়া আক্রমণ করেন। তাঁর বাহিনী মস্কো যুদ্ধে ধ্বংস হয়। জার্মানীতে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জেগে উঠে। লাইপ্‌জিগের যুদ্ধে নেপোলিয়ন পরাজিত হয়ে এল্‌বা দ্বীপে নির্বাসিত হন। নেপোলিয়ন এল্‌বা থেকে পুনরায় ফ্রান্সে চলে এসে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে শেষ আক্রমণ চালান। ওয়াটার্লুর যুদ্ধে তাঁর চূড়ান্ত পতন হয়।

[চ] নেপোলিয়নের পতনের জন্যে তাঁর সাম্রাজ্যের সংগঠনের স্ববিরোধিতাই দায়ী ছিল। নেপোলিয়ন ইওরোপের জনসাধারণকে বংশানুক্রমিক স্বৈরাচারের হাত থেকে রক্ষা করলেও তিনি তাঁর নিজ স্বৈরাচারী শাসন তাদের উপর চাপিয়ে দেন। তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং বিশাল সাম্রাজ্য তাঁর আত্মীয়দের শাসক হিসাবে নিয়োগ তাঁর ভাবমূর্তি কলঙ্কিত করে। স্পেন ও রাশিয়ার দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় তাঁর সামরিক দক্ষতা কমতে থাকে। মহাদেশীয় অবরোধ স্থাপন তাঁর বিফলতা এবং তাঁর বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ তাঁর পতন ঘটায়।

অনুশীলনী

দ্বিতীয় অধ্যায় [ক]

১। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ফরাসী জনসাধারণ কয় শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল? (খ) উচ্চ যাজকসম্প্রদায় কি কি অধিকার ভোগ করত? (গ) স্পিরিট অব লজ্ কার রচনা? (ঘ) কাকে "ফরাসী বিপ্লবের ঝড়ের সামুদ্রিক পাখী" বলা হয়? (ঙ) "আমি অর্থাৎ রাজা হলেন রাষ্ট্র"—কার উক্তি? (চ) লত্র দ্য কেশে কি? (ছ) টুর্গো কে ছিলেন? (জ) কে বলেন "কেবলমাত্র টুর্গো ও আমি ফ্রান্সকে ভালবাসি"। (ঝ) "বিশেষ অধিকার বিষয়ক প্রবন্ধ" বইটির রচয়িতা কে ? (ঞ) সাঁ-কুলোৎ কাদের বলা হয়? (ট) প্যারিস কমিউন কি? (ঠ) "মুলতুবীনামা" কি? (ড) "ধর্মযাজকদের সংবিধান" কাকে বলে? (ঢ) ব্রান্সউইক ম্যানিফেস্টো কি? (ণ) জন নিরাপত্তা সমিতি কাকে বলে? (ত) বিপ্লবী বিচারালয়ের কাজ কি? (থ) জিরন্ডিস্ট কারা? (দ) জ্যাকোবিন কাদের বলে? (ধ) ব্যাবেয়ুফ কে ছিলেন? (ন) রোবসপিয়ার সম্বন্ধে কি জান?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(ক) ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কি জান? (খ) ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাতে দার্শনিকদের ভূমিকা কি ছিল? (গ) "দার্শনিকরা যে বীজ বপন করেন তা উপযুক্ত জমিতে অঙ্কুরিত হয়।"—ফরাসী বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। (ঘ) ফরাসী বিপ্লবের জন্যে বুরবোঁ রাজবংশ কতখানি দায়ী ছিল? (ঙ) "ফ্রান্সের রাজা অভিজাতদের বিশেষ অধিকারগুলি লোপ করতে অসমর্থ হলে বিপ্লব ঘটে।"—এই বিষয়ে ষোড়শ লুই-এর দায়িত্ব কি? (চ) টুর্গোর "কর-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার" সম্পর্কে কি জান? (ছ) ফরাসী বিপ্লবে জাতীয় সভার ভূমিকা আলোচনা কর। (জ) টেনিস কোর্টের শপথনামা কি? (ঝ) "বাস্তিলের পতনের ফল ছিল বহুমুখী"—আলোচনা কর। (ঞ) সংবিধান-সভার কার্যাবলীর বিবরণ দাও। (ট) ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল আলোচনা কর। (ঠ) কেন "সন্ত্রাসের রাজত্বের" প্রয়োজন হয়। (ড) জাতীয় সভার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর বিবরণ দাও। (ঢ) রোবসপিয়ার কে ছিলেন? "সন্ত্রাসের রাজত্বে" তাঁর ভূমিকা আলোচনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায় [খ]

১। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) "বাসফুল" নীতি কি? (খ) নেপোলিয়নকে কেন "বিপ্লবের সন্তান" বলা হয়? (গ) কোড নেপোলিয়ন কাকে বলে? (ঘ) কনকর্ডাট চুক্তি সম্বন্ধে কি জান? (ঙ) ক্যাম্পো-ফোর্মিওর সন্ধি কাদের মধ্যে সম্পাদিত হয়? (চ) ট্রাফালগারের নৌযুদ্ধ কাদের মধ্যে সংঘটিত হয়? (ছ) টিলজিটের সন্ধি কাদের মধ্যে সম্পাদিত হয়? (জ) লাইন্স অফ টরেসভেড্রা কি? (ঝ) বার্লিনের ডিক্রী ও মিলানের হুকুমনামার দ্বারা কি করা হয়? (ঞ) ওয়াটার্লুর যুদ্ধে কি হয়?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :,

(ক) জাতীয় সম্মেলন ১৭৯৫ খ্রীঃ যে সংবিধান গ্রহণ করে তাহা আলোচনা কর। (খ) নেপোলিয়নের উত্থানের জন্যে ডাইরেক্টরী কতখানি দায়ী ছিল? (গ) নেপোলিয়নের মধ্যপন্থা সম্পর্কে কি জান? (ঘ) "যদিও নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ছিল অস্থায়ী, তাঁর অসামরিক সংস্কারগুলি গ্রানাইট পাথরের স্থায়ী ভিত্তির উপর তৈরি হয়।"—উক্তিটির মাধ্যমে নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ সংস্কার আলোচনা কর। (ঙ) কোড নেপোলিয়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা কর। (চ) "আমিই বিপ্লবের বরপুত্র, আমিই বিপ্লবকে ধ্বংস করেছি।"—নেপোলিয়নের সংস্কারগুলি আলোচনা করে এই বিষয়ে তোমার মতামত দাও। (ছ) নেপোলিয়ন কিভাবে জার্মানী ও ইতালীর পুনর্গঠন করেন? (জ) টিলজিটের সন্ধির বিবরণ দাও। (ঝ) নেপোলিয়নের পতনের জন্য "স্পেনীয় ক্ষত" কতখানি দায়ী ছিল? (ঞ) মহাদেশীয় অবরোধ সম্পর্কে আলোচনা কর এবং কেন এই অবরোধকে "মহাভুল" বলা হয়? (ট) "নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের আত্ম-বিনাশী স্ব-বিরোধিতা এবং স্বতঃসিদ্ধ দুর্বলতার জন্যে এই সাম্রাজ্যের পতন অবধারিত ছিল।"—নেপোলিয়নের পতনের জন্যে তাঁর সাম্রাজ্যের স্ব-বিরোধিতা কতখানি দায়ী ছিল?

তৃতীয় অধ্যায়

ভিয়েনা কংগ্রেস ঃ জুলাই ও ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ঃ মেটারনিখ্‌তন্ত্র ঃ ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

[ক] প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ভিয়েনা-চুক্তি, ১৮১৫ খ্রীঃ (The Vienna Settlement, 1815) ঃ লাইপজিগের যুদ্ধে নেপোলিয়নের পতনের পর বিজয়ী মিত্রশক্তিরা ভিয়েনা নগরীতে ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকেন। নেপোলিয়ন যেভাবে ইওরোপের রাজনৈতিক সংগঠন করেন তা ভেঙে ফেলে ইওরোপের পুনর্গঠন করা ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, নেপোলিয়ন যেহেতু বলের দ্বারা ইওরোপের রাষ্ট্র সংগঠন তৈয়ারি করেছেন, তা অবৈধ। কারণ তার ফলে বংশানুক্রমিক বৈধ শাসনব্যবস্থাকে আমল দেওয়া হয় নি। নেপোলিয়নের রাষ্ট্রগঠন ভেঙ্গে পুনর্গঠনের লক্ষ্য নেওয়া হয়। পোপ ও তুরস্কের সুলতান ছাড়া ইওরোপের আর সকল শক্তি এই মহা-সম্মেলনে যোগ দেয়। এই সম্মেলনের মধ্যমণি ছিলেন রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডার, অস্ট্রিয়ার রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী মেটারনিখ্‌। এছাড়া ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কাসলরি ও ফ্রান্সের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ধূর্ত, চতুর মন্ত্রী ট্যালিরান্ডও ছিলেন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। মেটারনিখের লক্ষ্য ছিল বিপ্লবের পূর্ববর্তী ব্যবস্থাকে অর্থাৎ পুরাতনতন্ত্রকে যতদূর সম্ভব ইওরোপে কায়েম করা। ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী কাসলরি শক্তিসাম্য বা ব্যালান্স অব পাওয়ার স্থাপনের জন্যে চেষ্টা চালান। ঐতিহাসিক শেভিলের মতে, ট্যালিরান্ড ছিলেন "পাঁকাল মাছের মত পিচ্ছিল"। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল ফ্রান্সকে ব্যবচ্ছেদের হাত থেকে রক্ষা করা।

ভিয়েনা সম্মেলনের আদর্শ

সম্মেলনের প্রাক্‌কালে নেতারা "ইওরোপের রাজনৈতিক ব্যবস্থার "সমাজব্যবস্থার ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে পুনর্গঠন" প্রভৃতি উচ্চ আদর্শের কথা বলেন। আসলে ফরাসী বিপ্লবের নবজাত ভাবধারা, জাতীয়তাবাদ, উদারতন্ত্র ও গণতন্ত্রকে দমন করে ইওরোপে পুরাতনতন্ত্র প্রবর্তনই ছিল তাঁদের মূল লক্ষ্য।[১] ভিয়েনা সম্মেলনের সম্পাদক ফ্রেডাবিশ জেন্‌ৎস বলেন যে,"আমার মতে উপরোক্ত উচ্চ আদর্শগুলি জনসাধারণকে ভাঁওতা দেওয়ার জন্যে উচ্চারিত হয়েছিল। এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ছিল নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিজয়ী শক্তিগুলির বিজিত শক্তির রাজ্য-গ্রাস"। যদিও ইওরোপের বিভিন্ন শক্তি এই বিখ্যাত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেন, প্রকৃত ক্ষমতা চার প্রধানের হাতেই ন্যস্ত ছিল।

ভিয়েনা-সন্ধির (১৮১৫ খ্রীঃ) কর্তারা ইওরোপে তাঁদের পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে প্রধানতঃ তিনটি নীতিকে গ্রহণ করেন, যথা, নায্য অধিকার (Legitimacy); শক্তিসাম্য (Balance of Power) এবং ক্ষতিপূরণ (Compensation)। নায্য অধিকার নীতি অনুসারে নেপোলিয়নের আগে ইওরোপের যে সকল দেশে যে সকল রাজবংশের শাসন ছিল, তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। ফ্রান্সের সঙ্গে প্যারিসের দ্বিতীয় সন্ধি অনুসারে বুরবোঁবংশকে পুনরায় ফ্রান্সের সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। বুরবোঁ রাজা অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন। বিপ্লবের প্রাক্‌কালে ফ্রান্সের যে সীমানা ছিল, ফ্রান্সকে সেই সীমানা দেওয়া হয় এবং নিজ-সীমানার বাইরে যে সকল স্থান ফ্রান্স জয় করেছিল তা ত্যাগ করে। নেপোলিয়ন বিভিন্ন দেশ থেকে যে সকল মূল্যবান ঐতিহাসিক

নায্য নীতির প্রয়োগ

১ David Thomson—Europe Since Napoleon. P. 71-72

নিদর্শন আনেন, ফ্রান্স তা সেই সকল দেশকে নায্য অধিকার নীতি অনুযায়ী ফিরিয়ে দেয়। নায্য অধিকার নীতি অনুসারে হল্যান্ডের সিংহাসনে অরেঞ্জবংশকে পুনঃস্থাপন করা হয়। স্পেনে বুরবোঁবংশের শাখাকে, পিডমন্টে স্যাভয় রাজবংশকে এবং নেপল্স ও সিসিলিতে বুরবোঁ-বংশের অপর এক শাখাকে নায্য অধিকারবাদ অনুসারে স্থাপন করা হয়। রোমের পোপকেও তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া হয়। নায্য অধিকার ও শক্তি-সাম্যনীতির যৌথভাবে জার্মানীর পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। জার্মানীর ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে প্রতিবেশী বৃহৎ রাজ্যগুলির সঙ্গে যুক্ত করে জার্মানীকে মোট ৩৯টি রাজ্যে বিভক্ত করা হয়। অস্ট্রিয়ার মেটারনিখ এবং ফ্রান্সের প্রতিনিধি ট্যালির‍্যান্ড কেহই ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদী জার্মানী গঠন পছন্দ করতেন না। ফলে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর দাবি কংগ্রেসে অগ্রাহ্য হয়। এই ৩৯টি রাজ্যগুলিকে নিয়ে একটি বুন্ড (Bund) বা শিথিল যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে অস্ট্রিয়াকে তার সভাপতি করা হয়। কার্যতঃ ৩৯টি জার্মান রাজ্য অন্যান্য ব্যাপারে স্বাধীন ছিল। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে এই রাজ্যগুলিকে জার্মান বুণ্ডের নির্দেশ মেনে চলতে হবে বলা হয়। ইতালীকে মোট ৫টি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা, (ক) ক্ষতিপূরণ নীতি অনুসারে লম্বার্ডি ও ভেনেশিয়া দেওয়া হয় অস্ট্রিয়াকে; (খ) পোপের রাজ্য পোপকে দেওয়া হয়; (গ) পিডমন্ট, সার্ডিনিয়া নায্য অধিকার নীতি অনুসারে পিডমন্টের স্যাভয় রাজবংশকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়; (ঘ) মধ্য ইতালীকে বিভিন্ন হ্যাপ্‌সবার্গ রাজকুমারদের দেওয়া হয়; (ঙ) দক্ষিণে নেপলস ও সিসিলী বুরবোঁ রাজবংশের এক শাখাকে নায্য অধিকার নীতি অনুসারে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার ফলে ইতালীর রাজনৈতিক অস্তিত্ব লোপ পায়। মেটারনিখ বলেন যে "এখন থেকে ইতালী কেবলমাত্র একটি ভৌগোলিক নাম হিসাবে পরিচিত থাকবে।"

ক্ষতিপূরণ ছিল ভিয়েনা-সম্মেলনে গৃহীত দ্বিতীয় নীতি। এই নীতি অনুসারে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যে চারটি শক্তি দীর্ঘকাল যুদ্ধ করে, তারা ভৌগোলিক ক্ষতিপূরণ নেয়। অস্ট্রিয়া উত্তর ইতালীতে লম্বার্ডি ও ভেনেশিয়া এবং টাইরল, সালজবার্গ ও ইল্লিরিয়া ক্ষতিপূরণ হিসাবে পায়।

ক্ষতিপূরণ নীতির প্রয়োগ

প্রাশিয়া পায় স্যাক্সনীর $\frac{2}{3}$ অংশ, পোল্যান্ডের $\frac{2}{8}$ অংশ, পোমিরানিয়া প্রদেশ ও ওয়েস্টফ্যালিয়ার কিছু অংশ। রাশিয়া পায় ফিন্‌ল্যান্ড, পোল্যান্ডের $\frac{3}{8}$ অংশ ও বেসারাবিয়া প্রদেশ। ইংলন্ড পায় ইওরোপের বাইরে মাল্টা, আওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, হেলিগোল্যান্ড, ট্রিনিদাদ, মরিশাস, সিংহল, উত্তমাশা অন্তরীপ প্রভৃতি সামরিক ও বাণিজ্য ঘাঁটি। সুইডেন প্রাশিয়াকে পোমিরানিয়া প্রদেশ ছেড়ে দেওয়ার দরুন ক্ষতিপূরণ হিসাবে পায় নরওয়ে।

ভিয়েনা-সম্মেলনে শক্তিসাম্য নীতিই ছিল প্রধান। যাতে ফ্রান্স ভবিষ্যতে ইওরোপ আক্রমণ না করতে পারে এই উদ্দেশ্যে সন্ধি-কর্তারা ফ্রান্সের সীমানায় শক্তিশালী রাষ্ট্র স্থাপন করে শক্তি-সাম্য স্থাপন করেন। ফ্রান্সের উত্তর-পূর্বে বেলজিয়ামকে হল্যান্ডের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় এবং অরেঞ্জ রাজবংশের অধীনে নেদারল্যান্ড রাজ্য গড়া হয়। ফ্রান্সের পূর্ব-সীমায় রেনিশ প্রদেশ বা রাইন জেলাগুলিকে প্রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্বে তিনটি ক্যান্টন বা জেলাকে সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে জোড়া হয়। ফ্রান্সের দক্ষিণে স্যাভয় ও জেনোয়াকে পিডমন্টের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এইভাবে বাগানের চারদিকে বেড়ার মত ফ্রান্সের সীমানায় বেড়া দেওয়া হয়। তা ছাড়া নায্য অধিকার ও ক্ষতিপূরণনীতি প্রয়োগের সময়ও শক্তিসাম্য রক্ষা করা হয়।

শক্তি সাম্য-নীতির প্রয়োগ

ভিয়েনা-সন্ধির (১৮১৫ খ্রীঃ) প্রাক্‌কালে বৃহৎ শক্তিগুলি বহু উচ্চ আদর্শের কথা ঘোষণা করলেও কার্যতঃ তাঁরা অত্যন্ত স্বার্থপর ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসরণ করেন। নেপোলিয়নের

ব্যবস্থার পরিবর্তে এক উন্নততর ব্যবস্থা প্রবর্তনের আশ্বাস দিয়ে কার্যতঃ নায্য অধিকারের নামে পুরাতন রাজবংশগুলিকে ফিরিয়ে আনা হয়। সন্ধি-কর্তারা ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের জঠর হতে উদ্ভূত নবজাত ভাবধারা যথা গণতন্ত্রবাদ, উদারতন্ত্রবাদ ও জাতীয়তাবাদের অন্ধবিরোধী। তাঁরা এই ভাবধারাকে অস্বীকার করে ইতিহাসের বাতিল-করা আদর্শ, নায্য অধিকার, ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি প্রয়োগ করেন। জাতীয়তাবাদকে অগ্রাহ্য করে বেলজিয়ামকে হল্যান্ডের সঙ্গে, নরওয়েকে সুইডেনের সঙ্গে জুড়ে দেন। জার্মানীকে ৩৯টি রাজ্যে বিভক্ত করেন, ইতালীকে পাঁচ ভাগ করেন, পোল্যান্ডকে ব্যবচ্ছেদ করেন। ক্ষুদ্র জাতিগুলিকে দাবাখেলার ঘুঁটির মত ব্যবহার করেন। ইওরোপের সর্বত্র গণতন্ত্র ও উদারতন্ত্র দমন করে স্বৈরতন্ত্র স্থাপন করেন। নবজাত ভাবধারার প্রতি এই উপেক্ষা ছিল ঘোর অদূরদর্শিতা। ইতিহাসের স্রোতের বিরুদ্ধে তৈরী ভিয়েনা-সন্ধি এজন্যে বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই। ভিয়েনা-সন্ধি এজন্য শুধু প্রতিক্রিয়াশীল সন্ধি ছিল না। এই সন্ধির প্রধান ত্রুটি ছিল এর অস্থায়িত্ব। জুলাই বিপ্লব, ফেব্রুয়ারী বিপ্লব এবং ইতালী ও জার্মানীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এই সন্ধি তাসের ঘরের মতই ভেঙে পড়ে। তা ছাড়া এই সন্ধিরচনায় চার বৃহৎ শক্তি যথা— অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া ও ইংলন্ড প্রাধান্য স্থাপন করে। ক্ষুদ্র দেশগুলির বক্তব্য এই সম্মেলনে স্থান পায় নাই। আসলে ভিয়েনা-সন্ধির দ্বারা ফ্রান্সকে দুর্বল ও চতুর্দিকে বেষ্টন করার পর, চার বিজয়ী শক্তি ক্ষতিপূরণ-নীতির নামে রাজ্যগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন। ইওরোপে যাতে আর গণ্ডগোল না হয় এজন্য তাঁরা শক্তিসাম্য-নীতি ও নায্য অধিকার-নীতি প্রয়োগ করেন। কিন্তু ইওরোপীয় জাতিগুলির প্রতি ন্যায়বিচার করার কোন চেষ্টা তাঁরা করেন নাই।

ভিয়েনা চুক্তির ত্রুটিসমূহ

ডেভিড টমসন প্রভৃতি ঐতিহাসিক ভিয়েনা-চুক্তির স্বপক্ষে বলেন যে, "মোটামুটিভাবে ভিয়েনা-সন্ধি ছিল একটি যুক্তিযুক্ত রাষ্ট্রনীতিজ্ঞমূলক সন্ধি" (Reasonable and Statesmanlike Treaty)। ভিয়েনা-সন্ধি ইওরোপে অন্ততঃ ৪০ বছর স্থায়ী শান্তিস্থাপনে সক্ষম হয়। এই শান্তির ফলে সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, শিল্পকলায় সৃজনীশক্তির বিকাশ হয়। ইতিহাসে কোন সন্ধি চিরস্থায়ী হয় না। তা ছাড়া সন্ধি-কর্তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার অবকাশ বিশেষ ছিল না। নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধের সময় মিত্ররাষ্ট্রগুলি গোপন চুক্তির দ্বারা নিজেদের মধ্যে রাজ্যভাগের ব্যবস্থা করেছিল। সন্ধিরচনার সময় এই গোপন চুক্তিগুলিকে মান্য করতে হয়। ভিয়েনা-সন্ধির দ্বারা নবজাত ভাবধারাকে উপেক্ষা করা হয় সত্য। কিন্তু এই নবজাত ভাবধারা বিপ্লব, সন্ত্রাসের রক্তঝরা পথে জন্মলাভ করে। এই ভাবধারাকে তখন গ্রহণ করলে ইওরোপে বিপ্লব ও অশান্তি দেখা দিত। বিভিন্ন রাজশক্তিগুলি এই ভাবধারা স্বীকার করত না। পুরাতন রাজবংশগুলিকে গ্রহণ করায় ইওরোপে মোটামুটি শান্তি ফিরে আসে। ভিয়েনা-সন্ধি, ভার্সাই-সন্ধির মত কঠোর ছিল না। এই সন্ধির দ্বারা জার্মানীর মত ফ্রান্সকে ব্যবচ্ছেদ করা হয় নাই। এই সন্ধির আসল ত্রুটি ছিল যে, ফ্রান্সকে কোণঠাসা করা হয়। এজন্য ফ্রান্স এই শক্তিকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নাই। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন এজন্যে ভিয়েনা-চুক্তিকে ছেঁড়া কাগজে পরিণত করেন।

ভিয়েনা চুক্তির স্বপক্ষে যুক্তি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মেটারনিখ্ তন্ত্র (Metternich System) : অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স ক্লিমেন্স ফন মেটারনিখ্ (১৭৭৩-১৮৫৯ খ্রীঃ) ইওরোপের ইতিহাসে প্রিন্স মেটারনিখ্ নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং ভাষাতত্ত্ব ও আইনশাস্ত্রে পারদর্শিতা দেখান। ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ছাত্রাবস্থায় ফরাসী

বিপ্লব শুরু হয়। তখন থেকেই তাঁর চোখে ফরাসী বিপ্লব ছিল ঘোর অরাজকতা, নাশকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তখন থেকেই তিনি মনেপ্রাণে পুরাতনতন্ত্রকেই সমাজব্যবস্থার প্রকৃত ভিত্তি বলে ভাবতে আরম্ভ করেন। তিনি অস্ট্রিয়ার পররাষ্ট্রদপ্তরে যোগ দিয়ে ক্রমে ক্রমে অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর বা প্রধানমন্ত্রীর পদ পান। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন সুদর্শন, চারুবাক্, মার্জিতরুচি ও অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী। অনেকের মতে, তিনি ছিলেন ভয়ানক অহঙ্কারী ও ষড়যন্ত্রপরায়ণ। পররাষ্ট্রবিভাগে কাজ করার সময় তিনি অস্ট্রিয়ার সম্রাটকে বলেন যে, আপাততঃ নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে নতি স্বীকার করে অস্ট্রিয়ার নিজশক্তিকে সংহত করা দরকার। যথাসময়ে অস্ট্রিয়া নেপোলিয়নকে তীব্র আঘাত দ্বারা ধরাশায়ী করবে। রবার্ট এরগ্যাং নামক ঐতিহাসিকের মতে, মেটারনিখ চ্যান্সেলর বা প্রধানমন্ত্রী-পদে বসার পর এই নীতি অসীম ধৈর্যের সঙ্গে অনুসরণ করেন। ১৮১৪ খ্রীঃ লাইপজিগের যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয় হলে, মেটারনিখ্ নিজেকে "নেপোলিয়ন বিজেতা" রূপে ঘোষণা করেন। তবে কূটনীতিতে তাঁর যুগে তাঁর মত দক্ষ লোক ছিল বিরল। "মাছ যেমন ঘূর্ণিজলে অবলীলায় ঘোরাফেরা করে, তেমনই ভিয়েনা-সম্মেলনের কূটনৈতিক ঘূর্ণিজলে তিনি অক্লেশে সাঁতার কাটতেন।" তিনি ছিলেন "কূটনীতির বরপুত্র" (Prince of diplomacy)। মেটারনিখ্ তাঁর নীতি ও ব্যক্তিত্বকে তাঁর সমকালীন যুগের ইওরোপে এভাবে স্থাপন করেন যে ১৮১৫—১৮৪৮ খ্রীঃ "মেটারনিখের যুগ" (Age of Metternich) বলা হয়ে থাকে।

মেটারনিখের ব্যক্তিগত চরিত্র ও দক্ষতা

অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটারনিখ্ তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ ও রক্ষণশীল নীতির জন্যে বিখ্যাত। তিনি তাঁর এই মতবাদকে এমন পরিপাটি ও দক্ষভাবে প্রয়োগ করেন যে, এজন্যে এর নাম হয় মেটারনিখ্তন্ত্র বা মেটারনিখ্ প্রথা। মেটারনিখের মতবাদের কয়েকটি বিশেষ দিক ছিল। তিনি ফরাসী বিপ্লব হতে উপজাত নব ভাবধারা অর্থাৎ উদারতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি এই ভাবধারাগুলির সমালোচনা করে এই আদর্শগুলিকে "রাজনৈতিক মহামারী", "অরাজকতার দূত" প্রভৃতি আখ্যা দেন। বিপ্লবের আগে ইওরোপে যে স্বর্গীয় রাজতন্ত্র বা বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, ক্যাথলিক গীর্জার প্রাধান্য ছিল, তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্যে তিনি আজীবন সংগ্রাম চালান।

মেটারনিখের মতবাদ ও নবজাত ভাবধারার বিরোধিতা

মেটারনিখ্ তাঁর মতবাদের একটি ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দেন। প্রথমতঃ, তিনি বলেন যে, ফরাসী বিপ্লবের ফলে বুর্জোয়াশ্রেণীর উত্থান ঘটে। এই বুর্জোয়া মধ্যবিত্তরাই ছিল গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও উদারতন্ত্রের প্রচারক ও সমর্থক। কিন্তু মেটারনিখের মতে, বুর্জোয়াদের আসল লক্ষ্য ছিল অভিজাতদের হটিয়ে ক্ষমতা দখল করা এবং নিজশ্রেণীর স্বার্থে তা ব্যবহার করা। সুতরাং তিনি নবোদিত ভাবধারা যাকে আশ্রয় করে বুর্জোয়াশ্রেণী অভিজাতদের ক্ষমতাচ্যুত করতে চায়, তাকে অশুভ শক্তি বলে মনে করতেন।[1] মেটারনিখ্ বিশ্বাস করতেন যে, অভিজাতরাই একমাত্র সমাজে শক্তিসাম্য ও স্থিতি রক্ষা করতে সক্ষম। কারণ তারা উপরে শাসক রাজবংশ ও নিচে জনসাধারণের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী সেতুবিশেষ। অভিজাতরা দেশের জন্যে স্বার্থত্যাগে সক্ষম। নবোদিত বুর্জোয়াশ্রেণী স্বার্থপর ও ক্ষমতালোভী। তাঁরা সমাজকে শান্তি ও স্থিতি দিতে পারবে না।

বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতি ঘৃণা; অবিচ্ছিন্নতাবাদ; দমননীতি; আন্তর্জাতিক রক্ষণশীলতা

1. Jack Droz.

দ্বিতীয়তঃ, মেটারনিখ্ এজন্যেই ভিয়েনা-সন্ধির দ্বারা প্রাক্-বিপ্লব যুগের রাজবংশগুলি ও তাদের শাসনব্যবস্থাকে ন্যায্য অধিকারবাদ নামে ফিরিয়ে আনেন। তৃতীয়তঃ, তিনি এই ব্যবস্থা যাতে স্থায়ী হয় এজন্যে সকল প্রকার সংস্কার ও পরিবর্তন-নীতির ঘোর বিরোধিতা করেন। তিনি ইওরোপের রাজাদের পরামর্শ দেন "রাজত্ব করুন, পরিবর্তন বা সংস্কার স্বীকার করবেন না।" (Govern and change nothing)। এজন্যে তিনি দমননীতির দ্বারা বৈপ্লবিক ভাবধারা ও আন্দোলনকে উচ্ছেদ করার নীতি নেন। মেটারনিখের এই নীতিকে ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন "স্থিতাবস্থাবাদ" বা "অনবচ্ছেদবাদ" বলেছেন। চতুর্থতঃ, মেটারনিখের রক্ষণশীলতার মূলে ছিল তাঁর নিজরাজ্য অস্ট্রিয়াকে রক্ষা করার প্রয়াস। অস্ট্রিয়ার হ্যাপস্‌বার্গ বংশের সাম্রাজ্যে ছিল বহু জাতি ও বহু ভাষাভাষী গোষ্ঠীর অধিবাসী। যদি নবজাত গণতন্ত্রবাদ ও জাতীয়তাবাদ এই সাম্রাজ্যে প্রভাববিস্তারে সক্ষম হত, তাহলে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলত। সাম্রাজ্যের ঐক্য ভেঙে পড়ত। পঞ্চমতঃ, তিনি লক্ষ্য করেন যে, নবজাত ভাবধারার আবেদন অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর। মড়ক যেমন গৃহ হতে গৃহে ছড়িয়ে পড়ে, মেটারনিখের মতে নবজাত ভাবধারা রাজনৈতিক মহামারীর মতই ইওরোপের এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ছিল। সুতরাং কেবলমাত্র অস্ট্রিয়ার রক্ষণশীল নীতি অনুসরণ করে আত্মরক্ষা করা সম্ভবপর ছিল না। এজন্যে মেটারনিখ্ আন্তর্জাতিক রক্ষণশীলতা ও স্থিতাবস্থা-নীতিকে কায়েম করার চেষ্টা করেন।

মেটারনিখ্ তাঁর নীতির ব্যবহারিক প্রয়োগ অস্ট্রিয়া ও জার্মানীতে বিশেষভাবে করতে সক্ষম হন। তিনি অস্ট্রিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নবজাত ভাবধারার অনুপ্রবেশ রোধ করার জন্যে উদারপন্থী ছাত্র, অধ্যাপকদের কারারুদ্ধ করেন। ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও দর্শনের পঠন-পাঠন নিষিদ্ধ করা হয়। কারণ এই সকল বিষয় পড়লে ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীন যুক্তিবাদী চিন্তা গড়ে উঠত। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ক্যাথলিক গীর্জার আধিপত্য স্থাপন করা হয়। বিশেষ অনুমতি ছাড়া বিদেশী পুস্তক, পত্রিকার ও বিদেশী অধ্যাপকদের অস্ট্রিয়ায় অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ হয়।

অস্ট্রিয়া ও জার্মানীতে মেটারনিখ্ তন্ত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগ

ছাত্র-অধ্যাপকের গতিবিধির উপর গোয়েন্দা দ্বারা নজর রাখা হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীন মতামত প্রকাশ বন্ধ করা হয়। শিল্প, কলা, শিক্ষা সকল কিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ঐতিহাসিক কার্লটন হেইজের (Hayes) মতে, "কেবলমাত্র সঙ্গীতের উপর মেটারনিখ্ নিয়ন্ত্রণ খাটাতে পারেন নাই।" মেটারনিখ্ অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোকের মধ্যে ভেদনীতি খাটান এবং অস্ট্রিয়ার শাসক জার্মানজাতির আধিপত্য দৃঢ় করেন। অস্ট্রিয়াতে তিনি শিল্প-বিপ্লবের অগ্রগতি সমর্থন করেন নাই। কারণ তার ফলে বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রভাব বাড়ত। জার্মানীর বুন্ড বা রাষ্ট্রসংঘের সভাপতি হিসাবে অস্ট্রিয়ার পদকে ব্যবহার করে তিনি জার্মানীতে তাঁর রক্ষণশীল নীতি কায়েম করেন। তিনি জার্মান জাতীয়তাবাদ ও ছাত্র-আন্দোলনকে দমনের জন্যে জার্মানীর শাসকদের কার্লস্‌বাডের ডিক্রী বা হুকুমনামা প্রয়োগে বাধ্য করেন। এই ডিক্রীর ফলে জার্মানীর উদারপন্থী ছাত্র ও অধ্যাপকদের নিগ্রহ করা হয়। বারশেনশাফট প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী ছাত্রসংগঠনগুলিকে নিষিদ্ধ করা হয়। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়। রাজনৈতিক দলগুলিকে নিষিদ্ধ করা হয়। মেইনজ নগরে দমননীতি পরিচালনার জন্যে একটি দপ্তর স্থাপিত হয়। জার্মানীর সংবিধানের ১৩নং ধারাকে মুলতুবী করা হয়।

মেটারনিখ্ ইওরোপে ভিয়েনা-চুক্তির দ্বারা তাঁর রক্ষণশীল নীতিকে কায়েম করেন। ন্যায্য অধিকারবাদ দ্বারা তিনি পুরাতনতন্ত্র ও অবিচ্ছিন্নতাবাদকে বলবৎ করেন। তিনি ইওরোপীয়

ইওরোপীয় নীতি

শক্তি-সমবায়ের সাহায্যে তাঁর রক্ষণশীল নীতিকে বজায় রাখেন এবং বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখা দিলে তা শক্তি-সমবায়ের দ্বারা দমন করেন। তিনি

শক্তি-সমবায়ের ট্রপোর বৈঠকে (১৮২০ খ্রীঃ) ট্রপোর ঘোষণাপত্র নামে এক দলিল পাস করিয়ে নেন। এই দলিলে বলা হয় যে, প্রজাদের সরকার পরিবর্তনের অধিকার নেই। কোন দেশে বিপ্লব ঘটলে শক্তি-সমবায় সেই দেশে হস্তক্ষেপ করে বিপ্লব দমন করবে এবং স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনবে। এই প্রতিক্রিয়াশীল আইনের বিরুদ্ধে ইংলন্ডের প্রতিবাদ তিনি অগ্রাহ্য করেন। ট্রপোর ঘোষণাপত্র অনুসারে অস্ট্রিয়ার সেনাদল দক্ষিণ ইতালীর নেপল্‌স ও মধ্য ইতালীর পিডমন্টের প্রজা-বিক্ষোভ দমন করে। শক্তি-সমবায়ের নির্দেশে ফরাসী সেনাদল স্পেনের উদারপন্থী বিদ্রোহ দমন করে। স্পেনে শক্তি-সমবায়ের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ইংলন্ড শক্তি-সমবায়ের সদস্যপদ ত্যাগ করে। এতে মেটারনিখ্ বিচলিত হন নাই। এইভাবে মেটারনিখ্ ইওরোপে রক্ষণশীলতা কায়েম করেন এবং প্রায় এক প্রজন্মের জন্যে ইওরোপের রাজনৈতিক অগ্রগতি রোধ করেন। মেটারনিখ্ অতঃপর ইওরোপের বাইরে আমেরিকাতেও পুরাতনতন্ত্র কায়েম করার চেষ্টা করেন। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে স্পেনের দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলি একতরফাভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এখন মেটারনিখ্ উদ্যোগ নেন যে, ন্যায্য অধিকার নীতি ও ট্রপোর ঘোষণাপত্র অনুযায়ী তিনি স্পেনের বিদ্রোহী উপনিবেশগুলিকে আবার স্পেনের হাতে ফিরিয়ে দিবেন। এজন্য শক্তি-সমবায় দক্ষিণ আমেরিকায় হস্তক্ষেপ করবে। এর জবাবে ইংলন্ড আটলান্টিক মহাসমুদ্রের পথে শক্তি-সমবায় নৌবহরকে রোখার জন্যে ব্রিটিশ বহরকে আদেশ দেয়। মার্কিন রাষ্ট্রপতি মনরো তাঁর মনরো-নীতি ঘোষণা করে ইওরোপের শক্তিগুলিকে সতর্ক করে বলেন যে—(১) "আমেরিকা কেবলমাত্র আমেরিকাবাসীদের জন্যে, এখানে ইওরোপের হস্তক্ষেপ সহ্য করা হবে না।"(২) আমেরিকা ইওরোপে হস্তক্ষেপ করতে চায় না। এই প্রবল বাধার সম্মুখে মেটারনিখের হস্তক্ষেপ নীতি বিফল হয়। শক্তি-সমবায় ভেঙ্গে যায়। মেটারনিখ্ ছিলেন, বাক্-বৈদগ্ধের অধিকারী। তিনি ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যানিংকেই তাঁর হস্তক্ষেপ-নীতির বিফলতার জন্যে দায়ী করেন। তিনি বলেন যে, "ক্যানিং হলেন এক ক্ষতিকারক উল্কাপিণ্ড, যাঁকে দুর্দান্তদৈব ইওরোপের আকাশে নিক্ষেপ করেছে।" এরপর মেটারনিখ্-তন্ত্রের পতন হতে থাকে। ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই-বিপ্লব ও ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী-বিপ্লবের আঘাতে মেটারনিখ-তন্ত্র ভেঙ্গে পড়ে। অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে ১৮৪৮-এর বিপ্লব ছড়িয়ে পড়লে, মেটারনিখ্-তন্ত্রের পতন ঘটে। মেটারনিখ্ ইংলন্ডে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নেন। তথাপি গর্বিত মেটারনিখ্ তাঁর মত বদলান নি। তিনি বলেন, "হয় আমি অনেক আগে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি, অথবা অনেক পরে জন্মগ্রহণ করেছি।" (মেটারনিখ-তন্ত্রের পতন পরে সপ্তম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।)

মেটারনিখ্-তন্ত্রের সমর্থনে বলা হয় যে, ফরাসী বিপ্লবের সময় ইওরোপে যে অরাজকতা এবং নেপোলিয়নের যুগে যে যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখা দেয়, মেটারনিখের স্থিতাবস্থা নীতি তার হাত থেকে ইওরোপকে রক্ষা করে অন্ততঃ ৩০ বছরের জন্যে শান্তি ও স্থিতি দেয়। এই শান্তির ফলে সাহিত্য, শিল্পের উন্নতি হয়। তা ছাড়া মেটারনিখ্ ছিলেন অস্ট্রিয়ার মন্ত্রী। বহু জাতি ও ভাষা-ভাষী অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে ঐক্যরক্ষার জন্যে তিনি রক্ষণশীল নীতি নেন। নতুবা অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যেত। অস্ট্রিয়ার মন্ত্রী হিসাবে অস্ট্রিয়ার স্বার্থরক্ষা ছিল তাঁর কর্তব্য। ঐতিহাসিক গর্ডন ক্রেইগের মতে, রক্ষণশীল নীতির জন্যে মেটারনিখ্ প্রকৃতপক্ষে দায়ী ছিলেন না। তাঁর প্রভু সম্রাট ফ্রান্সিস যোসেফ ছিলেন ভয়ানক রক্ষণশীল এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কাউন্ট কোলেরার্টও ছিলেন রক্ষণশীল। এদের চাপেই মেটারনিখ্ রক্ষণশীল নীতি নিতে বাধ্য হন।

মেটারনিখ্‌তন্ত্রের পক্ষে যুক্তি

মেটারনিখের পক্ষে উপরের সকল যুক্তি মেনে নেওয়া যায় না। প্রথমতঃ, তিনি অস্ট্রিয়ার

সম্রাট ফ্রান্সিস যোসেফের স্বার্থে রক্ষণশীল নীতি নেন। সম্রাট ফ্রান্সিস যোসেফের স্বার্থ ও অষ্ট্রিয়ার স্বার্থ এক ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, মেটারনিখ্ ছিলেন পুরাতন-পন্থী। তিনি যুগধর্মকে স্বীকার করেন নাই। ইতিহাসের স্রোতের বিরুদ্ধে তিনি যাওয়ার চেষ্টা করেন। এই কাজ ছিল নিছক প্রতিক্রিয়াশীলতা। জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র যে নূতন প্রগতিশীল ঐতিহাসিক শক্তি, তার তাৎপর্য মেটারনিখ উপলব্ধি করেন নি। তৃতীয়তঃ, তাঁর নীতি ছিল দমনমূলক, গঠনমূলক ছিল না। তিনি ভুলে যান, "তিনি বার্ধক্যদশাগ্রস্ত হলেও পৃথিবী প্রতিদিন নব-যৌবন লাভ করছিল। তিনি প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার পরেও তাঁর নীতি চালু রেখে ভুল করেন।"

মেটারনিখের বিপক্ষ যুক্তি; মেটারনিখতন্ত্রের দুর্বলতা

[খ] তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ১৮২০ খ্রীঃ বিদ্রোহ ঃ ল্যাটিন আমেরিকা (The Revolution of 1820 : Latin America) ঃ ভিয়েনা-চুক্তির দ্বারা ইওরোপে ন্যায্য অধিকারবাদ অনুযায়ী পুরাতন রাজবংশগুলিকে বিভিন্ন দেশে স্থাপন করা হয়। কিন্তু এই সকল রাজাদের স্বৈরশাসন ছিল জনগণের কাছে অসহনীয়। যে সকল দেশে নেপোলিয়নের হস্তক্ষেপ ঘটে, সেই সকল দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রখর রাজনৈতিক চেতনা, জাতীয়তাবাদ ও উদারতান্ত্রিক শাসনের প্রতি অনুরক্তি দেখা দেয়। দুষ্ট ঘোড়া যেমন তার সওয়ারকে পিঠ থেকে ফেলে দিতে চেষ্টা করে, এই সকল দেশের প্রজারা হয় এই রাজাদের বিতাড়িত করার চেষ্টা করে অথবা সংবিধান প্রবর্তন করে পার্লামেন্টের হাতে ক্ষমতা দিতে বাধ্য করে।

ইওরোপীয় শক্তিসমবায়ের বৈঠক ১৮২০ খ্রীঃ যখন ট্রপোতে চলছিল তখন শক্তিবর্গ খবর পান যে, স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে বুরবোঁবংশীয় রাজা ফার্দিনান্দকে স্পেনের নেতারা ১৮১২ খ্রীঃ উদারতান্ত্রিক সংবিধান পুনরায় চালু করতে বাধ্য করেছেন। জার প্রথম আলেকজান্ডার স্পেন থেকে ইওরোপে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ার আতঙ্কে স্পেনে সেনা পাঠাবার জন্যে প্রস্তাব দেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কাসল্‌রি এই হস্তক্ষেপ প্রস্তাবের সমালোচনা করে বলেন যে, স্পেনের বিপ্লব স্পেনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। তিনি শক্তিবর্গকে তাঁদের "সাধারণ জ্ঞান ও বিচারের সীমা লঙ্ঘন না করতে পরামর্শ দেন।" তিনি বলেন যে, স্বৈরাচারী রাজার কুশাসনের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহ করার ন্যায্য অধিকার আছে। শক্তি-সমবায় তা কেড়ে নিতে পারে না। ইংলন্ডের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে ট্রপোর সম্মেলনে শক্তিসমবায়ের সদস্যরা স্থির করেন যে,—ইওরোপের কোন দেশে প্রজাদের দ্বারা রাজার ক্ষমতা সঙ্কুচিত হলে শক্তি-সমবায় হস্তক্ষেপ করবে।

স্পেনের বিদ্রোহ ঃ ট্রপোর ঘোষণাপত্র

ইতিমধ্যে জানা যায় যে, দক্ষিণ ইতালীর নেপল্‌সের বুরবোঁবংশীয় রাজা, ফার্দিনান্দকে প্রজারা স্পেনের সংবিধানের অনুরূপ সংবিধান প্রবর্তনে বাধ্য করেছে। নেপল্‌স থেকে এই উদারতান্ত্রিক বিপ্লব পিডমন্টে ছড়িয়ে পড়ে। ট্রপোর ঘোষণাপত্র অনুসারে মেটারনিখ্ অষ্ট্রিয়ার ১২ হাজার সেনা ইতালীর বিদ্রোহ দমনেপাঠান। এই সেনাদল নেপল্‌সের বিপ্লব দমন করে ফার্দিনান্দের স্বৈর-ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। পিডমন্টেও স্যাভয় রাজবংশের স্বৈর-শাসন পুনঃ-স্থাপিত হয়।

ইতালীর বিদ্রোহ ও অষ্ট্রিয়ার দমননীতি

এরপর শক্তি-সমবায়ের দৃষ্টি স্পেনের উপর পড়ে। স্পেন থেকে বিপ্লবের অগ্নিশিখা প্রতিবেশী পর্তুগালে স্পর্শ করেছিল। পর্তুগালের রাজবংশ নেপোলিয়নের আক্রমণের সময় থেকে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলে বাস করতেন। মার্শাল বেরেস ফোর্ড নামে জনৈক ইংরাজ

সেনাপতি কার্যতঃ পর্তুগালের রাজার নামে দেশ শাসন করায়, পর্তুগীজ অভিজাত ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ক্ষোভ দেখা দেয়। পর্তুগীজ বিপ্লবীরা কার্যকরী সরকারের কাছ থেকে স্পেনের সংবিধানের অনুকরণে একটি সংবিধান প্রবর্তন এবং রাজাকে দেশে ফিরিয়ে আনতে অঙ্গীকার আদায় করে। একটি এককক্ষ-বিশিষ্ট পার্লামেন্ট গড়া হয়। রাজা ষষ্ঠ জন দেশে ফেরেন। স্পেন ও পর্তুগালের এই উদারপন্থী বিপ্লবদমনে শক্তি-সমবায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফ্রান্সকে স্পেন ও পর্তুগালের বিপ্লবদমনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ফ্রান্স এই দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করে ; স্পেনে স্বৈরতন্ত্র ফিরিয়ে আনে এবং সংবিধান রদ করে।

পর্তুগালের বিদ্রোহ ও ফ্রান্সের হস্তক্ষেপ

এদিকে স্পেনীয় আমেরিকান বা ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদী ঢেউ আঘাত করে। নেপোলিয়ন যখন স্পেন অধিকার করেন, সেই সময় স্পেনের দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলি বা ল্যাটিন উপনিবেশগুলি মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। এখন স্পেনের সিংহাসনে তার ন্যায্য অধিকারবাদী বৈধ রাজবংশ ফিরে এলে, স্পেনরাজ ফার্দিনান্দ শক্তি-সমবায়কে তাঁর বিদ্রোহী ল্যাটিন উপনিবেশগুলি ফিরিয়ে দিতে আবেদন জানান। এদিকে পর্তুগালের সিংহাসনে রাজা ষষ্ঠ জন ফিরে এলেও তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ওম পেড্রো ব্রাজিলে থেকে যান। তাঁর নেতৃত্বে ব্রাজিল স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং রাজা জন এই স্বাধীনতা মেনে নিতে বাধ্য হন। ফলে গোটা ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি স্পেন-পর্তুগালের হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। ন্যায্য অধিকারবাদী মেটারনিখ্ শক্তি-সমবায়ের নেতৃত্বে বেপরোয়া বিপ্লবী, জাতীয়তাবাদী উপনিবেশগুলিকে মাতৃরাষ্ট্রের জঠরে ফিরিয়ে আনার প্রস্তুতি চালান।

ল্যাটিন আমেরিকার বিদ্রোহ

ইতিমধ্যে ইংলন্ডের বিদেশদপ্তরে ক্যানিং নামে এক নূতন মন্ত্রী দায়িত্ব নেন। তিনি ল্যাটিন আমেরিকার উপনিবেশগুলিতে শক্তি-সমবায়ের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেন। ইংলন্ডের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করায় ক্যানিং মেটারনিখ্ ও শক্তি-সমবায়ের অন্য সদস্যদের সমুচিত শিক্ষা দিতে মনস্থ করেন। স্পেনীয় উপনিবেশগুলির সঙ্গে ইতিমধ্যে ইংলন্ড তার বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। ব্রিটিশ নৌবহর আটলান্টিক মহাসমুদ্রে শক্তি-সমবায়ের সেনাদের আমেরিকাযাত্রার পথ আটকে দাঁড়ায়। মার্কিন রাষ্ট্রপতি জেম্‌স মন্‌রোকে শক্তি-সমবায়ের পরিকল্পিত হস্তক্ষেপে বাধাদানের জন্যে ক্যানিং পরামর্শ দেন। ফলে মন্‌রো ১৮২৩ খ্রীঃ তাঁর বিখ্যাত মন্‌রো-নীতি (Monroe Doctrine) ঘোষণা করে শক্তি-সমবায়কে নিরস্ত করেন। মন্‌রো-নীতির দ্বারা বলা হয় যে, "আমেরিকা আমেরিকাবাসীদের জন্যে; আমেরিকায় বাইরের হস্তক্ষেপ (ইওরোপের) চলবে না।" ব্রিটেন ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির স্বাধীনতাকেও স্বীকৃতি দান করে। ফলে ১৮৩০ খ্রীঃ নাগাদ মেক্সিকো, কলম্বিয়া, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি ল্যাটিন আমেরিকান রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। ক্যানিং আত্মপ্রসাদের সঙ্গে বলেন যে, "পুরাতন পৃথিবীর (ইওরোপের) সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষার জন্যেই আমি এক নূতন পৃথিবীকে স্বীকৃতি দিলাম।"

ইংলন্ডের ল্যাটিন আমেরিকার স্বাধীনতা সমর্থন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : গ্রীসের স্বাধীনতার যুদ্ধ, ১৮২৭—১৮২৯ খ্রীঃ (Greek War of Independence) : গ্রীস ছিল ইওরোপের প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি। প্রাচীন এথেন্স, স্পার্টা প্রভৃতি নগরীতে গণতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র প্রভৃতি রাজনৈতিক ভাবধারার বিকাশ ঘটে। প্রাচীন গ্রীসের দর্শন, বিজ্ঞান ইওরোপীয় সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে। কিন্তু পরের যুগে গ্রীস তার স্বাধীনতা হারায় এবং ষোড়শ শতক থেকে ইসলামীয় শক্তি তুরস্কের অধীনে থেকে গ্রীস

তার আপন সভ্যতা ও সত্তা ভুলে যায়। অষ্টাদশ শতকে গ্রীক সাহিত্য ও শিল্পের নূতন করে জাগরণ ঘটে। এই রেনেসাঁসের ফলে মৃতপ্রায় গ্রীক জাতীয়তাবাদী ভাবধারা বলকান উপদ্বীপ তথা গ্রীসের শুষ্ক-প্রায় কঙ্কালে নবজীবনের সঞ্চার করে। গ্রীসে তার প্রভাব তীব্র ছিল। গ্রীক জনসাধারণ ছিল আর্থোডক্স গীর্জা নামে এক খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। গ্রীকজাতির সঙ্গে তাদের প্রভু তুর্কীজাতির বহু পার্থক্য থাকায় গ্রীক জাতীয়তাবাদীরা তুরস্কের হাত থেকে গ্রীসদেশের মুক্তিকামনা করে। গ্রীকদের ছিল প্রাচীন সভ্যতা, উন্নত গ্রীকভাষা। তারা ছিল শ্বেতাঙ্গ। অপরদিকে শাসক তুর্কীরা ছিল মুসলিম ধর্মাবলম্বী, এশিয়ার লোক ও কৃষ্ণাঙ্গ। এজন্য গ্রীকজাতি তুর্কী-প্রভুদের আধিপত্য থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে চঞ্চল হয়। ফিলকে হেটোইরিয়া নামে এক গুপ্তসমিতি গ্রীকজাতির স্বাধীনতা-আন্দোলনকে সংগঠন করে।

গ্রীসের বিদ্রোহের কারণ

১৮২১ খ্রীঃ আলেকজান্ডার হিপসিল্যান্টি নামে এক গ্রীক নেতা, যিনি ছিলেন মোলদাভিয়ার শাসনকর্তা, তিনি প্রথম তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তোলেন। রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডার গ্রীকজাতির স্বাধীনতালাভের পক্ষে সমর্থক হলেও, ব্রিটেন ও অস্ট্রিয়ার চাপে নিষ্ক্রিয় থাকেন। ফলে মোলদাভিয়ার গ্রীক বিদ্রোহ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তুর্কী-সেনা তা দমিয়ে দেয়।

মোলদাভিয়ার বিদ্রোহ

এর পর গ্রীসের মোরিয়া প্রদেশে তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে। ক্রমে তা সারা গ্রীসে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রীক বিদ্রোহীরা কিছু তুর্কী মুসলমানকে হত্যা করলে, তুর্কী সুলতান গ্রীক প্রজাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। তিনি তাঁর সামন্ত-সেনাপতি মিশরের পাশা মহম্মদ আলির পুত্র ইব্রাহিম আলির আধুনিক সেনাদলের সাহায্যে গ্রীকদের হত্যা, গ্রীক ধর্মগুরু প্যাট্রিয়ার্ককে হত্যা এবং গ্রীক নারীদের ক্রীতদাসীতে পরিণত করতে থাকেন। গ্রীসে প্রচুর খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের প্রাণহানিতে ইওরোপের জনমত বিক্ষুব্ধ হয়। ইওরোপের নানা দেশ থেকে স্বেচ্ছা-সেনারা এসে গ্রীকদের হয়ে যুদ্ধে যোগ দেন।

মোরিয়ার বিদ্রোহ ও তুরস্কের দমননীতি

রুশ-জার প্রথম নিকোলাস গ্রীসের অনুকূলে তুরস্কের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপে বদ্ধপরিকর হন। আসলে রুশ-জার গ্রীসদেশ সহ বল্‌কানের দেশগুলি থেকে তুর্কীদের হটিয়ে, সেই স্থানে রুশ-আধিপত্যবিস্তারের ইচ্ছা পোষণ করতেন। গ্রীকজাতি যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, রাশিয়ানরাও সেই সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টান ছিল। গ্রীসের স্বধর্মাবলম্বীদের রক্ষার অজুহাতে রাশিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রীসে সেনা পাঠাতে চায়। রাশিয়াকে একক হস্তক্ষেপের সুযোগ না দিয়ে ইংরাজ ও ফরাসী নৌ, স্থল-সেনা রুশ-সেনার সঙ্গে যোগ দিয়ে নাভারিনোর নৌযুদ্ধে মহম্মদ আলি ও তুর্কী সুলতানের বহরকে ধ্বংস করে। এরপর ইংলন্ড তার নৌবহর প্রত্যাহার করলেও, রুশ-সেনাদল যুদ্ধ চালিয়ে যায় এবং তুরস্ককে এড্রিয়ানোপলের (Adrianople) সন্ধি, ১৮২৯ খ্রীঃ স্বাক্ষরে বাধ্য করে। এই সন্ধির দ্বারা রাশিয়ার রক্ষণাধীনে গ্রীস স্বাধীনতা পায়। দার্দানালিস প্রণালীতে রুশ-জাহাজ চলাচলের অধিকার এবং মোলদাভিয়া রুশ-আশ্রিত রাজ্য হিসাবে স্বীকৃত হয়। রাশিয়ার ক্ষমতাবৃদ্ধিতে ইংলন্ড, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি এড্রিয়ানোপলের সন্ধি পরিবর্তনের জন্যে চাপ দেয়। শেষ পর্যন্ত লন্ডনের সন্ধির দ্বারা গ্রীস স্বাধীনতা লাভ করে। ব্যাভেরিয়ার রাজবংশের প্রথম অটো (Otto I) গ্রীসের রাজা হন। গ্রীসের জাতীয়তাবাদ জয়যুক্ত হয়। গ্রীসের স্বাধীনতালাভের দৃষ্টান্তে বল্‌কানের অন্য রাজ্যে তুরস্কের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-আন্দোলন প্রবল হয়।

এড্রিয়ানোপলের সন্ধি : গ্রীসের স্বাধীনতা লাভ

[গ] পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লব ও ইওরোপে তার প্রভাব (The July Revolution of 1830) ঃ নেপোলিয়নের পতনের পর প্যারিসের দ্বিতীয় সন্ধি অনুসারে ১৮১৪ খ্রীঃ ফ্রান্সের সিংহাসনে বুরবোঁবংশের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। অষ্টাদশ লুই এই সন্ধি অনুসারে ফ্রান্সের সিংহাসনে ১৮১৪—১৮২৪ খ্রীঃ পর্যন্ত বসেন। ১৮২৪ খ্রীঃ অষ্টাদশ লুইয়ের মৃত্যু হলে তাঁর ভ্রাতা দশম চার্লস ১৮২৪—১৮৩০ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লবে ফ্রান্সে দ্বিতীয় বুরবোঁবংশের পতন হয়। দশম চার্লস পদত্যাগ করে ইংলন্ডে আশ্রয় নেন।

ফ্রান্সের সমকালীন ইতিহাসের মধ্যেই জুলাই বিপ্লবের বীজ লুকিয়ে ছিল। ফরাসী বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তনের স্রোত দেখা যায়। হ্যাজেনের মতে "ফ্রান্সের মত অপর কোন দেশে এত ব্যাপক ও আমূল পরিবর্তন দেখা যায় নাই।" ১৮১৫ খ্রীঃ পর ফ্রান্সের সমাজব্যবস্থায় অবিচ্ছিন্নতাবাদ বনাম পরিবর্তনবাদের মধ্যে তীব্র সংঘাত দেখা দেয়। এক শ্রেণী ফরাসী অভিজাত যারা বিপ্লবের সময় দেশত্যাগ করেছিল, তারা বুরবোঁ-শাসন পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হলে ফিরে আসে। তারা বিপ্লবের সময় তাদের যে সকল ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হয় এবং তাদের যে খেতাব ও বিশেষ অধিকারগুলি লোপ করা হয়, তা পুনরুদ্ধার করার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করে। তা ছাড়া তারা বিপ্লবের আমলের ভূমি ও সমাজব্যবস্থা ধ্বংস করে পুরাতনতন্ত্র ও রাজকীয় স্বৈরতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে চায়। তারা ছিল অবিচ্ছিন্নতাবাদী, উগ্ররক্ষণশীল। তারা ফরাসী বিপ্লবকে একটি দুর্ঘটনা মনে করত। এই বিপ্লব ও তার ফলে যে পরিবর্তন ঘটে, তা নস্যাৎ করার সঙ্কল্প তারা নেয়। তারা উগ্র রাজতন্ত্রী দল (Ultra Royalist Party) গড়ে রাজভ্রাতা ডিউক অব্ অটোইসের নেতৃত্বে শ্বেত-সন্ত্রাস বা White Terror চালায়। এই দলের বিপরীত মেরুতে ছিল উদারতন্ত্রী দল ও তাদের সমর্থক প্রজাতন্ত্রী দল। তারা ছিল পরিবর্তনবাদী শ্রেণী। বিপ্লবের যুগের মূল্যবান পরিবর্তনগুলিকে রক্ষা করতে এই গোষ্ঠী বদ্ধপরিকর ছিল। এই পরিবর্তনবাদীদের নেতৃত্বে ছিল ফরাসী বুর্জোয়াশ্রেণী। ১৭৮৯ খ্রীঃ ফরাসী বিপ্লবের সময় এই শ্রেণী শাসনক্ষমতা দখল করলেও তা স্থায়ী হয় নি। নেপোলিয়নের উত্থান-পতনের ফলে ফরাসী বুর্জোয়াশ্রেণীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা অপরিতৃপ্ত থাকে। ১৮১৫ খ্রীঃ পর ফ্রান্সে বুরবোঁ-শাসন ফিরে এলে বুর্জোয়াশ্রেণী দাবি করে যে, বিপ্লবের মূল্যবান সংস্কারগুলি, যথা 'কোড নেপোলিয়ন' আইনের সাম্য, ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রভৃতি এবং বিপ্লবের সামাজিক সাম্য, ভূমিব্যবস্থা রক্ষা করা হোক। উগ্র রাজতন্ত্রী দল এই দাবির তীব্র বিরোধিতা করে। তারা পুরাতনতন্ত্র অর্থাৎ সামন্ততন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র এবং গীর্জাতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নেয়। এই দুই গোষ্ঠীর সংঘাত ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবকে অনিবার্য করে।

অবিচ্ছিন্নতাবাদ-বনাম পরিবর্তনবাদের বিরোধ

নূতন রাজা অষ্টাদশ লুই ছিলেন অভিজ্ঞ লোক। তিনি বুঝেন যে, বিপ্লবের যুগের কিছু কিছু অনিবার্য পরিবর্তন মেনে না নিলে তাঁর সিংহাসন বুর্জোয়া-বিরোধিতার ফলে উড়ে যেতে পারে। সুতরাং তিনি ঘোষণা করেন যে, "জনবিরোধী নীতি নিয়ে আমি আর ভ্রমণকারী জীবনে ফিরে যেতে চাই না। আমি এখন অনুভব করি যে, সিংহাসন সর্বাপেক্ষা আরামপ্রদ কোমলতর আসন। তা আমি হারাতে চাই না।" তিনি একটি মধ্যপন্থা নীতি নেন এবং একাধারে সংবিধানপন্থী

বুর্জোয়াদের এবং রাজতন্ত্রী অভিজাতদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেন। তিনি ১৮১৪ খ্রীঃ একটি চার্টার বা সনদ বা ক্ষুদ্র সংবিধান দান করেন। এই সংবিধানে, (ক) আইনের চক্ষে সমান মর্যাদা, (খ) সরকারী পদলাভে সকল নাগরিকের সমান অধিকার, (গ) বিনা বিচারে গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা রদ, (ঘ) সম্পত্তির অধিকারের পবিত্রতা প্রভৃতি অধিকার দান করা হয়। তিনি বিপ্লবের যুগের ভূমিবণ্টন প্রথাকেও মোটামুটি মেনে নেন। কারণ তিনি বুঝেন যে, এই ব্যবস্থার আর পরিবর্তন করা খুব কঠিন। এছাড়া দুই কক্ষযুক্ত আইনসভা প্রবর্তন এবং রাজা সংবিধান মেনে চলার শপথ নেন। তবে সংবিধানের ১৪নং ধারায় রাজাকে বিশেষ অধিকার বলে সংবিধান রদ করা ও পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়। এইভাবে তিনি উদারপন্থী ও রাজতন্ত্রী উভয় গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেন।

অষ্টাদশ লুইয়ের সংবিধান দান : কিন্তু উগ্রপন্থী সন্তুষ্ট করার প্রয়াস

কিছুদিনের মধ্যে অষ্টাদশ লুইয়ের মধ্যপন্থা নীতিতে ভাঁটা পড়ে এবং উগ্র রাজতন্ত্রীদের ক্ষমতা বাড়তে থাকায় ফ্রান্স বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যায়। ঐতিহাসিক কোবানের মতে, মধ্যপন্থাকে সফল করতে হলে অষ্টাদশ লুইয়ের উগ্র রাজতন্ত্রীদের দমন করা উচিত ছিল। তিনি তা না করায় তারা তাঁর মধ্যপন্থা-নীতিকে ব্যর্থ করে দেয়। অষ্টাদশ লুই তাঁর নীতিকে পরিচালনার দায়িত্ব মন্ত্রী ভিলেলের হাতে দেন। ভিলেলে ধাপে ধাপে পুরাতনতন্ত্র ফিরিয়ে আনার নীতি নেন। ইতিমধ্যে ১৮২৪ খ্রীঃ অষ্টাদশ লুইয়ের মৃত্যু হলে তাঁর মধ্যপন্থা-নীতি বর্জিত হয়।

উগ্র রাজতন্ত্রীবাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি : ভিলেলের নীতি

অষ্টাদশ লুইয়ের পর তাঁর ভ্রাতা উগ্র রাজতন্ত্রী দলের ভূতপূর্ব নেতা দশম চার্লস উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। তাঁর সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা মন্তব্য করেছেন যে, "তিনি অতীত অভিজ্ঞতা থেকে কোন শিক্ষা নেন নাই"। তিনি ছিলেন গোঁড়া স্বৈরতন্ত্রবাদী ও পুরাতনতন্ত্রের উগ্র সমর্থক। তিনি বলেন যে, "আমি বরং কাঠ চেরাই করে জীবিকা অর্জন করতে রাজী আছি; কিন্তু আমি ইংলন্ডের রাজার মত ঠুটো-জগন্নাথ হতে পারব না"। তিনি অষ্টাদশ লুইয়ের মধ্যপন্থা-নীতিকে ত্যাগ করেন। তিনি পলিগ্ন্যাক (Polignac) নামে এক মন্ত্রীর সাহায্যে স্বৈরশাসন, অভিজাততন্ত্র ও ক্যাথলিক গীর্জাতন্ত্রকে পুনঃ-স্থাপনের কাজে হাত দেন। দশম চার্লসের মন্ত্রী পলিগ্ন্যাক অভিজাত ও যাজকশ্রেণীর লুপ্ত ক্ষমতা পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জন্যে কয়েকটি প্রতিক্রিয়াশীল আইন পাস করেন। বিপ্লবের সময় অভিজাতদের যে জমি বাজেয়াপ্ত হয়, এতদিন পরে তার জন্যে তিনি অভিজাতদের ১ হাজার মিলিয়ন ফ্রাঁ ক্ষতিপূরণ দানের আইন করেন। বুর্জোয়াশ্রেণী সরকারকে যে অর্থ ধার দেয়, তার প্রতিশ্রুত সুদের হার হ্রাস করে সেই অর্থ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। শিক্ষাব্যবস্থায় যাজকদের কর্তৃত্ব ফিরিয়ে দেওয়া হয়। জেসুইট পাদরিরা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে। স্বাধীন চিন্তা ও মতামত নিয়ন্ত্রিত হয়। এরপর তাঁর স্বৈরতন্ত্রকে কায়েম করার জন্যে দশম চার্লস ২০শে জুলাই, ১৮৩০ খ্রীঃ একটি জরুরী অর্ডিন্যান্স দ্বারা অষ্টাদশ লুইয়ের প্রদত্ত ১৮১৪ খ্রীঃ সংবিধান রদ করেন। আইনসভা ভেঙে দেন। ভোটাধিকার আইন বদল করে ভোটাধিকার সঙ্কোচন করেন। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়। নতুন নির্বাচনের আদেশ দেওয়া হয়।

দশম চার্লসের পুরাতনতন্ত্র পুনঃ-স্থাপন নীতি জুলাই অর্ডিনান্স

জুলাই অর্ডিন্যান্স জারী হলে উদারপন্থীরা ফ্রান্সে স্বৈরতন্ত্র ফিরে আসার আশঙ্কা করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। প্রজাতন্ত্রীরাও এই বিদ্রোহে যোগ দেয়। সেনাদল জনতার পক্ষে যোগ দেয়। দশম

চার্লস পদত্যাগ করে অবিরল ক্রন্দনরত অবস্থায় ইংলন্ডে আশ্রয়ের জন্যে যাত্রা করেন।

জুলাই বিপ্লবের অনিবার্যতা বিচার : ডেভিড টমসনের অভিমত

ঐতিহাসিক ডেভিড টমসনের মতে "জুলাই বিপ্লব ও তার ফলে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত বুরবোঁবংশের পতন না-ও ঘটতে পারত। যদি দশম চার্লস তাঁর ভ্রাতার মধ্যপন্থা-নীতি অনুসরণ করতেন, তবে এই রাজবংশ স্থায়ী হতে পারত। ১৮৩০ খ্রীঃ বিপ্লবের অনিবার্যতা কিছুই ছিল না।" কিন্তু উদারপন্থী ঐতিহাসিকরা ডেভিড টমসনের এই মত অগ্রাহ্য করেন। ফ্রান্সের জাতীয় জীবনে অবিচ্ছিন্নতাবাদ (Forces of Continuity) বনাম পরিবর্তনবাদের (Forces of Change) যে গভীর সংঘাত দেখা দেয়, তা বিপ্লবকে অনিবার্য করে। অষ্টাদশ লুই যে চার্টার বা সনদ দেন, তাতে ধনী সম্পত্তিবান ব্যক্তি ছাড়া আর কোন নাগরিকের ভোটাধিকার ছিল না। ফ্রান্সে ছিল ৩০ মিলিয়ন লোক। তার মধ্যে উপরোক্ত সনদের বলে মাত্র ২ লক্ষ লোক ভোটের অধিকার পায়। সুতরাং দশম চার্লস যদি মধ্যপন্থা মেনে চলতেন, তবুও ভোটাধিকারহীন ফ্রান্সের লক্ষ লক্ষ লোক এই সনদকে চিরদিনের জন্যে মেনে নিত না। বিশেষতঃ নিম্ন-মধ্যবিত্তশ্রেণী যারা ছিল প্রজাতন্ত্র ও গণভোটের সমর্থক, তারা এই ব্যবস্থা মেনে নিত না।

জুলাই বিপ্লবের ফলাফল ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে বংশানুক্রমিক অধিকারের ভিত্তিতে পুনঃ-স্থাপিত বুরবোঁ রাজবংশের চিরতরে পতন ঘটে। এর স্থলে অর্লিয়েন্স বংশীয় লুই ফিলিপ পার্লামেন্টের নির্বাচনক্রমে সিংহাসন পান। ফলে ন্যায্য অধিকারবাদের স্থলে পার্লামেন্টের নির্বাচিত সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের পত্তন হয়। ১৮১৪ খ্রীঃ প্রবর্তিত সনদের সংশোধন করে ভোটাধিকার বাড়ানো হয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ধর্ম-নিরপেক্ষতা প্রবর্তিত হয়।

ফ্রান্সে—জুলাই বিপ্লবের ফলাফল

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যাজকশ্রেণীর হস্তক্ষেপ রদ হয়। স্বাধীন চিন্তা, মতামত প্রচারের অধিকার ফিরে আসে। জুলাই বিপ্লব ফ্রান্সে সামন্ত ও অভিজাত প্রথার সমাধি রচনা করে। ১৭৮৯ খ্রীঃ এর বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে কৃষকের হাতে যে জমি দেওয়া হয়, জুলাই বিপ্লবের ফলে সেই ব্যবস্থা রক্ষা পায়। জুলাই বিপ্লবের পর ধনী বুর্জোয়াশ্রেণীই সরকারী ক্ষমতা, রাষ্ট্রযন্ত্র ও দেশের অর্থনৈতিক শক্তিকে কিছুকাল নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা পায়। নূতন রাজা লুই ফিলিপ ছিলেন এই শ্রেণীর মুখপাত্র—"বুর্জোয়া রাজা"। ইংলন্ডের গৌরবজনক বিপ্লবে (Glorious Revolution) ১৬৮৮ খ্রীঃ যেমন উচ্চ-মধ্যবিত্তরা ক্ষমতা পায়, জুলাই বিপ্লবে ফ্রান্সে তেমন উচ্চ-মধ্যবিত্তরা ক্ষমতা পায়। কিন্তু নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকশ্রেণী ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের পর উপরোক্ত বন্দোবস্তে সন্তুষ্ট হয় নি।

ফ্রান্সের বাইরে জুলাই বিপ্লবের তরঙ্গ প্রবলবেগে ছড়িয়ে পড়ে। পুরাতনতন্ত্র ও ভিয়েনা-চুক্তির ভিত এই আঘাতে আলগা হয়ে যায়। "ফ্রান্সে সর্দি হলে, ইওরোপে সেই যুগে হাঁচি আরম্ভ হত" (Europe sneezes when France catches cold)। ১৮১৫ খ্রীঃ

ফ্রান্সের বাইরে ইওরোপে জুলাই বিপ্লবের প্রভাব

ভিয়েনা-সন্ধির দ্বারা বেলজিয়ান জাতীয়তাবাদীদের দাবি অগ্রাহ্য করে বেলজিয়ামকে হল্যাণ্ডের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। জুলাই বিপ্লবের সুযোগে বেলজিয়াম এই নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা ভেঙে ফেলে ১৮৩০ খ্রীঃ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৮৩১ খ্রীঃ লন্ডন-সম্মেলনে বেলজিয়ামের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। জার্মানীতে জাতীয়তাবাদী অস্থিরতা জুলাই বিপ্লবের প্রভাব দেখা গেলে কার্লস্‌বাডের হুকুমনামা পুনরায় জারী করা হয়। প্রাশিয়ায় একটি উদারনৈতিক সংবিধান চালু হয়। মধ্য-ইতালীতে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহে স্বৈর-শাসকরা বিতাড়িত হলে অস্ট্রিয়ার সেনাদল তাদের পুনঃ-স্থাপন করে। পোল্যান্ডে স্বাধীনতার জন্যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হলে

রুশ-সেনাদল তা দমন করে। ইংলন্ডে চার্টিস্ট (Chartist) আন্দোলনের ফলে ১৮৩১ খ্রীঃ সাধারণের ভোটাধিকারের আইন পাস হয়। স্পেন, সুইজারল্যান্ড, সুইডেন, হল্যান্ডে উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা চালু হয়। গ্রীসের জাতীয়তাবাদী যুদ্ধ জোরদার হয়। ডেভিড টমসনের মতে, রাইন নদীর পশ্চিমদিকের ইওরোপ যথা ফ্রান্স, ইংলন্ড, স্পেন প্রভৃতি স্বৈরতন্ত্র ও পুরাতনতন্ত্র ত্যাগ করে উদারতন্ত্রের পথ নেয়। ইওরোপ দুই আদর্শগত শিবিরে ভাগ হয়ে যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ফ্রান্সে ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের কারণ (The Causes of the February Revolution of 1848 in France) : ফ্রান্সে ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লবের ফলে অর্লিয়েন্সবংশীয় লুই ফিলিপ (Louis Philippe) ফরাসী পার্লামেন্টের নির্বাচনক্রমে সিংহাসনে বসেন। যে পার্লামেন্ট তাঁকে নির্বাচিত করে সেই পার্লামেন্ট ছিল একটি বুর্জোয়া-পার্লামেন্ট। সেই পার্লামেন্টের সদস্যরা সম্পত্তি-যুক্ত ব্যক্তিদের ভোটে নির্বাচিত হন। এজন্যে তাঁরা বুর্জোয়া বা সম্পত্তিভোগী শ্রেণীর স্বার্থ দেখতেন। লুই ফিলিপও এই শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার নীতি নেন, ফলে নিম্নমধ্যবিত্ত, শ্রমিক, দরিদ্র কৃষকশ্রেণী,—যাদের ভোটাধিকার ছিল না, তারা এই পার্লামেন্ট এবং তার মনোনীত রাজতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল হতে পারে নাই।

লুই ফিলিপের বুর্জোয়া স্বার্থরক্ষার নীতি

ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন এই কারণে মন্তব্য করেছেন যে, '১৮৩০-৩৩-এর বিদ্রোহের ফলাফল সক্রিয় অসন্তোষের বা বিদ্রোহের পটভূমিকা সৃষ্টি করে।"[১] তা ছাড়া এই পার্লামেন্টের ৪৩০ জন সদস্যদের মধ্যে মাত্র ২১৯ জন লুই ফিলিপের পক্ষে ভোট দেয়। তিনি এই পার্লামেন্ট দ্বারা সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত হন নাই। যাঁরা বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের আদর্শে বা ন্যায্য অধিকারবাদে বিশ্বাস করতেন, তাঁদের চোখে লুই ফিলিপ ছিলেন অবৈধ, বে-আইনী শাসক। তাঁরা জুলাই বিপ্লবের ফলে পদচ্যুত বুরবোঁ রাজা দশম চার্লসের পৌত্র ডিউক অফ বেরীকেই ফরাসী সিংহাসনের বৈধ আইনসম্মত উত্তরাধিকারী বলে মনে করতেন।

জুলাই বিপ্লবে(১৮৩০ খ্রীঃ) উদারতন্ত্রীরা মুখ্য ভূমিকা নিলেও, প্রজাতন্ত্রীরা এই বিপ্লবে অংশ নেন। নিম্নমধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীরা ছিল প্রজাতন্ত্রীদের প্রধান সমর্থক। তারা লুই ফিলিপের রাজতন্ত্রের ধনী বুর্জোয়া-তোষণ নীতি এবং ভোটাধিকার সঙ্কোচন-নীতির জন্যে হতাশাগ্রস্ত হয়।

প্রজাতন্ত্রীদের হতাশা ও বিদ্রোহ

রবার্ট এরগ্যাং-এর মতে, লুই ফিলিপের সরকারে ফ্রান্সের প্রতি ১৫০ জন নাগরিকের মধ্যে মাত্র ১ জন বা তারও কম সংখ্যক লোকের ভোটাধিকার ছিল। সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটদানের আইনের ফলে বেশির ভাগ লোক ভোটদানের অধিকারে বঞ্চিত হয়। ডেভিড টমসনের মতে, লুই ফিলিপের সরকার শুধুমাত্র সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটদানের আইন দ্বারা পুঁজিবাদী শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করে নাই; এই সরকার ভোটগ্রহণে দুর্নীতি ও মিথ্যাচারকে প্রশ্রয় দিয়ে নিজশ্রেণীর প্রার্থীদের নির্বাচনে জয়যুক্ত করত। লুই ফিলিপ যদিও এই নীতি নেন যে, আইনসভার বেশির ভাগ সদস্য যাঁকে সমর্থন করবে, তিনিই মন্ত্রী হবেন। কার্যক্ষেত্রে তিনি আইনসভায় নিজের হাতের লোকেদের নির্বাচিত করে এবং নির্বাচিত সদস্যদের নানা পদ দিয়ে তাদের হাতে রাখতেন। ফলে তারা লুই ফিলিপের মনোনীত মন্ত্রীকেই সমর্থন করত। সুতরাং লুই ফিলিপের গণতন্ত্র ছিল একটি ভাঁওতা। তাঁর সরকার ছিল

১· David Thomson—Europe Since Napoleon.

বাইরে গণতান্ত্রিক ধরনের, তা আসলে ধনী বুর্জোয়াপন্থী। এই কারণে ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রীরা এই সরকারকে বিদ্রোহের দ্বারা উৎখাতের নীতি নেয়।

লুই ফিলিপ ভয়ানকভাবে ধনিক-ঘেঁষা, পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে আশ্রয় করেন। ফ্রান্সে তখন শিল্প-বিপ্লবের প্রথম অবস্থা চলছে। ফলে কারখানামালিকরা অনিয়ন্ত্রিত মুনাফার লোভে শ্রমিককে ভয়ানক কম মজুরি দিত ও অনেক বেশী সময় খাটাত; তদুপরি ইচ্ছাক্রমে ছাঁটাই করত। এই সময় সমাজতন্ত্রীবাদী লুই ব্ল্যাঙ্ক (Louis Blanc) Organisation of Labour বা শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন নামে এক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি এই মত প্রচার করেন যে, শ্রমিকশ্রেণীকে তার অধিকার অর্জন করতে হলে তাদের অধিকারমূলক আইন রচনা দরকার। এই আইন মালিকশ্রেণী মানতে বাধ্য হবে। যেহেতু শ্রমিকের ভোট নেই, সেহেতু শ্রমিকের কণ্ঠস্বর আইনসভা বা পার্লামেন্টে পৌঁছায় না। এজন্যে লুই ব্ল্যাঙ্ক প্রজাতন্ত্রীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে শ্রমিক সরকারের কাছে গণভোটের দাবি করেন। যেহেতু লুই ফিলিপ এই দাবির বিরোধিতা করেন, এজন্যে এই প্রধান দলগুলি তাঁর পতন ঘটাতে বদ্ধপরিকর হয়। প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীরা বুঝতে পারে যে লুই ফিলিপ তাদের কথা শুনবেন না। তারা জনমত গঠনের জন্যে বিভিন্ন গুপ্তসমিতি গঠন করে। প্রজাতন্ত্রীদের গুপ্তসমিতির নাম ছিল "মানব-অধিকারবাদী সমিতি" (Society of the Rights of Man)। এই সমিতির সদস্যসংখ্যা ছিল ৬০ হাজার। সমাজতন্ত্রীরাও গুপ্তসমিতি গঠন করে। লুই ফিলিপ পুলিশ দ্বারা গুপ্তসমিতিগুলিকে দমাতে পারেন নি। প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীরা নিজ নিজ দলীয় সংবাদপত্র দ্বারা জনমতকে প্রভাবিত করে। লায়ন্স নগরে সমাজতন্ত্রী নেতা আগস্ট ব্ল্যাঙ্কি গুপ্তসমিতির দ্বারা শ্রমিক-বিদ্রোহ ঘটান। এইভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণেই জুলাই রাজতন্ত্রের পতনের পথ তৈরি হয়।

লুই ফিলিপের শ্রমিক স্বার্থ বিরোধিতা : সমাজতন্ত্রীদের হতাশা

লুই ফিলিপের বৈদেশিক নীতিও জাতির সন্তোষবিধানে ব্যর্থ হয়। তাঁর বৈদেশিক নীতির মূল কথা ছিল, যে-কোন মূল্যে শান্তি রক্ষা করা ও যুদ্ধের সম্ভাবনা এড়ানো। তিনি ফ্রান্সের জাতীয় স্বার্থের ক্ষতি করে ইংলন্ডের সঙ্গে মিত্রতা-রক্ষার নীতি নেন। ইওরোপের বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রগুলি তাঁকে দুচক্ষে দেখতে পারত না। কারণ লুই ফিলিপের সিংহাসনে কোন বংশানুক্রমিক দাবি ছিল না। তাঁর আশঙ্কা ছিল যে একবার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে ইওরোপের রাজতন্ত্রগুলি তাঁকে উচ্ছেদ করে ফেলবে। এজন্য তিনি শান্তি-নীতিকে সার করেন। ইংলন্ড ছিল উদারপন্থী। এজন্য তিনি ইংলন্ডের মিত্রতালাভের চেষ্টা করেন। ইংলন্ডকে তুষ্ট রাখার জন্যে তিনি বেলজিয়াম, মিশর, স্পেনে ফরাসী প্রভাব বিস্তারের সুবর্ণ সুযোগ হারান। পার্লামেন্টে তাঁর নীতির সমালোচনা হলে তিনি শাসানি দেন যে—"দরকার হলে ১০টি পার্লামেন্ট ভেঙে দিব; কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণা করব না।" তাঁর এই শান্তিবাদী, নিষ্ক্রিয় নীতির ফলে জাতীয়তাবাদী ও বোনাপার্টবাদীরা তাঁর বিরুদ্ধে চলে যায়।

নিষ্ক্রিয় বৈদেশিক নীতির ফলে জাতীয়তাবাদীদের হতাশা

লুই ফিলিপের মন্ত্রী গুইজো (Guizot) ছলেকৌশলে স্বৈর-ক্ষমতা প্রবর্তনের নীতি নেন। তিনি আইনসভায় রাজকীয় সমর্থকের সংখ্যা বাড়াবার জন্যে নির্বাচনে কারচুপির আশ্রয় নেন। গুইজোর এই দুর্নীতির প্রতিবিধানের জন্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি ভোটাধিকার বৃদ্ধির জন্যে আন্দোলন আরম্ভ করে। ১৮৪৭ খ্রীঃ জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ভোটাধিকার আইন সংস্কারের দাবিতে ৭০টি বিরাট জনসভা করা হয়। তাতে ১ লক্ষ ৭০ হাজার লোক ভোটাধিকার আইন পরিবর্তনের দাবিতে স্বাক্ষর দেয়। লুই ফিলিপ জনসাধারণের এই দাবিকে অগ্রাহ্য করেন।

ভোটাধিকার সম্প্রসারণের দাবী : ফেব্রুয়ারী বিপ্লব

অবশেষে বিরোধী দলগুলি ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৮ খ্রীঃ প্যারিসের প্রধান ময়দানে ভোটাধিকারের দাবি জানাতে এক কেন্দ্রীয় জমায়েত ডাকে। এই জমায়েত পুলিশ ছত্রভঙ্গ করলে, জনতা গুইজোর বাসগৃহ আক্রমণ করে। রক্ষীরা গুলি ছুঁড়ে কিছু লোক নিহত করলে উদারতন্ত্রী, প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীদের সমবেত অভ্যুত্থানে লুই ফিলিপ পদত্যাগ করেন। ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারী বিপ্লব আরম্ভ হয়।

যদিও উদারপন্থীদের ভোটাধিকার বাড়াবার দাবি উপলক্ষ করে ফেব্রুয়ারী বিপ্লব আরম্ভ হয়, উদারপন্থীরা এই বিপ্লব তাদের অনুকূলে ধরে রাখতে পারে নাই। উদারপন্থীরা ফ্রান্সে একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র, ভোটাধিকার বৃদ্ধি করে ধনী বুর্জোয়াদের হাতে ক্ষমতা ধরে রাখার চেষ্টা করে। প্রজাতন্ত্রীরা এতে সন্তুষ্ট হয়নি। তারা ফ্রান্সে গণভোট এবং প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চায়। প্রজাতন্ত্রী দল ছিল অধিক ক্ষমতাশালী। প্যারিসের নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্ররা ছিল এই দলের সমর্থক। ২৩শে ফেব্রুয়ারী এই দল আইনসভা দখল করে উদারতন্ত্রী বুর্জোয়া-সদস্যদের ভীতি প্রদর্শন করে তারা প্রজাতন্ত্র ঘোষণায় বাধ্য করে। ইতিমধ্যে সমাজতন্ত্রীরা প্যারিসের শ্রমিকশ্রেণীর সহায়তায় বিপ্লবে অংশ নেয়। শেষ পর্যন্ত প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীরা জোট বেঁধে ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র ও গণভোট-প্রথা ঘোষণা করে। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ফলে প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী এই দুই গোষ্ঠী মিলিতভাবে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে।

ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের উত্থান ও পতন : ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র স্থায়ী হয় নাই। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ফলে প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী এই দুই গোষ্ঠী মিলিতভাবে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে গভীর আদর্শগত বিরোধ দেখা দেয়। নিম্নমধ্যবিত্ত-সমর্থিত প্রজাতন্ত্রীরা গণভোট ও প্রজাতন্ত্র পেয়ে সন্তুষ্ট হয়। তারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিল না। দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ছিলেন লা-মার্টিন। তিনি প্যারিসের সমাজতন্ত্রীদের দাবি মেনে প্যারিসের ৮ হাজার কর্মহীন বেকার লোকের কর্মসংস্থানের দাবি মেনে নেন। এজন্য জাতীয় কর্মশালা স্থাপিত হয়। এখানে বেকার লোকেদের কাজ দেওয়া হয়। এই খবর গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লে কাজ অথবা কাজ না পেলে বেকার ভাতা পাওয়ার লোভে দলে দলে লোক প্যারিসে চলে আসে। শেষ পর্যন্ত ১ লক্ষ ১৫ হাজার বেকারকে প্রত্যহ ১$\frac{১}{২}$ ও পরে মাত্র ১ ফ্রাঁ হারে ভাতা দিতে রাজকোষ শূন্য হওয়ার উপক্রম হয়। এতে আইনসভার নিম্নবুর্জোয়া-সদস্যরা চটে যান। ভাতা ও জাতীয় কর্মশালা এজন্য বন্ধ করা হয়। এতে সমাজতন্ত্রীরা ও বেকার শ্রমিকেরা চটে যায়। তারা ১৮৪৮ খ্রীঃ জুন মাসে "হয় রুটি নতুবা বন্দুকের গুলি" (Bread or lead) ডাক দিয়ে গৃহযুদ্ধ শুরু করে। সরকার সেনাপতি ক্যাভিন্যাককে প্যারিসে শ্রমিক-বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব দিলে তিনি ৪ দিনে ১০ হাজার বিদ্রোহীকে নিহত করে সমাজতন্ত্রী বিদ্রোহ দমিয়ে দেন। কিন্তু এই গৃহযুদ্ধ ও শ্রমিক-হত্যার ফলে প্রজাতন্ত্রীদের জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়। এজন্য রাষ্ট্রপতি-পদের নির্বাচনে প্রজাতন্ত্রী প্রার্থী পরাজিত হয়। প্রজাতন্ত্রের নূতন সংবিধান অনুসারে গণভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হলে অপ্রত্যাশিতভাবে বোনাপার্টবাদী দলের সভাপতি মহাবীর নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র লুই নেপোলিয়ন নির্বাচনে জয়লাভ করে রাষ্ট্রপতির পদ পান। লুই নেপোলিয়ন রাষ্ট্রপতির পদে বসার পর ১৮৫২ খ্রীঃ ২রা ডিসেম্বর এক অতর্কিত ঘোষণার দ্বারা প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটান এবং নিজেকে দ্বিতীয় সম্রাটরূপে ঘোষণা করেন।

দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা : লুই নেপোলিয়নেব উত্থান: দ্বিতীয় সাম্রাজ্য

সপ্তম পরিচ্ছেদ : ইওরোপে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রভাব : মেটারনিখ্-তন্ত্রের পতন (Impact of the February Revolution on Europe: Fall of Metternich System) : ঊনবিংশ শতকে ফ্রান্স ছিল ইওরোপীয় বিপ্লবের ঝটিকাকেন্দ্র। ঐতিহাসিক লজ (Lodge) বলেন, "ফ্রান্সের বিপ্লবী চুল্লী হতে উড়ন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ইওরোপের ফাঁপা কাঠের গুদামে পড়ে দাবানল সৃষ্টি করে।" সমগ্র মধ্য ইওরোপে বিপ্লব সহস্র ফণা তুলে পুরাতনতন্ত্রকে মরণচুম্বন দেয়। নায্য অধিকারবাদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বংশানুক্রমিক রাজবংশগুলির স্বৈরাচারী শাসন, মেটারনিখের অবিচ্ছিন্নতাবাদ বা স্বৈরাচারী শাসনের প্রতিষ্ঠা, অভিজাততন্ত্র প্রভৃতি ব্যবস্থা মধ্যবিত্তশ্রেণী যুবশক্তিকে বিপ্লবমুখী করে। শিল্প-বিপ্লবের ফলে পুরাতন কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। শিল্প-বিস্তারের ফলে নূতন নূতন নগর গড়ে ওঠে। নগরগুলিতে জনসংখ্যাবৃদ্ধি, বাসস্থানের সমস্যা, খাদ্যসঙ্কট ও শ্রমিকশ্রেণীর তীব্র অসন্তোষ বিপ্লবের বারুদ জমা করে। জার্মানী, ইতালী ও হাপ্‌সবার্গ সাম্রাজ্যে মেটারনিখ্-তন্ত্রের চাপে অবদমিত জাতীয়তাবাদ আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজছিল। ফেব্রুয়ারী বিপ্লব এই সকল বারুদের ভাণ্ডে যেন পলিতার ন্যায় অগ্নিসংযোগ করে। ডেভিড টমসনের মতে, এই বিপ্লবগুলি বার্লিন, ফ্রাঙ্কফুর্ট, ভিয়েনা, মিলান, রোম, বুডাপেষ্ট প্রভৃতি নগরকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। ইওরোপে মেটারনিখ্-তন্ত্রের পতন হয়।

ইওরোপে ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবের কারণ

প্রথমে জার্মানীর প্রাশিয়া, ব্যাভেরিয়া, ব্যাডেন, স্যাক্সনী, হ্যানোভার, হেসি প্রভৃতি রাজ্যগুলিতে উদারতান্ত্রিক বিপ্লব দেখা দেয়। ঝড়ের চাপে বাঁশগাছ যেমন নত হয়, আবার সোজা হয়,—সেইরূপ "বেতসীবৃত্তি" নিয়ে প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম জনতার দাবি মেনে প্রাশিয়ায় পার্লামেন্ট, সংবিধান প্রবর্তন করেন। জার্মানীর উপরোক্ত অন্য রাজ্যগুলিতেও পার্লামেন্ট ও সংবিধান চালু হয়। বুর্জোয়াশ্রেণী সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রবর্তন করে নিজশ্রেণীর হাতে শাসনক্ষমতা রাখে।জার্মান জাতীয়তাবাদীরা ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সুযোগে জার্মানীতে ১৮১৫ খ্রীঃ ভিয়েনা-চুক্তির দ্বারা যে ব্যবস্থা করা হয়, তা ভেঙ্গে ফেলার উদ্যোগ নেয়। ভিয়েনা বন্দোবস্তের বলে জার্মানীকে ৩৯টি রাজ্যে পরিণত করা হয়েছিল। ৩৯টি রাজ্যে ৩৯ জন রাজা ছিল। এখন এই ব্যবস্থা নস্যাৎ করে জার্মান জাতীয়তাবাদীরা ঐক্যবদ্ধ জার্মানী গঠনের জন্যে নূতন সংবিধান রচনার উদ্যোগ নেয়।তারা গণভোটের ভিত্তিতে প্রতি ৫০ হাজার জার্মানপিছু একজন সদস্য হিসাবে ৫০০ সদস্য নির্বাচন করে। জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে এই ৫০০ সদস্য জাতীয় পার্লামেন্টে ঐক্যবদ্ধ জার্মানী গঠনের জন্যে সংবিধান রচনায় হাত দেয়। এই পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্য ছিল বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত। মাত্র একজন কৃষক-প্রতিনিধি ছিল। এই পার্লামেন্ট স্থির করে যে, কেবলমাত্র জার্মানীর জার্মানদের নিয়ে, জার্মানীর ৩৯টি রাজ্য নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হবে। এই যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত পার্লামেন্টের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান সংবিধান মেনে চলতে বাধ্য হবেন। প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামকে এই সাংবিধানিক রাষ্ট্রপ্রধানের পদ দান করা হয়। কিন্তু তিনি ছিলেন স্বৈরতন্ত্র এবং স্বর্গীয় অধিকারে বিশ্বাসী। সুতরাং প্রাশিয়ারাজ জার্মানীর সাংবিধানিক রাজার পদ নিতে অস্বীকার করেন। এদিকে অস্ট্রিয়া দেখে যে, নূতন সংবিধান চালু হলে জার্মানীতে তার অধিকৃত অংশের ওপর আধিপত্য নষ্ট হবে। এজন্য অস্ট্রিয়া বলপূর্বক ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয়। প্রাশিয়াও এই কাজ সমর্থন করে। এর ফলে শান্তিপূর্ণ, সাংবিধানিক পথে জার্মানীর ঐক্যস্থাপনের প্রচেষ্টা বিফল হয়। তবে জার্মানীতে মেটারনিখ্-তন্ত্রের পতন ঘটে।

মেটারনিখের নিজরাজ্য অষ্ট্রিয়া বা হ্যাপ্‌সবার্গ সাম্রাজ্যে উদারতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের ঢেউ লাগে। মেটারনিখ্-তন্ত্রের পতন হয়। প্রজাবিদ্রোহের ফলে মেটারনিখ্ ইংলন্ডে পলায়ন করেন। অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় ছাত্র, বুদ্ধিজীবি, শ্রমিকরা বিপ্লব ঘোষণা করে। একটি সংবিধান দ্বারা অষ্ট্রিয়াতে সর্বসাধারণের ভোটাধিকার স্থাপিত হয়। হ্যাপ্‌সবার্গ সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলিতে জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে। (১) হাঙ্গেরীর জাতীয় নেতা লুই কাসাথের নেতৃত্বে হাঙ্গেরী স্বাধীনতা ঘোষণা করে। একটি স্বতন্ত্র হাঙ্গেরীয় পার্লামেন্ট ও সর্বসাধারণের ভোটাধিকার মার্চ সংবিধান দ্বারা চালু হয়। (২) বোহেমিয়ার রাজধানী প্রাগে সংখ্যাগরিষ্ঠ চেক জাতি জার্মান শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ করে। বোহেমিয়া স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষিত হয়। এখানেও সংবিধান ও ভোটাধিকার চালু হয়। (৩) উত্তর ইতালীর মিলানে অষ্ট্রিয়ার আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। (৪) দক্ষিণ হাঙ্গেরীতে ক্রোট জাতি স্বাধীনতার দাবিতে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ করে এবং ক্রোট জাতীয় রাষ্ট্র ঘোষণা করে। এইভাবে অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলিতে ৫টি স্থানে জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক, উদারতান্ত্রিক বিপ্লব দেখা দেয়।

অষ্ট্রিয়ায় ও হ্যাপ্‌সবার্গ সাম্রাজ্যে, ইতালীতে ফেব্রুয়ারী বিপ্লব: মেটারনিখতন্ত্রের পতন

ইতালীর স্বাধীনতার জন্যে পিডমন্টের রাজা চার্লস এলবার্ট স্ট্যাটুটো নামে এক সংবিধান প্রবর্তন করেন এবং ইতালীর স্বাধীনতালাভের মানসে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। চার্লস এলবার্ট অষ্ট্রিয়ার সেনাপতির হাতে পরাজিত হলে তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু ইতালীয় জাতীয়তাবাদীরা তাতে দমে যায় নি। জাতীয়তাবাদী নেতা ম্যাৎসিনী অতঃপর রোমে একটি ইতালীয় প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন।

কিন্তু অষ্ট্রিয়ার সেনাপতিরা ক্রমে পালটা আঘাত দ্বারা ভিয়েনা ও অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলিতে বিদ্রোহ ধ্বংস করেন। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন রোমে ম্যাৎসিনীর প্রজাতন্ত্র ধ্বংস করেন। রাজতান্ত্রিক আক্রমণের ফলে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের শিখা নিভে যায়। কিন্তু ইওরোপের বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদ ফল্গুধারার মত সুপ্তভাবে বইতে থাকে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্য ঃ লুই নেপোলিয়ন (Second Empire in France : Louis Napoleon) ঃ ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারী বিপ্লব, দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের উত্থান-পতন এবং লুই নেপোলিয়নের দ্বিতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিবরণ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে (পৃঃ ৬৯ দ্রষ্টব্য)। ১৮৫১ খ্রীঃ ২রা ডিসেম্বর দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি-পদে অবস্থিত লুই নেপোলিয়ন এক অতর্কিত আঘাত দ্বারা দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করে ফ্রান্সে তাঁর অধীন দ্বিতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পার্লামেন্টের ৭৮ জন বিরোধী সদস্যকে বন্দী করে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে প্রায় বিনা বাধায় পরিণতি দেন। ফ্রান্সের জনসাধারণের কাছে তখনও তিনি ছিলেন ভয়ানক প্রিয়। ২১শে ডিসেম্বর তিনি এক গণভোট দ্বারা জনমত চান যে, জনসাধারণ তাঁকে সম্রাট হিসাবে গ্রহণ করবে কিনা? ৭$^{১}/_{২}$ মিলিয়ান অর্থাৎ ৭০ লক্ষ ৫০ হাজার লোক তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করে ভোট দেয়, মাত্র ৭ লক্ষ লোক তাঁর বিরুদ্ধে ভোট দেয়। ফলে লুই নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সম্রাট-পদে বসেন। সম্রাট-পদে বসার পর লুই নেপোলিয়ন তাঁর পিতৃব্য মহাবীর নেপোলিয়নের রাজত্বের সঙ্গে ধারাবাহিকতা ও বংশানুক্রমিকতা রাখার জন্যে তৃতীয় নেপোলিয়ন নামগ্রহণ করেন।[১] গ্রেনভিলের

সম্রাট প্রথম নেপোলিয়নের পুত্রের অকালমৃত্যু ঘটে। তাঁকে দ্বিতীয় নেপোলিয়ন ধরে লুই নেপোলিয়ন নিজে তৃতীয় নেপোলিয়ন উপাধি নেন।

(Grenville) মতে, ইওরোপের বংশানুক্রমিক রাজারা নেপোলিয়নের বংশকে সহ্য করতে পারত না। তাঁদের উত্যক্ত করার জন্যেই তিনি তৃতীয় নেপোলিয়ন খেতাব নেন। তাঁর শাসনকাল ফ্রান্সের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য স্থান পেয়েছে।

তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁর পিতৃব্যের অনুকরণে প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করে একনায়কতন্ত্র প্রবর্তন করেন। তিনি তাঁর পিতৃব্যের মতই 'সম্রাট' খেতাব নেন। তিনি আইনসভাকে তিন কক্ষে ভাগ করে নিম্নকক্ষ বা লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের ২৬০ সদস্যকে সর্বসাধারণের ভোটে নির্বাচিত করার নিয়ম চালু করেন। কিন্তু মূল ক্ষমতা তিনি নিজহাতে রাখেন। তিনি ১৮৫২-৬০ খ্রীঃ পর্যন্ত নিম্নকক্ষের সদস্যদের বিতর্ক ও সমালোচনা সংবাদপত্রে প্রকাশ নিষিদ্ধ করেন। তিনি আইনসভার বিরোধী দলের কণ্ঠরোধ করেন। সংবাদপত্রগুলিকেও স্বাধীন সংবাদ প্রকাশে বাধা দেওয়া হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি তাঁর দমননীতির চাপে গুপ্তসমিতির মাধ্যমে কাজ করতে বাধ্য হয়। তৃতীয় নেপোলিয়ন বলেন যে, তিনি সংস্কার প্রবর্তনের জন্যেই সকল ক্ষমতা নিজহাতে রেখেছেন। কারণ তিনি উদার গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করবেন; বিরোধী দলগুলির বাধায় তাঁর সংস্কার সফল করা যাবে না। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয় ফরাসীজাতি ও রাজনৈতিক দলগুলি তাঁর এই আশ্বাসে সন্তুষ্ট হয় নি। প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করা এবং আইনসভার ক্ষমতা হরণ করায় তিনি নিম্ন-বুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর নিন্দাভাজন হন। ১৮৬০ খ্রীঃ পর তিনি দেখেন তাঁর জনপ্রিয়তা কমে গেছে। তখন তিনি কিছু কিছু উদারনীতি নেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক দলগুলির সভা-সমিতির অধিকার মেনে নেন। কিন্তু লোকে তাতে সন্তুষ্ট হয় নি। কোবান (Cobban) নামক ঐতিহাসিকের মতে তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের প্রধান কারণ ছিল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে হরণ করার জন্যে তাঁর বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবী ও নিম্নমধ্যবিত্তের ক্ষোভ।

আভ্যন্তরীণ নীতি: একনায়কতন্ত্র স্থাপন

তৃতীয় নেপোলিয়নের আমলেই ফ্রান্সে প্রকৃত শিল্প-বিপ্লবের সূচনা হয়। (চতুর্থ অধ্যায় পৃঃ ৭৮ দ্রষ্টব্য)। তিনি ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্স প্রবর্তন করেন। পেরিয়ার ব্রাদার্স, হোপ, লাফিয়ৎ প্রভৃতি ধনকুবেরদের সাহায্যে নূতন শিল্পে মূলধন লগ্নী করে ফ্রান্সে শিল্প গঠন করেন। তিনি রেলপথ নির্মাণের উপর জোর দেন। তার আমলে ৭৫০০ কিঃ মিঃ রেলপথ তৈরি হয়। রেলপথের নির্মাণকে উপলক্ষ্য করে লোহা, ইস্পাত ও কয়লা প্রভৃতি ভারী শিল্পের বিকাশ ঘটে। ফ্রান্সে বিলাসদ্রব্য, সুগন্ধিদ্রব্য, রেশমশিল্পেরও বিস্তার হয়। তৃতীয় নেপোলিয়ন কৃষির উন্নতির জন্যে গ্রামীণ কৃষি-ব্যাঙ্ক বা ক্রেডিট এগ্রিকোল স্থাপন করেন। সম্পত্তি মর্টগেজ রেখে কৃষকরা ঋণ নিয়ে আধুনিক প্রথায় কৃষিকাজ করার সুযোগ পায়। তৃতীয় নেপোলিয়ন শ্রমিকদের কথা ভোলেন নাই। তিনি শ্রমিকের কল্যাণের জন্যে নানাবিধ বীমা-প্রকল্প, যথা বার্ধক্য-বীমা, দুর্ঘটনা-বীমা, রোগ-বীমা প্রভৃতি চালু করেন। তিনি শ্রমিকদের জন্যে ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার স্বীকার করেন। শ্রমিকরা ধর্মঘটের অধিকার লাভ করায় তারা মজুরি বৃদ্ধি ও কাজের সময় কমাবার জন্যে এই অধিকার ব্যবহার করার সুযোগ পায়। তিনি ব্রিটেনের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য-চুক্তির দ্বারা সস্তাদরে শিল্পদ্রব্য গরীব লোকেদের জন্যে আমদানির ব্যবস্থা করেন। তিনি প্যারিস নগরীর পুনর্গঠন করেন। ব্যারন হাউসম্যান নামে এক স্থপতির দ্বারা তিনি প্যারিস নগরীর পুনর্গঠনের পরিকল্পনা করেন। প্যারিসকে উদ্যান, বুলেভার বা পার্ক এবং নূতন রাস্তাঘাট ও বাসগৃহ দ্বারা তিনি সুসজ্জিত করেন। এর ফলে প্যারিস তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সুন্দরী নগরীতে পরিণত হয়। এই নির্মাণকার্যের জন্যে বহু লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। রেলপথ ও রাস্তাঘাটের উন্নতির ফলে গ্রামের উদ্বৃত্ত কৃষি-পণ্য শহরে রপ্তানি করার সুবিধা হয়। এর ফলে গ্রামের

অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার

কৃষকদের অবস্থার উন্নতি হয়। তৃতীয় নেপোলিয়ন দরিদ্রদের জন্যে হাসপাতাল, ভবঘুরেদের জন্যে থাকার জায়গা, অসুস্থ শ্রমিকদের জন্যে আশ্রয়শিবির স্থাপন করেন। প্যারিস ছাড়া অন্যান্য শহর যথা মার্সাই, লায়নস প্রভৃতি শহরেরও তিনি পুনর্নির্মাণ শুরু করেন। তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসন-নীতি প্রধানতঃ বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করলেও তিনি শ্রমিক ও দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন। এইজন্যে তাঁকে "অশ্বারোহী সেন্ট সাইমন" বলা হত।

তৃতীয় নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতি ছিল ঘটনাবহুল, চমকপ্রদ, পরস্পর-বিরোধী এবং পরিণামে বিফল। তাঁর বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য কি ছিল এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তাঁর সমালোচক প্রজাতন্ত্রী ঐতিহাসিকরা বলেন যে, গৌরবপিপাসু ফরাসীজাতিকে তিনি জমকালো বৈদেশিক নীতির গৌরবে তৃপ্ত করার চেষ্টা করেন। তিনি প্রজাতন্ত্র ধ্বংস করায় তাঁর জনপ্রিয়তার যে হানি হয়, তিনি গৌরবজনক বৈদেশিক নীতির ফলে তা পূরণ করার চেষ্টা করেন। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা বলেন যে, তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁর বৈদেশিক নীতির দ্বারা ইওরোপের পদানত জাতীয়তাবাদকে নবজীবন দেন। তিনি ইতালিয়, জার্মান, রুমানীয় ও পোলিশ জাতীয়তাবাদকে সমর্থন দেন। এজন্য তিনি ইতালীর স্বাধীনতা-যুদ্ধে ইতালীয়দের পক্ষে যোগ দেন। ঐতিহাসিক এ· জে· পি· টেইলর অবশ্য এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, ভিয়েনা-চুক্তির (১৮১৫ খ্রীঃ) দ্বারা ফ্রান্সকে ইওরোপে কোণঠাসা করা হয়। ইওরোপের নিপীড়িত জাতীয়তাবাদকে সমর্থন দ্বারা তৃতীয় নেপোলিয়ন ভিয়েনা-চুক্তিকে ভেঙে ফেলার উদ্যোগ নেন। আসলে ফ্রান্সের স্বার্থবিরোধী ভিয়েনা-চুক্তিকে ছেঁড়া কাগজে পরিণত করার জন্যেই তিনি ইতালী প্রভৃতি দেশের জাতীয়তাবাদী ঐক্য-আন্দোলনকে সমর্থন জানান। তাঁর প্রথম কৃতিত্ব ছিল ক্রিমিয়ার রক্ষণশীল শক্তি রাশিয়াকে পরাজিত করে ফ্রান্সের সামরিক গৌরব অর্জন। এই যুদ্ধে তিনি ইংলন্ডের মিত্রতা লাভ করেন। ১৮৬১ খ্রীঃ প্লম্বিয়ারের চুক্তির দ্বারা তিনি পিডমন্টের পক্ষ নিয়ে ইতালীর স্বাধীনতা যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করেন। ভিল্লাফ্র্যাঙ্কার সন্ধি দ্বারা তিনি ইতালীতে যুদ্ধ ত্যাগ করেন। কিন্তু তিনি কূটনীতি ও বিভিন্নভাবে ইতালীর ঐক্যস্থাপনে বড় ভূমিকা নেন। রুমানিয়াও তাঁর আনুকূল্যে গঠিত হয়। তিনি মেক্সিকো অভিযানে বিফলতার দ্বারা অগৌরব ও দুর্নামের ডালি মাথায় নেন। জার্মানীর ঐক্যের গোড়ার দিকে তিনি নিরপেক্ষ নীতির দ্বারা পরোক্ষ সহায়তা করেন। পরে তিনি জনমতের চাপে ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং সেডানের যুদ্ধে ১৮৭০ খ্রীঃ পরাস্ত হলে সিংহাসনচ্যুত হন। (পররাষ্ট্র-নীতির বিবরণ পঞ্চম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।)

ফলাফল

সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের কৃতিত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা একমত নন। তাঁর সমকালীন যুগের লেখকরা তাঁর প্রতি সুবিচার করেন নি। ভিক্টর হুগো তাঁকে "ক্ষুদ্র নেপোলিয়ন" বলে উপহাস করেন। কিং লেক-এর মতে তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন যুদ্ধবাজ লোক; ইওরোপের জ্বলন্ত মশাল। তিনি ঠাণ্ডা মাথায় সুপরিকল্পিতভাবে ইওরোপের শান্তি বিনষ্ট করে যুদ্ধের আগুন জ্বালান। কিন্তু পরবর্তী যুগে ঐতিহাসিকরা বিচার করে দেখেছেন যে, তৃতীয় নেপোলিয়ন সম্পর্কে অতিরিক্ত কঠোর সমালোচনা তাঁর সমকালীন যুগে করা হয়। থিওডোর জেল্ডিনের মতে, তৃতীয় নেপোলিয়ন স্বৈরাচারী শাসক হলেও, আধুনিক যুগের হিটলার, মুসোলিনির তুলনায় তিনি ছিলেন অনেক বেশি মানবিক ও দরিদ্রশ্রেণীর প্রতি সহানুভূতিশীল। মর্সিয়ে গর্সের মতে, "তৃতীয় নেপোলিয়নের হৃদয় মানব দরদের দুগ্ধে পরিপূর্ণ ছিল।" মহাবীর নেপোলিয়নের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা অনুচিত। কারণ ইতিহাসের অঙ্গনে মহাবীর নেপোলিয়নের মত মানুষ বারে বারে আসেন না। তৃতীয় নেপোলিয়নের আমলে ফ্রান্সে প্রকৃত শিল্প-বিপ্লবের সূত্রপাত হয়।

তিনিই রাষ্ট্রযন্ত্রকে জনহিতকর কাজে নিয়োজিত করার পথ দেখান। তাঁর মাথায় ছিল প্রচুর নূতন পরিকল্পনা। কিন্তু তা কার্যকরী করার মত ক্ষমতা তাঁর ছিল না। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তিনি ইওরোপে প্রতিক্রিয়াশীল ভিয়েনা-চুক্তি ভেঙে জাতীয়তাবাদের জাগরণ ঘটান। ডেভিড টমসনের মতে, কাভ্যুর ও বিসমার্কের মত দুঁদে কূটনীতিবিদ্‌দের যুগে তৃতীয় নেপোলিয়নের মত স্বপ্নদর্শী রাজনীতিকের স্থান ছিল না। এই সকল ধূর্ত রাজনীতিকের প্যাঁচে তাঁর পতন ঘটে। তৃতীয় নেপোলিয়নের চরিত্রের ত্রুটি ছিল যে, তিনি সর্বদা পরস্পর-বিরোধী কাজ করে বসতেন। সকলকে সবরকম প্রতিশ্রুতি দিতেন। তা রক্ষা করতে পারতেন না। তাঁর পরস্পরবিরোধী কাজের ফলে তিনি বিশ্বাসযোগ্যতা হারান। দ্বিতীয়তঃ, তিনি বংশানুক্রমিক রাজা ছিলেন না। অথচ তিনি প্রজাতন্ত্র ধ্বংস করে সিংহাসন দখল করেন। এজন্য ফ্রান্সের নিম্নমধ্যবিত্ত বুর্জোয়াসম্প্রদায় তাঁকে ক্ষমা করে নি। এই সকল প্রজাতন্ত্রীর চাপে তিনি সিংহাসনচ্যুত হন। ১৮৬০ খ্রীঃ পর তিনি ইটালীর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে তাঁর পতনের সূচনা হয়। বৈদেশিক নীতির অসাফলতা ও ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধে তাঁর পতন ত্বরানিবত করে।

সারণী

[ক] নেপোলিয়নের পতনের পর ১৮১৫ খ্রীঃ ভিয়েনা-সম্মেলনে বিজয়ী শক্তিবর্গ ন্যায্য অধিকার, শক্তিসাম্য ও ক্ষতিপূরণ এই তিন প্রধান নীতির ভিত্তিতে ইওরোপের রাজ্যগুলির পুনর্গঠন করেন। ফ্রান্সে ন্যায্য অধিকার-নীতি অনুসারে বুরবোঁবংশের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। শক্তিসাম্য নীতি অনুযায়ী ফ্রান্সের ভৌগোলিক সীমার চারদিকে প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে শক্তিশালী করা হয়। ভিয়েনা-চুক্তি ন্যায্য অধিকারবাদ প্রয়োগ করে ইতিহাসের বাতিল করা স্বৈরশাসকদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে এবং জাতীয়তাবাদকে ও গণতন্ত্রকে পদদলিত করে। এজন্যে সন্ধিটি স্থায়ী হতে পারে নি। অপরদিকে বলা হয় যে, অন্ততঃ ৪০ বছর এই সন্ধি ইওরোপের শান্তি রক্ষা করে।

[খ] অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স মেটারনিখ্ প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ ও রক্ষণশীল নীতির প্রবক্তা হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি অস্ট্রিয়া এবং সমগ্র ইওরোপে প্রাক-বিপ্লব যুগের বংশানুক্রমিক স্বৈররাজতন্ত্র, সামন্তপ্রথা প্রভৃতি পুনঃস্থাপন এবং বিপ্লবের ভাবধারাকে দমনের জন্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ইওরোপের রাজাদের পরামর্শ দেন, "রাজত্ব করুন, পরিবর্তন স্বীকার করবেন না।" মেটারনিখ্ তাঁর নীতির ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্যে অস্ট্রিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে নবজাত ভাবধারার উন্মেষ দমন করেন এবং কৃষি অর্থনীতিকে সমর্থন করেন। তিনি জার্মানীতে নবজাত ভাবধারা-দমনের জন্যে কার্লসবাড হুকুমনামা জারী করেন। ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের সহায়তায় তিনি ইওরোপের বিভিন্ন দেশে উদারতন্ত্রী বিপ্লব দমন করেন। মেটারনিখ্‌তন্ত্র শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়, কারণ তিনি ইতিহাসের স্রোতের বিরুদ্ধে চলার চেষ্টা করেন।

[গ] ভিয়েনা-চুক্তির দ্বারা জাতীয়তাবাদ ও উদারতন্ত্রকে দমন করার চেষ্টা হলেও তা সফল হয় নি। ১৮২০ খ্রীঃ স্পেনে ও ইতালীর নেপলসে স্বৈরতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে উদারতান্ত্রিক বিদ্রোহ দেখা দেয়। মেটারনিখ্‌তন্ত্রের প্রভাবে শক্তিসমবায়ের নির্দেশে এই বিদ্রোহগুলি দমিত হলেও, ল্যাটিন আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ দেখা দেয়। ব্রিটেনের সমর্থনের ফলে ও মনরো-নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করায় ল্যাটিন আমেরিকার বিদ্রোহ শক্তিসমবায় দমন করতে পারে নি।

[ঘ] তুরস্কের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে ১৮২০—২১ খ্রীঃ জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ দেখা দেয়। রাশিয়া তুরস্কের প্রতি বিরোধের জন্যে গ্রীকদের পক্ষ নিয়ে তুরস্ককে যুদ্ধে পরাজিত করে ১৮২৯ খ্রীঃ এড্রিয়ানোপলের সন্ধি- স্বাক্ষরে বাধ্য করে। লণ্ডনের সন্ধির দ্বারা গ্রীকসমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়। গ্রীস কার্যতঃ স্বাধীনতা পায়।

[ঙ] ইওরোপে মেটারনিখ্‌তন্ত্র রক্ষণশীলতার দুর্গরক্ষার চেষ্টা করলেও ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই-বিপ্লবে ফ্রান্সে ন্যায্য অধিকারবাদী পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত বুরবোঁ-রাজবংশের পতন হয়। বুরবোঁ দশম চার্লস সিংহাসন হারান। উদারতন্ত্রবাদী ও সাংবিধানিক রাজা লুই ফিলিপ পার্লামেন্টের নির্দেশে সংবিধান মেনে সিংহাসনে বসলে ফ্রান্সে বংশানুক্রমিক স্বর্গীয় অধিকারবাদী রাজতন্ত্রের পতন হয়। ফ্রান্সে সামন্ত অভিজাতশ্রেণীর চূড়ান্ত পতন হয় ও বুর্জোয়াশ্রেণী প্রাধান্য পায়। ফ্রান্সের বাইরে বেলজিয়ামে জাতীয়তাবাদের জয় হয়। বেলজিয়াম হল্যাণ্ডের অধীনতামুক্ত হয়। প্রাশিয়ায় উদারনৈতিক শাসন প্রবর্তিত হয়। ইংলণ্ডে চার্টিস্ট আন্দোলনের ফলে ১৮৩২ খ্রীঃ ভোটাধিকার আইন পাস হয়। মোট কথা, পশ্চিম ইওরোপে উদারতন্ত্রের জয় হয়।

[চ] ফ্রান্স ছিল ইওরোপে বিপ্লববাদের সূতিকাগার। জুলাই রাজতন্ত্রের রাজা বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করে নিম্নমধ্যবিত্ত ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার নীতি নিলে এবং সংবিধান ভেঙে ব্যক্তিগত শাসন ও দুর্নীতিপূর্ণ নির্বাচন চালু করায়, ১৮৪৮ খ্রীঃ তাঁর বিরুদ্ধে ফেব্রুয়ারী বিপ্লব দেখা দেয়। উদারপন্থীরা ভোটাধিকার সংশোধনের দাবিতে এই বিদ্রোহ শুরু করায় লুই ফিলিপ পদত্যাগ করেন। কিন্তু নিম্নমধ্যবিত্ত সমর্থিত রিপাবলিক্যান দল উদারতন্ত্রীদের হটিয়ে ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। সমাজতন্ত্রীরা এই বিপ্লবে অংশ নিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আশায় প্রজাতন্ত্রকে সমর্থন করে। কিন্তু নিম্নমধ্যবিত্ত সমর্থিত প্রজাতন্ত্র শ্রমিকশ্রেণীর দাবি না মানায় সমাজতন্ত্রী বিদ্রোহ দেখা দিলে প্রজাতন্ত্রীরা গৃহযুদ্ধে জয়লাভ করে। কিন্তু রাষ্ট্রপতির পদে লুই নেপোলিয়ন নির্বাচিত হয়ে প্রজাতন্ত্র ধ্বংস করে দ্বিতীয় সম্রাটতন্ত্র স্থাপন করেন।

[ছ] ইওরোপে ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রভাব ছিল গভীর ও ব্যাপক। মেটারনিখ্‌তন্ত্রের প্রভাবে ইওরোপের জাতীয়তাবাদী ও উদারতান্ত্রিক শক্তিগুলি কিছুকাল দমিত থাকার পর ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের অনুকূল বাতাসে আবার নবজীবন লাভ করে। জার্মানীতে প্রাশিয়া, ব্যাভেরিয়া, ব্যাডেন প্রভৃতি রাজ্যে উদারতান্ত্রিক সংবিধান প্রচলিত হয়। জার্মানীকে এক ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদী, সাংবিধানিক রাজতন্ত্রশাসিত রাষ্ট্রে পরিণত করার সিদ্ধান্ত ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট দ্বারা গ্রহণ করা হয়। অস্ট্রিয়ায় মেটারনিখের পতন হয় ও উদারতান্ত্রিক সংবিধান চালু হয়। অস্ট্রিয়ার অধীনস্থ অঙ্গরাজ্যগুলিতেও যথা বোহেমিয়া, হাঙ্গেরী ও উত্তর ইতালীতে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ জয়লাভ করে। স্বাধীন রাষ্ট্র ও উদারতান্ত্রিক সংবিধান প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশেষে অস্ট্রিয়ার প্রবীন সেনাপতিদের উদ্যোগে অস্ট্রিয়ার বিদ্রোহ দমিত হয়। জার্মানীতে ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট অস্ট্রিয়ার বিরোধিতা ও প্রাশিয়ার রাজার অসহযোগিতায় সফল হয় নি। ইতালীতে ম্যাৎসিনীর ঘোষিত প্রজাতন্ত্রকে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ভেঙে দেন।

[জ] ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করে নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র লুই নেপোলিয়ন, 'তৃতীয় নেপোলিয়ন' উপাধি নিয়ে ফ্রান্সের সম্রাট-পদে বসেন। তিনি গণতন্ত্র ধ্বংস করলেও বহুবিধ আভ্যন্তরীণ সংস্কার করেন। তিনি ফরাসী শিল্প-বিপ্লবের উড্ডয়ন ঘটান। তিনি ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়াকে পরাস্ত করেন এবং ইতালীর স্বাধীনতাযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা নেন। কিন্তু বিসমার্কের কূটনীতির ফলে তিনি মিত্রহীন হন এবং ফ্রাঙ্কো-প্রাশীয় যুদ্ধে (১৮৭০ খ্রীঃ) তাঁর পতন ঘটে।

অনুশীলনী

১। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) ভিয়েনা-সম্মেলনে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের নাম কর। (খ) কার সম্বন্ধে বলা হয় "প্যাকাল মাছের মত পিচ্ছিল।" (গ) "ইওরোপের রাজনৈতিক ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন"—ভিয়েনা-সম্মেলনের আদর্শ বলতে কি বুঝ? (ঘ) "মোটামুটিভাবে ভিয়েনা-সন্ধি ছিল একটি যুক্তিযুক্ত রাষ্ট্রনীতিজ্ঞমূলক সন্ধি"—ভিয়েনা-চুক্তির সমর্থনে যাহা জান লিখ। (ঙ) কাকে বলা হয় "কূটনীতির বরপুত্র?" (চ) "রাজনৈতিক মহামারী, অরাজকতার দূত" কাকে বলে? (ছ) কার্লসবাডের ডিক্রী কি? (জ) মনরো নীতি কি? (ঝ) এড্রিয়ানোপলের সন্ধি সম্বন্ধে কি জান? (ঞ) অষ্টাদশ লুইয়ের সংবিধান আলোচনা কর। (ট) লুই ব্লাঙ্ক কে ছিলেন? (ঠ) গুইজো কে? (ড) দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা কে? (ঢ) কে "বেতসীবৃত্তি" পালন করেন?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(ক) ভিয়েনা-সন্ধির নীতিগুলি বর্ণনা কর। (খ) ভিয়েনা-সন্ধিকে কি যুক্তিযুক্ত সন্ধি বলা যায়? (গ) মেটারনিখ্‌-তন্ত্র কাকে বলে? অস্ট্রিয়া ও জার্মানীতে মেটারনিখ্‌-তন্ত্রের কিভাবে প্রয়োগ হয়? (ঘ) ট্রপোর ঘোষণাপত্র কি এবং ইওরোপে তা কিভাবে প্রয়োগ করা হয়? (ঙ) গ্রীসের স্বাধীনতার যুদ্ধের বিবরণ দাও। (চ) ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লবের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। (ছ) "১৮৩০-৩৩ এর বিদ্রোহের ফলাফল সক্রিয় অসন্তোষের বা বিদ্রোহের পটভূমিকা সৃষ্টি করে।"—ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের কারণ বর্ণনা কর। (জ) "ফ্রান্সের বিপ্লবী চুল্লী হতে উড়ন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ইওরোপের ফাঁপা কাঠের গুদামে পড়ে দাবানল সৃষ্টি করে"—ইওরোপে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব আলোচনা কর। (ঝ) সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার আলোচনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়
শিল্প-বিপ্লব

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের অগ্রগতি (Consolidation of Industrial Revolution in Britain) : এই পুস্তকে ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের কারণ ও সূচনার কথা আলোচনা করা হয়েছে। (প্রথম অধ্যায় তৃতীয় পরিচ্ছেদ পৃঃ ৬ দ্রষ্টব্য)। টয়েন্‌বির মতে, ১৭৬০—১৭৮০ খ্রীঃ মধ্যে ইংলন্ডের শিল্পের উড্ডয়ন ঘটে। উড্ডয়ন (Take off) বলতে শিল্পের ক্রমোন্নতির ফলে জাতীয় আয়ের ক্রমোন্নতি বুঝায়। ইতিমধ্যে ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। নেপোলিয়ন কন্টিনেন্টাল সিস্টেম বা মহাদেশীয় অবরোধ দ্বারা ইওরোপের বাজারে ইংলন্ডের মাল বিক্রি বন্ধ করে ব্রিটিশ শিল্পকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেন।

নেপোলিয়নের ঘোষিত মহাদেশীয় অবরোধের প্রত্যুত্তরে ব্রিটেন ইওরোপের বাইরে বাজারে ইওরোপীয় দেশগুলির থেকে মাল রপ্তানি বন্ধ করে দেয়। ইংলন্ড তার নৌশক্তির জোরে ইওরোপের বাইরে এই সকল দেশের বাজার নিজের মাল বিক্রির জন্যে দখল করে নেয়। উদাহরণস্বরূপ স্পেনের ল্যাটিন আমেরিকার উপনিবেশে ব্রিটিশ মালের বাজার গড়ে উঠে।

ইংলণ্ডের বৈদেশিক বাজারের চাহিদা বৃদ্ধি

ফলে ১৭৮৯—১৮১৫ খ্রীঃ ব্রিটেনের শিল্পদ্রব্যের রপ্তানি তিন গুণ বাড়ে। এ ছাড়াও ভারতের বাজারে চাহিদা ছিল। এই কারণে হব্‌স বম মন্তব্য করেছেন যে, "যদিও ইংলন্ডে আভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা বাড়ে, তুলনামূলকভাবে বৈদেশিক রপ্তানির চাহিদা বহু গুণ বাড়ে।" (Home market grew; foreign market multiplied)।

এখন এই বাড়তি মালের চাহিদা মেটাতে ব্রিটেনের শিল্প-উৎপাদন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। ঐতিহাসিক ফিশারের ভাষায় "ইংলন্ড বিশ্বের শিল্প-কারখানায় পরিণত হয়।" (England became the workshop of the world)। ইংলন্ডের এই শিল্পের

বস্ত্রশিল্পের ও অন্যান্য শিল্পের প্রসার

ক্ষেত্রে বস্ত্রশিল্পই ছিল প্রধান। এজন্যে হব্‌স বম বলেছেন যে, "ইংলন্ডে শিল্প-বিপ্লবের কথা বলা হলে প্রথমেই বস্ত্র-শিল্পের নাম করতেই হবে।" (Whoever says of Industrial Revolution in England must say Cotton and Cotton)। ভারত প্রভৃতি উপনিবেশের বাজারে ইংলন্ডের তৈরি বস্ত্রের চাহিদাও বিস্তর ছিল। ফলে ইংলন্ডের ল্যাঙ্কাশায়ারের বিরাট কাপড়ের কারখানাগুলি গড়ে উঠে। আগে কাপড় তৈরির যন্ত্রগুলি কাঠের তৈরি ছিল। এখন অবিরাম চলার প্রয়োজনে এবং বাষ্পীয় ইঞ্জিন দ্বারা চালাবার জন্যে লোহার তৈরি যন্ত্র তৈরি করা হয়। ১৮৩০ খ্রীঃ ইংলন্ড ও স্কটল্যান্ডে বাষ্পচালিত তাঁতের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০ হাজার। এদিকে যন্ত্রপাতি তৈরি করার জন্যে লোহা, এবং লোহা গালাবার ও বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালাবার জন্যে কয়লার দরকার হলে কয়লাশিল্পের বিরাট অগ্রগতি হয়। ১৮১৫ খ্রীঃ ইংলন্ডে কয়লা উৎপাদন ছিল ১৫ মিলিয়ন টন, ১৮৪৮ খ্রীঃ তা দাঁড়ায় ৫০ মিলিয়ন টনে। ১৮৩৫ খ্রীঃ ব্রিটেনের লোহার উৎপাদন ছিল ১ মিলিয়ন টন, ১৮৫০ খ্রীঃ নাগাদ বিশ্বের অশোধিত লোহার অর্ধেক লোহা ব্রিটেনে উৎপাদিত হতে থাকে। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পরিবহণ ব্যবস্থার জন্যে রেলপথের নির্মাণ হতে থাকে। ১৮৩০ খ্রীঃ লিভারপুল থেকে ম্যানচেস্টার পর্যন্ত ব্রিটেনের প্রথম রেলপথ তৈরি হয়। ১৮৫০ খ্রীঃ ৬,৬২১ মাইল রেলপথে

ব্রিটেনের মাল ও যাত্রী-পরিবহণ হতে থাকে। এই রেলপথ নির্মাণের জন্যে যে পরিমাণ লোহা লাগে, তা ব্রিটেনেই উৎপাদিত হয়। আব্রাহাম ডার্বি নামে এক ব্যক্তি কয়লা ও চুণ মিশিয়ে সেই জ্বলন্ত কয়লার তাপে লোহা গালাবার কৌশল আবিষ্কার করেন। জন স্পিটন লোহা গালাবার জন্যে ফার্নেস বা চুল্লী ও কড়াই আবিষ্কার করেন। এর ফলে কম দামে প্রচুর লোহা উৎপাদন করা সম্ভব হয়। ১৭৮৮ খ্রীঃ ইংলন্ডে লোহার উৎপাদন ছিল ৬০ হাজার টন, ১৮৩০ খ্রীঃ তা দাঁড়ায় অর্ধ মিলিয়ন টনে। বেসমার প্রথার উদ্ভবের ফলে হেনরী ঘুরসামার শেফিল্ড শহরের কারখানায় তাঁর প্রথা দ্বারা আকরিক লোহাকে শোধন করে ভাল ইস্পাতে পরিণত করার কৌশল উদ্ভাবন করেন। রেলের জন্যে কয়লাশিল্পেরও বিরাট অগ্রগতি হয়। এই সঙ্গে ব্রিটেনে যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা এবং তা বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি করার জন্যে আন্তর্জাতিক বাজার ব্রিটেন দখল করে। ইংলন্ডে জাহাজ পরিবহণ ব্যবস্থাও বাড়তে থাকে। ১৮১২ খ্রীঃ উন্নত বাষ্পীয় ইঞ্জিন-চালিত জাহাজ কমেট সর্বপ্রথম গ্লাসগো থেকে গ্রীণকের মধ্যে যাতায়াত করে। ক্রমে এই ধরনের জাহাজ মাল ও যাত্রী নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিতে শুরু করে। উপনিবেশে মাল রপ্তানির জন্যে সামুদ্রিক পরিবহণ প্রধান ছিল। ১৮৫০ খ্রীঃ বিশ্বের সামুদ্রিক মাল-পরিবহণের ৬০% ছিল ব্রিটিশ মাল। এই সঙ্গে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থারও প্রসার ঘটে। উন্নত মানের জীবনযাত্রা ও প্রচুর খাদ্যসরবরাহের ফলে ইংলন্ডের লোকসংখ্যা দ্রুতবেগে বাড়তে থাকে। ১৭৫০ থেকে ১৮৩০ এই ৮০ বছরে ইংলন্ড ও ওয়েল্‌সের লোকসংখ্যা দ্বিগুণ বাড়ে। ১৮৭০ খ্রীঃ নাগাদ ব্রিটেনের প্রতি ১ লক্ষ লোকের $\frac{৩}{৪}$ ভাগ শিল্প-কারখানা, বাণিজ্য, খনি, চাকুরি ও বিভিন্ন জীবিকায় নিয়োজিত হয়। বাকি $\frac{১}{৪}$ ভাগ গ্রামে কৃষিতে রত থাকে। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কৃষি উৎপাদন বাড়ায় ইংলন্ড খাদ্যে স্বয়ম্ভর হতে পারে। জেথ্রোটাল কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহারের যে সূত্রপাত করে, তা ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে। শিল্প-বিপ্লবের পরিপূরক হিসাবে 'সবুজ বিপ্লব' বা (Green Revolution) ইংলন্ডে চলে। গোরুর বদলে ঘোড়ায় টানা লাঙ্গল, যান্ত্রিক নিড়ানী, ক্রমিক আবর্তন প্রথায় বিভিন্ন শস্য ও ফসলের চাষ, জৈব সারের প্রয়োগ ও এনক্লোজার বা ক্ষেতগুলিকে বেষ্টনী দ্বারা ঘিরে উন্নত প্রথায় চাষ শুরু করা হয়। এর ফলে প্রভূত শস্য উৎপাদন হয়। এর সঙ্গে তাল রেখে রবার্ট লাইসেস্টার নূতন প্রজাতির ভেড়া ও গোরু প্রজনন করে মাংস, দুধ, পশম ও চামড়ার উৎপাদন ও ডেয়ারীশিল্পের বিকাশ ঘটান।

ইংলন্ডে শিল্প-বিপ্লবের ফলে কৃষি-সম্পদ ও জন-সম্পদে গরীয়ান ইওরোপের একদা ধনশালী দেশগুলি হীনবল, হৃত-গৌরব হয়ে পড়ে। এখন ইওরোপের বহির্জগতে খাদ্য, সম্পদ এবং বাণিজ্যের মুনাফা, শিল্পদ্রব্য সরবরাহ করে ইংলন্ড অত্যন্ত ধনশালী দেশে পরিণত হয়। এতদিন একটি জাতির উন্নতি ও সম্পদ বলতে কৃষি-সম্পদ ও জন-সম্পদ বুঝাত। এই দিক থেকে ফ্রান্স ছিল ব্রিটেনের অপেক্ষা শক্তিশালী। এখন ব্রিটেন ইওরোপের সকল দেশকে পিছনে ফেলে দেয় এবং তুলনামূলকভাবে তার রাজনৈতিক গুরুত্বও বাড়ে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইওরোপ মহাদেশে শিল্প-বিপ্লব (Industrialisation in the continent of Europe) : ইংলন্ডের তুলনায় ইওরোপ মহাদেশ শিল্পবিপ্লবের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে ছিল। ইংলন্ডের যে ভৌগোলিক সুযোগ-সুবিধা ছিল, ইওরোপের ফ্রান্স, হল্যান্ড ছাড়া খুব কম দেশের সে-রকম সামুদ্রিক বন্দরের দ্বারা আমদানি-রপ্তানির সুযোগ ছিল। রেলপথ আবিষ্কারের আগে ইওরোপ মহাদেশের ভিতর যোগাযোগ ও পরিবহণের ব্যবস্থা ছিল খুব অনুন্নত। নদীপথ, খাল ছাড়া মাল পরিবহণের কোন উপায় ছিল না। এমন কি ভাল

রাস্তাঘাটও ছিল না।[১] ডেভিড ল্যান্ডিস নামে এক অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকের মতে, ইওরোপের লোকেদের সামন্তপ্রথার ফলে মধ্যযুগীয় মানসিকতা দেখা দেয়। তারা জমিদারি পরিচালনা, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও শাসনকার্য পরিচালনাকেই একমাত্র সম্মানজনক কাজ মনে করত। ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানার কাজকে খুবই নীচু কাজ মনে করত। এজন্যে ইওরোপ শিল্পগঠনের ক্ষেত্রে ইংলন্ড অপেক্ষা পিছিয়ে পড়ে। তাছাড়া ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া প্রভৃতি দেশগুলির নিজস্ব পিছিয়ে পড়া সমাজ, মূলধনের অভাব, কারিগরী জ্ঞানের অভাবের জন্যে শিল্পগঠনের কাজে বিলম্ব হয়।

ইউরোপ মহাদেশে শিল্পের অনগ্রসরতার কারণ

ইওরোপের লোকেরা কিছুদিনের মধ্যেই তাদের ভুল বুঝতে পারে। একদা কৃষি-সম্পদ ও জন-সম্পদের জোরে ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ যে প্রভাব-প্রতিপত্তি ভোগ করত, ক্ষুদ্র দেশ ইংলন্ড শিল্প গঠন করে তাদের অপেক্ষা সম্পদে ও শক্তিতে অনেকদূর এগিয়ে গেলে তাদের চোখ খুলে যায়। ইংলন্ডের উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের উপর তারা নির্ভর করতে বাধ্য হয়। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইংলন্ডের অর্থবল ও ক্ষমতা ইওরোপকে বিস্মিত করে। এর ফলে ইওরোপের দেশগুলি শিল্পগঠনের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে।

শিল্পগঠনের আগ্রহ

ইওরোপের দেশগুলির মধ্যে ফ্রান্সে শিল্প-গঠনের কথা প্রথমে উল্লেখ্য। লুই ফিলিপের রাজত্বকালে ফ্রান্সে প্রকৃতপক্ষে শিল্প-বিপ্লবের সূচনা হয়। তিনি শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের অনেক স্বাধীনতা ও সুযোগ দেন। তাঁর আমলে প্যারিস থেকে সেন্ট জার্মেইন পর্যন্ত ফ্রান্সের প্রথম রেলপথ ১৮৩৭ খ্রীঃ তৈরি হয়ে যায়। অপর একটি মত হল যে, ১৮৪৩ খ্রীঃ প্যারিস থেকে মার্সাই পর্যন্ত প্রথম রেলপথ ফ্রান্সে স্থাপিত হয়। এছাড়া রাস্তাঘাট তৈরি হয়। ফ্রান্সের কৃষি পণ্য এর ফলে শহরে বয়ে আনা সহজ হয়। ফ্রান্সের শিল্প শহরগুলি যথা লায়নস, বোর্দো, তুলোঁ, নন্টস প্রভৃতিতে লোকসংখ্যা বাড়তে থাকে এবং গ্রাম থেকে বহু লোক শিল্প শ্রমিকের কাজ নিয়ে চলে আসে।

ফ্রান্সে শিল্প-বিপ্লব

তথাপি ফ্রান্সের শিল্প ব্রিটেনের তুলনায় অনেক পিছিয়ে ছিল। ১৮৫১ খ্রীঃ একটি সেন্সাস থেকে জানা যায় যে, ৫৭% লোক তখনও কৃষিদ্বারা জীবিকা অর্জন করত। ২৫% লোক শিল্পকে জীবিকা হিসাবে বেছে নেয়। এদের মধ্যে অনেকেই কুটিরশিল্পকেই আশ্রয় করে। সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁর রাজত্বকালে ফ্রান্সকে শিল্পে অগ্রণী করার জন্যে বিবিধ প্রকার প্রযত্ন করেন। প্রথমতঃ, তিনি রেলপথ নির্মাণের কাজ ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে দেন। তাঁর আমলে মাত্র ১০ বছরের মধ্যে ফ্রান্সের রেলপথ ২ হাজার মাইল থেকে ১০ হাজার মাইলে দাঁড়ায়। এই বিরাট নির্মাণকার্যের জন্যে যে পরিমাণ লোহা, ইস্পাত ও অন্যান্য দ্রব্য লাগে, তার ফলে লৌহ শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয়। লা ক্রুশের লোহা—ঢালাই কারখানা ছাড়া আরও বহু লোহার কারখানা স্থাপিত হয়। রেলপথ তৈরির ফলে ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ বাজারে শিল্পদ্রব্যগুলি সরবরাহ করা সহজ হয়। রেলপথের সাহায্যে গ্রামাঞ্চলের খাদ্য ও কাঁচামাল শহরে ও কারখানায় চলে আসে। এছাড়া রেশমশিল্প, বস্ত্রশিল্প, গন্ধদ্রব্যের উৎপাদনে ফ্রান্স বিশেষ খ্যাতি পায়। শিল্পে মূলধন যোগানের জন্যে তৃতীয় নেপোলিয়ন ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্সের পুনর্গঠন করেন। হোপ, লাফিৎ, পেরিয়ার ব্রাদার্স প্রভৃতি পুঁজিপতিদের শিল্পে মূলধন লগ্নী করতে তিনি উৎসাহ দেন। তিনি ক্রেডিট-কাঁসিয়ার নামে এক মূলধন সরবরাহকারী ব্যাঙ্ক গঠনে উৎসাহ দেন। এইভাবে তৃতীয় নেপোলিয়নের আমলে ফ্রান্সে শিল্প-বিপ্লবের উড্ডয়নকাল দেখা দেয়। ফ্রান্সের বেশির ভাগ কয়লা তোলা হত তার বেলজিয়ামের সীমান্তসংলগ্ন অঞ্চল থেকে। ১৮১৫ খ্রীঃ ভিয়েনা-চুক্তিতে ফ্রান্সের যে সীমা

ফ্রান্সে শিল্পের উৎপাদন: উড্ডয়ন

১· David Thomson.

নির্ধারণ হয়, তার ফলে এই অঞ্চলের $\frac{২}{৩}$ অংশ বেলজিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হলে ফ্রান্সে কয়লার টান পড়ে! পরে লোরেনের খনি থেকে কয়লা তুলে এই অভাব মেটানো হয়। রেলপথ দ্বারা এই কয়লা কারখানা ও শহরে বহন করা হত। তথাপি প্রচুর কয়লা না থাকায় ফ্রান্সে ইংলন্ডের মত ধাতুশিল্পের বিকাশ ঘটতে পারে নাই। তৃতীয় নেপোলিয়নের আমলে ফ্রান্সে বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের সংখ্যা ছিল ৩১৬০০০ অশ্বশক্তির সমান। এ ছাড়া ছিল বহু জলশক্তি-চালিত ইঞ্জিন। ফ্রান্স কৃষি ও শিল্প উভয় বিষয়কেই সমান গুরুত্ব দেয়।

বেলজিয়ামে শিল্প-বিপ্লব

বেলজিয়াম ১৮৩০ খ্রীঃ হল্যান্ডের অধীনতা থেকে মুক্ত হওয়ার পর অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে শিল্পায়ন ঘটায়। ইংলন্ডের আগেই বেলজিয়ামে রেলপথ তৈরি আরম্ভ হয়। ১৮৩৫ খ্রীঃ ব্রাসেল্স থেকে মালিনস পর্যন্ত প্রথম রেলপথ হয়। ইংলন্ড, ফ্রান্স, হল্যান্ড, জার্মানীর যোগাযোগের প্রধান পথ হিসেবে বেলজিয়াম তার রেলপথগুলি ১০ বছরে তৈরি করে ফেলে। ১৮১৫ খ্রীঃ ভিয়েনা-চুক্তির দ্বারা ফ্রান্সের সীমান্ত নির্ধারণের সময় ফ্রান্সের বিখ্যাত লীজ ও হেনল্টের কয়লাখনিগুলি বেলজিয়াম-সীমান্তে ঢুকে যায়। এই দামী ও চালু খনিগুলি থেকে বেলজিয়াম লোহা ও কয়লা তুলে যন্ত্রশিল্প গড়ে তুলে। হল্যান্ড, জার্মানী ও রাশিয়াকে বেলজিয়াম যন্ত্র ও ইঞ্জিন সরবরাহ করতে সক্ষম হয়।

জার্মানীতে শিল্প গঠনে বাধা

জার্মানীতে ১৮৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত শিল্পের প্রসার মন্থরগতিতে ঘটে। জার্মানীতে শিল্পবিস্তারের কয়েকটি বড় বাধা ছিল। প্রথমতঃ, জার্মানীর রাজনৈতিক ঐক্য না থাকায় এবং দেশটি ৩৯টি রাজ্যে বিভক্ত হওয়ায় প্রতি রাজ্যে আলাদা শুল্ক আদায় দিয়ে জার্মানীর এক অঞ্চল হতে অন্য অঞ্চলে মাল বহন করা ছিল ব্যয়-সাপেক্ষ। দ্বিতীয়তঃ, জার্মানীর ভিতর কোন যোগাযোগকারী রাস্তা বা মাল ও পরিবহণের জলপথ ছিল না। জার্মানীর উত্তরভাগ নিচু হওয়ায় রাইন সহ তিনটি নদী ছিল উত্তরবাহিনী অথচ জার্মানী ভৌগোলিক দিক দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত। ফলে জার্মানীর ভিতর যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল খুবই অনুন্নত। তৃতীয়তঃ, জার্মানী ছিল মূলতঃ কৃষিপ্রধান দেশ। জার্মানীর আভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা ছিল না। উপনিবেশ না থাকায় বাইরের বাজারের চাহিদাও ছিল না। ফলে শিল্প উৎপাদনের কোন তাগিদ ছিল না। তা ছাড়া জার্মানীতে শিল্পের জন্যে প্রয়োজনীয় মূলধনেরও অভাব ছিল। জার্মানীর ধনী লোকের হাতে এমন কিছু মূলধন জমা ছিল না, যার দ্বারা শিল্প গঠন করা যায়। জার্মানীর ব্যাঙ্কব্যবস্থাও ছিল ভীষণ অনুন্নত। সর্বশেষে নেপোলিয়নের যুদ্ধের ফলে জার্মানীর অর্থনৈতিক কাঠামো যা কিছু ছিল, তা একেবারে ভেঙে-চুরে যায়। জার্মানীর লোকসংখ্যাও কমে যায়। খোদ বার্লিন শহরের লোকসংখ্যা ১৮৩০ খ্রীঃ ছিল মাত্র ১$^{১}/_{২}$ লক্ষ। জার্মানীর ১৮টি শহর ছিল আধা-গ্রাম-আধা-শহর। মেটারনিখ্‌তন্ত্রের প্রভাবে জার্মানীর জনগণের মনে পরিবর্তনের হাওয়া দেখা দিতে অনেক দেরী হয়। একমাত্র শিক্ষিত নিম্ন-বুর্জোয়া, ছাত্র,বণিক ও বুদ্ধিজীবীরাই জার্মানীকে পরিবর্তনের স্রোতে যুক্ত করে।

জার্মানীতে রেলপথ নির্মাণ ও স্থাপন

জার্মানীতে ফ্রেডারিক লিস্ট নামে এক অর্থনীতিবিদ্ রেলপথ নির্মাণের জন্যে বিশেষ উদ্যম দেখান। প্রাশিয়ার যুবরাজের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি লাইপজিগ্ থেকে ড্রেসডেন পর্যন্ত ১৮৩৯ খ্রীঃ জার্মানীর প্রথম রেলপথ নির্মাণ করেন। বেলজিয়ামে রেলপথ তৈরি হলে তার সঙ্গে জোড়া লাগাতে জার্মানীতেও দ্রুত রেলপথ তৈরি হয়। ফলে প্যারিস থেকে বার্লিন, ড্রেসডেন যাত্রা এখন সহজতর হয়। জার্মানীতে রেলপথের গুরুত্ব ছিল বিরাট। প্রথমতঃ, জার্মানীতে যেহেতু সড়করাস্তা ভাল ছিল না, সেহেতু রেলপথ জার্মানীর এক প্রান্তের সঙ্গে অন্য প্রান্তের যোগ স্থাপন করে। দ্বিতীয়তঃ, রেলপথের ফলে গ্রামগুলির বিচ্ছিন্নতা দূর হয়। গ্রামগুলি শিল্প-শহরের সঙ্গে

রেলপথের দ্বারা যুক্ত হয়। গ্রামের কাঁচামাল, খাদ্য শহরে চলে আসে; শহরের শিল্পদ্রব্য গ্রামের বাজারে ঢুকে পড়ে। এর ফলে শিল্প-বাণিজ্যের বিশেষ বিস্তার হয়। জার্মানীর প্রাশিয়া রাজ্য জার্মানীর শিল্পগঠনে বিশেষ উদ্যোগ নেয়। ১৮১৫ খ্রীঃ পরেই প্রাশিয়া সরকার ভূমিদাস-প্রথার উচ্ছেদ আইন ঘোষণা করায় মুক্ত ভূমিদাসদের অনেকে শহরে চলে আসে। তারা শিল্প-শ্রমিকের জীবিকা নিলে শিল্পের উন্নতি ঘটে। জার্মানীতে ৩৯টি রাজ্য থাকায় বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন আইন, বিভিন্ন হারে শুল্কের হার থাকায় মালচলাচলে বাধা হত। এই বাধা দূর করার জন্যে জার্মানীতে জোলভেরাইন (Zollverein) নামে এক শিল্পসংঘ গঠিত হয়। ১৮৩৪ খ্রীঃ প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর ১৮টি রাজ্য নিয়ে এই শিল্পসংঘ গঠিত হয়। ক্রমে জার্মানীর সকল রাজ্য এতে যোগ দেয়। জোলভেরাইনের মাধ্যমে জার্মানীতে একই হারে মালের উপর শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা হয়।

জার্মানীর শিল্পগঠনের উড্ডয়নকাল ছিল ১৮৬৬-৭০ খ্রীঃ। এই সময়ের মধ্যে জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হলে জার্মানীতে বিসমার্কের উদ্যোগে শিল্পের উড্ডয়ন ঘটে। বিসমার্ক শিল্পকে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রেখে শিল্পবিস্তারের উদ্যোগ করেন। তিনি জার্মানীতে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন মুদ্রা, ওজন, মাপ ও শুল্ক লোপ করে দেন। জার্মানীতে একপ্রকার কেন্দ্রীয় মুদ্রা বা মার্ক, একই শুল্ক, একই মাপ বা ওজন চালু করে তিনি বাণিজ্যের বিস্তার করেন। তিনি জার্মান ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার সংগঠন দ্বারা শিল্পে মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। তিনি হাইপার ব্যাঙ্ক গঠন করেন। এই ব্যাঙ্কগুলি ছিল কয়েকটি ব্যাঙ্কের সমষ্টি। এই সংযুক্ত ব্যাঙ্কগুলির প্রচুর মূলধন থাকায় তা শিল্পে লগ্নী করা হয়। তিনি ট্রাস্ট, কার্টেল, কম্বাইন প্রভৃতি একচেটিয়া যৌথ শিল্পগঠনের ব্যবস্থা করে বিরাট আকৃতির শিল্প-কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। কার্টেল ও কম্বাইন গঠনের ফলে যেমন অতিকায় শিল্প কারখানা গড়ে উঠে, তেমনই এক একটি শিল্পে ক্ষুদ্র কারখানাগুলির প্রতিযোগিতা লোপ পায়। জার্মানীর রেলপথ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকায়, জার্মানীর বিভিন্ন অঞ্চলে রেলপথে মাল পরিবহণের সুযোগ বাড়ে। জার্মানরা প্রথমে ইংলন্ডের ইঞ্জিনীয়ার ও দক্ষ কারিগরদের সাহায্য নিলেও, শীঘ্রই তারা নিজেরা যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করে। অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকদের মতে, জার্মানী তার শিল্পগঠনের কাজে ইংলন্ডের যন্ত্রপাতি ও কারিগরী বিদ্যাকে দারুণ নকল করার ক্ষমতা দেখায়। ফরাসী, ব্রিটিশ ও আমেরিকান আবিষ্কারগুলিকে জার্মানী হুবহু নকল করে আত্মসাৎ করে এবং তাতে কুশলী দক্ষতা যোগ করে। জার্মানী ক্রমে প্রয়োগ-বিজ্ঞান ও কারিগরী দক্ষতায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করে। বিসমার্ক শিল্পকে বিদেশী মালের প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষার জন্যে সংরক্ষণ-নীতি নেন। অর্থাৎ বিদেশ থেকে আমদানী মালের উপর চড়া হারে শুল্ক বসালে সেগুলির দাম এত হারে বাড়ে যে, জার্মানীর বাজারে তা বিক্রি হত না। ফলে জার্মানীর তৈরী মাল জার্মানীতে বিক্রি হত। জার্মান ব্যাঙ্কগুলি একাধারে ব্যাঙ্ক ও শিল্প-কারখানা গঠন করে। ১৮৭০—১৮৭৪ খ্রীঃ মধ্যে ৮৫৭টি নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। লৌহশিল্পে বিরাট সম্প্রসারণ হয়। জার্মানীর ক্রাপ (Krupp) কোম্পানি জগৎজোড়া শিল্প-সাম্রাজ্য পায়। ১৮৭০ খ্রীঃ আলসাস, লোরেণ দখলের ফলে জার্মানীর হাতে প্রচুর কয়লা, লোহা এসে যায়। অস্ত্রশিল্পে জার্মানী মুখ্য স্থান নেয়। ১৯১৩ খ্রীঃ জার্মানীর আকরিক লোহার উৎপাদন দাঁড়ায় ১৪,৭৯৪,০০০ মেট্রিক টন। যন্ত্রশিল্প, মোটর, এঞ্জিন নির্মাণ ছাড়াও রসায়ন-শিল্পে, ঔষধ-শিল্পে জার্মানী শীর্ষস্থান দখল করে। বিজ্ঞান, সমরবিজ্ঞান, ফলিতবিজ্ঞান সর্বক্ষেত্রে জার্মান সৃজনীশক্তি, জার্মান কুলটুর (Kultur) সহস্র শাখায় বিকশিত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে পুঁজিবাদী অর্থনীতির দাপটে জার্মানী সাম্রাজ্যবাদী পথে পা বাড়ায়।

জার্মানীতে শিল্প বিস্তার : শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থার উড্ডয়ন

রাশিয়াতে শিল্প-বিপ্লব ইংলন্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের অনেক পরে ঘটে। রাশিয়া ছিল প্রধানতঃ একটি সামন্ততান্ত্রিক, স্বৈরতান্ত্রিক কৃষিপ্রধান দেশ। রাশিয়ার বেশির ভাগ লোক ছিল ভূমিদাস, প্রান্তিক কৃষক। দেশে মধ্যবিত্তশ্রেণীর সংখ্যা ছিল যৎসামান্য। রাশিয়ায় সকল প্রকার ক্ষমতা জার সরকার ও সামন্ত-প্রভুদের হাতে থাকায় এই দেশে নূতন কিছু করা সহজ কাজ ছিল না। সামন্ত-প্রভুরা জমিদারির আয় ভোগ করত। তাদের খামারে ভূমিদাসদের বেগার খাটাত। রাশিয়ায় শিল্পগঠনের জন্যে তাদের মাথাব্যথা ছিল না। শিল্পগঠনের দায়িত্ব সকল দেশে সাধারণতঃ বুর্জোয়া বা উদ্যোগী মধ্যবিত্তশ্রেণী নিয়ে থাকে। রাশিয়ার লোক ছিল হয় সামন্ত, নয় কৃষক। রাশিয়াতে বুর্জোয়াশ্রেণী না থাকায় শিল্প-বিপ্লবের সম্ভাবনা ছিল সুদূর-পরাহত। তা ছাড়া শিল্পগঠনের উপযোগী মূলধন ও অর্থনীতিও রাশিয়াতে ছিল না। কৃষিপ্রধান রাশিয়ায় ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থাও ছিল না। রাশিয়ার সামন্তশ্রেণী ও কৃষক কারও হাতে জমা মূলধন ছিল না। ফলে শিল্পগঠনের সম্ভাবনা ছিল এই দেশে খুবই কম। এই বিশাল দেশে যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সেকেলে ও মধ্যযুগীয়। ঘোড়ায় টানা গাড়ী ও স্লেজ গাড়ী ছাড়া রাশিয়াতে অন্য কোন পরিবহণ ব্যবস্থা ছিল না। রাস্তাঘাটও এই দেশে বিশেষ তৈরি হয় নি। নদীগুলি বছরের বেশির ভাগ সময় বরফে জমে থাকত; রাস্তাগুলি বর্ষা, বরফে কর্দমাক্ত, গর্ত হয়ে থাকত। মাল চলাচলের কোন উপায় ছিল না। ভূমিদাসরা গ্রামে বাস করত। সামন্ত-আইনে কৃষক ও ভূমিদাসরা সামন্ত-প্রভুর অনুমতি ছাড়া গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে পারত না। সুতরাং শিল্পকারখানা স্থাপন করলে শ্রমিকের সরবরাহ পাওয়া সহজ ছিল না। কারণ গ্রামের উদ্বৃত্ত লোক গ্রাম ছেড়ে শহরে যেতে পারত না।

রাশিয়াতে শিল্প গঠনে বাধা

১৮৬১ খ্রীঃ জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ভূমিদাস-প্রথার উচ্ছেদমূলক আইন পাস করার পর রাশিয়ায় প্রকৃতপক্ষে শিল্প-বিপ্লবের সূচনা হয়। এই শিল্প-বিপ্লবের কাজে জার সরকার সক্রিয় ভূমিকা নেয় এবং শিল্পবিস্তারে বিস্তর সাহায্য করে। ভূমিদাস-প্রথা উচ্ছেদ করার ফলে গ্রাম থেকে বহু মুক্তিপ্রাপ্ত ভূমিদাস শহরে এসে শিল্প-শ্রমিকের জীবিকা নেয়। ফলে কলকারখানাগুলিতে শ্রমিকের চাহিদা মিটে। ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লব স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটেছিল। তাতে সরকারের হস্তক্ষেপের কোন দরকার হয় নি। কিন্তু রাশিয়ার মত পিছিয়ে পড়া দেশে শিল্পগঠনের জন্যে সরকারকেই প্রধান উদ্যোগীর ভূমিকা নিতে হয়। ব্রিটেনে বুর্জোয়া শিল্পপতিরা নিজে থেকেই শিল্প গঠন করে। রাশিয়ার জার সরকার মন্ত্রী কাউন্ট উইটির চেষ্টাতেই রুশ-বিপ্লবের আগেই রাশিয়াতে শিল্প গঠন শুরু হয়ে যায়। জার সরকারের উদ্যোগে মস্কো থেকে সেন্ট পিটার্সবার্গ পর্যন্ত রাশিয়ায় প্রথম রেলপথ তৈরি হয়। এরপর গোটা রাশিয়ার বুক চিরে অসংখ্য রেলপথ তৈরি করা হয়। সাইবেরিয়ার কাঁচামাল সরবরাহের জন্যে পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ ট্রান্স-সাইবেরীয় রেলপথ নির্মিত হয়। মাঞ্চুরিয়ার সঙ্গে রুশশাসিত সাইবেরিয়ার যোগাযোগের জন্যে দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথ রাশিয়া নির্মাণ করে। রেলপথ নির্মাণের ফলে লৌহ, কয়লাশিল্প ও আধুনিক প্রযুক্তির বিস্তার ঘটে। কারণ রেল তৈরি করতে প্রচুর লোহা ও রেল চালাতে প্রচুর কয়লা লাগত। এজন্যই রেলের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লোহা ও কয়লা শিল্পের বিস্তার হয়। রাশিয়ায় শিল্প স্থাপনের পথে মূলধনের অভাব প্রধান বাধা ছিল। কাউন্ট উইটি আমদানি কমিয়ে রপ্তানি বাড়ান; স্বর্ণমান প্রবর্তন করেন এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিক্রির উপর বিক্রয়-কর চাপিয়ে যে অর্থ যোগাড় করেন তা শিল্পে মূলধন হিসাবে লগ্নীর ব্যবস্থা করেন। ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি দেশ হতে সরকারী গ্যারান্টি দিয়ে প্রভূত বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করা হয়। ১৮৯০ খ্রীঃ রাশিয়ায় শিল্পে প্রায় ৮০০ মিলিয়ন রুবল বৈদেশিক মূলধন নিয়োজিত হয়। ১৯১৩ খ্রীঃ এই বৈদেশিক

ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদ : শিল্প স্থাপন

মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ২ মিলিয়ন রুবল। ফরাসী সহযোগিতায় দক্ষিণ মাঞ্চুরীয় রেলপথ তৈরি করা হয়। জার্মান প্রযুক্তিবিদ, শিল্প-পরিচালনার সাহায্যে শিল্প গঠন করা হয়। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো হয়। ব্যাঙ্কের আমানত-করা অর্থ শিল্পে লগ্নী করা হয়। সরকার ভারী শিল্প অর্থাৎ লৌহ, কয়লা প্রভৃতি শিল্পগঠনে বিশেষ উদ্যম দেখান। অস্ত্রনির্মাণশিল্পেরও উন্নতি ঘটে। ১৮৮০-৯০ খ্রীঃ মধ্যে রাশিয়ায় শিল্পের বিশেষ অগ্রগতি হয়। সেন্ট পিটার্সবার্গ একটি বিরাট শিল্পনগরে পরিণত হয়। এখানে পুচি লোভ লোহার কারখানা ছাড়াও আরও বহু অতিকায় কারখানা স্থাপিত হয়। রুশ শিল্প ছিল বিদেশী মূলধনের উপর প্রধানতঃ নির্ভরশীল। এর ফলে শিল্প-বিপ্লবের সুফল রুশ জনসাধারণ পায় নাই। বিদেশী মূলধনী ও রুশ বুর্জোয়া শ্রেণী এই শিল্পের মুনাফা ভোগ করত। শ্রমিকরা অসহনীয় দারিদ্র্যে পীড়িত হত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব ও শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল (Effects of the Industrial Revolution : Rise of the Working Class) : বিপ্লব কথাটির অর্থ হল পুরাতন ব্যবস্থার দ্রুত আমূল পরিবর্তন। হস্তচালিত কুটিরশিল্পের স্থানে বাষ্পীয় যন্ত্রচালিত শিল্পের কারখানা-ভিত্তিক ব্যাপক উৎপাদন আরম্ভ হলে ইওরোপের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে তার আমূল পরিবর্তনের সূচনা হয়।

শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব

শিল্প-বিপ্লবের ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিরাট আকারের শিল্প-কারখানাগুলি স্থাপিত হয়। সেই কারখানায় উৎপাদিত মালের বিপণন ও তার কাঁচামালের বিপণনকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাজার গড়ে উঠে। শিল্পকেন্দ্রকে আশ্রয় করে শিল্প-শ্রমিক, বণিক ও অন্যান্য লোকের ঘনবসতিপূর্ণ শিল্প-শহর দ্রুত গড়ে উঠে। দ্বিতীয়তঃ, শিল্পকে আশ্রয় করে একশ্রেণীর শ্রমিক জীবিকা অর্জন করত, যাদের শিল্প-শ্রমিক বলা হয়। এই শিল্প-শ্রমিকরা ছিল চালচুলোহীন, কারখানার কাজনির্ভর শ্রেণী। এরা কারখানা-মালিকদের কাছে তাদের শ্রম বিক্রি করত। বিনিময়ে পেত যৎসামান্য মজুরি। এই শ্রমিকরাই ছিল শিল্পকারখানার প্রাণ। তারা কারখানায় যে সামান্য মজুরি পেত তার দ্বারা কায়ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্বাহ করত। শ্রমিক বস্তিগুলিতে মড়ক, নৈতিক স্খলন, দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে জীবনযাত্রা নরকের পাঁকে পরিণত হয়। শ্রমিক-বস্তিগুলির ঘরবাড়ি ছিল অন্ধকার, অপরিচ্ছন্ন। বাড়ীগুলির আশেপাশে সর্বদা স্তূপীকৃত নোংরা জমে থাকত। কোন পৌর প্রতিষ্ঠান না থাকায় সেগুলি সাফাই হত না। একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, ম্যাঞ্চেস্টার শিল্পশহরের একটি পাড়ার ৮৫০টি গৃহের মধ্যে ৩২৩টিতে পায়খানা ছিল না। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্যে শ্রমিক পরিবারগুলি যক্ষা, বসন্ত, টাইফয়েড, কলেরা প্রভৃতি মারাত্মক রোগে উজাড় হয়ে যেত। পানীয় জলের বিশুদ্ধতা ছিল না এবং পর্যাপ্ত জলসরবরাহ ছিল না। শ্রমিক-বস্তিগুলির নৈতিক পরিবেশ ছিল ভয়ঙ্কর খারাপ। মদ্যপান ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা শ্রমিকদের জীবনকে লক্ষ্যহীন ও ক্লেদাক্ত করে দেয়।

শিল্প-শ্রমিকরা দক্ষ ও অদক্ষ দুইভাগে বিভক্ত ছিল। দক্ষ শ্রমিকরা অপেক্ষাকৃত বেশী হারে মজুরি পেত। বাকী সাধারণ শ্রমিকরা কম হারে মজুরি পেত। মালিকরা শ্রমিকদের বহু ঘণ্টা ধরে কারখানায় খাটিয়ে অত্যন্ত কম মজুরি দিত। মাঝে মাঝে কারখানা থেকে ছাঁটাই করত।

শ্রমিকশ্রেণীর দূরবস্থা

সাধারণতঃ কারখানার বায়ু চলাচলহীন, ধূলিধূসরিত, অন্ধকারময় ঘরে শ্রমিকদের ১২-১৪ ঘণ্টা কাজ করতে হত। এজন্য শ্রমিকদের অকালমৃত্যু ঘটত। শিল্প-বিপ্লবের ফলে শিল্প-সামগ্রীর প্রভূত উৎপাদন এবং সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা এর ফলে আরামপ্রদ হয়। কিন্তু শ্রমিকের জীবনে আসে অভাব, দারিদ্র্য,

অকালমৃত্যু। মার্কসের মতে, "সূর্যালোকিত দিনের মাঝে শ্রমিকের জীবন ছিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন।" শিল্প-বিপ্লবের যুগে শিশু ও নারী শ্রমিকের সমস্যা ছিল ভয়াবহ। পিতামাতাহীন অনাথ শিশু অথবা দরিদ্র শ্রমিকদের সন্তানদের মালিকরা কষ্টকর কাজে দীর্ঘসময় ধরে খাটাত। এজন্য তাদের নামমাত্র মজুরি দেওয়া হত। দৈহিক কষ্ট, অনাহার ও রোগে এই শিশু-শ্রমিকরা অকালে মারা যেত। নারী-শ্রমিকদেরও বেশী সময় কাজ করিয়ে কম হারে মজুরি দেওয়া হত। এই শিশু-শ্রমিকদের নাম ছিল "শিক্ষানবিস শিশু" (apprentice children)। পার্লামেন্ট আইন করে শিশু-শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ করলেও পরিদর্শকের অভাবে দীর্ঘকাল এই আইন চালু হয় নি।

শিল্প-বিপ্লবের অন্যান্য ফলগুলিও কম সুদূর-প্রসারী ও চমকপ্রদ ছিল না। শিল্প-দ্রব্য উৎপাদনের জন্যে বাষ্পচালিত যন্ত্র ব্যবহারের ফলে শিল্প-দ্রব্যের উৎপাদনের হার বেড়ে যায়। লোকের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হয়। কৃষির বিকল্প হিসাবে শিল্প একটি প্রধান জীবিকায় পরিণত হয়। লোকে কল-কারখানায় কাজের লোভে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসতে থাকে। স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রামীণ জীবনযাত্রা শিল্প-বিপ্লবের আঘাতে ভেঙে পড়ে। কারখানায় যন্ত্রে তৈরী মালের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কুটিরশিল্প পিছু হটতে বাধ্য হয়। কুটির-শিল্প ধ্বংস হলে যে সকল লোকে হাতের কাজ করে জীবনধারণ করত, তারা জীবিকাহীন, বেকার মজুরে পরিণত হয়। বেশ কিছুদিন ধরে কল-কারখানাকে তারা তাদের জীবিকার শত্রু মনে করে কারখানা ভাঙার জন্যে দাঙ্গা বাধায়। এভাবে ইংলণ্ডে "লাডাইট দাঙ্গা" (Luddite Riot) চলে।

কুটির শিল্পের ধ্বংস : গ্রাম জীবনের পরিবর্তন : লাডাইট দাঙ্গা

শিল্প-বিপ্লবের ফলে কল-কারখানায় মূলধন খাটিয়ে শিল্পপতিরা প্রচুর মুনাফা পায়। আগে সামন্তশ্রেণী বা ধনী জমিদাররা সমাজ ও রাষ্ট্রে যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ভোগ করত, এখন এই ধনী বুর্জোয়ারা সেই প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা ভোগ করে। এই শ্রেণীকে পুঁজিপতি বা ধনতন্ত্রবাদী (Capitalist) শ্রেণী বলা হয়। সমাজে ধনবণ্টনের ব্যবস্থা না থাকায় এই শ্রেণীর হাতে শিল্প-বাণিজ্যের মুনাফা জমা হয়। এই শ্রেণী অভিজাতদের হটিয়ে সরকারী ক্ষমতা দখল করে। অভিজাতদের ছিল বংশকৌলীন্য; ধনী বুর্জোয়াদের ছিল ধনকৌলীন্য। তারা সংবিধান বদলে সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটদানের আইন চালু করে। ফলে সম্পত্তিবান বুর্জোয়ারাই ভোটাধিকার পায়। এদের সাহায্যে বুর্জোয়াশ্রেণী সরকারকে নিজহাতে রাখে। নিজশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্যে তারা আইন রচনা করে এবং শ্রমিক-আন্দোলন ভাঙার জন্যে সরকারের প্রশাসন, আইন, পুলিশ ব্যবহার করে। সমাজে ধনী-দরিদ্রের ফারাক বাড়তে থাকে। দার্শনিক মার্কসের মতে, "ধনী আরও ধনী হয়; গরীব আরও গরীব হয়।" এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যে সমাজতন্ত্রবাদ ও শ্রমিক আন্দোলন আরম্ভ হয়। (বিশদ পরে দ্রষ্টব্য)।

বুর্জোয়া, পুঁজিবাদী শ্রেণীর উদ্ভব ও তাদের প্রভাব

শিল্প-বিপ্লবের ফলে কৃষি-অর্থনীতির বিকল্প হিসাবে শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির প্রসার হয়। শিল্প-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে শহরের সংখ্যা বাড়ে। শহরে লোকসংখ্যা বাড়লে শহরে গৃহসমস্যা, পানীয় জলের ও অন্যান্য সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যা যতদিন না সমাধান হয় ততদিন শহরবাসী বুর্জোয়া, নিম্নমধ্যবিত্ত বা পেটি বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণী তীব্র আন্দোলন চালায়। জুলাই (১৮৩০ খ্রীঃ) ও ফেব্রুয়ারী (১৮৪৮ খ্রীঃ) বিপ্লব ইওরোপের শিল্প-শহরগুলিতে প্রধানতঃ দেখা দেয়। নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকরা উপলব্ধি করে যে, ভোটাধিকার লাভ করে পার্লামেন্টে নিজ নিজ শ্রেণীর জন্যে আইন রচনা করতে পারলে নিজশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা যাবে। সুতরাং যাতে পার্লামেন্টের নির্বাচনে শ্রমিক ও সাধারণ লোকে

নগর জীবনের প্রসার ও সমস্যা বৃদ্ধি : সর্বসাধারণের ভোটাধিকার আন্দোলন

ভোটাধিকার পায় এজন্যে ইংলন্ডে চার্টিস্ট (Chartist) আন্দোলন দেখা দেয়। ফ্রান্সেও ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবে সর্বসাধারণের ভোটাধিকারের দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি আদায়ের জন্যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও ধর্মঘট করে। শিল্পবিস্তারের ফলে সমাজতন্ত্রবাদের বিশেষ অগ্রগতি হয়। সেন্ট সাইমন, ফুরিয়ের, রবার্ট আওয়েন প্রভৃতি সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন তত্ত্ব প্রচার করেন। কার্ল মার্কস শ্রমিকের দ্বারা রাষ্ট্রগঠনের কথা বলেন এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপের কথা বলেন।

শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইওরোপে শিল্পে অগ্রসর জাতিগুলির মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ তীব্রভাবে দেখা দেয়। এই সকল দেশের শিল্পপতিরা শিল্পে মূলধন খাটিয়ে, শ্রমিককে কম মজুরি দিয়ে এবং প্রায় একচেটিয়া বাণিজ্যের দ্বারা মুনাফার পাহাড় জমায়। হব্‌সন নামে অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকের মতে, এই বাড়তি মুনাফা তারা শিল্পে অনগ্রসর দেশ ও উপনিবেশে শিল্পগঠনে লগ্নী করে আরও মুনাফা পাওয়ার জন্যে সচেষ্ট হয়। তাছাড়া, ইওরোপের এই সকল দেশের কারখানায় দরকারের অপেক্ষা বেশী মাল তৈরি করা হয় এবং মুনাফার লোভে সেগুলি বিক্রির জন্যে উপনিবেশের একচেটিয়া বাজার দখলের চেষ্টা চালানো হয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ ভারত, চীন, ইন্দোচীন, আফ্রিকার অধিকাংশ স্থানে উপনিবেশ দ্বারা একচেটিয়া বাজার গঠন করে। জার্মানী প্রভৃতি দেশ পরে শিল্পে অগ্রসর হয়ে বাজার না পেয়ে যুদ্ধ বাধায়। এইভাবে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ও বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়।

সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের উদ্ভব : বাজার দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন (The Working Class Movement) : শিল্প-বিপ্লবের ফলে শিল্প-শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভবের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। (তৃতীয় পরিচ্ছেদ পৃঃ ৮২ দ্রষ্টব্য)। শিল্প-বিপ্লবের গোড়ার দিকে শিল্পপতিগোষ্ঠী অতিরিক্ত মুনাফার লোভে শ্রমিকদের কম মজুরি দিত এবং বেশী সময় ধরে কারখানায় খাটাত। যন্ত্রপাতিগুলি ছিল তখনকার যুগে খুবই অনুন্নত ও নিম্নমানের। কারখানাগুলির ভিতর ঠাণ্ডা, ধোঁয়া, ধূলা ও প্রচণ্ড শব্দের সমন্বয়ে এক নরককুণ্ড সৃষ্টি হত। এই অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে শ্রমিককে দিবা-রাত্রের বেশির ভাগ সময় কাজ করতে হত। ফলে তার অকালমৃত্যু হত। শ্রমিকের কোন অধিকার না থাকায় ছাঁটাইয়ের ভয়ে তাকে সদাই ত্রস্ত থাকতে হত। কারখানার পাশের বস্তিতে অত্যন্ত নোংরা পরিবেশে, অসামাজিক পরিমণ্ডলে সে ও তার পরিবারের লোকেরা কায়ক্লেশে জীবন কাটাত।

শ্রমিকশ্রেণীর দূরবস্থা

এই সময় ইংলন্ডে কোন কোন চিন্তাশীল লোক শ্রমিকদের দুরবস্থার প্রতিকারের জন্যে সচেষ্ট হন। ফরাসী বিপ্লবের আমল থেকে ইংলন্ডে সভা, সমিতি ও ইউনিয়ন গড়া নিষিদ্ধ ছিল। ফলে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনও ইংলন্ডে নিষিদ্ধ ছিল। এই নিষেধমূলক আইনের নাম ছিল 'কম্বিনেশন আইন' (Combination Act)। জনমতও শিশু-শ্রমিকদের কারখানায় কাজের ব্যাপারে উদাসীন ছিল। পূর্ণ শ্রমিকদের ব্যাপারে জনমত একবারেই অনুকূল ছিল না। বরং এমন সকল লোক ছিল, যারা বলত যে শ্রমিক-শিশুরা কারখানায় কাজ করলে জনসাধারণের উপর তারা উৎপাত করতে সময় পাবে না। শ্রমিকরা কারখানায় বেশী সময় কাজ করলেই ভাল। তাদের আর্থিক অবস্থা ভাল হবে এবং ভিক্ষাবৃত্তি ও অসামাজিক কাজের দ্বারা লোকজনকে উত্যক্ত করবে না। একমাত্র কিছু চিন্তাশীল লোক শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে ভাবতেন। শ্রমিকদের সংগ্রাম তাদের নিজেকেই করতে হয়। ইংলন্ডের পার্লামেন্টও শ্রমিকদের সমস্যার প্রতি উদাসীনতা দেখায়।

শ্রমিক আন্দোলনের উপর নিষেধাজ্ঞা

১৮১৫ খ্রীঃ ভিয়েনা-চুক্তির পরেই ইংলণ্ডে টোরী দলের শাসনের বিরুদ্ধে হুইগ দল যে প্রবল আন্দোলন গড়ে, তাতে তারা শ্রমিকদের সাহায্য নেয়। শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া জানাবার জন্যে বিভিন্ন সভা-সমিতি হুইগ দলের সাহায্যে আরম্ভ হয়। শিশু-শ্রমিকদের দুর্দশার জন্যে হুইগ সংবাদপত্রগুলি লেখালেখি শুরু করায় টোরী সরকারের টনক নড়ে। ১৮৩৩ খ্রীঃ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এক আইন প্রয়োগ করে। এই আইনে বলা হয় যে ৯-১২ বছরের শিশুদের কারখানায় সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার বেশী খাটালে মালিক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে। এই শিশুদের প্রত্যহ ২ ঘণ্টা স্কুলে পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যাদের বয়স ১৮ বছরের কম, তাদের সপ্তাহে ৬৯ ঘণ্টার বেশী কাজ করানো যাবে না। ১৮৪২ খ্রীঃ এক আইন দ্বারা বলা হয় যে খনিগর্ভে ১০ বছরের কম বয়সের কোন বালকবালিকাকে কাজে নিযুক্ত করা চলবে না। বয়স্ক শ্রমিকদের জন্যে তখনও কোন আইন রচিত হয় নি। এজন্য শ্রমিকরা আন্দোলন চালাতে বাধ্য হয়। শ্রমিক-সমিতি গঠন নিষিদ্ধ হলেও বহু গুপ্তসমিতি গঠিত হয়। শ্রমিকদের পক্ষ নিয়ে উইলিয়াম কবেট (William Cobbett) এবং জন কার্টরাইট (John Cartwright) বিভিন্ন পুস্তিকা ও প্রবন্ধ রচনা করেন এবং জনমতকে আলোকিত করার চেষ্টা করেন। সরকার আইন করে এই ধরনের রচনা নিষিদ্ধ করলে শ্রমিকরা চটে যায়। থিসেল উড নামে এক গরম্-মাথা শ্রমিক-নেতা কিছু শ্রমিক জুটিয়ে এবং একটি বন্দুকের দোকান লুট করে সেই অস্ত্র নিয়ে লন্ডন নগর আক্রমণ করেন। পুলিশ তাঁকে ও তাঁর সহকারীদের গ্রেপ্তার করে। সরকার এই সামান্য ঘটনার অজুহাতে এর পর আন্দোলন-রত শ্রমিকদের 'হেবিয়াস কর্পাস' আইনে সভা-সমিতি করার অধিকার কেড়ে নেন।

ইংলণ্ডে হুইগ দলের শ্রমিক স্বার্থ সমর্থন : কবেট ও কার্টরাইট

সরকার শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে সেন্ট পিটারের ময়দানে প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিক সমবেত হয়। ম্যানচেস্টারের কারখানা থেকে এই শ্রমিকরা সপরিবারে কম্বল কাঁধে করে সভাস্থলে আসে। এজন্যে এই সভাকে 'কম্বলধারীদের অভিযান' (March of the blanketeers) বলা হয়। স্থানীয় প্রশাসন ভীত হয়ে সেনাদলকে শ্রমিক-সমাবেশের উপর আক্রমণের নির্দেশ দিলে প্রায় ১১ জন শ্রমিক নিহত এবং কয়েক শত আহত হয়। সেন্ট পিটারের হত্যাকাণ্ড ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত লোকেদের দ্বারা তীব্রভাবে ধিকৃত হয়। পার্লামেন্টে এই ঘটনাকে "পিটারলু"র (Peterloo) হত্যাকাণ্ড বলে নিন্দা জানানো হয়। ওয়াটার্লু-বিজয়ী সেনাদলকে শ্রমিকহত্যার জন্যে সেন্ট পিটারের ময়দানে নিয়োগ করায় এই শোকাবহ ঘটনাকে পিটারলুর হত্যাকাণ্ড (১৮১৯ খ্রীঃ) বলা হয়। সমিতি নিষিদ্ধকরণ আইনের বিরুদ্ধে ফ্রান্সিস প্লেস নামে এক অবসরপ্রাপ্ত দর্জি আন্দোলন গঠন করেন। সরকার ১৮২৪ খ্রীঃ সমিতি নিষিদ্ধকরণ আইন লোপ করেন। ১৮২৫ খ্রীঃ থেকে শ্রমিকরা ধর্মঘট ও দাঙ্গাহাঙ্গামার মাধ্যমে কাজের সময় কমাবার চেষ্টা করে। সরকার দমননীতির দ্বারা শ্রমিক আন্দোলনকে হতবল করেন।

পিটারলুর হত্যাকাণ্ড

ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে ভোটাধিকার সম্প্রসারণ দাবি তীব্রতর হয়। হুইগ দলের সঙ্গে শ্রমিকরাও এই দাবির সমর্থনে যোগ দেয়। ১৮৩২ খ্রীঃ প্রথম ভোটাধিকার আইন পাস হলে ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের চরিত্র অনেক বেশী গণমুখী হয়। ১৮৩৩ খ্রীঃ প্রথম ফ্যাক্টরী আইন পাস হয়। ১০ বছরের কম বয়সের বালক-বালিকাকে প্রত্যহ ৮ ঘণ্টার বেশী কাজ করানো নিষিদ্ধ হয়। রাত্রিকালে শিশুদের কারখানার কাজে নিয়োগ নিষিদ্ধ হয়। শ্রমিকদের নগদ বেতনের পরিবর্তে

তৈয়ারী জিনিসপত্র দ্বারা বেতন প্রদান বা ট্রাক-প্রথা নিষিদ্ধ হয়। ১৮৪২ খ্রীঃ কারখানায় স্ত্রী-শ্রমিকদের ৮—১০ ঘণ্টার বেশী কাজ করানো এবং রাত্রিকালে কাজ করানো নিষিদ্ধ হয়। খনির কাজে স্ত্রীলোক ও শিশুদের নিয়োগ নিষিদ্ধ হয়। এ ছাড়া দরিদ্র ও কর্মহীন শ্রমিকদের জন্যে ১৮৩৪ খ্রীঃ দরিদ্র-সহায়তা আইন বা পুওর ল' (Poor Law) পাস হয়।

হুইগ দলের শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন

শ্রমিকরা তাদের দাবিদাওয়া আদায়ের জন্যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গঠন করে। ১৭৯০ খ্রীঃ থেকে ট্রেড ইউনিয়ন নিষিদ্ধ থাকায় শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে বাধা পায়। কিন্তু ১৮২৪ খ্রীঃ থেকে আইনের বাধা অপসারিত হলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে উঠে। ১৮৩২ খ্রীঃ ভোটাধিকার আইন দ্বারা শ্রমিক-সমাজের বিশেষ উপকার না হলে হতাশা বাড়ে। ফলে ট্রেড ইউনিয়নগুলি-সহ বে-আইনী ধর্মঘট শ্রমিকরা আরম্ভ করে। ১৮৩৩ খ্রীঃ গ্রান্ড ন্যাশনাল কন্‌সলিডেটেড ট্রেড ইউনিয়ন (Grand National Consolidated Trade Union) গড়া হয়। রবার্ট আওয়েন ছিলেন এই সমিতির প্রধান সংস্থাপক। এই সমিতি সকল শ্রমিকের জন্যে ৮ ঘণ্টা কাজের সময় ও অন্যান্য অধিকার দাবি করে। কিন্তু মালিকদের চক্রান্তে ও সরকারের বিরোধিতায় ১৮৩৫ খ্রীঃ এই সমিতি ভেঙে যায়।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিস্তৃতি

এর পরে ইংলন্ডের শ্রমিক-সংস্থাগুলি কতকগুলি দাবিপত্রের সনদ বা চার্টার গ্রহণ করে। এই দাবিপত্র নিয়ে যারা আন্দোলন করে তাদের চার্টিস্ট (Chartist) বলা হয়। ১৮৩৬ খ্রীঃ উইলিয়ম লোভেট (William Lovett) নামে রবার্ট আওয়েনের এক প্রাক্তন শিষ্য লন্ডন শ্রমিক-সমিতি (London Workingmen's Association) স্থাপন করেন। শ্রমিক সহ সমাজের সকল শ্রেণীর ন্যায্য অধিকারলাভের জন্যে এই সমিতি ১৮৩৮ খ্রীঃ একটি সনদ বা দাবিপত্র প্রচার করে। এই দাবিপত্রের নাম ছিল "জনগণের সনদের পত্র" (People's Charter)। এই দাবিগুলি ছিল—(১) বাৎসরিক পার্লামেন্ট নির্বাচন; (২) সর্বসাধারণের ভোটাধিকার প্রবর্তন; (৩) সমান আকৃতির নির্বাচনকেন্দ্র গঠন; (৪) সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার আইন লোপ; (৫) গোপন ব্যালটের দ্বারা নির্বাচন চালনা; (৬) পার্লামেন্টের সদস্যদের ভাতা প্রদান। ক্রমে চার্টিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব ও' কোনর, ও' ব্রায়েন প্রভৃতি চরমপন্থী, গরম-মাথা লোকদের হাতে চলে যায়। তাঁরা লন্ডনের শ্রমিক-সম্মেলনে প্রস্তাব নেয় যে, যদি পার্লামেন্ট তাঁদের দাবিপত্র নাকচ করে, তবে সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হবে ও জনসাধারণের হাতে অস্ত্র দেওয়া হবে। কিন্তু পার্লামেন্ট এই দাবি নাকচ করে। এরপর ও' কোনরের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং চার্টিস্ট আন্দোলন বিফল হয়। সরকার কিছু কিছু শ্রমিক-কল্যাণমূলক আইন পাস করে শ্রমিকদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেন। (আগে ১৮৩৫ খ্রীঃ পাস-করা আইনগুলির বিবরণ দ্রষ্টব্য)। ১৮৬০ খ্রীঃ বস্ত্রকল শ্রমিকদের প্রত্যহ ১০ ঘণ্টা রবিবার বাদে সপ্তাহে ৬০ঘণ্টা কাজ করার জন্যে আইন পাস করা হয়। এছাড়া শ্রমিক-সমবায় বা কো-অপারেটিভ গঠন করা হয়। ১৮৬৮ খ্রীঃ ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস স্থাপিত হলে ইংলন্ডে শ্রমিক আন্দোলন বিশেষ সংগঠিত হয়।

চার্টিস্ট আন্দোলন

ফ্রান্সে ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই-বিপ্লবের পর শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে শ্রমিক-সমস্যাও দেখা দেয়। লুই ফিলিপ ছিলেন বুর্জোয়া রাজা। তিনি শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি উদাসীন থাকেন।

লায়নসের শিল্প-শ্রমিকরা কম মজুরি, ১৮ ঘণ্টা কাজের প্রতিবাদে ১৮৩১ খ্রীঃ বিদ্রোহ করে এবং লুই ফিলিপ সেনাদল দ্বারা তা দমন করেন। ১৮৩৪ খ্রীঃ লায়নস, প্যারিস, বোর্দো নগরে শ্রমিক বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং পুনরায় সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা হয়। এই পরিস্থিতিতে সেন্ট সাইমন্, ফিলিপ বুনারোত্তি, অগাস্ত ব্ল্যাঙ্কি তাঁদের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচার করেন।

ফ্রান্সে শ্রমিক আন্দোলন লুই ফিলিপের নীতি

১৮৪৭ খ্রীঃ শস্যহানির ফলে খাদ্যশস্যের দাম বাড়লে ফ্রান্সের শ্রমিকদের দুঃখকষ্ট অসহনীয় হয়। এই সময় সমাজতন্ত্রবিদ্ লুই ব্যাঙ্ক তাঁর Organisation of Labour-এর তত্ত্ব প্রচার করেন। শ্রমিকশ্রেণীর অসন্তোষ লক্ষ্য করে ঐতিহাসিক ও রাজনীতিবিদ্ তক্ভিল জাতিকে সতর্ক করে বলেন যে, "এই আবেগ সমাজের বিরুদ্ধে...আমরা একটি আগ্নেয়গিরির উপর বসে আছি। ঈশ্বরের নামে বলছি সরকারের নীতি পাল্টান, নতুবা ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।" ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে প্রজাতন্ত্রবাদী নিম্নমধ্যবিত্ত ও সমাজতন্ত্রবাদী শ্রমিকরা যৌথভাবে লুই ফিলিপের পতন ঘটায়। ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়। (তৃতীয় অধ্যায়, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ পৃঃ ৬৭ দ্রষ্টব্য)।

১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লব : শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা

দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হলে শ্রমিকদের কর্মের অধিকার (Right to work) স্বীকার করা হয়। বেকার শ্রমিকদের প্রত্যহ কাজ দিলে ২ ফ্রাঁ এবং কাজ না করলে ১ ফ্রাঁ হারে ভাতা কিছুদিন দেওয়া হয়। এজন্যে জাতীয় কর্মসংস্থান-কেন্দ্র বা ন্যাশনাল ওয়ার্কশপ স্থাপন করা হয়। কিছুদিন বাদে নির্বাচনে প্রজাতন্ত্রী মধ্যবিত্তরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে জাতীয় কর্মশালাগুলি বন্ধ করে বেকার শ্রমিকদের হটিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে সমাজতন্ত্রীদের নেতৃত্বে হাজার হাজার শ্রমিক বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং প্যারিসের রাস্তায় অবরোধ বা ব্যারিকেড রচনা করে। সরকার সেনাপতি ক্যাভিগ্ন্যাককে এই বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব দেন। ক্যাভিগ্ন্যাক রক্তাক্ত হাতে এই বিদ্রোহ দমন করেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন ক্ষমতায় এসে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ধর্মঘটের অধিকার দেন। তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের আমলে ফরাসী শ্রমিকরা আরও অধিকার পায়। ১৮৯৫ খ্রীঃ C. G. T. নামে ফ্রান্সে এক কেন্দ্রীয় শ্রমিকসংগঠন হয়। ট্রেড ইউনিয়নগুলি এই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র : শ্রমিকশ্রেণীর বিদ্রোহ : জুনের গৃহযুদ্ধ

রাশিয়ায় ১৯০৬ খ্রীঃ পর্যন্ত শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন নিষিদ্ধ হলেও, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৮৭৯ খ্রীঃ সেন্ট পিটার্সবার্গ শ্রমিক ধর্মঘট হয়। ১৮৮৫ খ্রীঃ মস্কোর মরোজোভ কারখানায় ধর্মঘট হয়। জার তৃতীয় আলেকজান্ডারের আমলে রাশিয়ায় শিল্প-কারখানার বহু বিস্তার হয়। ফলে শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যা ১৮৯৬ খ্রীঃ ছিল কমপক্ষে ১৭ লক্ষ ৪২ হাজার। এই শ্রমিকরা গড়ে ১২-১৪ ঘণ্টা কাজ করতে বাধ্য হত। শ্রমিকদের মজুরি ১৮৮০ খ্রীঃ ছিল পশ্চিম ইওরোপের শ্রমিকের মজুরির ভগ্নাংশ মাত্র। মার্কসবাদী কমিউনিস্টরা রুশ শ্রমিকদের মধ্যে গুপ্ত সংগঠন তৈয়ারি করে। ১৮৯৫ খ্রীঃ পিটার্সবার্গে শ্রমিকদের সোভিয়েত গঠিত হয়। ১৮৯৭ খ্রীঃ ৮,৮৭,০০০ শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দেয়। ১৯০৫ খ্রীঃ রুশ-জাপান যুদ্ধে জার সরকার পরাজিত হলে রাশিয়ার জার শাসনের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। সেন্ট পিটার্সবার্গের শ্রমিকরা ব্যাপক ধর্মঘট দ্বারা জার সরকারকে অচল করার চেষ্টা করে। ফাদার গ্যাপন নামে এক জারের গুপ্তচর ধর্মযাজক, জারের কাছে শান্তিপূর্ণ আবেদনের জন্যে শ্রমিক মিছিল পরিচালনা করেন। আসলে তিনি ছিলেন জার সরকারের গুপ্তচর। এই শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর জারের সেনাদল নির্মমভাবে গুলিবর্ষণ করে।

রাশিয়ায় শ্রমিক আন্দোলন

এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রাশিয়ার শিল্প-কারখানাগুলিতে লাগাতার ধর্মঘট চলে। রিগা শহরে ৬০ হাজার শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দেয়। জার সরকার পার্লামেন্ট বা ডুমা আহ্বান করতে প্রতিশ্রুতি দিলে ধর্মঘটে ছেদ পড়ে। সেই সুযোগে জারের সেনাদল ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়। পেট্রোগ্রাডের শ্রমিক সোভিয়েত নাগরিকদের রাজস্ব প্রদান রদ করার ডাক দেয়; ব্যাঙ্ক থেকে সকলকে জমা টাকা তুলে নিয়ে ব্যাঙ্ক অচল করার ডাক দেয়। কিন্তু তাতে বিশেষ ফল হয় নি।

১৯০৫-১৯১৭ খ্রীঃ পর্যন্ত রাশিয়ার শ্রমিকদের সংগঠন বিশেষ মজবুত হয়। বলশেভিক দল শ্রমিক সোভিয়েতগুলিকে নেতৃত্ব দেয়। জার সরকার প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিলে জার্মানীর হাতে রাশিয়া পরাস্ত হয়। জার্মান সেনা রাশিয়ার একাংশ অধিকার করে। যুদ্ধে যোগদানের ফলে রাশিয়াতে অর্থনৈতিক ধস নামে। জার সরকারের বিরুদ্ধে সর্বত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়। শ্রমিকরা বলশেভিকদের নির্দেশে লাগাতার ধর্মঘট দ্বারা জার সরকারকে অচল করে দিলে, জার বাধ্য হয়ে চতুর্থ ডুমার অধিবেশন ডাকেন। চতুর্থ ডুমার অধিকাংশ সদস্য ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধি। তারা জার তৃতীয় আলেকজান্ডারকে পদচ্যুত করে জারতন্ত্রের অবসান ঘটায়। ৪র্থ ডুমা রাশিয়ায় একটি অস্থায়ী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। যদিও শ্রমিক-বিদ্রোহের ফলেই জার সরকারের পতন হয়, কিন্তু সরকারের ক্ষমতা শ্রমিকদের সমর্থিত দল বলশেভিকদের হাতে আসে নাই। বুর্জোয়াশ্রেণী অস্থায়ী প্রজাতন্ত্রের মাধ্যমে জার সরকারের হাত থেকে ক্ষমতা দখল করে নেয়। অস্থায়ী প্রজাতন্ত্রের কাছে শ্রমিকরা প্রত্যহ ৮ ঘণ্টা কাজের সময়সূচক আইন ও ন্যায্য মজুরি দাবি করে। প্রজাতন্ত্রী সরকার এই দাবি উপেক্ষা করায় শ্রমিকরা এই সরকারের পতন কামনা করে।

এইসময় বলশেভিক নেতা লেনিন ঘোষণা করেন যে, অস্থায়ী সরকারের পতন চাই। শ্রমিক সোভিয়েতগুলি ও অন্যান্য সোভিয়েতের হাতে সকল ক্ষমতা ন্যস্ত করা দরকার। পেট্রোগ্রাডের শ্রমিকরা প্রজাতন্ত্রী সরকারের সদরদপ্তরগুলি দখল করলে অস্থায়ী প্রজাতন্ত্র সরকারের পতন ঘটে। রাশিয়ায় বলশেভিকদের নেতৃত্বে শ্রমিক সমর্থিত সরকার ঘোষিত হয়। রাশিয়ায় শ্রমিক বিপ্লব জয়যুক্ত হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ সমাজতন্ত্রবাদের অগ্রগতি ঃ আদি সমাজতন্ত্রবাদ (Growth of Socialist Thoughts : Early Socialism) ঃ মধ্যযুগে ইংলন্ডের চিন্তাবিদ স্যার টমাস মোর (Thomas More) 'ইউটোপিয়া' নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে টমাস মোর সর্বপ্রথম (১৫১৬ খ্রীঃ) সমাজে সকলের জন্যে ধনবণ্টন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপের কথা প্রচার করেন। ফরাসী বিপ্লবের আগে অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত দার্শনিক রুশোর চিন্তাধারায় প্রথম সমাজতন্ত্রবাদের ছায়া দেখা যায়। রুশো ঘোষণা করেন যে, মানুষ মাত্রেই সমান অধিকার নিয়ে জন্মায়। সমাজে লোভ, সম্পত্তির মোহ ও দুর্নীতি মানুষে মানুষে প্রভেদ রচনা করে, ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান সৃষ্টি করে। Inequality বা সমাজে অর্থনৈতিক অসাম্যকে তিনি সমাজে মানুষের দুর্নীতি ও লোভের ফল বলে বর্ণনা করেন। সুতরাং ফরাসী বিপ্লবের Fraternity বা ভ্রাতৃত্ববাদকেই সমাজতন্ত্রের পথ বলে মনে করা হয়। প্রাক-মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রবাদকে মার্কসবাদীরা অবাস্তব সমাজতন্ত্রবাদ বা ইউটোপীয়ান সমাজতন্ত্রবাদ বলে সমালোচনা করেন।

ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী যুগে ইংলণ্ডে রবার্ট আওয়েন সমাজতন্ত্রবাদের তত্ত্ব প্রচার করেন। তিনি নিউ লানার্ক মিলের ম্যানেজার হিসাবে শ্রমিকদের বহু কল্যাণমূলক কাজ চালু করেন।

রবার্ট আওয়েন

তিনি ১৮২৫ খ্রীঃ ইণ্ডিয়ানায় স্বেচ্ছাক্রমে স্বয়ং-শাসিত একটি সমাজতান্ত্রিক সমবায় অর্থনীতিযুক্ত সম্প্রদায় স্থাপনের পরীক্ষা করেন। এইপরীক্ষার তিনি নাম দেন "নিউ হারমনি" (New Harmony)। শ্রমিকরা যাতে ন্যায্য মূল্যে জিনিসপত্র পায়, এজন্যে তিনি বিনা-লাভ বিনা-ক্ষতি নীতিতে সমবায়-বিপণি স্থাপন করেন। রবার্ট আওয়েন এমন একটি সমাজের কথা ভাবেন যেখানে প্রতিযোগিতার স্থলে সহযোগিতা ও সমবায় থাকবে।

ইওরোপীয় সমাজতন্ত্রবাদের আদি গুরু ছিলেন ফ্রান্সের হেনরী সেন্ট সাইমন (১৭৩০—১৮২৫ খ্রীঃ)। তাঁর বিখ্যাত রচনার নাম ছিল "নবখ্রীষ্টবাদ"। তিনি বলেন যে, লোকে অর্থনৈতিক বা ধনবন্টনের অসাম্যের জন্যে ধনী বা দরিদ্র শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে। সমাজে

সেন্ট সাইমন

চার্লস ফুরিয়ের

নীতিবোধ ও শিক্ষার প্রসার হলে শিক্ষিতশ্রেণী দরিদ্রদের উন্নতির চেষ্টা করবে। তিনি শ্রমিক ও মালিকের সহযোগিতা ও সমবায়ের উপর গুরুত্ব দেন। তিনিই প্রথম এই তত্ত্ব প্রচার করেন যে, "প্রত্যেকে তার ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করবে এবং প্রত্যেকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী পাবে।" সেন্ট সাইমনের সমসাময়িক ছিলেন চার্লস ফ্যুরিয়ের (১৭৭২—১৮৩৭ খ্রীঃ)। তিনি বলেন যে, সমাজে মুনাফার লোভ ও প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতা হল সামাজিক অসাম্য ও শোষণের কারণ। এজন্যে তিনি নিজের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্য নিজে ভোগ করার কথা বলেন। তিনি কমিউন বা ফ্যালাঙ্কস্টারি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন। সেন্ট সাইমনের শিষ্য ফ্যুরিয়্যের তাঁর গুরুর কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রকে বাস্তব রূপদানের চেষ্টা করেন। তিনি বলেন যে, ১৬০০—২০০০ নারী-পুরুষ দ্বারা এক-একটি কমিউন বা ফ্যালাঙ্কস্টারি হওয়া উচিত। প্রতি ফ্যালাঙ্কের হাতে ১ বর্গলীগ জমি থাকা উচিত। ফ্যালাঙ্কেসের কাহারও কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না। প্রত্যেকে নিজ নিজ শক্তি ও যোগ্যতা অনুসারে ফ্যালাঙ্কের জন্যে শ্রমদান করবে, প্রত্যেকে প্রয়োজনমত ফ্যালাঙ্কেসের সম্পদ ভোগ করবে। ফ্যালাঙ্কেসের জন্যে শ্রমদান হবে আনন্দদায়ক কাজ। ফ্যালাঙ্কেসে নারী-পুরুষের বিবাহ-প্রথা থাকবে না। যে পুরুষ ও যে নারী পরস্পরকে ভালবাসবে, তারা যৌথ জীবনযাপনের অধিকার পাবে। ফ্যালাঙ্কেসের সম্পদের ভাগ কিভাবে হবে তা ফ্যুরিয়ের স্থির করে দেন, যথা :— সমগ্র সম্পদ ১২ ভাগ হবে। তার মধ্যে শ্রমিকরা ৫, মূলধন বাবদ ৪, বুদ্ধিজীবীরা পাবে ৩ ভাগ। ফ্যুরিয়ারের আদেশ অনুযায়ী ইওরোপ ও আমেরিকায় কয়েকটি ফ্যালাঙ্ক স্থাপিত হয়।

এছাড়া ফিলিপ বুনারোত্তি, অগাস্ট ব্ল্যাঙ্কি প্রভৃতিও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা প্রচার করেন। এই সকল আদি সমাজতন্ত্রবাদীদের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তাঁরা সমাজে শ্রেণী-সংগ্রামের কথা

ইউটোপিয়

ভাবেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, তাঁরা মালিকশ্রেণীর মুনাফা বৃদ্ধি করার জন্যে শ্রমিকের শ্রমকে শোষণ করার নিন্দা করেন। তৃতীয়তঃ, মুনাফার জন্যে তীব্র প্রতিযোগিতা এবং শোষণের তাঁরা সমালোচনা করেন। তাঁরা মানুষে মানুষে সহযোগিতা, নৈতিক মূল্যবোধের জাগরণের উপর গুরুত্ব দেন। কার্ল মার্কস এই সকল সমাজতন্ত্রবাদীদের "অবাস্তব, স্বপ্নবিলাসী সমাজতন্ত্রী" বা ইউটোপিয়ান সোসালিস্ট নামে অভিহিত করেছেন। প্রথমতঃ, তাঁরা বুঝেন নাই যে, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে স্বার্থের সামঞ্জস্য সম্ভবপর নয়। রাষ্ট্রের বলিষ্ঠ হস্তক্ষেপ ও আইন দ্বারা শ্রমিকের অধিকার রক্ষা না করলে মালিকশ্রেণী স্ব-ইচ্ছায় কখনও শ্রমিককে অধিকার দিবে না। দ্বিতীয়তঃ, তাঁরা মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক

বস্তুবাদ বা ইতিহাসের দ্বন্দ্বমূলক ব্যাখ্যার চিন্তা করেন নাই। সুবিধাভোগীর বিরুদ্ধে সুবিধাহীন শ্রেণীর সংগ্রামের পথেই শ্রমিকের অধিকার অর্জন করতে হবে, একথা তাঁরা বুঝেন নাই।

সমাজতন্ত্রবাদীদের মধ্যে অনেক বেশী বাস্তবতাসম্পন্ন ছিলেন লুই ব্ল্যাঙ্ক (Louis Blanc)। তাঁর Organisation of Labour বা শ্রমিকের সংগঠন-তত্ত্ব একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। তিনি বলেন যে, শ্রমিকের স্বার্থ-রক্ষা করতে হলে সরকারকে শ্রমিক-কল্যাণমূলক আইন রচনায় বাধ্য করতে হবে। এই কারণে তিনি সর্বসাধারণের ভোটাধিকার দাবি করেন, যাতে শ্রমিকরাও ভোটাধিকার পেতে পারে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, শ্রমিকরা ভোটাধিকার পেলে রাষ্ট্রকে শ্রমিক-কল্যাণমূলক আইন-রচনায় বাধ্য করতে পারবে এবং কর্মের অধিকার বা বেকারের কাজ পাওয়ার অধিকার স্বীকৃত হবে। লুই ব্ল্যাঙ্ক ব্যক্তিগত মালিকানায় শিল্প-বাণিজ্য গঠনের নিন্দা করেন। তিনি চান গণভোটে নির্বাচিত সরকার গঠিত হলে তাতে শ্রমিক-ভোটদাতাদের সংখ্যা অনেক হবে। এই সকল শ্রমিক-ভোটদাতাদের স্বার্থে সরকার মূলধন ও কারিগরী বিনিয়োগ করে কৃষকের জন্যে খামার, শ্রমিকের জন্যে কারখানা এবং বিপণনের জন্যে দোকান খুলবে। তার মুনাফা শ্রমিক ও কৃষকদের সরকার ন্যায্য হারে বন্টন করবে। লুই ব্ল্যাঙ্কের এই সমাজতান্ত্রিক আদর্শ এখনও বহু সমাজতান্ত্রিক দেশে অনুসৃত হয়ে থাকে।

লুই ব্ল্যাঙ্ক

কার্ল মার্কস ও মার্কসীয় সমাজতন্ত্র (Karl Marx and Marxism) : জার্মানীর এক ইহুদি-পরিবারে ১৮১৮ খ্রীঃ কার্ল মার্কসের জন্ম হয়। তিনি বন ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ নেন এবং দার্শনিক হেগেলের মতবাদে কিছুকাল প্রভাবিত হন। পরে তিনি হেগেলীয় দ্বন্দ্ব-তত্ত্বকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ-তত্ত্ব প্রচার করেন। তিনি তাঁর বিপ্লবী মতবাদের জন্যে প্রাশিয়া সরকার দ্বারা বহিষ্কৃত হলে প্যারিসে চলে আসেন। ১৮৪৭ খ্রীঃ প্যারিসে তিনি কমিউনিস্ট লীগের সদস্য হিসেবে যোগ দেন। তিনি এই সময় ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের মিত্রতা লাভ করেন। এই বন্ধুত্ব উভয়ের মধ্যে আজীবন ছিল এবং উভয়ের মধ্যে বৌদ্ধিক ও আদর্শগত ঐক্য ছিল। পরে মার্কস প্যারিস থেকে বহিষ্কৃত হয়ে কিছুদিন ব্রাসেল্‌সে আশ্রয় নেন। এই সময় তাঁর ভুবন-বিখ্যাত গ্রন্থ 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' (Communist Manifesto) প্রকাশিত হয়। পরে তিনি শেষজীবন ইংলন্ডে কাটান। এছাড়া ১৮৫৯ খ্রীঃ তাঁর ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি (Critique of Political Economy) প্রকাশিত হয়। ১৮৬৭ খ্রীঃ তাঁর 'ডাস ক্যাপিট্যাল' প্রকাশিত হয়। সমাজতন্ত্রবাদের উপর এটি একটি দার্শনিক গ্রন্থ। অনেকের মতে 'ডাস ক্যাপিট্যাল' হল সমাজতন্ত্রবাদের বাইবেল বিশেষ। ১৮৮৩ খ্রীঃ এই মনীষীর মৃত্যু হয়।

কার্ল মার্কস

মার্কসবাদ বা কমিউনিজম হল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ। আদি সমাজতন্ত্রবাদ থেকে এই মতবাদের আলাদা বৈশিষ্ট্য বুঝাবার জন্যে সাধারণতন্ত্র বা কমিউনিজম বা মার্কসীয় সমাজতন্ত্র নাম দেওয়া হয়।মার্কস দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ-তত্ত্বের দ্বারা সমাজব্যবস্থার ব্যাখ্যা করেন। হেগেলের সঙ্গে মার্কসের চিন্তাধারার পার্থক্য এই যে, হেগেল মনে করতেন Idea বা আদর্শবাদ হল ইতিহাসের চালিকা-শক্তি। Ideaর ফলেই সমাজের পরিবর্তন ঘটে। মার্কস হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদকে অর্থনৈতিক স্তরে প্রয়োগ করেন। তিনি বলেন যে, অর্থনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত ও উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর বিশেষ শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ ও তার বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীর বিপ্লবই হল ইতিহাসের চালিকা-শক্তি। (১) যে-কোন সমাজব্যবস্থায় সম্পদের উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর যারা

নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে, তারাই সমাজ পরিচালনা করে। এই উৎপাদন শক্তি ও সম্পদকে দখলের জন্যে সমাজে নিরন্তর বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে। ফলে শ্রেণীদ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ইঞ্জিন যেমন গাড়ীকে চালায়, শ্রেণীদ্বন্দ্বই তেমনি ইতিহাসকে চালিত করে। (২) মার্কসের মতে, পরিবর্তন আকস্মিকভাবে ঘটে। এভাবেই বিপ্লব হয়। কারণ আগের মুহূর্তে যা ছিল জল, পরে তাপে তা হয় বাষ্প; আবার 0° ডিগ্রীতে তা হয় বরফ। এই আকস্মিক পরিবর্তন বা উল্লম্ফনই সমাজকে প্রগতির পথে পরিচালিত করে। (৩) সমাজ নেতির নিয়মে (Law of Negation) চলছে—প্রস্তাব, বিপ্রস্তাব ও সমন্বয় (Thesis, Anti-thesis and Synthesis)। প্রস্তাব ও বিপ্রস্তাব পরস্পরকে কাটাকাটি করে শেষ পর্যন্ত সমন্বয়ে পৌঁছায়। সুতরাং কোন সমাজব্যবস্থা স্থায়ী হবে না, যতক্ষণ তার মধ্যে Contradiction বা স্ব-বিরোধিতা থাকবে। (৪) মার্কস সমাজের বিকাশকে ৫টি পর্যায়ে ভাগ করেছেন; যথা—আদিম, দাসপ্রথাযুক্ত সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক সমাজ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ। (ক) আদিম সমাজে ব্যক্তি একা কিছু উৎপাদন করতে পারত না। সুতরাং যা উৎপন্ন হত সকলেই তা ভাগ করে নিত। (খ) কিছুদিন চলবার পর থিসিস-এ্যান্টিথিসিস বা প্রস্তাব-বিপ্রস্তাব তত্ত্ব অনুসারে দাস-সমাজের উদ্ভব হয়। দাস-সমাজে উৎপাদন দাসশ্রেণীর শ্রমে হলেও মালিকানা দাস-মালিকদের হাতে থাকে। (গ) ক্রমে উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। সামন্ত-প্রথার উদ্ভব হয়। সামন্ত-প্রভু উৎপাদন-ব্যবস্থার সম্পদের বৃহত্তর অংশের মালিকানা ভোগ করে, কৃষক-ভূমিদাসরা সম্পদের উৎপাদন করে, কিন্তু তারা ছিল শোষিত শ্রেণী। ক্রমে উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। শিল্প বিপ্লবের ফলে নূতন পুঁজিপতি বা বুর্জোয়াশ্রেণীর উদ্ভব হয়। বুর্জোয়াশ্রেণী সামন্ত শ্রেণীর হাত থেকে রাজনৈতিক ও সম্পদ ভোগ করার একচেটিয়া অধিকার কেড়ে নিতে চেষ্টা করে। (ঘ) শিল্প-বিপ্লবের ফলে সামন্তশ্রেণী তাদের অধিকার হারিয়ে ফেলে। ধনতন্ত্রী বা পুঁজিপতি শ্রেণী মূলধন বিনিয়োগ করে শ্রমিকের শ্রম দ্বারা উৎপাদন করতে থাকে। তারা এই উৎপাদিত সম্পদের মালিকানা ভোগ করে এবং তা বিক্রি করে মুনাফা পায়। শ্রমিককে শোষণ করে তার শ্রম নিংড়ে নিতে থাকে। এদিকে শ্রমিকের শ্রমে উৎপাদিত মাল বিক্রি করে তারা মুনাফার পাহাড় জমায়। শ্রমিকরা এই শোষণ চিরদিন মেনে নিতে পারে না। এটাই ছিল মার্কসের স্থির বিশ্বাস। কারণ তিনি ইতিহাসের দ্বন্দ্বমূলক বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করতেন। শ্রমিকশ্রেণীর বঞ্চনা ও মালিকশ্রেণীর মুনাফাবাজি ছিল বুর্জোয়া-ব্যবস্থার contradiction বা স্ববিরোধিতা বা দ্বন্দ্ব। (ঙ) মার্কস বিশ্বাস করতেন যে, এই ধনতন্ত্রী বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্ববিরোধিতা, শ্রমিক শোষণ যে শ্রেণীবিরোধ সৃষ্টি করে, তা থেকে আসবে শ্রমিক-বিপ্লব। তার ফলে পুঁজিবাদী সমাজের পতন হবে এবং প্রোলিতারিয় বা সর্বহারা শ্রমিকের শোষণহীন সমাজ ও রাষ্ট্র স্থাপিত হবে। মার্কসের মতে প্রলিতারিয় বা শোষিত সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের ফলে যে রাষ্ট্র বা সমাজ গঠিত হবে, তা হবে শ্রেণীহীন সমাজ (Classless Society); তাতে কোন শ্রেণী অপর শ্রেণীকে শোষণ করতে পারবে না। কারণ এই প্রলিতারিয় রাষ্ট্র শ্রমিকের স্বার্থে উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থাকে হাতে নিবে। ফলে আসবে সমাজতন্ত্র;—যেখানে উৎপাদন-ব্যবস্থা সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত হবে। (৫) শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ তার প্রয়োজন অনুপাতে উৎপাদনের অংশ পাবে। এই সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিষিদ্ধ হওয়ায় কেহ কাহাকেও শোষণ করতে পারবে না। (৬) মার্কস শ্রেণী-সংগ্রামকেই ইতিহাসের পরিবর্তনের হাতিয়ায় (tools of history) বলে মনে করতেন। অতীতে বুর্জোয়াশ্রেণী যেরূপ বুর্জোয়া-বিপ্লবের দ্বারা সামন্ততন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রকে ধ্বংস করে, সেইরূপ শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবের দ্বারা বুর্জোয়া বা পুঁজিপতি

মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব

শ্রেণীর আধিপত্য ধ্বংস করবে বলে তিনি বলেন। এজন্যে তিনি বলেন যে, "দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ঐক্যবদ্ধ হও। তোমাদের শৃঙ্খল ছাড়া আর কিছুই হারাবার ভয় নেই।" (৭) মার্কসীয় মূল্যতত্ত্বে উৎপাদিত দ্রব্যের প্রচলিত মূল্য নিরূপণ-পদ্ধতিকে মার্কস নাকচ করেন। তিনি বলেন যে, কোন দ্রব্যের মূল্য নিরূপণের সময় (Theory of Value) মূলধনের সুদ, পরিচালকের মুনাফা প্রভৃতিকে উৎপাদনের হিসাবের মধ্যে ধরা উচিত নয়। একমাত্র শ্রমিকের শ্রমের দ্বারাই দ্রব্য উৎপন্ন হয়। সুতরাং এই দ্রব্য বিক্রি করে যে মুনাফা পাওয়া যায়, তা শুধু শ্রমিকেরই প্রাপ্য। কারণ এই মুনাফা শ্রমিককে শোষণ করে পাওয়া যায়। "সকল প্রকার সম্পদ একমাত্র শ্রমের দ্বারা পাওয়া যায়; সুতরাং সম্পদ শ্রমিকেরই প্রাপ্য" (All wealth is due to labour and therefore to the labour all wealth is due). (৮) মার্কসের মতে, সম্পদের উৎপাদন ও বন্টনের উপর শ্রমিক-পরিচালিত রাষ্ট্রের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করলে সমাজের সকলের স্বার্থে সেই সম্পদ ব্যবহার করা সম্ভব হবে। সম্পদের জাতীয়করণ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ করলে শ্রেণীহীন সমাজ স্থাপিত হবে, শোষণ থাকবে না। (৯) মার্কস বলেন, "ইতিহাস হল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সম্পদ ও শাসনের অধিকার দখলের জন্যে সংঘাতের কাহিনী। এই সংঘাত ও দ্বন্দ্বের মূলে আছে উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর আধিকার স্থাপনের জন্যে সংগ্রাম। সুতরাং ইতিহাসের নিয়মে পুঁজিবাদী বুর্জোয়াতন্ত্রের পতন ও প্রলিতারীয় বা সর্বহারা শ্রমিক-রাষ্ট্রের উত্থান হতে বাধ্য।

সমালোচনা

মার্কসীয় মতবাদের সমালোচনা করে বলা হয় যে, ইতিহাসের গতি কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। অর্থনীতি ছাড়া আদর্শ, ব্যক্তি প্রভৃতি নানা প্রভাব দ্বারা ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, দ্বন্দ্ববাদ ইতিহাসের চাবিকাঠি হতে পারে না। কারণ যে-কোন প্রস্তাবকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট পথে ব্যাখ্যা করা হয়। ইতিহাস এই পথ মেনে না-ও চলতে পারে। ডেভিড টমসনের মতে, "ইতিহাস কোন ছক ধরে চলে না। ঐতিহাসিকরাই ইতিহাসের গতিপথের উপর ছক চাপিয়ে দেন।" তৃতীয়তঃ, ইতিহাসের বিষয়বস্তু মানুষ ও তার সামাজিক সম্পর্ক। এই সম্পর্ক এতই জটিল, মনঃস্তাত্ত্বিক, যে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দ্বারা তার হদিশ পাওয়া যায় না। চতুর্থতঃ, মার্কস হিংসাত্মক বিপ্লব বা সংগ্রামের দ্বারা শ্রমিকের জয়ের কথা বলেছেন। কিন্তু নির্বাচনের দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকশ্রেণী সরকার দখল করে পরিবর্তন আনতে সক্ষম। এজন্যে শ্রেণীসংগ্রামের দরকার নাই। রাশিয়াতে ক্রুশ্চেভ মার্কসবাদকে সংশোধন করে এই মত প্রচার করেন। পঞ্চমতঃ, মার্কস জাতীয়তাবাদকে অগ্রাহ্য করলেও আধুনিক পৃথিবীতে চীনা, রুশ কমিউনিস্টদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চিন্তা প্রবলভাবে দেখা যায়। ষষ্ঠতঃ, কোয়ার্টার্লি জার্নাল অফ ইকনমিক্স পত্রিকায় (Quarterly Journal of Economics X X, 1900 Page 584) থর্নস্টিন ভেবলেন বলেন যে, মার্কসের মূল্যতত্ত্ব সঠিক নয়। মার্কস বলেছেন একমাত্র শ্রমিকের শ্রম দ্বারাই সম্পদ উৎপাদিত হয়। এ সম্পর্কে তিনি প্রকৃত প্রমাণ দেন নি। আসলে এ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো অনেকদিন ধরে এই ধরনের কথা বলেন। মার্কসের চিন্তাধারায় তার ছাপ পড়ে। সপ্তমতঃ, একমাত্র অর্থনৈতিক প্রভাবেই ইতিহাস চালিত হয়, এই মতটি আদপেই গ্রহণীয় বলে বহু ঐতিহাসিক মনে করেন না।

সারণী

[ক] ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের পর আভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা অপেক্ষা বৈদেশিক বাজারের চাহিদা বহুগুণ বাড়ে। এই বাড়তি চাহিদার দরুন ইংলণ্ডের শিল্পের দারুণ অগ্রগতি ঘটে। এই শিল্পগুলির মধ্যে ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র-শিল্প ছিল প্রধান। লোহা ও কয়লার উৎপাদনও ভীষণভাবে বাড়ে। রেল ও জাহাজ পরিবহণের ব্যবস্থার অগ্রগতি হয়। ইংলণ্ড বিশ্বের সেরা সম্পদশালী দেশে পরিণত হয়।

[খ] ইংলণ্ড অপেক্ষা ইওরোপ মহাদেশের প্রধান দেশগুলি শিল্পের বিকাশে অনেক পিছিয়ে পড়ে। মূলধনের অভাব, শিল্পকারখানা ও বাণিজ্যকে হীন কাজ মনে করা ছিল তার কারণ। ক্রমে ইওরোপের দেশগুলি শিল্প-বিপ্লবের পথে পা বাড়ায়। ফ্রান্সে তৃতীয় নেপোলিয়ন রেলপথ নির্মাণের প্রসার দ্বারা ফ্রান্সে শিল্পের উদ্ভাবনের সূচনা করেন। সরকারী প্রচেষ্টায় মূলধনের যোগান দেওয়া হয়। বেলজিয়ামও পিছিয়ে থাকে নি। জার্মানীতে প্রাথমিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক বাধা ও যোগাযোগের অভাব দূর করে শিল্প গঠন আরম্ভ হয়। রেলপথ ও সড়ক বা স্তার মাধ্যমে জার্মানীর বিভিন্ন অঞ্চল যুক্ত হয়। জোলভেরাইন দ্বারা শুল্কের অসাম্য দূর করা হয়। ১৮৭১ খ্রীঃ জার্মানীর ঐক্য স্থাপিত হলে জার্মানীতে শিল্পের বিরাট অগ্রগতি হয়। ট্রাস্ট, কার্টেল, কম্বাইন ও বিভিন্ন কারিগরী আবিষ্কার, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার পুনর্গঠন দ্বারা জার্মানী শিল্পের ক্ষেত্রে এক বৃহৎ পদক্ষেপ করে। রাশিয়া ছিল ইওরোপের বৃহৎ দেশগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অনগ্রসর। ভূমিদাস-প্রধান রুশী সমাজে না ছিল শিল্পগঠনের পরিবেশ, না ছিল প্রয়োজনীয় মূলধন ও কারিগরী জ্ঞান। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ১৮৬১ খ্রীঃ ভূমিদাস-প্রথা উচ্ছেদ করেন ও রুশমন্ত্রী কাউন্ট উইটি শিল্পগঠনে উৎসাহ দেখান। রাষ্ট্র উদ্যোগ নিয়ে বিকল্প প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিল্পসংগঠনে উদ্যোগ নিলে রাশিয়ায় শিল্প-বিপ্লব ঘটে।

[গ] শিল্প-বিপ্লবের ফলে ধনতান্ত্রিক মালিকানা-প্রথার উচ্ছেদ ঘটে। শিল্পশ্রমিকরা শোষিত হয়ে দুর্দশায় পড়েন। মার্কসের মতে "শ্রমিকদের জীবন ছিল সূর্যালোকিত দিনের মাঝে অন্ধকার।" শিল্প-বিপ্লবের ফলে লোকের জীবনযাত্রার মান বাড়ে; গ্রাম থেকে শহরে লোক চলে আসতে থাকে; শহরের সংখ্যা বাড়ে। সমাজে সামন্তশ্রেণী প্রতিপত্তি হারায়, বুর্জোয়াশ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণী রাজনীতিসচেতন হয়ে উঠায় ১৮৩০, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবগুলি ঘটে। শ্রমিকরাও তাদের দাবিদাওয়ার পূরণের জন্যে সংগঠিত হয়। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ দেখা দেয়। সমাজতন্ত্রবাদও ছিল শিল্প-বিপ্লবের ফল।

[ঘ] শিল্প-কারখানাগুলিতে নিচু মজুরি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অতিরিক্ত সময়ে কাজের চাপে শ্রমিকদের দুরবস্থার সীমা ছিল না। ইংলণ্ডে কাস্ট ও কার্টরাইট শ্রমিকদের সমর্থনে আন্দোলন করেন। শ্রমিকদের ভোটাধিকার প্রদানের জন্যে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ভোটাধিকার আইন পাস হয়। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্যাক্টরী আইন পাস হয়। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট আওয়েন গ্র্যাণ্ড ন্যাশন্যাল ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করেন। চার্টিস্টগণ সর্বসাধারণ অর্থাৎ শ্রমিক ও কৃষকদের ভোটাধিকারের দাবিতে আন্দোলন করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস স্থাপিত হয়। ফ্রান্সে সমাজতান্ত্রিক লুই ব্লাঙ্ক তাঁর Organisation of Labour তত্ত্ব প্রচার করেন। দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রে শ্রমিকদের কাজের অধিকারদানের চেষ্টা করা হয়। তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের আমলে শ্রমিকদের আরও উন্নতি ঘটে। রাশিয়ায় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সেন্ট পিটার্সবার্গে শ্রমিক-ধর্মঘট দ্বারা শ্রমিক-আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমিকশ্রেণীর সহায়তায় রুশ-বিপ্লব সম্পন্ন হয়।

[ঙ] ইওরোপের চিন্তাশীল মানুষরা সমাজে ধনবন্টনে বৈষম্য দূর করার ও খেটে-খাওয়া লোকেদের উন্নতির জন্যে নানা চেষ্টা করেন। রবার্ট আওয়েন তাঁর নিউ হারমনি প্রথার মাধ্যমে সমবায় অর্থনীতি চালু করার চেষ্টা করেন যার সুফল শ্রমিকরা ভোগ করবে বলে তিনি আশা করেন। সেন্ট সাইমন ও ফুরিয়োর নিজশ্রমের ফসল যাতে শ্রমিক ভোগ করতে পারে, সেজন্য ফ্যালানস্টারি বা কমিউন প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। আগাস্ট ব্লাঙ্কি প্রভৃতিও সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচার করেন। লুই ব্লাঙ্ক শ্রমিকের ভোটাধিকারের মাধ্যমে আইনসভায় শ্রমিকের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। এই সকল সমাজতন্ত্রবিদকে স্বপ্নদর্শী ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রবিদ বলা হয়।

[চ] ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কার্ল মার্কসের জন্ম হয়। তিনি হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদকে সংশোধন করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ দ্বারা ইতিহাসের বিচার করেন। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' ও 'ডাস ক্যাপিট্যাল' বিখ্যাত মার্কসীয় মতবাদকেই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ বলা হয়। মার্কস বলেন যে, উৎপাদনব্যবস্থার উপর যে শ্রেণী নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে, তারাই সমাজ ও রাষ্ট্রকে চালায়। মার্কস শ্রেণীসংগ্রামের পথে ইতিহাসের বিবর্তনের ব্যাখ্যা করেন এবং শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদীশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকের জয়লাভের কথা ঘোষণা করেন। তিনি মূল্যনিরূপণের নূতন তত্ত্ব প্রচার করেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তির রাষ্ট্রীয়করণ দ্বারা একচেটিয়া পুঁজিব্যবস্থা লোপের কথাও তিনি বলেন।

অনুশীলনী

১। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

(ক) ব্রিটেনের প্রথম রেলপথ কোথায় তৈরী হয়? (খ) ব্রিটেনে প্রথম কোন্ শিল্পের উন্নতি হয়। (গ) কার আমলে ফ্রান্সে প্রথম শিল্প-বিপ্লবের সূচনা হয়? (ঘ) কার আমলে ফ্রান্সের শিল্পের উড্ডয়ন হয়? (ঙ) বেলজিয়ামে প্রথম রেলপথ কোথায় তৈরী হয়? (চ) কার আমলে জার্মানীর কোথায় প্রথম রেলপথ তৈরী হয়? (ছ) জোলভেরাইন কি? (জ) কার আমলে জার্মানীতে শিল্পের উড্ডয়ন হয়? (ঝ) কার আমলে রাশিয়ায় প্রথম শিল্প-বিপ্লব ঘটে? (ঞ) শিল্প শ্রমিক কাদের বলে? তাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কি জান? (ট) পিটারলুর হত্যাকাণ্ড কি? (ঠ) চার্টিষ্ট আন্দোলন কাকে বলে? (ড) উইলিয়াম কবেট ও জন কার্টরাইট কে ছিলেন? (ঢ) সেন্ট সাইমন কে ছিলেন? (ণ) কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো সম্বন্ধে কি জান? (ত) প্রস্তাব, বিপ্রস্তাব ও সমন্বয় সম্বন্ধে কি জান?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

(ক) ব্রিটেনে প্রথম শিল্প-বিপ্লব হওয়ার কারণ কি? (খ) ইওরোপ মহাদেশ প্রথম শিল্প-বিপ্লবে অনগ্রসর ছিল কেন? (গ) তৃতীয় নেপোলিয়নের আমলে ফ্রান্সে শিল্প-বিপ্লবের বর্ণনা দাও। (ঘ) বিসমার্কের উদ্যোগে কিভাবে জার্মানীতে শিল্প বিস্তার ঘটে? (ঙ) কার আমলে এবং কিভাবে রাশিয়ায় শিল্প স্থাপিত হয়? (চ) কার আমলে রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ হয় এবং তার ফল কি হয়? (ছ) শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইওরোপের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে কি কি পরিবর্তন ঘটে? (জ) শিল্প-শ্রমিকদের দুরবস্থার বর্ণনা দাও। (ঝ) শিল্প-বিপ্লবের ফলে স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রাম জীবন কিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়? (ঞ) ব্রিটেনে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের বিবরণ দাও। (ট) ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা বর্ণনা কর। (ঠ) আদি সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে কি জান? (ড) কার্ল মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ তত্ত্ব আলোচনা কর। (ঢ) মার্কসীয় মতবাদের সমালোচনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন :
ইতালী ও জার্মানীর ঐক্য আন্দোলন

[ক] প্রথম পরিচ্ছেদ : ইতালীর ঐক্য স্থাপন (The Movement of Italian Unification) : উনবিংশ শতকের ইওরোপের ইতিহাসে জাতীয়তাবাদের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভিয়েনা-চুক্তি ও মেটারনিখ্ তন্ত্রের দ্বারা ইওরোপের বিভিন্ন দেশের নবোদিত জাতীয়তাবাদ নিপীড়িত হলেও, তা ভস্মশয্যা থেকে জেগে উঠে নবজীবনের আবেগে ইওরোপকে আলোড়িত করে। ইতালীর ঐক্য ছিল এই পরিবর্তনের প্রথম ধাপ।

নেপোলিয়নের ইতালী জয়ের আগে ইতালী অনেকগুলি স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। নেপোলিয়ন ইতালীর মূল ভূখণ্ডকে নিজ সাম্রাজ্যের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করলে ইতালীবাসী রাজনৈতিক ঐক্যের প্রথম আস্বাদ পায়। নেপোলিয়ন ইতালীতে 'কোড নেপোলিয়ন' ও তাঁর অন্যান্য আলোকপ্রাপ্ত সংস্কার চালু করেন। এর ফলে ইতালীবাসীর মনে জাতীয় চেতনার উদ্ভব হয়। নেপোলিয়নের পতনের পরে ভিয়েনা-চুক্তির (১৮১৫ খ্রীঃ) দ্বারা ইতালীর বেশির ভাগ অংশের উপর অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য স্থাপন করা হয়। ভিয়েনা-চুক্তির দ্বারা ইতালীকে কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত করে ইতালীর জাতীয় ঐক্যকে ধ্বংস করা হয়।

ইতালীতে নেপোলিয়নের আন্দোলন

ইতালীয় জাতীয়তাবাদীরা ভিয়েনা-চুক্তি ভেঙে ইতালীকে অস্ট্রিয়ার অধীনতা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা গোড়া থেকে আরম্ভ করে। কার্বোনারী নামে এক গুপ্তসমিতি ১৮২০ খ্রীঃ এবং ১৮৩০ খ্রীঃ দুটি বিদ্রোহ করে। কিন্তু অস্ট্রিয়ার সামরিক হস্তক্ষেপে এই বিদ্রোহ দমিত হয়। কার্বোনারীদের সংগঠন দুর্বল ছিল এবং তারা আন্দোলনের লক্ষ্য সঠিকভাবে স্থির করতে পারে নাই।

কার্বোনারী আন্দোলন

এই সময় যোসেফ ম্যাৎসিনী ইতালীর মুক্তি-আন্দোলনের "ভাবপুরুষ, দার্শনিক ও আত্মা রূপে" আবির্ভূত হন। ম্যাৎসিনি ছিলেন একাধারে বাগ্মী, সুলেখক, চিন্তাবিদ্ ও বিপ্লবী সংগঠক, সর্বোপরি দেশপ্রেমিক। ম্যাৎসিনী তাঁর বিভিন্ন বিপ্লবী রচনাবলীর দ্বারা ইতালীবাসীদের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি জাতিকে একথা বুঝান যে, ইতালীকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করতে হলে ইতালীয়দের জাতীয়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তিনি এই মত প্রচার করেন যে ইতালী সহ ইওরোপের প্রতি নিপীড়িত জাতির মুক্তি আবশ্যক। জাতির কাছে ইতিহাসের বাণী হল ইতালীর জাতীয়তাবাদী ঐক্য চাই। তিনি যুবশক্তিকে বলেন, "কেবলমাত্র সমগ্র ইতালী, ঐক্যবদ্ধ ইতালীর কথা চিন্তা কর।" ম্যাৎসিনীর বিপ্লবী জীবন, নির্বাসনে দুঃখকষ্ট ভোগ, দেশের জন্যে স্বার্থত্যাগ, গভীর দেশপ্রেম, আদর্শবাদ, প্রজাতন্ত্রবাদ ও জনসাধারণের প্রতি ভালবাসা তাঁকে এক মহিমাময় মর্যাদায় মণ্ডিত করে। তিনি ইয়ং ইতালী বা যুব ইতালী দল গড়েন। "স্বাধীনতা ও ঐক্য" (Unity and Independence) এই দুই আদর্শ তিনি যুবশক্তির সামনে স্থাপন করেন। তিনি ইয়ং ইতালী দলের পতাকার একদিকে "স্বাধীনতা ও ঐক্য" কথাটি ছাপিয়ে দেন। পতাকার অপর দিকে "গণতন্ত্র, সাম্য ও মানবতা" কথা তিনটি ছাপিয়ে দেন। ইয়ং ইতালী আন্দোলনের সম্মুখে তিনি এই আদর্শগুলি স্থাপন করেন। ১৮৩৩ খ্রীঃ প্রায় ৩০ হাজার সদস্য ইয়ং ইতালী দলে যোগ দেয়। ইতালীর সর্বসাধারণের মধ্যে জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার ছিল

মাৎসিনীর ইয়ং ইতালী দল গঠন

ইয়ং ইতালী দলের সদস্যদের প্রথম ও প্রধান কাজ। ইয়ং ইতালী দলের প্রচারের ফলে ইতালীর ঐক্য-আন্দোলন এক জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়।

ম্যাৎসিনীর আদর্শ ও প্রভাব

ম্যাৎসিনী স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক ইতালী গঠনের স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর নীতি ছিল ইতালীয়রা তাদের রক্ত ঝরিয়ে ইতালীকে মুক্ত করবে। এজন্যে বৈদেশিক সাহায্যের দরকার নেই। "শহীদের রক্ত যতই ঝরবে ততই আদর্শের বীজ সারবান হবে।" ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ইতালীতে দেখা দিলে ম্যাৎসিনী তাঁর নির্বাসন ত্যাগ করে ইতালীতে ফিরে আসেন। তিনি প্রথমে জেনোয়ায় গ্যারিবল্ডীর সেনাদলে যোগ দেন। তারপর রোমে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হলে তিনি তার প্রধান পরিচালকে পরিণত হন। রোমান প্রজাতন্ত্রের মাধ্যমে ম্যাৎসিনী সর্বসাধারণের ভোটাধিকার, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ভূমিবণ্টন আইন প্রভৃতি চালু করে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টির পরিচয় দেন। কিন্তু রাজতান্ত্রিক ইওরোপ রোমের ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রকে স্বীকার করতে রাজী ছিল না। ইওরোপের রাজশক্তিগুলি আশঙ্কা করে যে, ইতালীয় প্রজাতান্ত্রিক আদর্শ মহামারির মত তাদেরও দেশে ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন রোমে ধর্মগুরু পোপকে প্রতিষ্ঠা করার অজুহাতে সামরিক হস্তক্ষেপ দ্বারা রোমান প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করেন। ম্যাৎসিনী ভগ্নহৃদয়ে লন্ডনে আশ্রয় নেন এবং শেষজীবন লন্ডনেই কাটান।

ম্যাৎসিনীর বিফলতা ছিল এক মহান বিফলতা। ইতালীবাসীর মতে, তিনি যে ভাবগত ঐক্যের ভিত স্থাপন করেন, তার উপর নির্ভর করে কাভুর রাজনৈতিক ঐক্যের ইমারত গড়েন। কাউন্ট ক্যামিলো দ্য কাভুর ছিলেন পেশায় ইঞ্জিনীয়ার বা কারুবিদ্ এবং নেশায় সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ্। তিনি ছিলেন বাস্তববাদী রাজনীতির (Realpolitik) ভক্ত। ম্যাৎসিনীর বিফলতা থেকে তিনি শিক্ষা নেন যে, অস্ট্রিয়া একটি পরাক্রান্ত শক্তি। ইতালীবাসী একক চেষ্টায় অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে না। ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সুযোগে পিডমন্টের রাজা চার্লস এলবার্ট ইতালীকে মুক্ত করার জন্যে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি কাস্টোজা ও নোভারার যুদ্ধে পরাস্ত হন এবং পদত্যাগে বাধ্য হন। সুতরাং বৈদেশিক শক্তির সাহায্য দ্বারা একমাত্র অস্ট্রিয়াকে ইতালী থেকে বিতাড়িত করা সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন। ম্যাৎসিনী প্রজাতন্ত্রকে ইতালীর স্বাধীনতা-আন্দোলনের লক্ষ্য নেন। বাস্তববাদী কাভুর প্রজাতন্ত্রকে নাকচ করেন। পিডমন্টের স্যাভয় রাজবংশের অধীনে ইতালীকে ঐক্যবদ্ধ করা বা রাজতান্ত্রিক ঐক্য স্থাপন করার লক্ষ্য তিনি নেন। তৃতীয়তঃ, কাভুর রেলপথ নির্মাণ, বাণিজ্যের প্রসার ও পার্লামেন্ট গঠন করে ইতালীর ঐক্যকে দৃঢ় করা যাবে বলে মনে করতেন। ম্যাৎসিনীর আবেগময় ঐক্যবাদ অপেক্ষা সভ্যতা বা Civilisation বা বিভিন্ন সংস্কারের ভিত্তিতে ঐক্য স্থাপন বেশী কার্যকরী বলে তিনি মনে করতেন।

কাভ্যুরের আদর্শ

পিডমন্টের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কাভুর তার আদর্শকে বাস্তবায়িত করেন। তিনি অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ইংলন্ড বা ফ্রান্স যে-কোন একটি শক্তির সাহায্যলাভের চেষ্টা করেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (১৮৫৫-৫৬ খ্রীঃ) বাধলে তিনি এই দুই শক্তির পক্ষ নিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে পিডমন্টের ১৫ হাজার সেনা যুদ্ধে পাঠান। এই যুদ্ধে সহায়তাদানের জন্যে পিডমন্ট ইংলন্ড ও ফ্রান্সের সহানুভূতি পায়। প্যারিসের শান্তিবৈঠকে এই দুই শক্তি পিডমন্টকে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি তুলতে অনুমতি দেয়। ইতালীর প্রশ্ন ইওরোপীয় প্রশ্নে পরিণত হয়। প্যারিসের সন্ধির পর ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের দৃষ্টি ইতালীর উপর পড়ে। তৃতীয় নেপোলিয়ন ১৮৫৮ খ্রীঃ পিডমন্টের

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ও প্লোমবিয়ারের সন্ধি

সঙ্গে প্লোমবিয়ারের গোপন চুক্তি সম্পাদন করেন। এই সন্ধির দ্বারা—(১) তৃতীয় নেপোলিয়ন উত্তর ইতালীকে পিডমন্টের সঙ্গে সংযুক্ত করতে রাজী হন। (২) অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ইতালীর স্বাধীনতার যুদ্ধে তিনি পিডমন্টকে ফরাসী সামরিক সাহায্য দিতে রাজী হন। (৩) এই পরিকল্পিত যুদ্ধে ফ্রান্সের যোগদানের জন্যে বৈধ কারণ যোগাড় করে দিতে পিডমন্টকে দায়িত্ব নিতে হয়। (৪) পিডমন্টকে সাহায্যের বিনিময়ে ফ্রান্সকে স্যাভয় ও নিস দিতে অঙ্গীকার করা হয়।

প্লোমবিয়ারের সন্ধির পর কাভ্যুর অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার বৈধ কারণ সৃষ্টি করতে প্রায় বিফল হন। এই সময় অস্ট্রিয়া পিডমন্টকে একটি চরমপত্র দিলে যুদ্ধের বৈধ কারণ সৃষ্টি হয়।

অস্ট্রো-ইতালীর যুদ্ধ : তৃতীয় নেপোলিয়নের ভূমিকা : ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি

ফরাসী সেনা ম্যাজেন্টা, সল্‌সফেরিনোর যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার বাহিনীকে পরাস্ত করে এবং লম্বার্ডি অধিকার করে। কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালীর মুক্তি-যুদ্ধকে মাঝপথে রদ করেন। তিনি অস্ট্রিয়ার সঙ্গে ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধির দ্বারা লম্বার্ডি ও মিলান পিডমন্টের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। অবশিষ্ট ইতালীতে স্থিতাবস্থা বহাল থাকে। অর্থাৎ বাকী ইতালীতে ভিয়েনা চুক্তির গৃহীত ব্যবস্থা বহাল রাখা হয়। কাভ্যুর এই সন্ধির ফলে দারুণ হতাশাগ্রস্ত হন। কিন্তু পিডমন্টের রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েল বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে এই সন্ধি গ্রহণ করেন।

অতঃপর মধ্য ইতালীর জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীরা তাদের নিজচেষ্টায় মধ্য ইতালী থেকে হ্যাপস্‌বার্গবংশীয় বিদেশী শাসকদের বিতাড়িত করেন। তাঁরা এই অঞ্চলকে পিডমন্টের সঙ্গে সংযুক্তিকে জন্যে গণভোটের দ্বারা রায় দেয়। সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন এই সংযুক্তির সমর্থন করেন; বিনিময়ে তিনি স্যাভয় ও নিস নামে দুটি স্থান ফ্রান্সের সঙ্গে যুক্ত করেন। অস্ট্রিয়া দুই সংযুক্তিতে বাধা দিতে সাহস করে নাই। ফলে মধ্য ইতালী পিডমন্টের সঙ্গে যুক্ত হয়।

মধ্য ইতালীর সংযুক্তি

এর পর ইতালীর ঐক্যের তৃতীয় পর্যায় আরম্ভ হয়। ম্যাৎসিনীর শিষ্য স্বাধীনতার পূজারী গ্যারিবল্ডী দশ হাজার লালকোর্তা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীসহ দক্ষিণ ইতালীর সিসিলিতে জাহাজ-যোগে নামেন। দক্ষিণ ইতালীর বুরবোঁবংশীয় রাজা দ্বিতীয় ফার্দিনান্দকে পরাস্ত করে তিনি সিসিলি ও নেপল্‌স জয় করেন। গ্যারিবল্ডী দক্ষিণে একটি স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্র স্থাপন ও পোপের রাজ্য আক্রমণের পরিকল্পনা করলে, কাভ্যুর বিপদ বুঝেন। ইওরোপের রাজারা প্রজাতন্ত্র সহ্য করবে না কাভ্যুর জানতেন। সুতরাং তিনি রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েলকে গ্যারিবল্ডীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠাবার নির্মম সিদ্ধান্ত নেন। পথে রোম ছাড়া পোপের অবশিষ্ট রাজ্য অধিকার করে রাজকীয় বাহিনী নেপল্‌সে এসে যায়। গ্যারিবল্ডী গৃহযুদ্ধ এড়াবার জন্যে ভিক্টর ইম্যানুয়েলের হাতে দক্ষিণ ইতালী তুলে দেন। দক্ষিণ ইতালী পিডমন্টের সঙ্গে যুক্ত হয়। গণভোট দ্বারা এই সংযুক্তি সমর্থিত হয়। এর পর কাভ্যুবের মৃত্যু হয়।

গ্যারিবল্ডীর ভূমিকা : দক্ষিণ ইতালীর সংযুক্তি ও ইতালীর অন্যান্য অংশের সংযুক্তি

তখনও ভিনিসিয়া ও রোম স্বাধীন ইতালীর সঙ্গে যুক্ত হয় নাই। ১৮৬৬ খ্রীঃ অস্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের প্রাক্কালে বিসমার্কের সঙ্গে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন শর্ত স্থির করেন যে, যুদ্ধের পর ভিনিসিয়া অঞ্চল যাতে অস্ট্রিয়া পিডমন্টকে ছেড়ে দেয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। অস্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধে এজন্য পিডমন্ট প্রাশিয়ার পক্ষ নিয়ে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিবে। অস্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের পর ভিনিশিয়া পিডমন্ট বা স্বাধীন ইতালীর সঙ্গে যুক্ত হয়। বাকী থাকে রোম। ফরাসী সেনা ১৮৪৮ খ্রীঃ থেকে পোপকে রক্ষার অছিলায় রোম অধিকার করেছিল। ১৮৭০ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের প্রাক্কালে রোম থেকে ফরাসী সেনা প্রত্যাহার করা হলে রোম পিডমন্টের অধিকারে আসে ও স্বাধীন ইতালীর রাজধানীতে পরিণত হয়। ইতালীর ঐক্য সম্পূর্ণ হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইতালীর মুক্তি-আন্দোলনে ম্যাৎসিনী, কাভুর প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের ভূমিকা (The role of Italian leaders in the Unification of Italy : Mazzini, Cavour etc.) **ম্যাৎসিনী :** ইতালির মুক্তি-আন্দোলনের প্রাণপুরুষ, দার্শনিক ও আত্মা যোসেফ ম্যাৎসিনীর ১৮০৫ খ্রীঃ জেনোয়া নগরীতে এক চিকিৎসকের গৃহে জন্ম হয়। বাল্যকাল থেকে তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটে। সাহিত্য, বাইবেল ও বিভিন্ন রচনাগুলি অল্প বয়সেই তিনি অধিগত করেন। বাল্যকাল থেকে ম্যাৎসিনী ছিলেন ইতালীর স্বাধীনতার সাধক। এজন্য প্রথম যৌবনে তিনি কিছুকাল কার্বোনারী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। এই আন্দোলনের অসারতা বুঝে তিনি কার্বোনারীদের সম্পর্ক ছাড়েন। তিনি অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্ররোচনাদানের অভিযোগে কিছুকাল কারাদণ্ড ও নির্বাসন ভোগ করেন। এই সময় তিনি প্যারিস, সুইজারল্যান্ডে নির্বাসিত জীবন যাপন করেন। ঐতিহাসিক জ্যাক ড্রজের মতে, প্যারিসে থাকার সময় তিনি বিভিন্ন দেশের বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর মনে প্রজাতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের ভাবধারা শিকড় বিস্তার করে। ম্যাৎসিনী উপলব্ধি করেন যে, ইতালীর সমস্যা হল দুই প্রকার—আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক। বৈদেশিক দিক হতে অস্ট্রিয়াকে ইতালী থেকে বলপূর্বক বিতাড়ন ছাড়া পথ নাই। এই প্রচেষ্টার দ্বারা ইতালীয়দের স্বাধীনতা বা Liberty লাভ হবে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ সমস্যাই ছিল কঠিন। এই সমস্যা ছিল আঞ্চলিকতা, স্থানীয়তায় বিভক্ত ইতালীয়দের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগ্রত করা। এজন্যে তিনি Unity বা 'ঐক্য' কথাটি এবং Independence বা 'স্বাধীনতা' কথাটি ইয়ং ইতালী দলের পতাকায় খোদাই করেন। তিনি ইয়ং ইতালী দলের সদস্যদের জাতীয় ঐক্যের আদর্শপ্রচারে নিয়োজিত করেন। ম্যাৎসিনীর প্রচেষ্টার ফলেই ইতালীয়দের মনে জাতীয় ঐক্যের বীজ রোপিত হয়। এজন্যে তাঁকে 'নব-ইতালীর আত্মা' বলা হয়। ম্যাৎসিনি ছিলেন সুলেখক ও প্রাবন্ধিক। ইতালীর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও বুলেটিনের মাধ্যমে তিনি তাঁর গণতান্ত্রিক, প্রজাতান্ত্রিক ভাবধারা শিক্ষিত শ্রেণী ও যুবকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেন।

ম্যাৎসিনী কামনা করতেন যে, ইতালীয়রা তাদের গণতান্ত্রিক সরকারের দ্বারা প্রকৃত স্বাধীনতার আস্বাদ লাভ করবে। এজন্যে তিনি প্রজাতন্ত্রবাদের আদর্শ প্রচার করেন। ম্যাৎসিনি জাতিকে বোঝান যে, কেবলমাত্র বিদেশী অস্ট্রিয়ানদের হাত থেকে মুক্তি হলেই ইতালীয়দের সব কাজ সিদ্ধ হবে না। তাদের স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে হলে চাই গণভোটের অধিকার ও প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। তিনি ভূমিসংস্কার, মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও ব্যক্তি স্বাধীনতার কথাও বলেন। এছাড়া নিছক স্বাধীনতা অর্থহীন বলে তিনি ভাবতেন। ১৮৪৮ খ্রীঃ তিনি রোমান প্রজাতন্ত্র স্থাপন করেন। তিনি ফরাসী জ্যাকোবিনদের আদর্শে এই স্বল্পস্থায়ী সরকারের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও করেন। তাঁর চিন্তাধারা ছিল প্রগতিশীল, জনস্বার্থ-উপযোগী। কিন্তু তিনি ছিলেন ভাববাদী। বাস্তব বুদ্ধি তাঁর কম ছিল। তিনি ইতালীর মুক্তিযুদ্ধে বৈদেশিক শক্তির সাহায্য গ্রহণের বিরোধী ছিলেন। ম্যাৎসিনি ছিলেন ইতালীর মুক্তি-আন্দোলনের প্রাণপুরুষ। কিন্তু তাঁর নীতির দুটি বাস্তব ত্রুটি ছিল। প্রথমতঃ, ইতালীতে আদর্শবাদ দেখা দিলেও, ভিয়েনা-সন্ধি ভেঙ্গে, অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করার ক্ষমতা ইতালীর ছিল না। এই সত্যটি ম্যাৎসিনি বোঝেন নি। তাঁর উদ্দেশ্য সফল করতে হলে কূটনীতি প্রয়োগ ও অন্য শক্তির সহায়তার দরকার তিনি বোঝেন নি। দ্বিতীয়তঃ, ইতালীতে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হলে ইওরোপের রাজতন্ত্রগুলি তা সহ্য করবে না, এই বাস্তব প্রশ্ন ম্যাৎসিনী বোঝেন নি। তথাপি ম্যাৎসিনী ঘুমন্ত জাতীয় ঐক্য সম্পর্কে অচেতন ইতালীকে জাগান। তিনিই যুবশক্তিকে প্রেরণা দেন। তাঁর আন্দোলনের পর থেকে ইতালীয়রা স্বাধীনতালাভের জন্যে নিরন্তর প্রয়াস

ম্যাৎসিনীর প্রজাতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ

চালায়। তিনি যে মানসিক ঐক্য স্থাপন করেন, তার ওপরে কাভুর ইতালীর রাজনৈতিক ঐক্যের ইমারত গড়েন।

কাভুর : কাউন্ট ক্যামিলো দ্য কাভুর ছিলেন ইতালীয় ঐক্য-আন্দোলনের মস্তিষ্ক। যে ক্ষেত্রে ম্যাৎসিনী ছিলেন র‍্যাডিক্যাল বা চরমপন্থী, সে ক্ষেত্রে কাভুর ছিলেন মধ্যপন্থী বা মডারেট (Moderate)। কাভুর ম্যাৎসিনীর প্রজাতন্ত্রবাদ, গণভোট ও বিপ্লবের পথ পরিত্যাগ করে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রবাদ ও সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকারের নীতিতে বিশ্বাস করতেন। ম্যাৎসিনি ছিলেন জনগণের নেতা, কাভুর ছিলেন নিজে বুর্জোয়াপন্থী ও ইতালীর বুর্জোয়াদের নেতা। কাভুর প্রজাতন্ত্রের স্থলে ইতালীকে পিডমন্টের স্যাভয় রাজবংশের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করার পরিকল্পনা করেন। তিনি সম্পত্তির ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ইতালীর জন্যে একটি সংবিধান ও পার্লামেন্ট গঠনের ব্যবস্থা করেন। পিডমন্টের রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েল এই সংবিধান মেনে চলতে প্রতিশ্রুতি দেন। কাভুরের এই নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র এবং সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার দ্বারা উচ্চ মধ্যবিত্তশ্রেণী লাভবান হলেও সর্বসাধারণ প্রকৃত গণতন্ত্রের আস্বাদ পায় নাই। এই দিক থেকে তিনি ম্যাৎসিনির গণতান্ত্রিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন। কাভুর ছিলেন দক্ষ কূটনীতিবিদ ও বাস্তব-বুদ্ধির লোক। তিনি ম্যাৎসিনির প্রজাতান্ত্রিক আদর্শ শুধু পরিত্যাগ করেন নি,—ম্যাৎসিনির মতবাদ বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া ইতালী, ইতালীয় যুবশক্তির দ্বারা মুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ হবে, এই মতবাদকেও তিনি বর্জন করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে—ম্যাৎসিনির এই দুইটি মতবাদ বাস্তবতাহীন। ইওরোপের রাজশক্তিগুলি প্রবল পরাক্রান্ত। তারা ইতালীতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সহ্য করবে না। কারণ প্রজাতন্ত্র হল রাজতন্ত্রের মৃত্যুর বিষ। অথচ ইওরোপীয় রাজশক্তিগুলির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহানুভূতি ছাড়া ভিয়েনা-সন্ধির দ্বারা বিভক্ত ইতালীকে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে না। দ্বিতীয়তঃ, কার্বোনারী, ইয়ং ইতালী আন্দোলনের বিফলতা এবং ১৮৪৮ খ্রীঃ ইতালীকে মুক্ত করার জন্যে রাজা চার্লস আলবার্টের অস্ট্রিয়ার হাতে পরাজয় প্রমাণ করে যে—বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া পিডমন্টের পক্ষে এককভাবে ইতালীকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। এই বাস্তবতাবোধ কাভুরকে সফলতা এনে দেয়।

কাভুরের ভূমিকা

তিনি তৃতীয় নেপোলিয়নের সহায়তায় প্লোমবিয়ারের সন্ধির দ্বারা ফ্রান্সের সাহায্য লাভ করে অস্ট্রিয়াকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন এবং লম্বার্ডি ও মধ্য ইতালী সংযুক্ত করেন। তিনি গ্যারিবল্ডীর দক্ষিণ ইতালীর প্রজাতন্ত্রবাদ দমন করে দক্ষিণ ইতালী পিডমন্টের সঙ্গে সংযুক্ত করেন। বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করার কুফলে কাভুর ভুগতে বাধ্য হন। তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালীর উপর ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি চাপিয়ে দিলে বাকী ইতালীকে মুক্ত করার কোন পন্থা তাঁর হাতে ছিল না। ইতালীর জাতীয়তাবাদীরা মধ্য ইতালী এবং ম্যাৎসিনীর শিষ্য গ্যারিবল্ডীই দক্ষিণ ইতালী জয় করে ক্যাভুরের হাতে তুলে দেন। কাভুরের নীতির এটিই ছিল দুর্বল দিক। মৃত্যুকালে তিনি ভিনিসিয়া ও রোম ইতালীর বাইরে রেখে যান। তাঁর কাজ অসম্পূর্ণ থাকে। এছাড়া, কাভুরের সমালোচকরা বলেন যে, কাভুর সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার চালু করার ফলে সম্পদশালী উত্তর ইতালীর বুর্জোয়ারাই ক্ষমতার ধারক ও বাহকে পরিণত হয়। দক্ষিণের দরিদ্র, অনুন্নত কৃষক ও বেকাররা ভোটাধিকার পায়নি। তারা ছিল কাভুরের ব্যবস্থার ফলে অবহেলিত। দক্ষিণ ছিল যেন উত্তর ইতালীর উপনিবেশ। এই অসাম্য তিনি দূর করতে চেষ্টা করেন নি। কাভুর ছিলেন মূলত বুর্জোয়া-নেতা ও ধূরন্ধর কূটনীতিবিদ। ম্যাৎসিনীর মানবতাবাদ ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের অভাবে তিনি ইতিহাসের প্রাদপ্রদীপে ম্লান হয়ে গেছেন। ইতালীবাসীর প্রকৃত

আশা-আকাঙ্ক্ষা তিনি পূরণে ব্যর্থ হন বলে ঐতিহাসিক এডপার হোল্ট মন্তব্য করেছেন। বিসমার্কের যুগে তিনি ছিলেন ইতালীতে বিসমার্কীয় রক্ত-লৌহনীতির প্রবক্তা। ম্যাৎসিনীয় উচ্চ আদর্শবাদে তিনি আলোচিত হন নি। তথাপি ইতালীর মুক্তি-আন্দোলনকে কার্যকরী পথে তিনিই পরিচালনা করেন।

ইতালীর মুক্তিযুদ্ধের বীর সৈনিক ছিলেন গ্যারিবল্ডী। তিনি ছিলেন স্বাধীনতার অম্লান পূজারী। এই দুঃসাহসী ব্যক্তি মাত্র কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবক ও বুকভরা দেশপ্রেম নিয়ে দক্ষিণ ইতালীকে বুরবোঁ-শাসনমুক্ত করতে ঝাঁপিয়ে পড়েন ও সফলতা বরণ করেন। তিনি ছিলেন ঘোর আদর্শবাদী, প্রজাতন্ত্রী। দেশের স্বার্থকে তিনি সবার উর্ধ্বে স্থান দেন। যদিও কাভ্যুর তাঁকে সমালোচনা করে বলেন যে, "গ্যারিবল্ডীর আছে সিংহের মত সাহসী হৃদয়, আর ষাঁড়ের মত নিরেট মস্তিষ্ক।" তিনি গৃহযুদ্ধ এড়াবার জন্যে ভিক্টর ইম্যানুয়েলের হাতে দক্ষিণ ইতালীর দায়িত্ব তুলে দেন। (বিশদ বিবরণ আগে পৃঃ ৯৭ দ্রষ্টব্য)।

গ্যারিবল্ডীর ভূমিকা

ভিক্টর ইম্যানুয়েল ছিলেন বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন, ধৈর্যশীল, ঠাণ্ডা মাথার লোক। যখন কাভ্যুর উদ্যম হারিয়ে ফেলতেন, হতাশায় নিমজ্জিত হতেন, তখন তিনি অবিচল লক্ষ্যে নেতৃত্ব দেন।

ভিক্টর ইম্যানুয়েল

[খ] তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ জার্মানীর ঐক্য আন্দোলন (The Unification of Germany) ঃ জার্মানীর রোমান্টিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং ঐক্যবাদী ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের আহ্বান ও তার পরিণতির কথা (১৮৪৮ খ্রীঃ) আগে আলোচনা করা হয়েছে। (তৃতীয় অধ্যায়, সপ্তম পরিচ্ছেদ পৃঃ ৬৮ দ্রষ্টব্য)। ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের পতনের পরে জার্মান জাতীয়তাবাদ প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বিসমার্কের নেতৃত্বে এক নূতন পথে পরিচালিত হয়। প্রাশিয়ার আইনসভায় লিবারেল বা উদারপন্থী সদস্যরা সেনাসংগঠনের জন্যে অর্থবরাদ্দ করতে অস্বীকার করেন। তখন বিসমার্ক তাঁর বিখ্যাত "রক্ত ও লৌহ" নীতির (Blood and Iron Policy) ব্যাখ্যা করে আইনসভার সদস্যদের বলেন যে, "প্রাশিয়ার উদারতন্ত্রের দ্বারা জার্মানীর সমস্যা বা জার্মানীর ঐক্যের প্রশ্নের সমাধান হবে না। প্রাশিয়ার সামরিক ক্ষমতাই জার্মানীকে পথ দেখাবে। বক্তৃতা, বিতর্ক বা ব্যালট ভোটের দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হবে না। রক্ত ও লৌহ নীতির দ্বারাই সমাধান হবে।" এই "রক্ত বা লৌহ নীতি" (Blood and Iron Policy) বলতে বিসমার্ক যুদ্ধের দ্বারা প্রাশিয়ার অধীনে জার্মানীর ঐক্যস্থাপনের কথা বুঝান। বিসমার্ক পরিষ্কার বুঝিযে দেন যে, প্রাশিয়ার নেতৃত্বে, প্রাশিয়ার রাজবংশের অধীনে জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হবে। জার্মানীকে প্রাশিয়ার ভাবধারায় প্রভাবিত করা হবে। তাঁর মতে এটাই ছিল ইতিহাসের নির্দেশ।

বিসমার্কের রক্ত ও লৌহ নীতির ভূমিকা

ভিয়েনা-চুক্তির (১৮১৫ খ্রীঃ) দ্বারা জার্মানীর উপর যে বুন্ড (Bund) বা রাষ্ট্রমণ্ডলের সংবিধান স্থাপন করা হয়, বিসমার্ক তা ভেঙে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর ঐক্যস্থাপনের লক্ষ্য নেন। ঐতিহাসিক আইখ্ এই কথা বলেন। ভিয়েনা-সংবিধান দ্বারা জার্মানীর উপর একটি বুন্ড (Bund) বা রাষ্ট্রমণ্ডল অস্ট্রিয়ার নেতৃত্বে স্থাপিত হয়। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সংঘাতের জন্যে তিনি প্রথমেই স্লেজভিগ ও হলস্টিন সমস্যাকে কাজে লাগান। স্লেজভিগ ও হলস্টিন ছিল জার্মানীর উত্তরে অবস্থিত দুটি অঞ্চল। এই দুই প্রদেশে জার্মান ও ডেন উভয় জাতির লোক বাস করত। ডেনমার্ক ও জার্মানী উভয় দেশের জাতীয়তাবাদীরা নিজ নিজ দেশে এই দুটি ডাচি বা প্রদেশের অন্তর্ভুক্তি চাইত। ১৮৫২ খ্রীঃ লন্ডনের আন্তর্জাতিক সন্ধির দ্বারা স্থির হয় যে, ডেনরাজ এই দুই

ডেনমার্কের যুদ্ধ : স্লেজভিগ-হলস্টিন সমস্যা

প্রদেশের উপর ব্যক্তিগত অধিকারে রাজত্ব করবেন। তিনি এই দুই প্রদেশকে কখনও ডেনমার্কের অন্তর্ভুক্ত করবেন না। পরবর্তী ডেনরাজ নবম ক্রিশ্চিয়ান এই শর্ত ভেঙে প্রদেশ দুটি ডেনমার্কের অন্তর্ভুক্ত করলে জার্মান জাতীয়তাবাদীরা বুন্ডের সভায় তীব্র প্রতিবাদ জানায়। জার্মান জাতীয়তাবাদীদের এই প্রতিবাদকে প্রাশিয়ার পক্ষে বিসমার্ক সমর্থন জানালে জার্মানীর জনমত প্রাশিয়ার নেতৃত্বকে সমর্থন জানায়। প্রাশিয়া একা ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করে অস্ট্রিয়াকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ডেনমার্ক যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে দুটি প্রদেশ যৌথভাবে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার হাতে ছেড়ে দেয়।

জার্মান জাতীয়তাবাদীরা আশা করেছিল যে, ডেনমার্কের হাত হতে মুক্ত প্রদেশ দুটিকে জার্মান বুন্ড বা রাষ্ট্রমণ্ডলের সদস্য হিসেবে স্থান দেওয়া হবে। ডিউক অব অগাস্টেনবার্গকে প্রদেশ দুটির শাসনের দায়িত্বভার দিতে বুন্ডের সদস্যদের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বিসমার্কের কূটনীতির প্রভাবে গ্যাস্টিনের সন্ধির দ্বারা ডাচি বা প্রদেশ দুটিকে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে অস্থায়ী ভাবে ভাগ করা হয়। অস্ট্রিয়া জার্মান সংখ্যাগরিষ্ঠ হলস্টিন এবং প্রাশিয়া ডেন-সংখ্যাগরিষ্ঠ স্লেজভিগ প্রদেশের প্রশাসনিক অধিকার নেয়। প্রাশিয়া ২$\frac{1}{2}$ মিলিয়ন টেলর ক্ষতিপূরণ দিয়ে লাওয়েনবার্গের ডাচি হস্তগত করে। প্রদেশ দুটির এই বন্টনের ব্যাপারে বিসমার্ক জার্মান বুন্ডের কোন সম্মতি নেন নি। অধিকন্তু গ্যাস্টিনের সন্ধিতে তিনি অস্ট্রিয়াকে এই শর্ত জানিয়ে দেন যে, ভবিষ্যতে স্লেজভিগ-হলস্টিন নিয়ে কোন বিরোধ—বিতর্ক হলে এই দুই শক্তি নিজেদের মধ্যেই তার সমাধান করবে, বুন্ড বা রাষ্ট্রমণ্ডলে বিষয়টি তোলা যাবে না। ঐতিহাসিক লর্ড এবং ঐতিহাসিক এ· জে· পি· টেইলার প্রভৃতির মতে, বিসমার্ক গ্যাস্টিনের সন্ধির শর্ত ইচ্ছাপূর্বক এমনভাবে স্থির করেন যে, এই সন্ধির প্রয়োগ উপলক্ষে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে প্রাশিয়ার বিরোধ দেখা দিবে।

গ্যাস্টিনের সন্ধি : অস্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের প্রস্তুতি

গ্যাস্টিনের সন্ধির পর বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের লক্ষ্য সামনে রেখে চলেন। তিনি অস্ট্রিয়াকে মিত্রহীন করার জন্যে কূটনীতি প্রয়োগ করেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় রাশিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করায় রাশিয়া অস্ট্রিয়ার উপর অসন্তুষ্ট ছিল। বিসমার্ক ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় রাশিয়াকে সন্তুষ্ট রেখে চলেন। ১৮৬৩ খ্রীঃ রাশিয়ার বিরুদ্ধে পোল-বিদ্রোহের সময় বিসমার্ক রুশ জারকে বহু সাহায্য দেন। ফলে আসন্ন অস্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধে তিনি রুশ-নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি পান। ইতালী গোড়া থেকে অস্ট্রিয়ার শত্রু-দেশ ছিল। এখন অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রাশিয়ার যুদ্ধের সময় প্রাশিয়ার পক্ষে ইতালী যোগ দিতে রাজী হয়। বাকী ছিল ফ্রান্স। বিসমার্ক আশঙ্কা করেন যে, সদাচঞ্চল ও সব ব্যাপারে হস্তক্ষেপবাদী, প্রভুত্বপরায়ণ তৃতীয় নেপোলিয়ন আসন্ন অস্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধে হয়ত অস্ট্রিয়ার পক্ষে যোগ দিয়ে বসবেন। তাহলে প্রাশিয়ার জয়লাভের কোন আশা থাকবে না। অথচ অস্ট্রিয়াকে জার্মানভূমি থেকে বলপূর্বক বিতাড়ন ছাড়া প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর ঐক্যস্থাপন আদপেই সম্ভব ছিল না। শেষ পর্যন্ত ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সঙ্গে বিসমার্ক বিয়ারিৎসের গোপন সাক্ষাৎকারে অস্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের সময় ফ্রান্সের নিরপেক্ষতা-রক্ষার মূল্যবান প্রতিশ্রুতি তিনি তৃতীয় নেপোলিয়নের কাছে পান। এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে বিসমার্ক তৃতীয় নেপোলিয়নকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি জার্মানীর কিছু স্থান ফ্রান্সকে তার সীমান্তের কাছে ছেড়ে দিবেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁর নিরপেক্ষতার বিনিময়ে ভিনিসিয়া প্রদেশ ইতালীকে হস্তান্তর করতে অস্ট্রিয়াকে যাতে বাধ্য করা হয়, সেজন্য প্রাশিয়াকে অঙ্গীকার

অস্ট্রিয়ার মিত্রহীনতা বিয়ারিৎসের চুক্তি

করান। এইভাবে বিসমার্ক অস্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের কূটনৈতিক প্রস্তুতি করেন। তাঁর কূটনীতির ফলে অস্ট্রিয়া মিত্রহীন হয়ে যায়।

এদিকে গ্যাস্টিনের সন্ধিস্বাক্ষরের পর অস্ট্রিয়া জার্মানীতে জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। জার্মান বুন্ডে এজন্য অস্ট্রিয়ার সমালোচনা হয়। অস্ট্রিয়া তার জনপ্রিয়তা ফিরে পাওয়ার জন্যে স্লেজভিগের সমস্যাকে বুন্ডের সভায় উত্থাপন করে। গ্যাস্টিনের সন্ধিতে স্থির ছিল যে, এই ডাচি দুটির সমস্যা অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নিবে। বুন্ডের সভায় কখনও তুলবে না। অস্ট্রিয়া এই শর্ত ভঙ্গ করায় বিসমার্ক সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, অস্ট্রিয়া গ্যাস্টিনের সন্ধি ভেঙেছে। কারণ এই সন্ধিতে স্লেজভিজ সমস্যা দুই শক্তির মধ্যে মীমাংসার জন্যে বলা হয়েছে। বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে জার্মান জনমতকে প্রাশিয়ার অনুকূলে আনার চেষ্টা করেন। গ্যাস্টিনের সন্ধিভঙ্গের অজুহাতে প্রাশিয়া অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে। ছয় সপ্তাহ যুদ্ধের পর স্যাডোয়া (Sadowa) বা কোনিগ্‌গ্রাৎসের খণ্ডযুদ্ধে অস্ট্রিয়া শোচনীয়ভাবে (১৮৬৬ খ্রীঃ) পরাস্ত হয়।

অস্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের কারণ

স্যাডোয়ার যুদ্ধে জয়লাভের পর বিসমার্ক ঘোষণা করেন যে, আর যুদ্ধের দরকার নেই। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে এবার আপস করা দরকার। কিন্তু প্রাশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়াম যুদ্ধজয়ের উন্মাদনায় যথাসময়ে যুদ্ধ রদ করতে চান নি। বিসমার্কের চাপে শেষ পর্যন্ত তিনি যুদ্ধবন্ধের আদেশ দেন। বিসমার্ক এর ফলে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে প্রাগের সন্ধি (১৮৬৬ খ্রীঃ) স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধির দ্বারা—(১) অস্ট্রিয়া জার্মানীর নেতৃত্ব ত্যাগ করে। জার্মানীর ভিতরে অবস্থিত তার রাজ্যাংশ প্রাশিয়াকে ছেড়ে দেয়। (২) দক্ষিণ জার্মানীর মেইন নদী পর্যন্ত বিস্তৃত যাবতীয় জার্মান ভূভাগ প্রাশিয়ার নেতৃত্বে উত্তর জার্মান রাষ্ট্ররূপে গঠিত হয়। (৩) মেইন নদীর দক্ষিণের জার্মান রাজ্যগুলি সংযুক্ত জার্মানী থেকে আলাদা থাকে। এগুলির নাম হয় দক্ষিণ জার্মান রাজ্য। (৪) উত্তর জার্মানীর যে সকল রাজ্য যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পক্ষ নেয়, প্রাশিয়া সেগুলির স্বাধীনতা লোপ করে এবং নিজরাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করে। বিসমার্ক মেইন নদীর দক্ষিণে দক্ষিণ জার্মানীর স্বতন্ত্রতা মানতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর পরিকল্পনা ছিল সমগ্র জার্মানীকে অস্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ করা। কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়নের হস্তক্ষেপে তাঁকে বাধ্য হয়ে প্রাগের সন্ধিতে দক্ষিণ জার্মানীর রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা স্বীকার করতে হয়। এর ফলে ফ্রান্সের সঙ্গে নবগঠিত জার্মানীর সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটে। বিসমার্ক ক্রোধের সঙ্গে তৃতীয় নেপোলিয়নের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেন, "লুই নেপোলিয়ন কি মনে করে উত্তর জার্মানী একটি পরাজিত দেশ? এজন্য তাঁকে দাম দিতে হবে!"

প্রাগের সন্ধি : জার্মান ঐক্য

এদিকে ফ্রান্সের পূর্ব সীমান্তে ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদী জার্মানরাষ্ট্রের উত্থানের ফলে ফ্রান্সের নিরাপত্তা বিপন্ন হয় বলে ফরাসী নেতারা মনে করেন। সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন অস্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধে নিরপেক্ষ থেকে নব জার্মানী গঠনে সহায়তা করায় জাতীয় নেতাদের দ্বারা ধিকৃত হন। ফরাসী নেতা থিয়ার্স বলেন যে, "স্যাডোয়ার যুদ্ধে আসল পরাজয় অস্ট্রিয়ার না হয়ে ফ্রান্সেরই হয়েছে।" সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁর জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধারের আশায় ফ্রান্সকে কিছু স্থান ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়ার জন্যে বিসমার্ক তথা নবজার্মানীর উপর চাপ দেন। তিনি প্রথমে রাইন্‌ল্যান্ড পরে বেলজিয়াম এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৬৭ খ্রীঃ ল্যাক্সেম্‌বার্গ দাবি করেন। বিসমার্ক বিয়ারিৎসের গোপন চুক্তি অনুসারে কিছু কিছু স্থান ছেড়ে দিতে তৃতীয় নেপোলিয়ানকে মৌখিক প্রতিশ্রুতি দেন। এখন তিনি কথা পালটালেন। নব-জাগ্রত জার্মান জনমত ফ্রান্সকে ক্ষতিপূরণ দানের বিরোধী দেখে বিসমার্কও এই জনমতের সামিল হন। তিনি মৌখিক ক্ষতিপূরণ দানে অস্বীকৃতি জানান।

ফ্রাঙ্কো-জার্মান সম্পর্কের অবনতি

যুদ্ধ অনিবার্য বুঝতে পেরে বিসমার্ক তাঁর কূটনৈতিক জাল ছড়িয়ে ফ্রান্সকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করেন। তিনি স্পেনের সিংহাসনে প্রাশিয়ার রাজবংশের রাজপুত্র লিওপোল্ডকে বসাবার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেন। এই ব্যবস্থা সফল হলে প্রাশিয়ার রাজশক্তি ফ্রান্সের পূর্বে নবগঠিত জার্মানি এবং পশ্চিমে প্রাশিয়া-শাসিত স্পেন দ্বারা ফ্রান্সকে বেষ্টন করে ফেলত। ফ্রান্সে এজন্যে দারুণ উত্তেজনা দেখা দেয়। প্রাশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়ামের নিকট ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত বেনেদিতি দাবি করেন যে, রাজাকে লিখিতভাবে জানাতে হবে যে, ভবিষ্যতে তাঁর বংশের কেহ স্পেনের সিংহাসনে বসবে না। রাজা প্রথম উইলিয়াম আশ্বাস দেন যে, স্পেনের সিংহাসনে আপাততঃ কেহ বসবে না। এমস (Ems) নামক স্থানে এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ তিনি টেলিগ্রামযোগে বিসমার্ককে রাজধানী বার্লিনে জানান। বিসমার্ক এই টেলিগ্রামের কয়েকটি শব্দ বাদ দিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশ করলে ফ্রান্সে এই ধারণা হয় যে, প্রাশিয়ার রাজা ফরাসী দূত বেনেদিতিকে অপমান করেছেন। অপর দিকে জার্মানদের ধারণা হয় যে, বেনেদিতি প্রথম উইলিয়ামকে অপদস্থ করেছেন। এর ফলে ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধ আরম্ভ হয় (১৮৭০ খ্রীঃ)। বিসমার্ক বলেন যে, "তিনি লাল কাপড় দেখিয়ে গল দেশের ষাঁড়কে ক্ষেপিয়ে দিয়েছেন।"

স্পেনে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন : ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধ

ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধে (১৮৭০ খ্রীঃ) সেডানে বহু ফরাসী সেনা নিহত ও বন্দী হয়। ফরাসী পার্লামেন্ট তৃতীয় নেপোলিয়নকে পদচ্যুত করে। ফ্রান্সে তৃতীয় প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়। ১৮৭২ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কফুর্টের সন্ধির দ্বারা (১) ফ্রান্স, জার্মানীকে আলসাস ও লোরেন প্রদেশ দুইটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। (২) ফ্রান্স পাঁচ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ জার্মানীকে দিতে অঙ্গীকার করে। (৩) দক্ষিণ জার্মানী উত্তর জার্মান সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হয়। ফ্রান্স এই সংযুক্তি মেনে নেয়। (৪) বিসমার্ক একটি সংবিধান ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাইখের উপর চাপিয়ে দেন।প্রাশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়াম নবগঠিত জার্মানীর সম্রাট 'কাইজার উইলিয়াম' উপাধি নেন।

জার্মানীর ঐক্য

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বিসমার্কের কৃতিত্ব : বিসমার্কের আমলে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর গঠন ও বৈদেশিক নীতি (The Role of Bismarck; Bismarck's role in Germany after Unification : His Foreign Policy) : ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর প্রতিষ্ঠাতা অটো ফন বিসমার্ক ছিলেন কূটনীতির যাদুকর। তাঁর কূটনৈতিক দক্ষতা, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও গঠনমূলক দৃষ্টির জন্যে ইতিহাসে তিনি এক প্রবাদপুরুষে পরিণত হয়েছেন। Realpolitik বা বাস্তব রাজনীতির জ্ঞান এবং শত্রুপক্ষকে মিত্রহীন করে লক্ষ্য-সাধনে তিনি বিরল ক্ষমতা দেখান। ঐতিহাসিক সি. ডি. হ্যাজেনের (C. D. Hazen) মতে বিসমার্কের বাস্তবমুখী কূটনীতিতে (Real Politik) ন্যায়নীতি (Ethics) ছিল গৌণ। শত্রুকে পরাস্ত করার জন্যে তিনি আলোকিত স্বার্থপরতা, প্রয়োজনীয় মিথ্যা আচরণ করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তাঁর যুক্তি ছিল যে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের জন্যে এই সকল কাজ দরকার হলে করা উচিত। বিসমার্ক তাঁর আত্মজীবনীতে বলেন যে, এথিক্স (Ethics) বা ন্যায়নীতি ব্যক্তির জীবনে বাধ্যতামূলক হলেও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এথিক্স রক্ষার গোঁড়ামি না করাই উচিত। সমকালীন যুগে তাঁর সফলতার জন্যে বিসমার্ক প্রশংসিত হন। কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁর সম্পর্কে উচ্ছ্বাস কমলে ঐতিহাসিকরা তাঁকে এথিক্সের হীনতার জন্যে নিন্দা করেছেন। তথাপি Real Politik বা বাস্তবতাময় সুবিধাবাদী রাজনীতির আধুনিক রূপকার হিসাবে বিসমার্ক প্রশংসিত হয়েছেন।

যখন জার্মানীর জনসাধারণ যুদ্ধের দ্বারা জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করার কথা ভাবেন নি, তখন বিসমার্ক জার্মানীর উদারপন্থীদের জানিয়ে দেন যে, "প্রাশিয়ার উদারপন্থা দ্বারা জার্মানজাতির ঐক্যের সমস্যার সমাধান হবে না...রক্ত ও লৌহের দ্বারাই সমাধান হবে।" তিনি প্রাশিয়াবাসীদের বুঝিয়ে দেন যে, অস্ট্রিয়াকে যুদ্ধের দ্বারা জার্মানী থেকে বহিষ্কার করে প্রাশিয়ার অধীনে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। এটাই ইতিহাসের নির্দেশ। প্রাশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়াম ভ্রাতৃপ্রতিম জার্মান দেশ অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় অনিচ্ছা দেখালে, বিসমার্ক তাঁকে ভর্ৎসনা করে বলেন, "জার্মানী এমন ছোট জায়গা যে জার্মানী ও অস্ট্রিয়া উভয়ের স্থানসঙ্কুলান হবে না। সুতরাং প্রাশিয়ার স্বার্থে অস্ট্রিয়াকে বহিষ্কার করতে হবে।" অস্ট্রিয়া ছিল শক্তি ও আকৃতিতে বিরাট। ক্ষুদ্র প্রাশিয়া এই অসমান যুদ্ধে সফল হবে কিনা এ সম্পর্কে আইনসভার সদস্যরা সন্দেহ প্রকাশ করেন। বিসমার্ক তাঁদের বলেন যে, "যখন একটি নেকড়ে বাঘ একপাল মেষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন সে কতগুলি মেষ আছে গুণে দেখে না। তার সাহস ও তেজ তাকে সফলতা দেয়।"

অস্ট্রিয়াকে জার্মানী থেকে বহিষ্কারের নীতি

বিসমার্ক তাঁর কূটনীতির দ্বারা অস্ট্রিয়াকে মিত্রহীন করে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। এই কূটনীতির ফলে মিত্রহীন অস্ট্রিয়াকে একাই প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে হয়। বিসমার্ক বিয়ারিৎসের চুক্তির দ্বারা অস্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের সময় ফ্রান্সকে নিরপেক্ষ রাখেন। স্যাডোয়ার জয়ের মাঝেই তিনি এই যুদ্ধের সীমা টেনে দেন এবং অস্ট্রিয়ার সীমান্তে সেনাদলকে থামিয়ে দেন। ভবিষ্যতে অস্ট্রিয়ার নিরপেক্ষতা তাঁর দরকার হবে তিনি জানতেন। এজন্যে তিনি অস্ট্রিয়াকে নতজানু করে মর্মান্তিক আঘাত দেন নাই।

অস্ট্রিয়ার পরাজয়

এর পর বিসমার্ক ফ্রান্সের শত্রুতায় বিরক্ত হয়ে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হন। তিনি তৃতীয় নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতির ভুলগুলি ব্যবহার করে ফ্রান্সকে মিত্রহীন করেন। স্পেনের সিংহাসন উপলক্ষে তিনি এমন কূটনৈতিক কৌশল দেখান যে, ফ্রান্সই জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে আক্রমণকারী রূপে চিহ্নিত হয়। সেডানের যুদ্ধে তৃতীয় নেপোলিয়নের পতন হয়। প্যারিসের পতন হয়। ফ্রাঙ্কফুর্টের সন্ধির দ্বারা ফ্রান্স নতজানু হয়ে আলসাস-লোরেন ছেড়ে দেয়। দক্ষিণ জার্মানী মূল জার্মানীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়। বিসমার্ক এক সংবিধান দ্বারা ঐক্যবদ্ধ জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

ফ্রান্সের পরাজয় : জার্মানীর ঐক্য

বিসমার্কের কয়েকটি গুরুতর ত্রুটির উল্লেখ করা দরকার। প্রথমতঃ, ঐতিহাসিক সিম্যান (Seaman)-এর মতে, বিসমার্ক জার্মানীর ঐক্যের বদলে জার্মানীর উপর প্রাশিয়ার কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেন। সংবিধানে প্রাশিয়ারই প্রাধান্য রাখা হয়। জার্মানীর অন্য রাজ্যগুলির ইচ্ছার দাম তিনি দেননি। দ্বিতীয়তঃ, জার্মানীতে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করে তিনি প্রাশিয়ার রাজার অধীনে এক স্বৈরতন্ত্রী শাসন প্রবর্তন করেন। প্রখ্যাত সংবিধানবিদ্ মেডলিকট (Medlicott) নবজার্মানীর এই সংবিধানকে "কপট সংবিধান" (Sham Constitution) বলেছেন। তৃতীয়তঃ, বিসমার্কই সর্বপ্রথম জার্মান ঐক্যের কথা ভাবেন একথা ঠিক নয়। তাঁর আগে জার্মান জাতীয়তাবাদীরা, জার্মান ছাত্ররা ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টে গণতান্ত্রিকভাবে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। ১৮৭০ খ্রীঃ পরে তাঁর বৈদেশিক নীতি ত্রুটিমুক্ত ছিল না।

বিসমার্কের নীতির সমালোচনা

নবগঠিত জার্মানীর নায়ক হিসাবে বিসমার্কের কৃতিত্ব (The Role of Bismarck as the leader of New Germany) : বিসমার্ক কেবলমাত্র ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন নবগঠিত জার্মানীর ধারক ও বাহক। কেটেল্‌বি (Ketelbye) বলেছেন যে, "ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের পর জার্মানী হয় ইওরোপের কর্ত্রী এবং বিসমার্ক হন জার্মানীর প্রভু" (The Franco-Prussian war made Bismarck the master of Germany and Germany the mistress of Europe)। বিসমার্ক নবগঠিত জার্মানীর জন্যে যে সংবিধান রচনা করেন, তাতে আইনসভার উর্ধ্বকক্ষে (Bundsrat) জার্মানীর ৩৮ জন রাজার প্রতিনিধিদের স্থান দেন। আইনসভার নিম্নকক্ষে (Reichstag) তিনি গণভোটের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করে জনসাধারণের অধিকার রক্ষা করেন। নবগঠিত জার্মানীর প্রধান সমস্যা ছিল ক্যাথলিক গীর্জা ও পোপের সঙ্গে জার্মানরাষ্ট্রের সম্পর্ক-নির্ণয়। ক্যাথলিকরা পোপের নির্দেশে রাষ্ট্রের আইনের উর্ধ্বে পোপের আইনকে স্থান দিতে চাইলে, বিসমার্ক তা মানেন নি। এজন্য জার্মানরাষ্ট্রের সঙ্গে ক্যাথলিক গীর্জার যে সংঘাত হয়, তার নাম ছিল 'কুলটুর ক্যাম্ফ' (Kultur Kampf)। শেষ পর্যন্ত বিসমার্ক ক্যাথলিক গীর্জাকে আপসে আসতে বাধ্য করেন। আভ্যন্তরীণ নীতিতে বিসমার্ক ছিলেন ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল। তিনি সমাজতন্ত্রবাদীদের প্রতি দমননীতি নেন। জার্মান রাজতন্ত্রের স্বৈরক্ষমতাকে তিনি প্রাণপণে উদারতন্ত্রবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, নবগঠিত জার্মানী একমাত্র এই রাজতন্ত্রের মাধ্যমে উন্নতিলাভে সক্ষম। তিনি সমাজতন্ত্রীদের দমন করলেও শ্রমিকদের অসন্তোষ দূর করার জন্যে কিছু কিছু শ্রমিক-কল্যাণমূলক সংস্কার করেন। যথা, শ্রমিক বীমা আইন, শ্রমিকদের কাজ করার সময় হ্রাস ইত্যাদি। তবে মূলত তিনি ছিলেন সামন্ততান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসক। তিনি জার্মানীতে শিল্পপ্রসারের জন্যে ব্যাঙ্কব্যবস্থার পুনর্গঠন, কার্টেল, কম্‌বাইন ও ট্রাস্ট গঠন করেন। তিনি জার্মান-শিল্পকে রক্ষার জন্যে সংরক্ষণ-শুল্ক স্থাপন করেন।

১৮৭০ খ্রীঃ পর বিসমার্ক তাঁর পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল নবগঠিত জার্মানীকে পরাজিত ফ্রান্সের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষা করা এবং ফ্রান্সকে মিত্রহীন করে দুর্বল করে রাখা। এজন্য তিনি ঘোষণা করেন যে জার্মানী এখন আত্মতৃপ্ত দেশ। জার্মানী শান্তি চায়, জার্মানী আর যুদ্ধ ও রাজ্যগ্রাস চায় না। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে বিসমার্ক অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, ইতালী ও ব্রিটেন প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলিকে ফ্রান্সের সঙ্গে মিত্রতার সম্ভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। এই সকল রাষ্ট্রকে তিনি বিভিন্ন চুক্তির দ্বারা জার্মানীর পক্ষে রাখেন। ফলে ইওরোপের শক্তিসাম্য জার্মানীর অনুকূলে থাকে। ফ্রান্স মিত্রহীন অবস্থায় জার্মানীর বিরুদ্ধে ব্যর্থ রোষে ফুঁসতে থাকে। বিসমার্ক এজন্য যে চুক্তিগুলি করেন তার মধ্যে প্রধান ছিল জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে দ্বিশক্তি-চুক্তি (১৮৭৯); জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও ইতালীর মধ্যে ত্রিশক্তি-চুক্তি বা-ট্রিপল এ্যালায়্যান্স।' তিনি রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও জার্মানীর মধ্যে তিন কাইজারের চুক্তি বা ড্রাই-কাইজার-বুন্ড গঠন করেন। এছাড়া তিনি জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে পারস্পরিক অনাক্রমণ চুক্তি বা রি-ইন্‌স্যুর্যান্স চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এইভাবে বিসমার্ক তাঁর পররাষ্ট্রনীতির দ্বারা ঐক্যবদ্ধ জার্মানীকে ইওরোপের প্রধান স্থানে আসন দেন। তিনি বলতেন, "আমি সর্বদা ৫টি বল নিয়ে খেলা করি। তার মধ্যে ২টি হাতে থাকে বাকি তিনটি থাকে শূন্যে"। বিসমার্কের অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতি যতদিন বজায় ছিল, ততদিন জার্মানী ছিল ভয়ানক শক্তিশালী। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, তাঁর উত্তরসুরী কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতি থেকে বিচ্যুত হলে, জার্মানী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ও জার্মানীর পতন হয়। তবে বিসমার্কের

পররাষ্ট্রনীতি ছিল জটিল ও পরস্পরবিরোধী। তাঁর পতনের পর এই নীতি চালু রাখা কঠিন ছিল। ১৮৯০ খ্রীঃ কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম বিসমার্ককে পদচ্যুত করলে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অবসান হয়।

[গ] পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ পোলিশ জাতীয়তাবাদ ঃ পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহ (Polish Nationalism : Polish Revolts) ঃ অষ্টাদশ শতকে প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক ও রাশিয়ার জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথারিন ১৭৭৫ খ্রীঃ, ১৭৯৩ খ্রীঃ ও ১৭৯৫ খ্রীঃ তিনটি ব্যবচ্ছেদ দ্বারা স্বাধীন পোল্যাণ্ড রাষ্ট্রের অস্তিত্ব লোপ করেন। নেপোলিয়ন এই ব্যবচ্ছেদকে নস্যাৎ করে 'গ্র্যান্ড ডাচি অব ওয়ারস' নামে রাজ্য সৃষ্টি করে ভাঙা পোল্যাণ্ড জোড়া লাগান ও জাতীয়তাবাদীদের আশা উদ্দীপ্ত করেন। নেপোলিয়ন তাঁর কোড নেপোলিয়ন প্রভৃতি সংস্কার চালু করার ফলে পোল্যাণ্ডে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বীজ রোপিত হয়। ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা পোল্যাণ্ডকে চতুর্থবার ব্যবচ্ছেদ করে $\frac{৩}{৪}$ অংশ জার শাসিত রাশিয়া ও $\frac{১}{৪}$ অংশ প্রাশিয়াকে দেওয়া হয়।

ফরাসী বিপ্লবের নবজাত ভাবধারা পোল জাতীয়তাবাদী ও ছাত্রদের মধ্যে জাগরণ ঘটায়। পোল অভিজাতশ্রেণী তাদের আধিপত্য এবং লিথুয়ানিযার জমিদারী স্বত্ব হারিয়ে জার সরকারের উপর রুষ্ট হয়। ফলে ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লবের সঙ্কেত ঘোষিত হলে রুশ-শাসিত পোল্যাণ্ডে বিদ্রোহ দেখা দেয়। রুশ গুপ্তসমিতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এই বিপ্লবে অগ্রণী হয়। যেহেতু জার পোল্যাণ্ডকে প্রায় স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার আগেই দান করেন, সেহেতু স্থানীয় প্রশাসন জারের পক্ষে পোলরাই চালাত। জার ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক শাসক। সুতরাং পোল দেশপ্রেমিকরা ১৮৩০ খ্রীঃ বিদ্রোহ ঘোষণা করলে এই বিদ্রোহ দমন করার মত প্রাথমিক রুশ সেনা ও পুলিশ জারের হাতে পোল্যাণ্ডে ছিল না। কারণ তিনি পোল জাতীয় সেনাদের উপরেই নির্ভর করতেন।

১৮৩০ খ্রীঃ পোল বিপ্লব

বিদ্রোহী পোলরা একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করে এবং ইওরোপের বিভিন্ন দেশে পোল জাতীয়তাবাদীদের প্রতি মৌখিক সহানুভূতি দেখানো হলেও কোন কার্যকরী সাহায্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে কোন রাষ্ট্র দেয় নি। ব্রিটেন নবগঠিত পোলরাষ্ট্রকে জানিয়ে দেয় যে, ব্রিটেন ও বৃহৎ শক্তিগুলি ভিয়েনা-চুক্তি সমর্থন না করলেও পোলজাতির স্বাধীনতা ও সংবিধান রক্ষার জন্যে তারা প্রতিশ্রুতি দেয় নি। ফ্রান্সের জনমত পোল্যান্ডের পক্ষে থাকলেও, ফরাসী সরকার রাশিয়ার বিরোধিতা করা অনুচিত মনে করেন। ফলে রুশ সেনাদল পোল্যাণ্ডে ঢুকে পড়ে। ভিশ্চুলার যুদ্ধে পরাস্ত হলে পোলবিদ্রোহ চূড়ান্তভাবে দমন করা হয়। পোল্যাণ্ডের সংবিধান নাকচ করা হয়। পোল্যাণ্ডের শাসন পরিচালনার দায়িত্ব রুশ শাসনকর্তাদের হাতে দেওয়া হয়। রুশভাষা শিক্ষা আবশ্যিক করা হয়। পোল অভিজাতদের জমি কেড়ে নিয়ে কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। একমাত্র পোল্যাণ্ডের জাতীয় গীর্জা ছাড়া পোল জাতীয়তাবাদের সকল উপাদানকে ভেঙে চুরমার করা হয়।

১৮৩০ খ্রীঃ পোল বিদ্রোহ দমনে রাশিয়ার ভূমিকা ঃ অন্যান্য শক্তির ভূমিকা

পোল জাতীয়তাবাদকে এই দমননীতির দ্বারা লোপ করা যায় নি। পোল্যাণ্ডের গ্যালিশিয়া প্রদেশ ছিল অস্ট্রিয়ার অধিকারে। গ্যালিশিয়া থেকে পোল জাতীয়তাবাদ সমগ্র পোল্যাণ্ডে ছড়ায়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়া পরাস্ত হলে পোলদের মনে আশার মুকুল ফুটে উঠে। ফরাসী রাজ তৃতীয় নেপোলিয়ন পোলিশ জাতীয়তাবাদীদের সক্রিয় বিদ্রোহঘোষণায় উৎসাহ দেন। পোল জাতীয়তাবাদীরা আশা করে যে, ফরাসী সেনা তাদের পক্ষ নিয়ে রাশিয়ার আক্রমণ প্রতিরোধ করবে। ১৮৬২ খ্রীঃ জার সরকার

পোল জাতীয়তাবাদের জাগরণ

পোলিশ যুবকদের রুশ সেনাদলে যোগ দিতে নির্দেশ দিলে পোল্যাণ্ডে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পোল অভিজাতরা এবং পোল বুর্জোয়াশ্রেণী পোলদের নেতৃত্ব দেন।

ইওরোপের সর্বত্র বিশেষতঃ ফ্রান্সে পোলজাতির স্বাধীনতার সমর্থনে জনমত প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বিসমার্ক আশঙ্কা করেন যে, রাশিয়া-অধিকৃত পোল্যাণ্ড স্বাধীনতা পেলে, প্রাশিয়া-অধিকৃত পোল্যাণ্ডে গণ্ডগোল দেখা দিতে পারে। সুতরাং তিনি রাশিয়ার জারকে সমর্থন করায় জার সরকার দৃঢ়তাসহ এই বিদ্রোহ দমন করেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন জারের হুমকিতে ভীত হয়ে পোল্যাণ্ড থেকে হাত গুটিয়ে নেন। পোল্যাণ্ডের আর্ত কণ্ঠস্বর ইওরোপের স্বার্থপর রাজতন্ত্রগুলিকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু পোল জাতীয়তাবাদ এত দমন সত্ত্বেও তার প্রাণশক্তিকে ভবিষ্যতের জন্যে টিকিয়ে রাখে।

১৮৬৩ খ্রীঃ পোল বিপ্লব

সারণী

[ক] ভিয়েনা-চুক্তির দ্বারা ইতালীকে রাজনৈতিক দিক থেকে অন্ততঃ প্রধান ৫টি ভাগে ভাগ করে ইতালীর জাতীয় ঐক্যকে ধ্বংস করা হয়। কার্বোনারী দল ও তার পরে ম্যাৎসিনীর ইয়ং ইতালী দল ইতালীকে বৈদেশিক শাসনমুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে। ম্যাৎসিনী গণভোট, প্রজাতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে নবইতালী গঠনের বিফল চেষ্টা করেন। এরপর ইতালীর মুক্তি-আন্দোলনে কাউন্ট কাভুর নেতৃত্ব দেন। কাভুর ম্যাৎসিনীর প্রজাতান্ত্রিক আদর্শবাদকে গ্রহণ না করে পিডমন্টের রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েলের নেতৃত্বে ইতালীতে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নেন। তিনি অস্ট্রিয়ার হাত থেকে ইতালীকে মুক্ত করার জন্যে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সঙ্গে প্লোম্বিয়ারের গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ফরাসী বাহিনীর সহযোগিতায় অস্ট্রিয়া ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি দ্বারা লম্বার্ডি প্রদেশ পিডমন্টকে ছেড়ে দেয়। মধ্য ইতালী পিডমন্টের সঙ্গে যুক্ত হয়। ম্যাৎসিনীশিষ্য গ্যারিবল্ডী দক্ষিণ ইতালীর সিসিলি ও নেপল্‌স জয় করার পর এই অঞ্চল পিডমন্টের সঙ্গে যুক্ত হলে ঐক্যবদ্ধ ইতালী গঠিত হয়। এরপর ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ভিনিসিয়া এবং ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে রোম ইতালীর সঙ্গে যুক্ত হয়।

[খ] ইতালীর মুক্তি-আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ম্যাৎসিনী ছিলেন প্রজাতন্ত্রবাদী ও গণভোটে বিশ্বাসী। তিনি ছিলেন ভাববাদী এবং ইতালীর বৈদেশিক শাসন থেকে মুক্তির সঙ্গে ইতালীর জাগরণের প্রকৃত মুক্তির জন্যে প্রজাতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আদর্শ প্রচার করেন। কাভুর ছিলেন বাস্তববাদী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর সমর্থক। তিনি নিজ কূটনৈতিক প্রতিভার জোরে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সহযোগিতায় ইতালীর মুক্তি-আন্দোলনের সূচনা করেন। তিনি ইতালীতে বুর্জোয়া গণতন্ত্র বা সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার ও সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। গ্যারিবল্ডী ছিলেন বিখ্যাত দেশপ্রেমিক ও ম্যাৎসিনীর ভাবশিষ্য ও সাহসী, আত্মত্যাগী সেনাপতি। ভিক্টর ইম্যানুয়েল ছিলেন বাস্তব বুদ্ধির ঠাণ্ডামাথা লোক।

[গ] জার্মানীর ঐক্য-আন্দোলনের নায়ক বিসমার্ক ছিলেন 'রক্ত ও লৌহ নীতির' প্রবক্তা। তিনি কূটনীতি ও যুদ্ধের দ্বারা জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্য নেন। তিনি ডেনমার্কের সঙ্গে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধে শ্লেজভিগ্ ও হলস্টিন প্রদেশ জার্মানীর অধীনে আনেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অস্ট্রো-প্রাশীয় যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে পরাস্ত করে প্রাগের সন্ধির দ্বারা মেইন নদী পর্যন্ত গোটা উত্তর জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করেন। অস্ট্রিয়া জার্মানীর আধিপত্যের দাবি ত্যাগ করে। ১৮৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের দ্বারা তিনি ফ্রান্সকে পরাজিত করে দক্ষিণ জার্মানীকে অবশিষ্ট জার্মানীর সঙ্গে যুক্ত করেন এবং ফ্রান্সকে আলসাস ও লোরেন প্রদেশ ছেড়ে দিতে বাধ্য করেন। ঐক্যবদ্ধ জার্মানীতে একটি সংবিধান দ্বারা তিনি দুই কক্ষযুক্ত আইনসভা গঠন করেন। প্রাশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়াম জার্মান সম্রাট কাইজার উইলিয়াম হিসাবে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর শাসক হন।

[ঘ] বিসমার্ক ছিলেন উনবিংশ শতকের ইওরোপের এক বিখ্যাত রাষ্ট্রনীতিবিদ। তাঁর যুদ্ধ ও কূটনীতি বা রক্ত-লৌহনীতি ছিল বিখ্যাত। তিনি তিনটি যুদ্ধের দ্বারা জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করেন ও ইওরোপের দুই বৃহৎ শক্তি অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সকে পরাজিত করেন। তিনি জার্মানীতে প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপন না করে একটি অর্ধ গণতন্ত্র স্থাপন করেন। প্রাশিয়ার ও তাঁর নিজ প্রাধান্য তিনি জার্মানীর উপর স্থাপন করেন।

[ঙ] ভিয়েনা-চুক্তি ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের দ্বারা পোল্যাণ্ডের $\frac{৩}{৪}$ অংশ রাশিয়ার ও $\frac{১}{৪}$ অংশ প্রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। ফরাসী বিপ্লবের দ্বারা প্রচারিত জাতীয়তাবাদ পোল্যাণ্ডকে শক্তিশালী করে। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে পোল বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পোলজাতি স্বাধীনতালাভের জন্যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তৃতীয় নেপোলিয়ন এই বিপ্লবে নৈতিক সমর্থন দিলেও, রাশিয়া পোলবিদ্রোহ দমন করে।

অনুশীলনী

১। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

(ক) কাকে ইতালীর মুক্তি-আন্দোলনের "ভাবপুরুষ, দার্শনিক ও আত্মা" বলা হয়? (খ) যোসেফ ম্যাৎসিনীর আদর্শ সম্বন্ধে কি জান? (গ) কাউন্ট কাভুর কোন্ রাজনীতির ভক্ত ছিলেন? (ঘ) ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি সম্বন্ধে কি জান? (ঙ) লালকোর্তা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সেনাপতি কে ছিলেন? (চ) ম্যাৎসিনীর প্রজাতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (ছ) কার্বোনারী কাদের বলে এবং কোন্ কোন্ সালে এরা বিদ্রোহ করে? (জ) কাভুর কোন্ রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন? (ঝ) স্বাধীন ইতালীর রাজধানীর নাম কি? (ঞ) "রক্ত ও লৌহ" নীতি কি? (ট) গ্যাস্টিনের সন্ধির দ্বারা কোন্ সমস্যার সমাধান করা হয়? (ঠ) কোন্ কোন্ রাষ্ট্রের মধ্যে প্রাগের সন্ধি হয়? (ড) কাকে "কূটনীতির জাদুকর" বলা হয়? (ঢ) কোন্ সংবিধানকে "কপট সংবিধান" বলা হয়? (ণ) কতবার পোল্যাণ্ডে ব্যবচ্ছেদ হয়? (ত) ১৮৬৩ খ্রীঃ পোলবিপ্লব সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

(ক) ইতালীর ঐক্য-আন্দোলনে যোসেফ ম্যাৎসিনী, কাউন্ট কাভুর ও গ্যারিবল্ডীর ভূমিকা আলোচনা কর। (খ) ম্যাৎসিনীর আদর্শ বর্ণনা কর এবং রোম প্রজাতন্ত্রে তিনি তাঁর আদর্শ কিভাবে বাস্তবায়িত করেন তার বিবরণ দাও। (গ) ইতালীর ঐক্য-আন্দোলনে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের ভূমিকা বর্ণনা কর। (ঘ) প্লোম্‌বিয়ারের সন্ধি কি এবং এই সন্ধির দ্বারা ইতালীর ঐক্য-আন্দোলন কিভাবে প্রভাবিত হয় তার বিবরণ দাও। (ঙ) ইতালীর মুক্তি-আন্দোলনে যোসেফ ম্যাৎসিনী, কাউন্ট কাভুর ও গ্যারিবল্ডীর আদর্শের তুলনামূলক বিবরণ দাও। (চ) বিসমার্কের নেতৃত্বে কিভাবে জার্মানীর ঐক্য সাধিত হয় তাহা আলোচনা কর। (ছ) স্লেজভিগ-হলস্টিন সমস্যা কি এবং এই সমস্যা অস্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের জন্যে কতখানি দায়ী ছিল? (জ) স্পেনের উত্তরাধিকারের প্রশ্নে কিভাবে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধ বাধে তাহা বর্ণনা কর। (ঝ) বিসমার্কের কৃতিত্বের বিবরণ দাও। (ঞ) ১৮৩০ খ্রীঃ এবং ১৮৬৩ খ্রীঃ ব্যর্থ পোল-বিপ্লবের বিবরণ দাও।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ঃ ক্রীতদাস প্রথা বিলোপ ঃ আব্রাহাম লিঙ্কন

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কারণ ঃ দাসপ্রথা ও বিচ্ছিন্নতার দাবি (Causes of the American Civil War: The Slavery and the Secession issues) ঃ আমেরিকার ত্রয়োদশ উপনিবেশ স্বাধীনতালাভের পর এক প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ করে। আমেরিকার অরণ্যপ্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করে মার্কিন দেশের এই পরিশ্রমী, উদ্যোগী লোকেরা শিল্প-গঠন ও কৃষি-খামার স্থাপন দ্বারা আমেরিকাকে বিশ্বের এক প্রধান সম্পদশালী দেশে পরিণত করে। ১৮১২ খ্রীঃ ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধের পর মার্কিনজাতির মনে কিছুকাল জাতীয়তাবাদের প্লাবন বইতে থাকে। মার্কিনজাতি ইওরোপের নেতৃত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিশ্বে তার নিজস্থান গ্রহণ করতে চায়। ১৮২২ খ্রীঃ ইওরোপীয় শক্তি-সমবায় (Concert of Europe) দক্ষিণ আমেরিকায় হস্তক্ষেপের উদ্যোগ নিলে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি মন্‌রো তাঁর সুবিখ্যাত মন্‌রো-নীতি ঘোষণা করেন। তিনি ইওরোপের শক্তিগুলিকে সতর্ক করে বলেন যে, "আমেরিকা আমেরিকাবাসীদের জন্য। এখানে ইওরোপের হস্তক্ষেপ সহ্য করা হবে না।" মন্‌রো-নীতি ছিল মার্কিন জাতীয়তাবাদ ও আমেরিকায় মার্কিন দেশের প্রসার নীতির আত্মপ্রকাশ। এই পরিবেশে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জেম্‌স মন্‌রো তাঁর বিখ্যাত "মন্‌রো-নীতি" ঘোষণা করেন।

উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে মার্কিন জাতীয়তাবাদ এক বিরাট সঙ্কটের মুখে পড়ে। এই সঙ্কটের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এই গৃহযুদ্ধের কারণ ছিল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের অর্থনীতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। উত্তর ছিল শিল্প ও বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল, সচ্ছল, বুর্জোয়া অর্থনীতির দ্বারা পরিচালিত। দক্ষিণ ছিল কৃষি-অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। দক্ষিণে তুলা, চাউল ও তামাকের চাষ ছিল প্রধান। দক্ষিণে শ্বেতাঙ্গ খামার-মালিকরা বিরাট তুলার খামার স্থাপন করে নিগ্রো দাসদের শ্রম দ্বারা তুলা ও অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদন করে তা বিক্রি করত। ১৭৯৩ খ্রীঃ এলি হুইটন কটন জিন নামে তুলা থেকে সূতা তৈরির এক যন্ত্র আবিষ্কার করলে সূতী কাপড়ের চাহিদা বাড়ে। সূতী কাপড়ের জন্যে তুলার দরকার হয়। দক্ষিণের তুলার খামারগুলিতে খামার-মালিকরা দাসদের উদয়াস্ত খাটিয়ে তুলা উৎপাদন বাড়াতে চেষ্টা করে। দাস-শ্রমের উপর নির্ভর করে দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গ অভিজাতশ্রেণী অর্থবান হতে থাকে। এদিকে উত্তরের অধিকাংশ রাজ্যে উনবিংশ শতকের গোড়া থেকে দাসপ্রথা ছিল না। এই রাজ্যগুলিকে দাসপ্রথাহীন রাজ্য (Free State) বলা হত। উত্তরের দাসপ্রথাহীন রাজ্যগুলি দাসপ্রথাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মর্যাদা-নষ্টকারী বলে মনে করত। ইওরোপের সর্বত্র আইন করে দাসপ্রথা ও দাসব্যবসায় নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই বর্বর প্রথা চালু থাকায় উত্তরের লোকেরা তা জাতির পক্ষে অপমানজনক বলে গণ্য করত। তাছাড়া দাসদের উপর খামার-মালিকরা দৈহিক নির্যাতন চালাত। এজন্যে উত্তরের মানবতাবাদীরা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়। দাসদের মুক্তির দাবি করে উত্তরের বিভিন্ন সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতিগুলি জনমতকে প্রভাবিত করে। দক্ষিণের খামার মালিকদের চোখে উত্তরের দাসপ্রথা বিরোধী মনোভাব উত্তরের জবরদস্তি বলে গণিত হয়।

উত্তরের শিল্প অর্থ নীতি : দক্ষিণের কৃষি- অর্থনীতি : দাসপ্রথার সমস্যা

উত্তরের ও দক্ষিণের এই দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্যে মার্কিন আইনসভায় দাসপ্রথাহীন রাজ্য ও দাসপ্রথাযুক্ত রাজ্য নিজ নিজ প্রভাব বাড়াতে চেষ্টা করে। দাসপ্রথাযুক্ত দক্ষিণের রাজ্যে তূলা উৎপাদন হত বলে তারা নিজ নিজ রাজ্যকে তূলা-উৎপাদনকারী রাজ্য বা কটন-স্টেট (Cotton State) নাম দেয়। আইনসভা বা মার্কিন কংগ্রেসেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালনার জন্যে আইন রচনা হত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সীমা তখন পশ্চিম ও দক্ষিণে বাড়ছিল। এই নূতন অঞ্চলগুলিতে মার্কিনজাতির বসবাসের প্রসার হলে নূতন রাজ্য স্থাপিত হতে থাকে। এই নূতন জনবসতি অঞ্চল কংগ্রেসে নূতন রাজ্য হিসাবে গৃহীত হয়। দাসপ্রথা দক্ষিণের যে রাজ্যগুলিতে আছে, সেখানেই তাকে সীমাবদ্ধ রাখতে উত্তরের দাসপ্রথাবিরোধীরা চেষ্টা চালাত। সুতরাং এই নূতন রাজ্যগুলিকে কংগ্রেসে সদস্যপদ দেওয়ার সময় 'ফ্রি স্টেট' বা দাসপ্রথাহীন রাজ্য রূপে চিহ্নিত করার জন্যে উত্তরের রাজ্যগুলি চেষ্টা করত। তার ফলে দাসপ্রথাহীন রাজ্যে দাসপ্রথা চালু করা হত বেআইনী। এজন্যে দক্ষিণের রাজ্য চাইত যে, নূতন রাজ্যগুলিকে দাসপ্রথাযুক্ত রাজ্য হিসাবে গণ্য করা হোক। তাহলে স্লেভ স্টেট বা দাসরাজ্যের সংখ্যা বাড়বে এবং কংগ্রেসে তাদের জোর বাড়বে। এভাবে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে মনকষাকষি আরম্ভ হয়।

কংগ্রেসে নতুন রাজ্যের সদস্য পদের চরিত্র নিয়ে উত্তর ও দক্ষিণের দ্বন্দ্ব

১৮২০ খ্রীঃ মিজুরী বা মিসৌরী প্রদেশকে কংগ্রেসের সদস্য করার সময় উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে উপরোক্ত বিরোধ তীব্রভাবে দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত মিজুরী প্রদেশকে দাসরাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু এইসঙ্গে 'মেইন' নামে অপর একটি নূতন রাজ্যকে ফ্রি স্টেট বা দাসপ্রথাহীন রাজ্যের মর্যাদা দিয়ে সদস্য-পদ দিতে হয়। এইভাবে উত্তর ও দক্ষিণের দাবির মধ্যে সমতা রক্ষা হয়। এই মীমাংসাকে 'মিজুরীর মীমাংসা' (Missouri Compromise) বলা হয়। কিন্তু এই মীমাংসা ছিল নিতান্তই সাময়িক। উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে বিরোধ বাড়তেই থাকে।

মিজুরী চুক্তি

উইলিয়াম লয়েড গ্যারিসন নামে এক মানবতাবাদী মার্কিনী নাগরিক এক ক্রীতদাস-নিবারণী সমিতি স্থাপন করেন। তিনি দাবি করেন যে, ক্রীতদাসদের আইন করে মুক্তিদান ও পূর্ণ নাগরিক অধিকার দিতে হবে। তিনি দক্ষিণের মেরিল্যান্ড, বাল্টিমোর প্রভৃতি দাস-রাজ্যে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চালান। 'লিবারেটর' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করে তিনি দাসপ্রথার বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে থাকেন। বোস্টন বন্দরে সভা করার সময় ক্রীতদাসপ্রথা-সমর্থক জনতা, গ্যারিসনের গলায় দড়ি বেঁধে তাঁকে টেনে নিয়ে শহর পরিক্রমা করায়। গ্যারিসন-পন্থী সাংবাদিক এলাইজা লাভজয়কে ইলিনয় নগরে হত্যা করা হয়। এই সন্ত্রাস দ্বারা দাসপ্রথা- বিরোধী জনমতকে দমানো সম্ভব হয় নি। বরং এর ফলে দাস-প্রথার বিরুদ্ধে জনমত তীব্র হতে থাকে। নিউ ইংলন্ডের পিউরিট্যান সম্প্রদায় গ্যারিসনের প্রচারে বিশেষ প্রভাবিত হয়। ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে জনমতের দাবি বুঝতে পেরে রাজনীতিবিদ্‌রা তার সামিল হন। ক্রীতদাস-প্রথা উচ্ছেদের আইন রচনার জন্যে মার্কিন কংগ্রেসে ঘন ঘন জনসাধারণের সহিযুক্ত আবেদন পাঠানো আরম্ভ হয়। ১৮৫০ খ্রীঃ নাগাদ ক্রীতদাস-বিরোধী সমিতির সদস্যসংখ্যা ২ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়।

উইলিয়াম লয়েড গ্যারিসন : ক্রীতদাস বিরোধী জনমত গঠন

ইতিমধ্যে ক্যালিফোর্ণিয়া অঞ্চলে সোনার খনি আবিষ্কৃত হলে দাসপ্রথা-বিরোধী উত্তরের লোকেরা দলে দলে সোনার লোভে ক্যালিফোর্নিয়ায় বসবাস করতে চলে আসে। দাসপ্রথা-বিরোধীরা ক্যালিফোর্ণিয়ায় আসায় ক্যালিফোর্ণিয়া রাজ্যকে সংক্ষেপে দাসপ্রথাহীন রাজ্যরূপে গণ্য করার দাবি উঠে। এদিকে দক্ষিণের দাসপ্রথার সমর্থকরা দাবি করে যে,

নব-গঠিত রাজ্য ক্যালিফোর্ণিয়ায় দাসপ্রথা অনুমোদন করে দাসরাজ্য হিসাবে কংগ্রেসে আইন পাস করা হোক। শেষ পর্যন্ত ১৮৫০ খ্রীঃ 'ক্লে কমপ্রোমাইজ' বা 'হেনরী ক্লে চুক্তি' অনুসারে মীমাংসা হয় যে—(১) ক্যালিফোর্ণিয়া রাজ্যটিতে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ হবে। কংগ্রেসে ফ্রী স্টেট বা দাসপ্রথাহীন রাজ্য হিসাবে ক্যালিফোর্ণিয়া যোগ দেবে। (২) অন্যান্য রাজ্যের জনসাধারণ ভোটের দ্বারা স্থির করবে তারা দাসপ্রথা রাখবে কিনা। (৩) পলাতক দাস-সম্পর্কিত আইন কঠোরভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা ক্লে-চুক্তিতে করা হয়। যদি দাসরাজ্য থেকে দাসহীন অঞ্চলে ক্রীতদাসরা পালিয়ে আশ্রয় নেয়, তবে কেন্দ্রীয় পুলিশ তাদের ধরে দাসরাজ্যে ফেরত পাঠাবে। ক্লে-চুক্তির দ্বারা কাগজ দ্বারা সাময়িকভাবে ফাটল বন্ধ করা হয় মাত্র। উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে মানসিক ব্যবধান বেড়ে যেতে থাকে। জন ক্যালহুনের মত বিজ্ঞ দক্ষিণী আমেরিকানও বলতে থাকেন যে, যুক্তরাষ্ট্র আর টিকবে না। দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের নিজ অর্থনীতি ও দাসপ্রথাকে উত্তরের সংখ্যাগরিষ্ঠ দাসপ্রথা-বিরোধীদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

ক্লে চুক্তি, ১৮৫০ খ্রীঃ

আসলে উভয় অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান ছিল বিরোধের মূল কারণ। রিচার্ড হেফনার নামে মার্কিন ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন যে, "উত্তরের শিল্প-অর্থনীতি এবং দক্ষিণের কৃষি-অর্থনীতি উভয় অঞ্চলের মধ্যে মৌলিক ব্যবধান রচনা করে।" ১৮৫০ খ্রীঃ উত্তরের লোকসংখ্যা ছিল ৯,৭২৮,৯২০ এবং দক্ষিণের লোকসংখ্যা ছিল ৭,৩৩৪,৪৩৭ জন। ১৮৫০ খ্রীঃ উত্তরে ছিল ১৩টি রাজ্য, দক্ষিণে ১২টি। ডেলাওয়ার রাজ্য ছিল নিরপেক্ষ। ফলে সিনেটে উত্তরের ২ জন সিনেট-সদস্য বেশী ছিল। প্রতিনিধিসভায় উত্তরের ছিল ১৩৫ জন সদস্য, দক্ষিণের ৮৫। এরপরে নূতন রাজ্যগুলি ফ্রি স্টেট অর্থাৎ দাসপ্রথাহীন রাজ্য হিসাবে যোগদান করলে উত্তরের শক্তি বাড়তে থাকে। শক্তিসাম্য উত্তরের পক্ষে চলে গেলে দক্ষিণের খামার-মালিক শ্বেতাঙ্গসম্প্রদায় আশঙ্কিত হয়ে পড়ে। উত্তরের শিল্প-অর্থনীতির দরুন উত্তরের মার্কিনীরা দক্ষিণের লোকদের পিছনে ফেলে দ্রুত উন্নতি করতে থাকে। উত্তরের লোকেরা শিল্পজীবী হিসাবে প্রোটেক্শন অর্থাৎ বৈদেশিক মালের আমদানি নিয়ন্ত্রণ এবং আমদানি মালের উপর চড়াহারে শুল্ক ধার্য করার পক্ষপাতী ছিল। এর ফলে তাদের নিজস্ব শিল্পদ্রব্য সস্তা বিদেশী মালের সঙ্গে প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা পেত এবং দেশের বাজারে বিক্রি হত। কিন্তু কৃষি-প্রধান দক্ষিণের লোকেরা চাইত অবাধ বাণিজ্য। সস্তা বিদেশী মালের অবাধ আমদানি, যাতে তারা সস্তায় শিল্পদ্রব্য কিনতে পারে। তারা তুলা প্রভৃতি কাঁচামাল আমেরিকার বাইরে রপ্তানি করতে চাইত। কিন্তু আইনসভায় উত্তরের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় তারা দক্ষিণের দাবিকে দমিয়ে দিত।

উত্তর ও দক্ষিণের অর্থনৈতিক বৈষম্য

এই পরিস্থিতিতে ক্রীতদাসপ্রথার প্রশ্ন ১৮৫০ খ্রীঃ পর পুনরায় জটিল হয়ে উঠে। হ্যারিয়েট বিচার স্টো (Harriet Bietcher Stoe) নামে এক মহিলা 'আঙ্কল টম্স কেবিন' বা টম কাকার কুটির নামে ক্রীতদাসদের দুর্দশা সম্পর্কে এক মর্মস্পর্শী উপন্যাস লেখেন। দক্ষিণের তুলার খামারে ক্রীতদাসদের উপর খামার-মালিকদের বর্বর নিপীড়ন, দৈহিক নির্যাতন, ক্রীতদাসদের মুক্তিলাভের আগ্রহ এবং দাসপ্রথাবিরোধী রাজ্যে আশ্রয়লাভের জন্যে তাদের পলায়নের চেষ্টা, ক্লে-চুক্তির কঠোর প্রয়োগ এবং কেন্দ্রীয় পুলিশের দ্বারা পলাতক দাসদের গ্রেপ্তার ও মালিকদের হাতে প্রত্যর্পণ, পলাতক দাসদের উপর অমানুষিক নির্যাতনের কাহিনী এই উপন্যাসটিতে জীবন্তভাবে তুলে ধরা হয়। উপন্যাসটির হাজার হাজার কপি মার্কিন নাগরিকরা সংগ্রহ করে। উত্তরের বহু লোক এই উপন্যাস পড়ে পুনরায় দাসপ্রথার বিরুদ্ধে চলে যায়। এক

টম কাকার কুটির উপন্যাস রচনা
জনমতের উপর প্রভাব

শ্রেণীর আদর্শবাদী লোক বিভিন্ন সমিতি স্থাপন করে পলাতক দাসদের আশ্রয় দেয় এবং তাদের হয়ে দক্ষিণের মালিকের সঙ্গে লড়াই চালাতে থাকে।

এই পরিবেশে মার্কিন সুপ্রীম কোর্টে ড্রেড স্কট মামলার রায় (১৮৫০ খ্রীঃ) গোটা ক্রীতদাস-প্রথা-ঘটিত প্রশ্নটিকে নূতন মাত্রা দেয়। ড্রেড স্কট মামলায় সুপ্রীম কোর্টের দক্ষিণী বিচারক রোজার ট্যানী (Roger Taney) ড্রেড স্কটের মামলার রায় দিয়ে মন্তব্য করেন যে: (১) মার্কিন কংগ্রেস বা আইনসভার কোন রাজ্যের ক্রীতদাস সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা দানের সাংবিধানিক অধিকার নেই। (২) ক্রীতদাস হল মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সংবিধানে কংগ্রেসকে নাগরিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (৩) সুতরাং মার্কিন কংগ্রেস আইন রচনা করে নির্দেশ করতে পারে না যে, যুক্তরাষ্ট্রের কোন্ রাজ্যে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ হবে এবং কোন্ রাজ্যে তা হবে না। এই রায়ের আলোকে মিজুরী-চুক্তি ও ক্লে-চুক্তি সংবিধানবিরোধী হিসাবে বাতিল হয়। দাসপ্রথার সমর্থকরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে-কোন রাজ্যে দাসপ্রথা বিস্তারের অধিকার পায়। নূতন রাজ্যগুলিতে দাসপ্রথা বিস্তৃত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা দেখা দেয়। এর ফলে উত্তরের রাজ্যগুলিতে আশঙ্কা দেখা দেয় যে, দাসপ্রথা-সমর্থক রাজ্যের সংখ্যা বাড়লে কংগ্রেসে তাদের প্রতিনিধি বাড়বে। শিল্পজীবী উত্তর আমেরিকার স্বার্থ কৃষি-অর্থনীতির দক্ষিণ থেকে পৃথক। কংগ্রেসে উত্তর কোণঠাসা হয়ে যাবে। ড্রেড স্কট মামলার রায়ের সুদূরপ্রসারী পরিণাম চিন্তা করে উত্তরে উত্তেজনা দেখা দেয়।

ড্রেড স্কট মামলার রায় ও তার গুরুত্ব

রিপাবলিকান দল এই পটভূমিকায় উত্তরের জনমতকে দৃঢ় সমর্থন জানায়। জনৈক প্রজাতন্ত্রী বা রিপাবলিকান নেতা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, যদি সংবিধানের ব্যাখ্যা জনস্বার্থবিরোধী হয়, তবে সংবিধান অপেক্ষা উচ্চতর আইনের আশ্রয় নিতে হবে। উত্তরের মার্কিনীরা এই উচ্চতর আইনের প্রয়োগের জন্যে প্রস্তুত হয়। উত্তরের সংবাদপত্রগুলি জনসাধারণকে বোঝায় যে, দরকার হলে বলপ্রয়োগ দ্বারা দক্ষিণের রাজ্যগুলিকে ক্রীতদাসপ্রথার বিস্তার থেকে নিরস্ত করতে হবে। নূতন রাজ্যগুলিতে দাসপ্রথা চলতে দেওয়া যাবে না। উত্তরের রিপাবলিকান দল দাসপ্রথার বিরোধিতাকে দলের একটি প্রধান নীতি হিসাবে গ্রহণ করে। দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গরা উত্তরের এই আপসহীন চড়া কথা, যুদ্ধং দেহি মনোভাব দেখে ভয়ানক চটে যায়। আসলে গোড়ায় দক্ষিণের খামার-মালিকরাই ছিল ধনী এবং ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী। শিল্প-বাণিজ্য বিস্তারের ফলে উত্তরের মধ্যবিত্তশ্রেণী প্রবল হয়ে উঠে। সুতরাং দক্ষিণের মতে উত্তরের নেতারা ছিল ভুঁইফোড়। দক্ষিণের সংবাদপত্রে ব্যঙ্গ করা হয় যে, "লর্ড নর্থ (উত্তর আমেরিকা) এখন লর্ড নর্থের (ইংরাজ মন্ত্রী— আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের সময়) অপেক্ষা বেশী ক্ষমতা ধরেন।" এভাবে উভয় অঞ্চলের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে।

রিপাবলিকান দলের দাসপ্রথার বিরোধিতা উত্তরের যুদ্ধং দেহি মনোভাবে দক্ষিণের ক্ষোভ

এই পরিস্থিতিতে মার্কিন রাষ্ট্রপতি-পদের জন্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৬০ খ্রীঃ দাসপ্রথা-হীন রাজ্যগুলি (একমাত্র নিউ জার্সি ব্যতীত) রিপাবলিকান প্রার্থী আব্রাহাম লিঙ্কনকে ভোট দিলে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হন। লিঙ্কন ছিলেন দ্বিধাহীনভাবে দাসপ্রথা-বিরোধী, তদুপরি রিপাবলিকান প্রার্থী। সুতরাং দক্ষিণের নেতারা মনে করেন যে, উত্তরের দাসপ্রথাহীন রাজ্যগুলির জবরদস্তির দ্বারা দাসপ্রথা উচ্ছেদের চেষ্টা আগে থেকেই ছিল। এখন নূতন রিপাবলিকান রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে আর তাদের কোন স্বার্থরক্ষার আশা নেই। সুতরাং দক্ষিণে বিচ্ছিন্নতার (Secession) দাবি উঠে। দক্ষিণের

আব্রাহাম লিঙ্কনের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন ১৮৬০ খ্রীঃ দক্ষিণের বিচ্ছিন্নতাবাদ

গরম-মাথা কিছু লোক হিংসাত্মক কাজ আরম্ভ করে। ফলে উত্তর ও দক্ষিণের সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

১৮৬১ খ্রীঃ আব্রাহাম লিঙ্কন রাষ্ট্রপতিরূপে শপথ নেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, "যুক্তরাষ্ট্রকে তিনি রক্ষা করবেন এবং রাজ্যগুলির সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা করবেন।" দক্ষিণের বিচ্ছিন্নতার দাবি থামাবার জন্যে রিপাবলিকানরা প্রস্তাব দেয় যে রাজ্যগুলিতে দাসপ্রথা আছে, তা রক্ষার জন্যে সংবিধান সংশোধন করা যেতে পারে। কিন্তু ড্রেড স্কট মামলার জাতীয়তা-বিরোধী রায় মানা যাবে না। কিন্তু দক্ষিণের নেতারা এই সকল প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করেন নি। তাঁরা মনে করেন যে, আব্রাহাম লিঙ্কনের রাষ্ট্রপতি হওয়ার অর্থই হল—(১) দক্ষিণের স্বার্থ নষ্ট হওয়া; (২) আমদানী বিদেশী মালের উপর চড়া হারে শুল্ক ধার্য করা; (৩) পশ্চিমের নূতন অঞ্চলকে দাসবিরোধী রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলা; (৪) দক্ষিণের খামার-মালিকদের স্বার্থ নষ্ট করা। তাঁরা লিঙ্কনকে নিন্দাজনক ভাষায় গালাগালি করেন। লিঙ্কন ঘোষণা দেন যে, "তিনি এবং তাঁর দল যে রাজ্যগুলিতে দাসপ্রথা আছে সেখানে হস্তক্ষেপ করতে চান না। তাছাড়া সংবিধান হল একটি স্থায়ী ব্যবস্থা। দক্ষিণ ইচ্ছামত যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে যেতে পারে না। দাসপ্রথা থাকুক বা না থাকুক, যুক্তরাষ্ট্রকে রক্ষা করতেই হবে।"

যুক্তরাষ্ট্র রক্ষায় আপোষের চেষ্টার বিফলতা

দক্ষিণের নেতারা লিঙ্কনের আশ্বাসবাণীকে মূল্য দেননি। ১৮৬১ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে দক্ষিণের রাজ্যগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তারা দক্ষিণ আমেরিকান কন্‌ফেডারেশন নামে এক রাষ্ট্রজোট স্থাপন করে। এই রাষ্ট্রজোটের একটি সংবিধান তৈরি হয় এবং জেফারসন ডেভিস রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। দক্ষিণের ৮টি রাজ্য প্রথমে এই বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগ দেয়। এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়।

দক্ষিণের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠন

রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কন এই সঙ্কটের সময় অসাধারণ দৃঢ়তা ও স্থির লক্ষ্য নিয়ে কাজ করার ক্ষমতা দেখান। তিনি ঘোষণা করেন যে—(১) যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য রক্ষা করা তাঁর প্রধান কর্তব্য। তিনি এজন্যে দক্ষিণের রাজ্যগুলির বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার স্বীকার করতে পারেন না। (২) এই সংঘর্ষে তাঁর মূল লক্ষ্য হল যুক্তরাষ্ট্রকে রক্ষা করা। (৩) তিনি যদি ক্রীতদাসপ্রথার বিরোধিতা করেন, তাহলে তা একমাত্র গণতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্যে। দাসপ্রথা অব্যাহত থাকলে তা সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রকে ছেয়ে ফেলবে। সুতরাং দাসপ্রথা উচ্ছেদ ও যুক্তরাষ্ট্র রক্ষা উভয় উদ্দেশ্য ছিল অঙ্গাঙ্গী ভাবে সংযুক্ত। লিঙ্কন আপাততঃ যুক্তরাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্নতাবাদ থেকে রক্ষার জন্যে গৃহযুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হন।

লিঙ্কনের নীতি

ইতিমধ্যে দক্ষিণের সেনারা উত্তরের ফোর্ট সামটার দুর্গ আক্রমণ করলে সরকারী ভাবে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধ চলার সময় ১৮৬২ খ্রীঃ ২২শে সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি লিঙ্কন ঘোষণা করেন যে, এই তারিখ পর্যন্ত যে সকল বিচ্ছিন্নতা ঘোষণাকারী রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করতে বিরত থাকবে সেই রাজ্যগুলিতে দাসপ্রথা উচ্ছেদ হবে। যেহেতু দক্ষিণের সকল রাজ্য এই আনুগত্যের ঘোষণা অগ্রাহ্য করে, সেহেতু গৃহযুদ্ধের পর দক্ষিণের রাজ্যগুলি পরাজিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে বাধ্য হয়। লিঙ্কনের ঘোষণা অনুসারে ক্রীতদাসপ্রথা এই সকল রাজ্যে আপনা থেকেই আইন-বিরুদ্ধ হয়। রাষ্ট্রপতি লিঙ্কন ১লা জানুয়ারী, ১৮৬৩ খ্রীঃ অপর এক ঘোষণার দ্বারা সকল ক্রীতদাসকে স্বাধীন ও মুক্ত বলে ঘোষণা করেন।

ক্রীতদাসদের মুক্তি ঘোষণা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ আব্রাহাম লিঙ্কনের ভূমিকা (The Role of Abraham Lincoln) ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্টাকী প্রদেশে এক দরিদ্র পরিবারে আব্রাহাম লিঙ্কনের জন্ম হয়। লিঙ্কন এই সত্য প্রমাণ করেন যে, জন্ম দৈবের অধীন কিন্তু কর্ম ও পৌরুষ নিজের হাতে গড়া যায়। তাঁর পিতা ইলিনয় প্রদেশে বাসস্থান স্থানান্তরিত করেন। লিঙ্কনের বাল্য ও কৈশোর ইলিনয় প্রদেশেই কাটে। রাজধানী ওয়াশিংটন বা কোন বড় শহরের কৃত্রিম মার্জিত আবহাওয়ায় লিঙ্কন নিজেকে গড়ার সুযোগ পান নাই। তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী। জীবিকা অর্জনের জন্যে তাঁকে নানারকম কাজ করতে হত। ইলিনয়ের নিষ্করুণ প্রকৃতিদেবী ও কৃপণ মানবসমাজের জীবনসংগ্রামের জন্যে তিনি বহু কষ্ট স্বীকার করেন। নানারকম শ্রমসাধ্য কাজের মাঝে তিনি নিজের চেষ্টায় নিজেই পড়াশোনা করতেন। অনেক সময় তিনি ধার করে অথবা ভিক্ষা চেয়ে পড়ার বই যোগাড় করতেন। বইয়ের দাম শোধ করার জন্যে দৈহিক শ্রম করে দাম মিটিয়ে দিতেন। বই পড়ার সময় কোন অংশের অর্থ স্পষ্ট না হলে তিনি বারে বারে পড়তেন যতক্ষণ না অর্থ স্পষ্ট হত। তিনি নিজেই ছিলেন নিজের শিক্ষক। পরে তিনি আইন অধ্যয়ন করেন এবং আইনজীবীর পেশা নেন। তাঁর পত্নী ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষিনী এবং বদ্‌মেজাজী। লিঙ্কনের পারিবারিক জীবন আদপেই সুখের ছিল না।

লিঙ্কনের বাল্যকাল ও স্বয়ং শিক্ষা

আইনজীবী, সাংবাদিক, বক্তা ও রাজনীতিবিদ্ হিসাবে লিঙ্কন শীঘ্রই খ্যাতি পান। সততাই ছিল লিঙ্কনের প্রধান মূলধন। তিনি মানব-চরিত্র অত্যন্ত ভালভাবে বুঝতেন। লিঙ্কন খুব গভীর ও মৌলিকভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা রাখতেন। তিনি প্রতি বিষয় অত্যন্ত সরল অথচ গভীর ভাবগর্ভ ভাষায় ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা রাখতেন। তিনি যতটা পড়তেন তার বেশি চিন্তা করতেন। তাঁর চিন্তা ছিল সৃজনশীল। তাঁর ইচ্ছাশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রবল ও দৃঢ়। কিন্তু তাঁর ইচ্ছাশক্তির পশ্চাতে থাকত নিপীড়িত মানব এবং দরিদ্রের প্রতি করুণা।

লিঙ্কনের প্রতিভা

লিঙ্কন রিপাবলিকান দলের সদস্য হিসাবে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিতর্কে যোগ দিয়ে জনসমক্ষে বিশেষ খ্যাতি পান। পরে তিনি ১৮৬০ খ্রীঃ রাষ্ট্রপতিরূপে নির্বাচিত হন। দাসপ্রথাহীন রাজ্যগুলিতে তিনি প্রচুর ভোট পান। দক্ষিণী নেতারা তাঁর নির্বাচনে প্রমাদ গণেন। কারণ দাসপ্রথার প্রতি তাঁর বিরুদ্ধতা সকলেই জানত। দক্ষিণী নেতারা লিঙ্কনকে কদর্য ভাষায় গালি দেন এবং তাঁর অসুন্দর চেহারা নিয়ে ইঙ্গিত পর্যন্ত দেন। লিঙ্কন এজন্যে একটুও বিচলিত হন নাই। খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসীমূলক ঔদাসীন্য নিয়ে তিনি সব অপমানকে উপেক্ষা করেন। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল জাতীয় ঐক্য রক্ষা ও যুক্তরাষ্ট্রকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করা। দাসপ্রথা উচ্ছেদ হল গৌণ লক্ষ্য। লিঙ্কন তাঁর বিখ্যাত পত্রে বলেন যে, "আমার প্রধান লক্ষ্য হল যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য রক্ষা করা; দাসপ্রথা রক্ষা বা উচ্ছেদ করা নয়। যদি আমি কোন দাসকে মুক্ত না করে যুক্তরাষ্ট্র রক্ষা করতে পারি তবে তাই করব; অথবা যদি সকল দাসকে মুক্ত করে এই লক্ষ্যে যেতে পারি তবে তাই করব; যদি কিছু দাসকে মুক্ত, বাকীকে না করে এই লক্ষ্যে যেতে পারি তাও করব। তবে আমি বিশ্বাস করি যুক্তরাষ্ট্র রক্ষা পেলে দাসপ্রথা লোপ পাবে।"

লিঙ্কনের রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিভা ও রাজনৈতিক ধ্রুব লক্ষ্য

দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি তাঁর মীমাংসা-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে বিচ্ছিন্ন হলে তিনি দুঃখিত হৃদয়ে দক্ষিণের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্যরক্ষার জন্যে গৃহযুদ্ধে রত হন। এই যুদ্ধে তাঁর নিজ-সন্তান নিহত

হন। বহু পিতা-মাতার হৃদয় খালি করে পুত্ররা প্রাণ দেন। তবুও লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত লিঙ্কন যুদ্ধ চালিয়ে যান। তিনি ১৮৬৩ খ্রীঃ দাসদের মুক্তির আইন ঘোষণা করেন। অবশেষে দক্ষিণের সেনাপতি লী উত্তরের সেনাপতি গ্রান্টের কাছে আত্মসমর্পণ করলে, লিঙ্কন বিনাশর্তে শান্তি ঘোষণা করেন। উত্তরের উগ্রপন্থীদের দক্ষিণের প্রতি শাস্তিপ্রদানের দাবি তিনি অগ্রাহ্য করেন। দক্ষিণের রাজ্যগুলির প্রাক্-গৃহযুদ্ধের সময়ের সকল অধিকার ফিরিয়ে দেন। তিনি দক্ষিণের যুদ্ধ-অপরাধী নেতাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করেন। দক্ষিণের কৃষকরা যাতে চাষ-আবাদ করতে পারে, এজন্যে তাদের যুদ্ধের ঘোড়াগুলি ফেরত দেন। লিঙ্কনের এই উদারতা ও মানবতা দক্ষিণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। লিঙ্কন দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তিনি যখন বিজয় উপলক্ষ্যে একটি থিয়েটার-হলে ভাষণ দেন এবং বলেন "কারও প্রতি ঈর্ষা নয়, সকলের প্রতি ভালবাসা ও উদারতা নিয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদে যেন এই জাতি উন্নতি লাভ করে,"—তখন অকস্মাৎ এক আততায়ীর গুলিতে তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হয়। জীবিত আব্রাহাম লিঙ্কন ইতিহাসে স্থান পান। আমেরিকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে লিঙ্কন অন্যতম।

গৃহযুদ্ধ : লিঙ্কনের সফলতা; দাসদের মুক্তি : লিঙ্কনের হত্যা

সারণী

[ক] ব্রিটেনের শাসনমুক্ত হয়ে আমেরিকার ত্রয়োদশ উপনিবেশ এক ঐক্যবদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর অঞ্চল ছিল শিল্পে অগ্রসর; দক্ষিণাঞ্চল ছিল কৃষি-অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল। এজন্যে উভয় অঞ্চলের স্বার্থে বিরোধ ছিল। দক্ষিণে লোকসংখ্যার অভাব ও কৃষি-অর্থনীতির প্রয়োজনে দাসপ্রথার দ্বারা শ্বেতাঙ্গ খামারমালিকরা চাষবাসের কাজ করত। উত্তরের শিল্প, বুর্জোয়া অর্থনীতির ফলে দাসপ্রথার প্রতি ঘৃণা দেখা দেয়। ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে নতুন প্রদেশগুলি যোগদানের সময় উত্তর চাইত যে সেগুলি দাসত্বপ্রথাহীন রাজ্যরূপে যোগ দিক, দক্ষিণ চাইত যে এগুলি দাসত্বপ্রথাযুক্ত রাজ্য হিসেবে গণ্য হোক। ইতিমধ্যে উত্তরে মানবতাবাদী লোকেরা দাসত্বপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন। হ্যারিয়েট বিচার স্টো নামে এক মহীয়সী মহিলা টম কাকার কুটির নামে এক উপন্যাসে দাসপ্রথার অমানবিক দিকগুলি উদ্ঘাটন করায় উত্তরের জনমত দাসপ্রথা লোপের জন্যে আইনরচনার দাবি করে। আমেরিকার রিপাবলিকান দল দাসপ্রথার বিরোধিতা করে। আব্রাহাম লিঙ্কন রিপাবলিকান দলের প্রার্থী হিসেবে মার্কিন দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে দক্ষিণের লোকেরা মনে করে যে তাদের স্বার্থ রক্ষা করা যাবে না। সুতরাং দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি জোটবদ্ধ হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। এই কারণে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। রাষ্ট্রপতি লিঙ্কন ঘোষণা করেন যে, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য যে কোন মূল্যে রক্ষা করবেন এবং ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী দাসপ্রথা উচ্ছেদ আইন ঘোষণা করেন। এজন্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। দক্ষিণের রাজ্যগুলি পরাজিত হলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য রক্ষা পায়। ক্রীতদাসরা মুক্তিলাভ করে স্বাধীন নাগরিকে পরিণত হয়।

[খ] আব্রাহাম লিঙ্কন আমেরিকার কেন্টাকী প্রদেশের এক দরিদ্রপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যে কঠিন দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম দ্বারা উন্নতি লাভ করেন। তিনি রিপাবলিকান দলের প্রার্থী হিসেবে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন। তিনি দাসপ্রথা উচ্ছেদ করে এবং দক্ষিণের বিচ্ছিন্নতামূলক গৃহযুদ্ধ দমন করে আমেরিকার ইতিহাসে যুগান্তর ঘটান। তিনি ছিলেন প্রখর মানবতাবাদী।

অনুশীলনী

১। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

(ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন্ রাজ্যগুলিকে দাসপ্রথাহীন রাজ্য বলা হত? (খ) কোন্ সালে কে আমেরিকায় সুতা তৈরির যন্ত্র আবিষ্কার করেন? (গ) মিজুরী-চুক্তি কি? (ঘ) উইলিয়াম লয়েড গ্যারিসন কে ছিলেন? (ঙ) আমেরিকার কোন্ প্রদেশে সোনার খনি আবিষ্কৃত হয়? (চ) ১৮৫০ খ্রীঃ ক্লে-চুক্তির দ্বারা কোন্ সমস্যার মীমাংসা হয়? (ছ) টম কাকার কুটির কার রচনা? (জ) ড্রেড স্কট মামলার রায় সম্বন্ধে কি জান? (ঝ) কোন্ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথা উচ্ছেদ হয়? (ঞ) টম কাকার কুটির উপন্যাসটিতে কি বর্ণিত আছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনমতের উপর উপন্যাসটির প্রভাব বর্ণনা কর। (ট) আব্রাহাম লিঙ্কন কোন্ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন? (ঠ) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের রাজ্যগুলি কাকে তাদের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করে?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

(ক) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর এবং দক্ষিণের রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিবরণ দাও এবং ইহা গৃহযুদ্ধের জন্যে কতখানি দায়ী ছিল তাহা বর্ণনা কর। (খ) দাসপ্রথা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের জন্যে কতখানি দায়ী ছিল? (গ) আব্রাহাম লিঙ্কন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন্ প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন? (ঘ) ড্রেড স্কট মামলার রায় ও তার গুরুত্ব বর্ণনা কর। (ঙ) যুক্তরাষ্ট্র রক্ষায় রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কনের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের বিবরণ দাও। (চ) আব্রাহাম লিঙ্কনের জীবনী ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর।

সপ্তম অধ্যায়

পূর্বাঞ্চল সমস্যা

প্রথম পরিচ্ছেদ : পূর্বাঞ্চল সমস্যার প্রকৃতি (Character of the Eastern Question) : পূর্বাঞ্চল সমস্যাকে ইওরোপের ইতিহাসে এক জটিল সমস্যা রূপে গণ্য করা হয়। পূর্বাঞ্চল বলতে ইওরোপের পূর্বদিকে অবস্থিত বলকান উপদ্বীপের বিভিন্ন জাতিগুলির বাসস্থান বুঝায়। এই অঞ্চলকে নিকটপ্রাচ্য (Near East) বলা হয়। পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে অটোমান তুর্কীরা এই অঞ্চলের গ্রীস, বুলগেরিয়া, মোলদাভিয়া, রুমানিয়া, সার্বিয়া প্রভৃতি জাতির উপর আধিপত্য স্থাপন করে। শাসক তুর্কীরা ছিল ইসলাম ধর্মাবলম্বী, কৃষ্ণকায়, এশিয়াবাসী। আর শাসিত প্রজারা ছিল খ্রীষ্টান, শ্বেতকায়, ইওরোপবাসী ও প্রধানতঃ স্লাভ জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ফলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে জাতিগত, সংস্কৃতিগত ব্যবধান ছিল বিস্তর। তুরস্ক সরকার কোন উদারনৈতিক বা ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন দ্বারা শাসিত বলকান জাতিগুলিকে তুর্কী সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত করার চেষ্টা করেনি। কেবলমাত্র সামরিক শক্তির জোরে তুরস্ক দীর্ঘকাল বলকানে তার আধিপত্য রক্ষা করে।

উনবিংশ শতকে তুর্কী সাম্রাজ্যে ক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দেয়। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে যুগের উপযোগী শাসনব্যবস্থা, সামরিক সংগঠন ও সামাজিক সংস্কার তুরস্কে করা হয়নি। বলকানের শ্বেতাঙ্গ, খ্রীষ্টীয় প্রজাদের শাসক তুর্কীদের সঙ্গে সমান অধিকার দেওয়া হয়নি। তাদের আপন করার কোন চেষ্টা হয়নি। পার্লামেন্ট গঠন করে বলকানের প্রজাদের তাতে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয়নি। মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা, মোল্লাতন্ত্র অনুসরণ করার ফলে তুরস্ক উনবিংশ শতকের এক পিছিয়ে-পড়া দেশে পরিণত হয়। তুর্কী সামরিক সংগঠনের আধুনিকীরণ না-করার ফলে তুর্কী সেনা তার প্রাচীন সংগঠন নিয়ে আধুনিক ইওরোপীয় শক্তিগুলির সামরিক ক্ষমতার কাছে দুর্বল ও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। প্রজাবিদ্রোহ দমন ও বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষায় তুরস্ক ক্রমে অক্ষম হয়ে পড়ে। তুরস্কের শ্বেতাঙ্গ সেনাদলের নাম ছিল 'জানিজারী' (Janiwari) বাহিনী। এই বাহিনী সুলতানের প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্য জানাত এবং বলকান অঞ্চলের শ্বেতাঙ্গ প্রজাদের শাসনের জন্যে-এই বাহিনী নিযুক্ত হত। সুলতানের বিরুদ্ধে জানিজারী বাহিনী বিদ্রোহ করায় এই বাহিনী ভেঙে দেওয়া হয়। তার ফলে তুরস্কের সামরিক শক্তি আরও দুর্বল হয়ে যায়। তুরস্ককে এজন্যে "ইওরোপের রুগ্‌ণ মানুষ" (Sick-man of Europe) আখ্যা দেওয়া হয়।

উনবিংশ শতকে তুরস্কের দুর্বলতা ও তার কারণ

তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগে ইওরোপের বিভিন্ন শক্তি বলকানে তুরস্কের সাম্রাজ্য সম্পর্কে বিভিন্ন নীতি নেয়। সপ্তদশ শতকে রুশ জার পিটার দি গ্রেটের আমল থেকে রাশিয়া "উষ্ণ জল নীতি" (Warm Water Policy) নেয়। এই উষ্ণ জল নীতি আসলে ছিল বরফমুক্ত সাগরের উপকূল পর্যন্ত রুশসাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি। অষ্টাদশ শতকে জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথরিনের আমলে রাশিয়া তুরস্কের কাছ থেকে ইউক্রেন, ক্রিমিয়া অধিকার করে। ফলে কৃষ্ণ সমুদ্রের তীর পর্যন্ত রুশসাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। উনবিংশ শতকে জার সরকার বলকানে রাজ্যবিস্তার-নীতি অব্যাহত রাখে। বলকানের খ্রীষ্টীয় জাতিরা ছিল গ্রীক গীর্জার অন্তর্গত। রাশিয়াও ছিল এই গীর্জার অধীনে। ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের জন্যে রাশিয়া বলকানে তার আধিপত্যের দাবিকে জোরদার করতে পারে। ইসলামীয় ধর্মাবলম্বী তুরস্ক রাশিয়ার এই হস্তক্ষেপ সহ্য করতে রাজী ছিল না। এজন্য রুশ-তুরস্ক-দ্বন্দ্বের সূচনা হয়।

রুশ আগ্রাসন নীতি

পূর্বাঞ্চল সমস্যার আর একটি দিক ছিল, বলকান জাতিগুলির তুরস্কের শাসনমুক্ত হয়ে স্বাধীনতালাভের ইচ্ছা। ফরাসী-বিপ্লবের জাতীয়তাবাদ বলকান জাতিগুলিকে প্রভাবিত করে। ইসলামী তুর্কী-শক্তির অধীনতামুক্ত হয়ে নিজ নিজ জাতিগত স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে বলকান জাতিগুলির মধ্যে ব্যগ্রতা দেখা দেয়। বলকান জাতীয়তাবাদের সফলতার অর্থ ছিল বলকানে তুর্কীসাম্রাজ্যের ক্ষয়। এই জাতীয়তাবাদ ছিল নবজাগ্রত ও তীব্র। রাশিয়া বলকান জাতীয়তাবাদকে সমর্থন দ্বারা তুর্কী সাম্রাজ্যকে ভেঙ্গে ফেলার নীতি নেয়। বলকানের স্লাভজাতিগুলিকে নৈতিক ও সামরিক সহায়তা দানের জন্য প্যান-স্লাভ আন্দোলন গঠন করে। প্যান-স্লাভ আন্দোলনের দ্বারা বলকানে রুশ-প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

বলকান জাতীয়তাবাদ

ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি ইওরোপীয় শক্তিগুলি আশঙ্কা করে যে, বলকানে রুশ-প্রাধান্য বাড়লে ইওরোপের শক্তিসাম্য ভেঙে যাবে। ব্রিটেনের বিশেষ আশঙ্কা ছিল যে, রুশ যুদ্ধজাহাজ কৃষ্ণসাগর থেকে দার্দানালিশ প্রণালী দিয়ে পূর্ব-ভূমধ্যসাগরে ঢুকলে এই অঞ্চলে ব্রিটিশ নৌ-প্রাধান্য নষ্ট হবে। ব্রিটেনের ভারতে আসার নৌ-পথ বিপন্ন হবে। অস্ট্রিয়া মনে করত যে, রাশিয়ার মতই তারও বলকানে আধিপত্য স্থাপনের অধিকার আছে। রাশিয়া বলকানে ঢুকলে অস্ট্রিয়ার নিরাপত্তা নষ্ট হবে বলে এই দেশের সরকার মনে করতেন।এই সকল কারণে বৃহৎ শক্তিগুলি দাবি তোলে যে, তুরস্কের সাম্রাজ্য যেমন আছে তেমনই থাকবে। বলকানে রুশ-অনুপ্রবেশে বাধা দেওয়া হবে। তুরস্কের সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করা হবে। এভাবে পূর্বাঞ্চল সমস্যা একটি সমাধানবিহীন, পাকানো গ্রন্থি ও জটিল প্রশ্নে পরিণত হয়।

ব্রিটেন ও অন্যান্য শক্তির নীতি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (The Crimean War) ঃ পূর্বাঞ্চল সমস্যার একটি অধ্যায় ছিল ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, ১৮৫৪—৫৬ খ্রীঃ। এই যুদ্ধ আপাতদৃষ্টিতে খুব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আরম্ভ হয়। তুরস্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত জেরুজালেম হল যীশুখ্রীষ্টের জন্মস্থান। এই জন্মস্থানে গ্রোটোর গীর্জা হল খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের পবিত্র তীর্থ। এই গ্রোটোর গীর্জার চাবির অধিকার নিয়ে তুর্কী সুলতানের সঙ্গে রাশিয়ার জারের বিবাদ বাধে। আসলে রুশ-জার নিকোলাস তুরস্ককে ব্যবচ্ছেদ করার চেষ্টায় ছিলেন। এজন্য তিনি চাবির অধিকারকে উপলক্ষ করে তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধ বাধান। জার ১৮৪৫ খ্রীঃ, পুনরায় ১৮৫৩ খ্রীঃ ইংলন্ডের কাছে তুরস্ককে ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব দেন। ইংলন্ড এই প্রস্তাবকে সরাসরি নাকচ না করে পরোক্ষভাবে নাকচ করলেও জারেব বিশ্বাস ছিল যে, তুরস্ক ব্যবচ্ছেদ আরম্ভ হলে ইংলন্ড ব্যবচ্ছেদে রাজী হবে। সুতরাং গ্রোটোর চাবি সম্পর্কিত ঝগড়া উপলক্ষ করে রুশ-সেনা তুরস্কের রাজ্য মোলদাভিয়া, ওয়ালাচিয়া অধিকার করলে তুর্কী সুলতান রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইংলন্ড, ফ্রান্স, সার্ডিনিয়া তুরস্কের সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে তুরস্কের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয়। এর ফলে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ অপরিহার্য ছিল কিনা এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। ফরাসী রাজনীতিবিদ্ খেদের সঙ্গে বলেছেন যে, কতকগুলি হতভাগ্য খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসীকে গ্রোটোর চাবির অধিকার দানের জন্যে এই যুদ্ধ হয়। অন্য এক ঐতিহাসিক ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফলাফল বিচার করে এই যুদ্ধকে অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধ (useless war) বলেছেন। অপরদিকে ম্যারিয়ট (Marriot) নামে ঐতিহাসিক বলেন যে এই যুদ্ধ ছিল অনিবার্য। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকদের— যথা টেম্পারলি (Temperley) প্রভৃতির মতে, যদি ইংলন্ড গোড়া থেকে রুশ-জারকে খোলসা করে বলে দিত যে, তুরস্কের ব্যবচ্ছেদে তাদের সম্মতি নেই, তাহলে জার একটি চাবির ব্যাপার উপলক্ষ করে যুদ্ধ বাধাতেন না।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের প্যারিসের সন্ধির (১৮৫৬ খ্রীঃ) দ্বারা অবসান হয়। এই সন্ধির দ্বারা—(১) রাশিয়া তুরস্ককে মোলদাভিয়া, ওয়ালাচিয়া ও বেসারাবিয়া ফিরিয়ে দেয়। (২) বৃহৎ শক্তিগুলি তুরস্কের স্বাধীনতা ও সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে প্রতিশ্রুতি দেয়। (৩) তুরস্ককে ইওরোপের রাষ্ট্রমণ্ডল এবং আন্তর্জাতিক আইনের এক্তিয়ারভুক্ত করা হয়। (৪) তুর্কী সুলতান তুরস্কের আধুনিকীকরণ, আলোকিত সংস্কার প্রবর্তন, ধর্মসহিষ্ণুতা নীতি গ্রহণ ও সাম্রাজ্যের সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিযুক্ত পরিষদ গঠনে সম্মত হন। (৫) দার্দানালিস প্রণালীতে শান্তির সময় কোন দেশের যুদ্ধজাহাজ চলাচল নিষিদ্ধ হয়। (৬) কৃষ্ণসাগরের তীরে রাশিয়া ও তুরস্ককে নৌঘাঁটি নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। (৭) রাশিয়া তুরস্কের খ্রীষ্টান ইওরোপীয় প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণের দাবি ত্যাগ করে। (৮) তুরস্কের সুলতান সার্বিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করেন। (৯) মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়াকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হয়। প্যারিসের সন্ধির কিছু পরে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের হস্তক্ষেপে মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া নিয়ে রুমানিয়া রাজ্য নবগঠিত হয়।

প্যারিসের সন্ধি, ১৮৫৬ খ্রীঃ

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল ছিল খুবই অস্থায়ী। কারণ প্যারিসের সন্ধির দ্বারা তুর্কীসাম্রাজ্যে রাশিয়ার আগ্রাসন রোধ এবং তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষা ও তুরস্ককে শক্তিশালী করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এই চেষ্টা সফল হয় নি। কিছুদিন পরে (১৮৭৭ খ্রীঃ) রাশিয়া পুনরায় তুরস্কের বিরুদ্ধে আগ্রাসন নীতি নেয়। তুরস্কের সুলতানও তুরস্কে আধুনিক সংস্কার বা তাঞ্জিমৎ বা আলোকিত সংস্কার প্রবর্তনে বিফল হন। এই আলোকিত সংস্কার বলতে আধুনিক শিক্ষার প্রসার, প্রশাসনিক সংস্কার, ভূমিসংস্কার, সামরিক সংস্কার বুঝায়। কিন্তু তুরস্কের রক্ষণশীল গোঁড়া মোল্লাদের বিরোধিতায় সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ বিফল হন। যদিও প্যারিসের সন্ধির দ্বারা বৃহৎ শক্তিগুলি তুর্কী সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রাখতে প্রতিশ্রুতি দেয়, পরবর্তী সময় এই শক্তিগুলি তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষায় উদাসীন হয়। বার্লিনের সন্ধি (১৮৭৮ খ্রীঃ) দ্বারা তুর্কী সাম্রাজ্যের ব্যবচ্ছেদ করা শুরু হয়। এজন্যে ক্রিমিয়ার যুদ্ধকে "ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধ" (Perfectly useless of all modern wars in history) বলা হয়। পূর্বাঞ্চল সমস্যার দুই প্রধান সমস্যা রুশ-আগ্রাসন ও তুরস্কের দুর্বলতা এই দুটি বিষয়ে কোন স্থায়ী সমাধান প্যারিসের সন্ধিতে করা যায় নি। তবে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরোক্ষ ও অনাকাঙ্ক্ষিত ফল ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যে ডেভিড টমসন মন্তব্য করেছেন যে, "এই যুদ্ধ ছিল আনাড়ী ধরনের (fumbling), সম্ভবতঃ অপ্রয়োজনীয়, নিঃসন্দেহে অবিবেচনা-প্রসূত (extravagant), বহুল পরিমাণে বিফল, তবে অনাকাঙ্ক্ষিত ফলের দ্বারা গৌরবান্বিত।"[১] ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ছিল "ইওরোপের . ইতিহাসের জল-বিভাজিকা" (Watershed of European history)।[২] এই যুদ্ধের ফলে রাশিয়া আপাততঃ ইওরোপ থেকে সরে যায়। রাশিয়া মধ্য এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যে রাজ্যবিস্তারে মন দেয়। রাশিয়ার জার দেশকে শক্তিশালী করার জন্যে ভূমিদাস-প্রথা উচ্ছেদ করেন। ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন এই যুদ্ধজয়ে মহাপ্রতাপশালী হন এবং ভিয়েনা-সন্ধিকে ছিঁড়ে ফেলেন। এই যুদ্ধের ফলে ইতালীর ঐক্য ত্বরান্বিত হয়। জার্মানীর ঐক্যের পথ প্রশস্ত হয়। ইংলন্ড এই যুদ্ধে ভাল ফল দেখাতে না পেরে কিছুকাল হতোদ্যম ও হতমান হয়ে থাকে।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ও প্যারিসের সন্ধির বিফলতা

১. "It was a fumbling war, probably unnecessary, largely futile, certainly extravagant, but rich with unintended consequences"—David Thomson.

২. David Thomson—Europe Since Napoleon.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : রুমানিয় সমস্যা (The Rumanian Questions) : তুরস্কের সাম্রাজ্য থেকে গ্রীস বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর অ-তুর্কী প্রজাদের সন্তুষ্ট রাখার জন্যে, তুরস্কের সুলতান আবদুল আজিজ এক সনদ বা চার্টার প্রদান করেন। এই সনদের দ্বারা সকল প্রজার জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু এর ফলে গোঁড়া মৌলবাদী তুর্কীরা বিষম ক্রুদ্ধ হয়। তারা মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া প্রদেশের রুমানিয়ান অধিবাসীদের উপর ঘোরতর অত্যাচার চালায়। এজন্যে ১৮৩০ খ্রীঃ থেকে এই দুটি প্রদেশের অধিবাসীদের মনে প্রদেশ দুটি সংযুক্তির দ্বারা একটি জাতীয় রাষ্ট্রগঠনের প্রতিজ্ঞা জাগে। এদিকে প্রতিবেশী কার্পা-ট্রানসিলভ্যানিয়া প্রদেশে, অস্ট্রিয়ার হ্যাপ্সবার্গ সম্রাটের অধীনে, রুমানিয়ান জাতির একাংশ বসবাস করত। তারাও এই নব প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়।

১৮৩০ বিপ্লব : রুমানিয় জাতীয়তাবাদ

১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সময় রুমানিয় জাতীয়তাবাদ জেগে উঠে। ওয়ালাচিয়ার বুখারেস্ট নগরে এক অস্থায়ী জাতীয় সরকার স্থাপিত হয়। রুমানিয় ঐতিহাসিক নিকোলাস বেলসেস্কো ছিলেন এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ। তিনি ভূমিদাসদের মুক্তি, সামন্তপ্রথার বিলোপ দাবি করলে রুমানিয়ার সামন্তশ্রেণী ভীত হয়। তারা এই জাতীয় আন্দোলনটিকে সমর্থনের ছল করে, আন্দোলন দুর্বল করে ফেলে। ইতিমধ্যে রুশ ও তুর্কী সেনা যৌথভাবে বিদ্রোহীদের দমন করে মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া প্রদেশ দুটি যৌথভাবে দখল করে।

১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ও রুমানিয়া

১৮৪৮ খ্রীঃ মার্চে রুমানিয়ায় ছাত্র-আন্দোলন দেখা দেয়। এই আন্দোলনকারীরা রুমানিয়ায় জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও তার স্বীকৃতি দাবি করে। রুশ-সেনা মোলদাভিয়া থেকে অপসারিত হয়। কিন্তু ক্রিমিয়ার যুদ্ধের প্রাক্কালে পুনরায় রুশ সেনা মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া অধিকার করে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর রাশিয়া প্যারিসের সন্ধির শর্ত অনুসারে রুশ-সেনা এই প্রদেশ দুটি ত্যাগ করে। এই সন্ধি অনুসারে রুমান ভাষাভাষী বেসারাবিয়া প্রদেশ রাশিয়া ফিরিয়ে দিলে প্রদেশটি মোলদাভিয়া-ওয়ালাচিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়। প্যারিসের সন্ধির দ্বারা এই প্রদেশ দুটি স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পায় এবং তুরস্কের শিথিল সার্বভৌমত্বের অধীনে রক্ষিত হয়। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রদেশ দুটিকে স্বাধীনতাদানের জন্যে চেষ্টা চালান। ১৮৫০ খ্রীঃ প্রদেশ দুটির সংযুক্তি অনুমোদিত হয়। আলেকজান্ডার কিউজা নামে এক রুমানিয় অভিজাত ১৮৫০-১৮৬৬ খ্রীঃ পর্যন্ত রুমানিয়া শাসন করেন। তিনি ভূমিদাস-প্রথার উচ্ছেদ, মঠ উচ্ছেদ, আধুনিক শিক্ষা-বিস্তার করে রুমানিয়াকে শক্তিশালী করেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ নেপোলিয়নের আত্মীয় এবং প্রাশিয়ার রাজবংশের লোক যুবরাজ ক্যারল রুমানিয়ার সিংহাসনে বসলে রুমানিয়ার দ্রুত উন্নতি হয়।

প্যারিসের সন্ধি ও রুমানিয়ার স্বাধীনতা লাভ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বার্লিনের সন্ধি, ১৮৭৮ খ্রীঃ (The Treaty of Berlin, 1878) : ক্রিমিয়ার যুদ্ধের শেষে প্যারিসের সন্ধির (১৮৫৬ খ্রীঃ) দ্বারা পূর্বাঞ্চল সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান হয় নাই। তুরস্কের সঙ্গে অধীনস্থ বলকান জাতিগুলির বিরোধ চলতে থাকে। বলকানের বিভিন্ন জাতিগুলি তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতালাভের জন্যে চেষ্টা চালায়। তুর্কী সুলতান বলকান জাতিগুলির স্বায়ত্তশাসনের দাবি উপেক্ষা করায় বিরোধ তীব্রতর হয়। তুরস্কের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে একদল গোঁড়া মুসলিম মৌলবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী নেতা বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে উদাসীন ছিল। তারা মনে করত যে, সুলতান আবদুল আজিজ তাঞ্জিমৎ বা উদারপন্থী, আলোক-প্রাপ্ত আধুনিক সংস্কার দ্বারা

তুরস্কে মৌলবাদী অভ্যুত্থান : তুরস্কের আধুনিকীকরণে বাধা জাতীয়তাবাদের, উপেক্ষা

তুরস্কের ইসলামীয় চরিত্র নষ্ট করছেন। তিনি বলকানের অ-তুর্কী প্রজাদের অহেতুক অধিকার দিচ্ছেন। তারা সুলতান আবদুল আজিজকে বলপূর্বক পদচ্যুত করে এবং পঞ্চম মুরাদকে সিংহাসনে বসায়। কিছুদিন বাদে পঞ্চম মুরাদকে পদচ্যুত করে দ্বিতীয় আবদুল হামিদকে সিংহাসনে বসায়।

তুরস্কের আবদুল হামিদের শাসনব্যবস্থায় তুরস্কে স্বৈরতন্ত্র দৃঢ় হয় এবং অ-তুর্কী প্রজাদের বিভিন্ন অধিকার খর্ব করা হয়। এর ফলে বিভিন্ন অ-তুর্কী জাতিগুলি সুলতানের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। প্যারিসের সন্ধির পর রাশিয়া কিছুকালের জন্যে বলকানে হস্তক্ষেপ বন্ধ করে। তুর্কী সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দিলে রাশিয়া পুনরায় তার পুরানো নীতিতে ফিরে আসে। তুর্কী সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ঘটাবার জন্যে অ-তুর্কী জাতিগুলিকে প্ররোচনা দেয়। বলকানের এই সকল অ-তুর্কী প্রজাদের বেশির ভাগ স্লাভ (Slav) জাতির লোক এবং রুশরাও ছিল স্লাভগোষ্ঠীর লোক। সুতরাং রুশ-এজেন্টরা বলকানে রুশ- প্রভাব বৃদ্ধির জন্যে প্যান-স্লাভ আদর্শ বা "স্লাভজাতির ঐক্যের" আদর্শ প্রচার করে। ১৮৬৭ খ্রীঃ মস্কোতে সর্ব স্লাভ কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। আসলে প্যান-স্লাভ আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল বলকানের তুর্কী সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করা। Pan-Slav বা স্লাভজাতির ঐক্য ও স্বাধীনতা প্রচারিত হলে বলকানের অ-তুর্কী প্রজাদের মনে জাতীয়তাবাদ জাগে। তুরস্ক এই বিক্ষোভ দমনের জন্যে বর্বর দমননীতি চালালে বিদ্রোহ আরও ছড়িয়ে পড়ে।

প্যান-স্লাভ আন্দোলন

১৮৭৫ খ্রীঃ আড্রিয়াটিক উপকূলে হার্জেগোভিনা অঞ্চলে, বসনিয়া প্রদেশে, ম্যাসিডোনিয়ায় এবং সর্বশেষে বুলগেরিয়ায় তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। বুলগেরিয়ার কৃষকরা তুর্কী কর্মচারী ও পুলিশদের হত্যা করে। এর ফলে বুলগেরিয়ার বিদ্রোহ প্রবল আকার ধরে। ক্রুদ্ধ সুলতান বুলগেরিয়ার বিদ্রোহদমনের জন্যে তুর্কী নিয়মিত ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে নিয়োগ করেন। এই বাহিনী নিরস্ত্র বুলগারদের পাইকারী ভাবে হত্যা করে। অন্ততঃ ১২ হাজার বুলগার নাগরিক তুর্কী সেনার হাতে নিহত হয়। বহু গ্রাম ধ্বংস হয়। এই ঘটনাকে ইওরোপের সংবাদপত্রগুলি "বুলগেরিয়ায় বর্বর হত্যাকাণ্ড" (Bulgarian Atrocity) নাম দিয়ে ফলাও করে ছাপায়।

বুলগেরিয়ায় বিদ্রোহ ও তুরস্কের বর্বর দমন নীতি ও তার প্রতিক্রিয়া

বুলগেরিয়ার হত্যাকাণ্ডের খবর, ইওরোপের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে, ইওরোপীয় জনমত, খ্রীষ্টান-হত্যার ফলে উত্তাল হয়ে উঠে। ইংলন্ডের অবসরপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করেন যে, "তুরস্ককে মালপত্র সহ ইওরোপ থেকে বিদায় করা হোক।" (Let the Turks leave Europe with bag and baggage)। লন্ডন, প্যারিস, সেন্ট-পিটার্সবার্গ প্রভৃতি শহরে বুলগার খ্রীষ্টানদের হত্যার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এই সকল দেশের সরকারকে তুর্কী সুলতানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণের জন্যে জনমত গড়ে উঠে।

এই পরিস্থিতিতে ইওরোপের বৃহৎ শক্তিগুলি একদিকে জনমতের চাপ, অন্যদিকে নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখার নীতি নেয়। অস্ট্রিয়ার হ্যাপ্‌সবার্গ সরকার ইতালী ও জার্মানী থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর বলকানে ভৌগোলিক ক্ষতিপূরণ নেওয়ার নীতি নেয়। জার-শাসিত রাশিয়া তার চিরাচরিত নীতি অনুসারে যে-কোন সুযোগে বলকানে প্রভাববৃদ্ধি ও রাজ্যবিস্তার নীতিকে প্রয়োগের চেষ্টা করে। প্যান-স্লাভ আন্দোলন গঠন করে রুশ-জার আগেই বলকানে ভাঙ্গন সৃষ্টি করেন। এখন ইওরোপের অনুকূল তুর্কী-বিরোধী জনমতের হাওয়ায় পাল খাটিয়ে তিনি বলকানে রুশ-অনুপ্রবেশের উদ্যোগ নেন। অপরদিকে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিস্‌রেইলী বলকানে রুশ-রাজ্য-

বৃহৎ শক্তিগুলির মনোভাব

বিস্তারকে ঘোরতর অপছন্দ করতেন।[১] মিশরের সুয়েজ খালের অংশীদারত্বের বৃহৎ অংশ ইংলন্ডের হাতে আসায় বলকানে রুশ-হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাকে তিনি ইংলন্ডের স্বার্থের ক্ষতিকারক মনে করতেন। ১৮৭০ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধে পরাজয়ের পর থেকে পুনরায় জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ বাধাবার জন্যে ফ্রান্স চেষ্টায় ছিল। বলকানের এই গণ্ডগোলকে জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ বাধাবার উপায় হিসাবে ব্যবহারের কথা ফ্রান্স ভাবে। সুতরাং ইওরোপের বৃহৎ শক্তিগুলি বলকান জাতিগুলির ওপর তুরস্কের অত্যাচারের জন্যে মৌখিক সহানুভূতি দেখায়। আসলে তারা নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থকে রক্ষায় ব্যস্ত থাকে। রাশিয়া ব্যতীত অন্যান্য শক্তিগুলি মোটামুটি বলকান জাতিগুলিকে তুরস্ক যাতে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেয় এজন্য চেষ্টা চালায়। বলকানে রুশ-হস্তক্ষেপ তারা পছন্দ করত না।

এই পরিস্থিতিতে রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও জার্মানী তুর্কী সুলতান আবদুল হামিদ যাতে একটি সংবিধান প্রবর্তন করেন, এবং বলকান জাতিকে স্বায়ত্তশাসন দান করেন, এজন্য তাঁকে চাপ দেয়। সুলতান এই চাপ এড়াবার জন্যে প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি বলকানের গণ্ডগোল শান্তিপূর্ণ মীমাংসার দ্বারা প্রশামন করবেন। এই প্রতিশ্রুতির নাম ছিল 'কনস্টান্টিনোপল প্রতিশ্রুতি' (১৮৭৬ খ্রীঃ)। কিন্তু সুলতান এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি। এইজন্যে রাশিয়া তুরস্ক আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। যাতে অস্ট্রিয়া রুশ-সেনাকে বাধা না দেয় এজন্য জার সরকার অস্ট্রিয়ার সঙ্গে রাইখস্ট্যাডের গোপন চুক্তির দ্বারা তুরস্কের সাম্রাজ্যভাগের পরিকল্পনা করে। অস্ট্রিয়াকে বসনিয়া হার্জেগোভিনা দিতে রাশিয়া অঙ্গীকার করে। বিনিময়ে অস্ট্রিয়া, রাশিয়াকে বুলগেরিয়া ও রুমানিয়ায় খোলা হাত দিতে রাজী হয়।

অস্ট্রো-রুশ রাইখস্ট্যাডের সন্ধি

অতঃপর বুলগেরিয় হত্যাকাণ্ড ও বলকানজাতির উপর অত্যাচারের অজুহাতে রাশিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে (১৮৭৭ খ্রীঃ) যুদ্ধ ঘোষণা করে। সার্বিয়া ও রুমানিয়াও তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধে তুরস্ক শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয় এবং ১৮৭৭ খ্রীঃ রাশিয়ার সঙ্গে স্যানস্টিফেনোর সন্ধি স্বাক্ষর করে। এই সন্ধির দ্বারা— (১) সুলতান সার্বিয়া, রুমানিয়া ও মন্টিনেগ্রোর স্বাধীনতা স্বীকার করেন। (২) একটি স্বয়ং-শাসিত বুলগেরিয়া রাজ্য গঠিত হয়। বুলগেরিয়ার সীমান্ত দানিয়ুব নদী থেকে ঈজিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। (৩) তুরস্ক কারস, বার্টুম ও রুমানিয়ার সীমান্তে অবস্থিত বেসারাবিয়া ও দোব্রুজা রাশিয়াকে ছেড়ে দেয়। (৪) তুরস্ক যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ রাশিয়াকে অর্থ দিতে রাজী হয়। এভাবে স্যানস্টিফেনোর সন্ধির দ্বারা তুরস্ক হতবল হয় এবং বলকানে রুশ-প্রভাব বাড়ে। স্যানস্টিফেনোর সন্ধির দ্বারা গঠিত বৃহৎ বুলগেরিয়া রাজ্য এক রুশ-তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হয়। রাশিয়া গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি এই সন্ধিতে লাভ করে।

রুশ-তুর্কী যুদ্ধ ও স্যানস্টিফেনোর সন্ধি. ১৮৭৭ খ্রীঃ

স্যানস্টিফেনোর সন্ধি স্বাক্ষরিত হলে ইংলন্ড, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি শক্তিগুলি এই সন্ধির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। বলকানে রুশ প্রভাব বাড়ার ফলে এই দেশগুলি ঈর্ষা বোধ করে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এই সন্ধির শর্ত পরিবর্তনের দাবিতে রাশিয়াকে রাজী করাবার জন্যে যুদ্ধের হুমকি দেন। কারণ তিনি আশঙ্কা করেন যে, এই সন্ধির বলে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে রুশ-নৌবহরের প্রভাব বাড়লে মিশরে ও সুয়েজ খালে ব্রিটিশ স্বার্থ বিপন্ন হবে। রাইখস্ট্যাডের সন্ধি অনুসারে রাশিয়া অস্ট্রিয়াকে বসনিয়া-হার্জেগোভিনা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও স্যানস্টিফেনোর সন্ধিতে তা অগ্রাহ্য করে। এজন্য অস্ট্রিয়া বিষম চটে যায়। তা ছাড়া নবগঠিত বুলগেরিয়ার

স্যানস্টিফেনো সন্ধির বিরুদ্ধে ইংলন্ড ও অস্ট্রিয়ার যুদ্ধের হুমকি

১· David Thomson—Europe since Napoleon.

সীমানা দানিয়ুব পর্যন্ত বিস্তৃত হলে অস্ট্রিয়ার নিরাপত্তা বিপন্ন হয়। এজন্যে অস্ট্রিয়া ইংলন্ডের সঙ্গে যোগ দেয়। বেসারাবিয়া ও দোব্রুজা রাশিয়া অধিকার করায় রুমানিয়া প্রতিবাদ জানায়। বৃহৎ বুলগেরিয়ার সীমানার জন্যে সার্বিয়া অসন্তুষ্ট হয়। সুতরাং পূর্বাঞ্চল সমস্যা উপলক্ষে পুনরায় যুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়। ইংলন্ড ভারত থেকে গুর্খা ফৌজ এনে সাইপ্রাসে নামায়।

জার্মান প্রধানমন্ত্রী বিসমার্ক এই সম্ভাবিত যুদ্ধ এড়াবার জন্যে একটি আন্তর্জাতিক কংগ্রেস ডাকার প্রস্তাব দেন। কারণ অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ হলে এই দুই শক্তির সঙ্গে তিনি যে জোট তৈরি করেন, যথা, তিন সম্রাটের জোট, তা ভেঙে যেত। ফ্রান্স তার পুরো সুযোগ নিত। বিসমার্ক বলেন যে, এই কংগ্রেসে তিনি মধ্যস্থ হিসাবে "সাধু দালালের" ভূমিকা (Honest Broker) পালন করবেন। বার্লিনের কংগ্রেসে ১৮৭৮ খ্রীঃ বার্লিনের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।

বিসমার্কের মধ্যস্থতা ও বার্লিন কংগ্রেস, ১৮৭৮ খ্রীঃ

বার্লিনের সন্ধি (১৮৭৮ খ্রীঃ) দ্বারা (১) সার্বিয়া মন্টিনেগ্রো, রুমানিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। (২) রুমানিয়াকে দোব্রুজা রাশিয়া ফেরত দেয়। (৩) বসনিয়া-হার্জেগোভিনা প্রদেশের উপর অস্ট্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। (৪) রাশিয়াকে কারস, বার্টুম, বেসারাবিয়া, আর্মেনিয়ার একাংশ দেওয়া হয়। (৫) ইংলন্ড সাইপ্রাস দ্বীপ পায়। (৬) ফ্রান্সকে ভবিষ্যতে উত্তর আফ্রিকায় টিউনিস দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। (৭) স্যান্‌স্টিফেনোর সন্ধির দ্বারা নব বৃহৎ বুলগেরিয়াকে তিন ভাগ করা হয় ঃ যথা— (ক) পূর্ব রুমেলিয়া তুরস্কের অধীনে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পায়। (খ) ম্যাসিডোনিয়া তুরস্ককে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। (গ) অবশিষ্ট স্থান নিয়ে বুলগেরিয়া গঠিত হয়। (৮) বুলগেরিয়াকে তুরস্কের অধীনে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হয়।

বার্লিন চুক্তির দ্বারা পূর্বাঞ্চল সমস্যায় আরও জটিলতা বাড়ে। এই চুক্তির দ্বারা রাশিয়ার মর্যাদা নষ্ট হয়। স্যান্‌স্টিফেনোর সন্ধি যা রাশিয়া একতরফা ভাবে তুরস্কের উপর চাপায়, বার্লিনের সন্ধির দ্বারা তছনছ হয়ে যায়। বার্লিন-চুক্তির ৪নং ধারায় দার্দানালিস প্রণালীতে রুশ-যুদ্ধজাহাজের চলাচল নিষিদ্ধ হয়। এজন্য কৃষ্ণসাগর থেকে রুশ-যুদ্ধজাহাজগুলি ভূমধ্যসাগরে ঢোকার অধিকার হারায়। রাশিয়ার উষ্ণ জলনীতি ব্যাহত হয়। রাশিয়া বার্লিনের সন্ধি ভেঙে ফেলার জন্যে চেষ্টা চালায়। বার্লিনের সন্ধির দ্বারা অস্ট্রো-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হয়। অস্ট্রিয়া বলকানে রাশিয়ার মতই আগ্রাসী নীতি নেয়। এজন্য রাশিয়ার সঙ্গে বিরোধ বেধে যায়। এই বিরোধকে উপলক্ষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। আসলে বার্লিন-চুক্তির দ্বারা বলকানে নূতন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র তৈরি হয়, যথা ঃ (ক) অস্ট্রো-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, (খ) সার্বো-অস্ট্রিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা; (গ) অস্ট্রো-বুলগার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বুলগেরিয়া ভুলতে পারেনি যে অস্ট্রিয়ার জন্যই বার্লিন-কংগ্রেসে বৃহৎ বুলগেরিয়াকে ব্যবচ্ছেদ করা হয়। অস্ট্রিয়া এই সন্ধিতে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা দখল করায় সার্বিয়া নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করে। দ্বিতীয়তঃ, ঐতিহাসিক এ·জে·পি· টেইলারের মতে, বার্লিন-চুক্তির দ্বারা ডিস্‌রেইলী অস্ট্রিয়াকে বলকান অঞ্চলে রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে খাড়া করেন। অস্ট্রিয়াকে বসনিয়া-হার্জেগোভিনা দেওয়ায় রুশ-আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়া প্রতিরোধী হয়। তৃতীয়তঃ, বার্লিন-চুক্তির ফলে তুরস্ক ইংলন্ডের প্রতি আস্থা হারায়। এতদিন ইংলন্ড ছিল তুরস্কের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি প্যারিসের সন্ধিতে ইংলন্ড দেয়। সেই ইংলন্ড বার্লিন-সন্ধির দ্বারা তুরস্কের ব্যবচ্ছেদে অংশ নিলে তুরস্ক হতাশ হয়। যদিও ডিস্‌রেইলী স্বদেশে ফিরে এসে বলেন, "আমি সম্মান ও শান্তি এনেছি," প্রকৃতপক্ষে এই দুটির কোনটিই তিনি লাভ করতে পারেন নাই। কারণ বার্লিন-সন্ধি দ্বারা ইওরোপে শান্তির

বার্লিনের সন্ধির ত্রুটিসমূহ

পরিবর্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়ে। তুরস্কের রক্ষার প্রতিশ্রুতি দান করে ব্যবচ্ছেদ করা ব্রিটেনের পক্ষে সম্মানজনক কাজ ছিল না। চতুর্থতঃ, বার্লিন-চুক্তির দ্বারা বলকান জাতীয়তাবাদের কোনো সমাধান হয় নাই। রুমানিয়া বেসারাবিয়া হারিয়ে, সার্বিয়া বসনিয়া-হার্জেগোভিনা হারিয়ে, বুলগেরিয়া খণ্ডিত হয়ে গভীর অসন্তোষে ভুগতে থাকে। গ্রীস ম্যাসিডোনিয়া হারিয়ে অসন্তুষ্ট হয়। পঞ্চমতঃ, বিসমার্ক যদিও নিজেকে "নিরপেক্ষ দালাল" বলেন, কিন্তু রাশিয়া মনে করে যে, তিনি অস্ট্রিয়ার প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছেন। ঐতিহাসিক Langer-এর মতে, এর ফলে রাশিয়া তিন সম্রাটের চুক্তি ত্যাগ করে এবং বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সঙ্গে দ্বিশক্তি চুক্তি করতে বাধ্য হন। সবশেষে, বার্লিনের সন্ধি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বীজ বপন করে। এ·জে·পি· টেইলারের মতে, অস্ট্রো-রুশ, অস্ট্রো-সার্বিয়, অস্ট্রো-বুলগেরিয়, সার্বো-বুলগেরিয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই সন্ধি থেকে জন্মায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ বুলগেরিয়ার সমস্যা (The Bulgarian Questions) ঃ বার্লিনের সন্ধির দ্বারা (১৮৭৮ খ্রীঃ) বুলগেরিয়ার ব্যবচ্ছেদের পর বুলগেরিয়ার জাতীয় নেতারা. ১৮৭৯ খ্রীঃ ব্যাটেনবার্গের আলেকজান্ডারকে বুলগেরিয়ার রাজা হিসাবে নির্বাচন করে। এই যুবরাজ ছিলেন জার্মান ভাষা-ভাষী এবং রুশবিরোধী। তিনি বুলগার সংবিধান ও বুলগার পার্লামেন্টের সাহায্যে বুলগারিয়ায় রুশ-আধিপত্য বিস্তারের পথ বন্ধ করার চেষ্টা করেন। এজন্যে তিনি ব্রিটেনের সহায়তা প্রার্থনা করেন। ব্রিটেনের হুইগ ও টোরী উভয় দল উপলব্ধি করে যে, বলকানে রুশ-আগ্রাসন প্রতিরোধের জন্যে অতঃপর তুরস্কের ভঙ্গুর সাহায্য অপেক্ষা বলকান জাতীয়তাবাদকেই ব্যবহার করা শ্রেষ্ঠতর পথ। সুতরাং ব্রিটিশ সরকার বুলগার জাতীয়তাবাদীদের সমর্থন দেন। এই সুযোগে রাজা আলেকজান্ডার বার্লিন-সন্ধির দ্বারা বুলগেরিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন পূর্ব রুমেলিয়া অধিকার করেন। পূর্ব রুমেলিয়া অধিকার করায় তুরস্ক ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু ব্রিটেনের চাপে তুরস্ক বুলগেরিয়াকে আক্রমণে সাহসী হয় নি। রুশ-জার তৃতীয় আলেকজান্ডারও বুলগেরিয়া আক্রমণে সাহস করেন নি। সার্বিয়া ১৮৮৫ খ্রীঃ বুলগেরিয়া আক্রমণ করলে তিন দিনের যুদ্ধে সার্বিয়া পরাস্ত হয়। ১৮৮৬ খ্রীঃ উভয় দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে রাজা আলেকজান্ডার পদচ্যুত হন। স্যাক্স-কোবার্গ বংশের ফার্দিনান্দকে বুলগার পার্লামেন্ট রাজা হিসাবে নির্বাচন করে। তিনি বিখ্যাত মন্ত্রী স্ট্যামবুলভের (Stambulav) সাহায্যে বুলগেরিয়ার উন্নতি ঘটান। বুলগেরিয়ার স্বাধীনতালাভ ও ক্ষমতা-বিস্তারের ফলে অটোমান সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ তুর্কী সাম্রাজ্যে জার্মানীর বিস্তৃতি ঃ বার্লিন-বাগদাদ রেলপথ পরিকল্পনা (German expansionism through the Berlin-Bagdad Railway Project) ঃ কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের আমলে জার্মানীর শিল্পের পুঁজিবাদী উৎপাদনের দারুণ উন্নতি ঘটে। রসায়নশিল্পে জার্মানী বিশ্বে শ্রেষ্ঠ স্থান পায়। যন্ত্রশিল্পে জার্মানী ব্রিটেনের সমকক্ষ হয়ে ওঠে। জার্মানীর উদ্বৃত্ত মাল বিক্রির জন্যে কোন একচেটিয়া বাজার বা উপনিবেশ ছিল না। ফলে এই উদ্বৃত্ত মাল বিক্রির জন্যে বাজার দখল বা উপনিবেশ দখল না করলে জার্মানীর শিল্পগুলি সঙ্কটের সম্মুখীন হত। জার্মান শিল্পসেবী কাইজারকে বুঝান যে, জার্মানীর পক্ষে পূর্ব-ইওরোপের ও তুরস্কের বাজারে একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপন করা দরকার। যেহেতু এশিয়া আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের বাজার ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির দখলে, সেহেতু একমাত্র তুর্কীসাম্রাজ্যে বাণিজ্য বিস্তারই হল জার্মানীর বাঁচবার পথ। অধিকন্তু এই সময় উপনিবেশদখল ছিল একটি মর্যাদার

জার্মানীর উদ্বৃত্ত শিল্প উৎপাদন ও সাম্রাজ্যবাদ

ব্যাপার। যে দেশের উপনিবেশ ছিল না, তাদের বিশেষ সম্মান দেখানো হত না। কাইজার তাই হতাশভাবে বলেন, "পৃথিবীর যেদিকে তাকাই, হয় ব্রিটিশ নয় ফরাসী উপনিবেশ। জার্মানীও সূর্যের নিচে বাস করে।" সুতরাং কাইজার তুরস্কের বিশাল সাম্রাজ্যে জার্মানীর অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তাকে ক্রমে রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদে পরিণত করার লক্ষ্য নেন।

যেহেতু ১৮৭৮ খ্রীঃ বার্লিন-সন্ধির পর তুরস্কের সঙ্গে ব্রিটেন ও রাশিয়ার সম্পর্কের অবনতি হয়, কাইজার তার সুযোগ নেন। জার্মান ডয়েশ ব্যাঙ্কের অর্থ লগ্নী করে, তুরস্কের অধীনস্থ বলকান অঞ্চল ও আরব দেশ হয়ে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এক রেলপথ নির্মাণের জন্যে কাইজার সরকার পরিকল্পনা রচনা করেন। এই রেলপথের নামকরণ হয় বার্লিন-বাগদাদ রেলপথ। কাইজার ১৮৮৯ খ্রীঃ তুরস্কের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল পরিদর্শনে যান এবং তুর্কী সুলতানের সঙ্গে এই রেলপথ নির্মাণ সম্পর্কে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই রেলপথ নির্মিত হলে তুরস্ক ও মধ্যপ্রাচ্যে জার্মান-বাণিজ্য বিস্তৃত হত। মধ্যপ্রাচ্যের তেল ও কাঁচামালের একচেটিয়া দখল জার্মানী পেয়ে যেত। মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে জার্মান মালপত্র বিক্রি হত।

তুর্কী সাম্রাজ্যে জার্মানীর এই অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের প্রসারের চেষ্টায় রাশিয়ায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রাশিয়া কৃষ্ণসমুদ্র অঞ্চলে এই রেলপথ নির্মাণে বাধা দিতে মনস্থ করে। ফ্রান্স এই রেলপথের পরিকল্পনাকে প্রথমে স্বাগত জানায়। কারণ এর ফলে তুরস্কে রুশ-প্রভাব হ্রাস পাবে বলে ফ্রান্স মনে করত। ব্রিটেনের সেসিল রোডস প্রভৃতি প্রথমে প্রস্তাবকে স্বাগত জানান, কিন্তু ব্রিটেন শীঘ্র এই পরিকল্পনার গুরুত্ব বুঝতে পারে। ব্রিটেন আশঙ্কা করে যে বার্লিন থেকে বাগদাদ পর্যন্ত রেলপথ তৈরি হলে জার্মান-সেনা বাগদাদে সহজে পৌঁছে যাবে। সেখান থেকে তারা ভারতে ব্রিটিশের আধিপত্য বিপন্ন করবে। তা ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের তৈলসম্পদ জার্মানীর অধিকারে ছেড়ে দিতে ব্রিটেন রাজী হয়নি। এজন্য বার্লিন-বাগদাদ রেলপথ নির্মাণে ব্রিটেন বাধা দেয়। কার্যতঃ প্রস্তাবটিকে রূপায়িত করতে বহু দেরী হয়। ফলে তেমন কোন লাভ হয় নি। তথাপি তুরস্ক-জার্মান মৈত্রী দৃঢ় হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক-জার্মানী মিত্রদেশ হিসাবে যুদ্ধে যোগ দেয়।

জার্মান-তুরস্ক চুক্তি

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ আর্মেনীয় সমস্যা (The Armenian Question) ঃ পূর্বাঞ্চল সমস্যার জটিলতা আর্মেনীয় অঞ্চলের স্বাধীনতা দাবির ফলে আরও বেশী জটিলতা ধরে। কৃষ্ণসমুদ্রের দক্ষিণ-পূর্ব তীরে ২ মিলিয়ন আর্মেনীয় বসবাস করত। রুশ-সাম্রাজ্যের ভিতরেও বহু আর্মেনীয় বসবাস করত। এই আর্মেনীয়রা ছিল ক্যাথলিক এবং তাদের নিজস্ব আর্মেনী গীর্জা ছিল। বার্লিনের সন্ধির দ্বারা তুরস্কের সুলতান প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি আর্মেনীয় প্রজাদের উপর নায্য ব্যবহার করবেন। এদের কুর্দ প্রভৃতি উপজাতির আক্রমণ থেকে রক্ষা করবেন। কিন্তু আর্মেনী কৃষক, বণিক বা মধ্যবিত্ত কাহাকেও সুলতান রক্ষার চেষ্টা করেন নি। অধিকন্তু তিনি আর্মেনীয়দের প্রতি দমনমূলক নীতি নেন। এজন্য আর্মেনীয়রা তাদের স্বাধীনতা দাবি করে ও ১৮৯০ খ্রীঃ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। জার্মানীর সাহায্যপুষ্ট সুলতান ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের সতর্কবাণীতে কর্ণপাত না করে আর্মেনীয় স্বাধীনতার বিদ্রোহ কড়া হাতে দমিয়ে ফেলেন।

পরিচ্ছেদ ঃ তরুণ তুর্কী আন্দোলন (The Young Turk Movement) ঃ সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের প্রতিক্রিয়াশীল, স্বৈরতান্ত্রিক, মধ্যযুগীয় নীতিতে একশ্রেণীর দেশপ্রেমিক তুর্কী ঘোর হতাশা বোধ করেন। এনভার পাশার নেতৃত্বে তাঁরা

"তরুণ তুর্কী" (Young Turk) আন্দোলন গড়ে তোলেন। সুলতান আবদুল হামিদের (দ্বিতীয়) দমননীতির ফলে তরুণ তুর্কীগোষ্ঠী গুপ্তসমিতির মাধ্যমে সংগঠন চালায়। তারা সুলতানী সেনাদলকে বুঝিয়ে নিজ পক্ষে আনতে সক্ষম হয়। ১৯০৮ খ্রীঃ তরুণ তুর্কী গোষ্ঠী (Young Turks) প্রকাশ্যে আন্দোলন শুরু করে। তারা স্বাধীনতা, মৈত্রী, সাম্য ও ন্যায়বিচার (Liberty, Fraternity, Equality and Justice) প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ঘোষণা করে। তারা দাবি করে যে, যদি তুরস্ককে বর্তমান পৃথিবীতে একটি স্বাধীন শক্তি হিসাবে টিকে থাকতে হয়, তবে অবিলম্বে তুরস্কের আধুনিকীকরণ দরকার। মধ্যযুগের তন্দ্রা ও অচল আয়তন ভেঙে তুরস্ককে বর্তমান যুগের ভাবধারা, আলোকপ্রাপ্ত সংস্কার, শিক্ষা ও জীবনধারা গ্রহণে বাধ্য করা দরকার। নতুবা বৃহৎ শক্তিগুলির রাজ্য-লালসায় এবং বলকান জাতিগুলির বিদ্রোহে তুরস্ক ক্ষয় পেয়ে যাবে। তরুণ তুর্কীরা "জাতীয় ঐক্য ও প্রগতি সমিতি" (Committee of Union and Progress) নামে এক সমিতি গড়ে ১৮৭৬ খ্রীঃ সংবিধান প্রবর্তনের দাবি করে এবং "লাল সুলতান" আবদুল হামিদের পদত্যাগ দাবি করে। সুলতান হামিদ দেখেন যে, সেনাদল তাঁর প্রতি অনুগত নেই। তিনি বাধ্য হয়ে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে জাতীয় পার্লামেন্ট ডাকেন। তুর্কী এবং অতুর্কী প্রজাদের মহা উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে এই পার্লামেন্টের অধিবেশন বসে। তরুণ তুর্কী আন্দোলন আপাততঃ জয়যুক্ত হয়।

তুরস্ক তুর্কীদের ভাবধারা

সুলতান আবদুল হামিদ ছিলেন ভয়ানক প্রতিক্রিয়াশীল শাসক। তিনি রক্ষণশীলগোষ্ঠীর সাহায্যে ১৯০৯ খ্রীঃ পার্লামেন্ট ভেঙে দেন এবং তরুণ তুর্কীদের দমনের চেষ্টা করেন। কিন্তু তরুণ তুর্কী সেনারা আবদুল হামিদকে গৃহযুদ্ধের দ্বারা পদচ্যুত করে এবং পঞ্চম মুরাদকে সিংহাসনে বসায়। তরুণ তুর্কীদের দ্বারা গঠিত পার্লামেন্ট এরপর বহু সংস্কার চালু করে। তুর্কী ও অ-তুর্কী সকল প্রজাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হয়। বিনা কারণে ও বিনা বিচারে যে-কোন লোকের গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড নিষিদ্ধ হয়। আবদুল হামিদের দুর্নীতিপূর্ণ শাসনযন্ত্র ভেঙ্গে আধুনিক ভাবধারায় তা গঠন করা হয়। গুপ্তচর-নিয়োগ রদ করা হয়। সংবাদপত্রগুলিকে মত-প্রকাশের অধিকার দিলে তুর্কী সাম্রাজ্যে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নিজ ভাষায় সংবাদপত্রগুলি প্রকাশিত হয়। তুরস্কের ভিতর যাতায়াতের জন্যে পাসপোর্ট-প্রথা লুপ্ত হয়। যে-কোন নাগরিক সাম্রাজ্যের যে-কোন অঞ্চলে যাতায়াতের অধিকার পায়। তুরস্কের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের অবাধে বাণিজ্য করার অধিকার দেওয়া হয়।

তরুণ তুর্কী আন্দোলন শীঘ্রই তার যৌবনের উদ্যম হারিয়ে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে যায়। প্রাথমিক উচ্ছ্বাস কমে গেলে গঠনমূলক কাজের সভায় তরুণ তুর্কী সরকার প্রতিশ্রুতিগুলি রক্ষায় ব্যর্থতা দেখায়। অভিজ্ঞতার অভাবে তরুণ তুর্কী নেতারা ভেবেছিল যে সুলতানী স্বৈরশাসন দূর হলে সবকিছু সহজে করা যাবে। কিন্তু তুর্কী মুসলিমদের প্রচণ্ড রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামি এবং তুরস্কের অর্থনৈতিক দুরবস্থা সম্পর্কে তাঁরা অজ্ঞ ছিলেন। ফলে রাস্তাঘাট নির্মাণ, পুল তৈরির কাজ ও শহরে জল-বিদ্যুৎ সরবরাহে তাঁরা অক্ষম হন। তুরস্কে আধুনিক শিক্ষাপ্রসারের কাজও অবহেলিত হয়। আইন-আদালত ও পুলিশবিভাগ আগের মতই দুর্নীতিতে ডুবে যায়।

এদিকে তরুণ তুর্কী আন্দোলনের উদার নীতির সুযোগে তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীনস্থ কয়েকটি জাতি স্বাধীনতা ঘোষণা করে। বুলগেরিয়ার রাজা প্রথম ফার্দিনান্দ বুলগেরিয়াকে পূর্ণ স্বাধীন ঘোষণা করেন। অস্ট্রিয়া বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা প্রদেশ দুটি পুরোপুরি আত্মস্মাৎ করে। ক্রীট দ্বীপ গ্রীসের সঙ্গে মিলিত হয়। এদিকে তরুণ তুর্কী গোষ্ঠীর মধ্যে তুর্কী জঙ্গী জাতীয়তাবাদ দেখা দেয়। তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অ-তুর্কী জাতিগুলির তুর্কীকরণ নীতি তারা নেয়। অ-তুর্কী

জাতিগুলির নিজস্ব ভাষা-সাহিত্য ও ধর্মবিশ্বাসকে দমন করা শুরু হয় ও খ্রীস্টান প্রজারা তাদের স্বায়ত্বশাসনের যে অধিকার পেত, তা লোপ করা হয়। অ-তুর্কী প্রজারা তুর্কী সাম্রাজ্যে বাণিজ্যের যে সুযোগ পেত তা লোপ করা হয়। ম্যাসিডোনিয়ায় তুর্কী উপনিবেশ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কীরা জোর করে বসবাস শুরু করায় তাদের ভয়ে খ্রীস্টান ম্যাসিডোনীয়রা প্রতিবেশী অঞ্চলে পালাতে থাকে। তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে বলকান জাতিগুলি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বলকান লীগ গঠন করে। বলকান যুদ্ধে তুর্কী সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়।

তরুণ তুর্কীদের সাম্রাজ্যবাদ

নবম পরিচ্ছেদ ঃ দুইটি বলকান যুদ্ধ (The Two Balkan Wars) ঃ বলকান জাতীয়তাবাদ বুলগেরিয়া, সার্বিয়া প্রভৃতি দেশকে কেন্দ্র করে ক্রমে ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠে। তুরস্ক সরকার দমননীতির দ্বারা জাতীয়তাবাদকে ধ্বংস করার চেস্টা করলে তা ক্রমে সংগ্রামশীল ও মারমুখী হয়। সুলতান আবদুল হামিদ দমন ও সংস্কার এই উভয় নীতির দ্বারা বলকান জাতির স্বাধীনতার দাবিকে চাপা দেওয়ার চেস্টা করেন। কিন্তু তাঁর পতনের পর, তরুণ তুর্কী নেতারা বলকান জাতিগুলির প্রতি তীব্র উপেক্ষা দেখান। তুর্কীকরণ নীতি গ্রহণ করে বলকানের অধিবাসীদের তুর্কী ভাষা লিখতে বাধ্য করেন। এর ফলে সার্বিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি বলকানের দেশগুলি বুঝতে পারে যে, অবিলম্বে বলকান অঞ্চলকে তুর্কী-শাসন থেকে মুক্ত করা দরকার। বার্লিন-চুক্তি থেকে বলকানজাতিগুলি শিক্ষা নেয় যে, বৃহৎ শক্তিগুলি মুখে বলকান জাতিগুলির প্রতি সহানুভূতি দেখায়, কাজে নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষা করে। সুতরাং তুরস্কের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের জন্যে বলকান রাষ্ট্রগুলি বৃহৎ শক্তির সাহায্যের অপেক্ষা না করে নিজেরাই জোট তৈরি করে। এই উদ্দেশ্যে সার্বিয়া, গ্রীস, বুলগেরিয়া ও মন্টিনেগ্রো, বলকান লীগ (১৯১২ খ্রীঃ) গড়ে।

বলকান জাতিগুলির সমস্যা

এদিকে তরুণ তুর্কী আন্দোলন অন্তর্দ্বন্দ্বে দুর্বল হয়ে পড়লে তুরস্ক সরকারের বৈদেশিক নীতিতে দুর্বলতা দেখা দেয়। সেই সুযোগে ইতালী তুরস্কের অধীনস্থ ত্রিপলী এবং অস্ট্রিয়া, বসনিয়া-হার্জেগোভিনাকে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করে। সেই সুযোগে বলকান লীগ তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। বলকান লীগের সেনাদল, বিশেষতঃ বুলগেরিয়ার সেনাদল তুরস্ককে বলকান অঞ্চল হতে বিতাড়িত করে।

বলকান লীগ গঠন ও প্রথম বলকান যুদ্ধ

বৃহৎ শক্তিগুলি বলকান লীগের সফলতাকে সন্দেহের চোখে দেখে। কারণ বলকান জাতির উপর তাদের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য স্থাপনের গোপন ইচ্ছা এর ফলে ব্যাহত হয়। অপরদিকে বলকান জাতির স্বাধীনতার দাবি এত প্রবল এবং ইওরোপের জনমত এই দাবির এত অনুকূল ছিল যে, তাকে অগ্রাহ্য করা কঠিন ছিল। সুতরাং বৃহৎ শক্তিগুলি মধ্যস্থের ভূমিকা নিয়ে ১৯১৩ খ্রীঃ লন্ডন-কংগ্রেসে তুরস্কের সঙ্গে একটি শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তির ফলে—(১) তুরস্ক তার ইওরোপীয় সাম্রাজ্য ত্যাগ করে। (২) তুরস্কের ইওরোপীয় সাম্রাজ্য যৌথভাবে বলকান লীগের অধিকারে আসে। (৩) ইওরোপের ক্ষুদ্র অংশ তুরস্কের হাতে থাকে। (৪) আলবানিয়া একটি স্বয়ং-শাসিত রাজ্যে পরিণত হয়। (৫) ক্রীট দ্বীপ গ্রীসের সঙ্গে যুক্ত হয়। বলকান জাতীয়তাবাদের জয় হয়

লণ্ডনের সন্ধি, ১৯১৩ খ্রীঃ

লন্ডন-চুক্তির মধ্যে দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের বীজ লুকিয়ে ছিল। লন্ডন-চুক্তির দ্বারা যৌথভাবে তুরস্কের ইওরোপীয় সাম্রাজ্যকে বলকান লীগের হাতে দেওয়া হয়। এই চুক্তির পর সার্বিয়া আড্রিয়াটির সমুদ্রের উপকূল অঞ্চল দখলের চেষ্টা করলে অস্ট্রিয়া ও ইতালীর বাধায় সার্বিয়াকে পিছু হঠতে হয়। তখন সার্বিয়া ম্যাসিডোনিয়ার বৃহৎ অংশ দাবি করে। বুলগেরিয়া সার্বিয়ার এই

দাবি মানতে রাজী হয়নি। সার্বিয়া ম্যাসিডোনিয়ার সিংহভাগ দাবি করলে বুলগেরিয়া আপত্তি জানায়। অস্ট্রিয়া এই ঝগড়ায় হস্তক্ষেপ করে এবং বুলগেরিয়ার পক্ষ নেয়। তুরস্কের স্যালানিকা অঞ্চলে গ্রীস দাবি করলে বুলগেরিয়া এই দাবি নাকচ করে। যেহেতু তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বুলগেরিয়া প্রধান ভূমিকা নেয়, সেহেতু বুলগেরিয়া সার্বিয়া বা গ্রীসের দাবিকে অন্যায় মনে করত। তুরস্কের বিরুদ্ধে কার্ক-কিলিসা ও লুসেবুর্গাজের (১৯১৬ খ্রীঃ) যুদ্ধ জয় করে বুলগেরিয়ার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। সার্বিয়ার সঙ্গে ম্যাসিডোনিয়ার অধিকার উপলক্ষে বিরোধের জন্যে বুলগেরিয়া ১৯১৩ খ্রীঃ জুন মাসে যুদ্ধ ঘোষণা করে। গ্রীসদেশের বিরুদ্ধেও বুলগেরিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে। রুমানিয়া, মন্টিনিগ্রো, সার্বিয়ার পক্ষে যোগ দেয়। দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ শুরু হলে বলকান দেশগুলির সম্মিলিত আক্রমণে বুলগেরিয়া নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ বুখারেস্টের সন্ধির (১৯১৩ খ্রীঃ) দ্বারা অবসিত হয়। বুলগেরিয়া ম্যাসিডোনিয়ার অংশ সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো, গ্রীসকে ভাগ করে দেয়। রুমানিয়া দোব্রুজা পায়। তুরস্ককে বুলগেরিয়া এ্যাড্রিয়ানোপল ফিরিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ : বলকানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

এভাবে দুই বলকান যুদ্ধের দ্বারা তুরস্কের ইওরোপীয় সাম্রাজ্যের ব্যবচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়। ইওরোপে কেবলমাত্র গ্যালীপোলী উপদ্বীপ, এ্যাড্রিয়ানোপল তুরস্কের অধিকারে থাকে। বলকান যুদ্ধের ফলে সার্বিয়া এক প্রভাবশালী রাষ্ট্ররূপে দেখা দেয়। সার্বিয়া বসনিয়া প্রদেশটির উপর অতঃপর দাবি জানায়। জার্মানীর সঙ্গে দ্বিশক্তি চুক্তির বলে শক্তিমান অস্ট্রিয়া, বসনিয়াকে তার অধিকারে রেখে সার্বিয়াকে কোণঠাসা করবার চেষ্টা করলে, সার্বিয়া রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা করে। রাশিয়া বার্লিনের সন্ধির প্রতিশোধ নিতে সার্বিয়াকে সাহায্য দেয়। ফলে অস্ট্রো-সার্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বলকান জ্বলে উঠে। শেষ পর্যন্ত এই বিরোধকে উপলক্ষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। (অস্টম অধ্যায় পৃঃ ১৩৩ দ্রস্টব্য)।

ফলাফল

দশম পরিচ্ছেদ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তুর্কী সাম্রাজ্যের পতন (The World War I and the disintegration of the Ottoman Empire) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অটোমান তুর্কী সরকার মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে জার্মানীর পক্ষ নেয়। ফলে তুরস্ক মিত্রশক্তির শত্রু-দেশ রূপে পরিগণিত হয়। যুদ্ধে তুরস্কের পরাজয় হলে তুরস্কের উপর সেভরের সন্ধি, ১৯২০ খ্রীঃ চাপানো হয়। এই সন্ধির দ্বারা তুরস্ককে ৩ লক্ষ বর্গমাইল সীমানাসম্পন্ন একটি রাজ্যে পরিণত করা হয়। তুরস্কের বিশাল সাম্রাজ্যের ব্যবচ্ছেদ করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই বলকান যুদ্ধের (১৯১২ খ্রীঃ) ফলে তুরস্ক তার ইওরোপীয় সাম্রাজ্য হারায়। এখন সেভরের সন্ধি দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তুরস্কের এশিয়া, আফ্রিকার সাম্রাজ্য গ্রাস করার আয়োজন করে।

সেভরের সন্ধি, ১৯২০ খ্রীঃ

সেভরের সন্ধির দ্বারা তুরস্কের হাত থেকে আরব দেশের অঞ্চল কেড়ে নেওয়া হয়। সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, ইরাক ও আরব দেশের অবশিস্ট অংশ লীগ অব্ নেশনস অধিগ্রহণ করে। ইওরোপে তুরস্কের হাতে মাত্র কনস্ট্যান্টিনোপল শহরটি রাখা হয়। তুরস্কের অঞ্চল নিয়ে আর্মেনিয়া ও কুর্দ রাজ্য দুটি গঠন করা হয়। স্পার্না বা পূর্ব থ্রেস অঞ্চল গ্রীসকে দেওয়া হয়; আরবদেশের অন্তর্গত মেসোপটেমিয়া বা ইরাক, জোর্দান এবং প্যালেস্টাইন লীগ ম্যাণ্ডেট হিসাবে ব্রিটেনকে দান করে। এভাবে ব্রিটেন এই তৈল-সমৃদ্ধ অঞ্চল লাভ করে। ফ্রান্সকে ম্যাণ্ডেট হিসাবে সিরিয়া দেওয়া হয়। আরবদেশের অন্তর্গত হেজ্জাজ অঞ্চলকে স্বাধীন

আরবরাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। হজরত মহম্মদের বংশধর হুসেন্ হেজ্জাজের সিংহাসন পান। এশিয়া-ইওরোপের সংযোগস্থলে অবস্থিত স্মার্না, থ্রেস, গ্যালিপোলি অঞ্চল গ্রীসকে দান করা হয়। এ ছাড়া তুরস্কের সাম্রাজ্যের ভিতর বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও অন্যান্য বিশেষ সুবিধা-সুযোগ ফ্রান্স ও ইতালীকে দেওয়া হয়। দার্দানালিস প্রণালীকে আন্তর্জাতিক জলপথ হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

বহির্তুরস্কীয় সাম্রাজ্যের ব্যবচ্ছেদ

তুরস্ককে সেভরের সন্ধিগ্রহণে বাধ্য করার জন্যে ব্রিটিশ ও গ্রীক সেনদল তুরস্ক আক্রমণ করে। তুর্কী সুলতান মুরাদ সেভরের সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। কিন্তু তুর্কী জাতীয়তাবাদীদের নেতা হিসাবে মুস্তাফা কামাল পাশা সেভরের সন্ধি অগ্রাহ্য করেন। তিনি সোভিয়েত রাশিয়া, ফ্রান্স ও ইতালীর গোপন সহযোগিতায় যে অস্ত্র পান, তার দ্বারা গ্রীক সেনাদের ১৯২২ খ্রীঃ শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেন এবং দার্দানালিসের তীরে ব্রিটিশবাহিনীকে আটক করেন। শেষ পর্যন্ত মুস্তাফা কামালের শৌর্যে ব্রিটিশ সরকার সেভরের সন্ধি পরিবর্তনে বাধ্য হন এবং ল্যাসেনের সন্ধির (১৯২৩ খ্রীঃ) দ্বারা (Lausanne) তুরস্ককে উদার শর্ত দেওয়া হয়।

গ্রীক-তুরস্ক যুদ্ধ ও ল্যাসেনের সন্ধি

ল্যাসেনের সন্ধি, ১৯২৩ খ্রীঃ দ্বারা—(১) তুরস্ক আরবদেশ ও উত্তর আফ্রিকার সাম্রাজ্যের উপর তার দাবি ত্যাগ করে। (২) মিত্রশক্তি অবশিস্ট তুর্কী সাম্রাজ্যের উপর তুরস্কের দাবি স্বীকার করেন। ফলে কনস্টান্টিনোপল, স্মার্না, থ্রেস, গ্যালিপোলি তুরস্ক ফেরত পায়। (৩) ব্রিটেন ও ফ্রান্স আরবদেশে ম্যাণ্ডেটের অধিকার পায়। (৪) দার্দানালিস প্রণালী ও বসফরাস উপসাগর আন্তর্জাতিক জলপথ হিসাবে চিহ্নিত হয়। এভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুরস্কের সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদ হলে পূর্বাঞ্চল সমস্যার সমাধি ঘটে। জাতীয় তুর্কী-রাষ্ট্রের উত্থান মুস্তাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়।

ল্যাসেনের সন্ধির শর্ত ঃ তুরস্কের সাম্রাজ্যের ব্যবচ্ছেদ

সারণী

[ক] পূর্ব ইওরোপের বলকান উপদ্বীপের খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী প্রজাদের উপর ইসলামী তুর্কী সুলতানের আধিপত্যের বিরুদ্ধে তাঁর খ্রীষ্টীয় প্রজাদের জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ ঘটে। জারশাসিত রাশিয়া পূর্ব ইওরোপের খ্রীষ্টীয় প্রজাদের স্ব-নিযুক্ত অভিভাবকরূপে তুরস্কের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়। রাশিয়ার অভিপ্রায় ছিল বলকানে তুরস্কের স্থলে নিজ আধিপত্য বিস্তার করা। এজন্যে ইওরোপের বৃহৎ শক্তিগুলি রাশিয়ার বিরোধিতা করলে পূর্বাঞ্চল সমস্যা সৃষ্টি হয়। ব্রিটেন বিশেষভাবে রুশ আগ্রাসনের বিরোধিতা করে।

[খ] পূর্বাঞ্চল সমস্যা ছিল একটি দীর্ঘায়ত জটিল সমস্যা। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ১৮৫৪-৫৬ খ্রীষ্টাব্দ ছিল পূর্বাঞ্চল সমস্যার একটি অধ্যায়। এই যুদ্ধের উপলক্ষ ছিল গ্রোটোর গীর্জার চাবির অধিকারের দ্বন্দ্ব। আসল কারণ ছিল রাশিয়ার তুরস্ককে ব্যবচ্ছেদের চেষ্টা এবং ব্রিটেনের বিরোধিতা। তুরস্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মোলদাভিয়া, ওয়ালাচিয়া প্রদেশ দখল করলে রুশ-তুর্কী যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই উপলক্ষে ব্রিটেন ও ফ্রান্স তুরস্কের পক্ষ নিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ বাধে। প্যারিসের সন্ধির দ্বারা ক্রিমিয়ার যুদ্ধের নিষ্পত্তি হয়। রাশিয়া তুরস্কের অধিকৃত স্থান ফিরিয়ে দেয়। কৃষ্ণসাগরে রুশ যুদ্ধজাহাজের অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল ক্ষণস্থায়ী হলেও পরোক্ষ ফল ছিল গুরুত্বপূর্ণ। রাশিয়া পূর্ব ইওরোপ ছেড়ে মধ্য এশিয়ায় রাজ্যবিস্তারে মন দেয়। ফ্রান্সের গৌরব বৃদ্ধি পায়।

[গ] তুরস্কের অধিকৃত মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া প্রদেশ নিয়ে নব জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগঠনের জন্যে নিকোলাস বেলসেস্কো আন্দোলন গঠন করেন। রুশ ও তুর্কী সেনা এই আন্দোলন দমন করে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর প্যারিসের সন্ধির দ্বারা রুমানিয়া স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পায়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে রুমানিয়া কার্যতঃ স্বাধীনতা লাভ করে।

[ঘ] ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ও প্যারিসের সন্ধির দ্বারা পূর্বাঞ্চল সমস্যার সমাধান হয় নি। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বুলগেরিয়ায় স্বাধীনতা-আন্দোলন প্রবল হলে তুর্কী সুলতানের সেনাদল বহু বুলগেরিয়কে হত্যা করায়, রাশিয়া বুলগেরিয়ার পক্ষ

নিয়ে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং পরাজিত তুরস্কের উপর স্যানস্টিফেনোর সন্ধি ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে চাপিয়ে দেয়। এই সন্ধির দ্বারা বলকানে রুশ-প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় ইংলন্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি এই সন্ধির তীব্র বিরোধিতা করলে, বিসমার্কের মধ্যস্থতায় বার্লিনের সন্ধি দ্বারা স্যানস্টিফেনোর সন্ধি নাকচ করা হয়। বসনিয়া, হার্জেগোভিনা প্রদেশ অষ্ট্রিয়াকে, রাশিয়াকে কারস, বাটুম দেওয়া হয়। বার্লিন-চুক্তি দ্বারা পূর্বাঞ্চল সমস্যার প্রকৃত সমাধান হয়নি।

[ঙ] বুলগেরিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডার ব্রিটেনের সহায়তায় বুলগেরিয়ার স্বাধীনতালাভের পথ প্রস্তুত করেন। পরবর্তী রাজা ফার্দিনান্দ মন্ত্রী স্ট্যামবুলোভের সাহায্যে বুলগেরিয়ার উন্নতি ঘটান।

[চ] বার্লিন-চুক্তির পর ব্রিটেনের সঙ্গে তুরস্কের মিত্রতা সম্পর্কে ফাটল ধরে। কাইজার-শাসিত জার্মানী সেই সুযোগে তুর্কী সুলতানের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে বার্লিন-বাগদাদ রেলপথ পরিকল্পনা গঠন করেন।

[ছ] তুরস্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত আর্মেনীয় প্রজারা ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তুর্কী সুলতান তা দমন করেন।

[জ] তুরস্কের সুলতান আবদুল হামিদের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনে হতাশ হয়ে এনভার পাশার নেতৃত্বে তুরস্কের যুবশক্তি তরুণ তুর্কী আন্দোলন দ্বারা "জাতীয় ঐক্য ও প্রগতি" সমিতি গড়ে। তরুণ তুর্কী স্বদেশে আধুনিক সংস্কার প্রবর্তন ও সাম্রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ দমনের দাবি জানায়।

[ঝ] তুর্কী সাম্রাজ্যের ভিতর খ্রীষ্টীয় প্রজাদের উদগ্র জাতীয়তাবাদকে দমনের জন্যে সুলতান দমনমূলক নীতি ও তুর্কীকরণ নীতি নেন। বলকান জাতিগুলি বলকান লীগ গঠন করে তুরস্ককে যুদ্ধে পরাস্ত করে এবং লন্ডন-চুক্তি দ্বারা ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের ইওরোপীয় সাম্রাজ্য লোপ করা হয়। এই সাম্রাজ্য যৌথভাবে বলকান লীগের অধীনে যায়। আলবানিয়া স্বয়ংশাসিত রাজ্যে পরিণত হয়। লন্ডন-সন্ধির পর ম্যাসিডোনিয়ার উপর আধিপত্য স্থাপনের জন্যে সার্বিয়া-বুলগেরিয়া যুদ্ধ বা দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ বাধে। বুখারেস্টের সন্ধি ১৯১৩ খ্রীঃ দ্বারা বুলগেরিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে ম্যাসিডোনিয়া বিভক্ত করা হয়।

(ঞ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষে যোগদান করে পরাজিত হলে বিজয়ী মিত্রশক্তি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের উপর সেভরের সন্ধি (Treaty of Savres) চাপিয়ে দেয়। তুরস্কের এশীয় সাম্রাজ্য লীগ ম্যাণ্ডেট হিসাবে গ্রহণ করে তৈলসমৃদ্ধ আরব অঞ্চল ব্রিটেন ও ফ্রান্সের হাতে ম্যাণ্ডেট হিসাবে তুলে দেয়। তুর্কী জাতীয়তাবাদী নেতা মুস্তাফা কামাল পাশা সেভরের সন্ধির বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধঘোষণা করায় মিত্রশক্তি ল্যাসেনের সন্ধির দ্বারা আরব দেশ ও উত্তর আফ্রিকায় তুর্কী সাম্রাজ্য লোপ করলেও অবশিষ্ট অংশে তুরস্কের আধিপত্য স্বীকার করেন।

অনুশীলনী

১। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) পূর্বাঞ্চল সমস্যা বলতে কি বোঝায়? (খ) কাকে "ইওরোপের রুগ্ণ মানুষ" বলা হয়? (গ) "উষ্ণ জল নীতি" কি? (ঘ) গ্রোটোর চাবির সঙ্গে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের কি সম্পর্ক ছিল? (ঙ) ক্রিমিয়ার যুদ্ধকে কেন "ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধ" বলা হয়? (চ) রুমানীয় আন্দোলনের প্রাণপুরুষ কে ছিলেন? (ছ) কোন্ সালে রুমানীয়া স্বাধীনতা লাভ করে এবং কে প্রথম রুমানীয় সিংহাসনে বসেন? (জ) প্যান-স্লাভ আন্দোলন সম্পর্কে কি জান? (ঝ) স্যানস্টিফেনো সন্ধির বিবরণ দাও। (ঞ) কাকে বার্লিন কংগ্রেসের "সাধু দালাল" বলা হয়? (ট) আলেকজাণ্ডার কোন্ রাষ্ট্রের রাজা ছিলেন? (ঠ) বার্লিন-বাগদাদ রেলপথ সম্পর্কে কি জান? (ড) "লাল সুলতান" কে ছিলেন? (ঢ) "তরুণ তুর্কী আন্দোলনের" কয়েকজন নেতার নাম কর। (ণ) প্রথম ও দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ কোন্ কোন্ শক্তির মধ্যে সংঘটিত হয়? (ত) কে সেভরের সন্ধি অগ্রাহ্য করেন?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(ক) পূর্বাঞ্চল সমস্যার জন্যে তুরস্কের দুর্বলতা কতখানি দায়ী ছিল? (খ) বলকান জাতীয়তাবাদ ও বৃহৎ শক্তিগুলির নীতি কিভাবে পূর্বাঞ্চল সমস্যাকে জটিল করে তোলে তার বিবরণ দাও। (গ) ক্রিমিয়ার যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর। (ঘ) কিভাবে রুমানিয়া স্বাধীনতা লাভ করে তার বিবরণ দাও। (ঙ) বার্লিন চুক্তির শর্তসমূহ আলোচনা কর এবং এই চুক্তির ফলাফল বর্ণনা কর। (চ) বার্লিনের সন্ধির দ্বারা বুলগেরিয়ার যে সমস্যা হয়, তা রাজা আলেকজাণ্ডার কিভাবে সমাধান করেন? (ছ) বার্লিন-বাগদাদ রেলপথ পরিকল্পনার কারণ কি ছিল এবং ইহার প্রতিক্রিয়া কি হয়? (জ) তুরস্কে "তরুণ তুর্কী আন্দোলন" সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (ঝ) বলকান জাতিগুলির সমস্যার সমাধানে দুটি বলকান যুদ্ধের কি প্রয়োজন ছিল? (ঞ) সেভরের সন্ধির শর্তাবলী আলোচনা কর এবং ল্যাসেনের সন্ধির দ্বারা এর কি পরিবর্তন হয়?

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঃ ভার্সাইয়ের সন্ধি ঃ জাতিসঙ্ঘ

[ক] প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ (The causes of the World War I) ঃ বার্লিন-কংগ্রেসের পর (১৮৭৮ খ্রীঃ) ইওরোপে রাজনৈতিক অশান্তির আগুন ধূমায়িত হতে থাকে। ইওরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মারণাস্ত্র- নির্মাণের প্রতিযোগিতা, বৃহৎ শক্তিগুলির স্বার্থপর নীতি, অতৃপ্ত ও অপূর্ণ জাতীয়তাবাদ ইওরোপকে একটি ধূমায়মান আগ্নেয়গিরিতে পরিণত করে। ঐতিহাসিক ল্যাংসামের মতে, "ইওরোপের শান্তি যেকোন দুর্ঘটনার দ্বারা ধ্বংস হওয়ার রাস্তা তৈরি হয়।" অবশেষে সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ডকে উপলক্ষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রধান কারণ ছিল ইওরোপের বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে উপনিবেশ দখলের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। হবসন নামক অর্থনীতিবিদ এই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে, শিল্পপতি, ব্যাঙ্ক-মালিক, কারখানা-মালিকরা অপরিমেয় মুনাফার সুযোগ পান। ফলে তাঁরা মুনাফা সঞ্চয় করে মূলধনের পাহাড় জমিয়ে ফেলেন (Glut of Capital)। এই মূলধন আর নিজদেশে বিনিয়োগের সুযোগ না থাকায় তাঁরা উপনিবেশে এই উদ্বৃত্ত মূলধন বিনিয়োগ করে উপনিবেশে একচেটিয়া ভাবে বাজারদখল, তূলা, পাট, রবার, রেশম প্রভৃতি কাঁচামাল দখলের জন্যে ব্যস্ত হন। এজন্যে তাঁরা নিজ নিজ সরকারকে সৈন্য-সামন্ত দ্বারা উপনিবেশ দখলের জন্যে চাপ দেন এবং এজন্যে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেন। যেহেতু পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি প্রধানতঃ বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত হয়, সেহেতু মূলধনী শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্যে এই সকল রাষ্ট্র উপনিবেশ দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে পড়ে। ফলে যুদ্ধ বাধে।

ইওরোপীয় শক্তিগুলির উপনিবেশিক দ্বন্দ্ব ঃ হবসন তত্ত্ব

ভি· আই· লেনিন তাঁর "সাম্রাজ্যবাদ হল পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর"[১] পুস্তিকায় এই মতটিকে একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে,ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের ভিতরেই সাম্রাজ্যবাদের বীজ ও তার জন্যে যুদ্ধের বীজ লুকিয়ে থাকে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে বুর্জোয়া মিল-মালিক বা পুঁজিপতিশ্রেণী মুনাফার লোভে দেশের চাহিদা অপেক্ষা বেশী উৎপাদন করে। পুঁজিপতিশ্রেণী চাহিদা অপেক্ষা বাড়তি মাল উৎপাদন করে তা বিক্রির জন্যে এবং সস্তাদরে কাঁচামাল পাওয়ার জন্যে উপনিবেশ দখলের চেষ্টা চালায়। তাদের নিজ নিজ সরকারকে বুর্জোয়াশ্রেণী উপনিবেশ দখলে চাপ দেয় এবং উৎসাহ দেয়। এজন্যে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। যেহেতু উপনিবেশের সংখ্যা সীমিত, সেহেতু সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি যুদ্ধের দ্বারা উপনিবেশের উপর একচেটিয়া দখল নিতে চেষ্টা করে। এভাবে পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রভাবে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

উপনিবেশের বাজার ও কাঁচামালের দখলের জন্যে সংঘাত ঃ লেনিন তত্ত্ব

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণের ক্ষেত্রে হবসন ও লেনিনের ব্যাখ্যা বিশেষ কার্যকরী দেখা যায়। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে শিল্প-বিপ্লব আগেই আরম্ভ হয় (শিল্প-বিপ্লব তৃতীয় অধ্যায় পৃঃ ৭ দ্রষ্টব্য)। ব্রিটেন সবার আগেই ভারত, চীন, মালয় প্রভৃতি উপনিবেশ দখল করে। ফ্রান্স, ইন্দোচীন, টিউনিস, আলজেরিয়া দখল করে। এর পর আফ্রিকার উপনিবেশ স্থাপন নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিলে ১৮৭৮ খ্রীঃ বার্লিনের সন্ধির দ্বারা আফ্রিকার কিছু অংশ বিভিন্ন শক্তির মধ্যে ব্যবচ্ছেদ করা হয়।

ইংরাজ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ ঃ আফ্রিকার ব্যবচ্ছেদ

১· V.I., Lenin—Imperialism Highest stage of Capitalism.

জার্মান-সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম দেখেন যে, বিশ্বের বেশির ভাগ উপনিবেশগুলি ইংরাজ, ফরাসী শক্তির করতলগত হয়েছে। এদিকে জার্মানীর শিল্পকারখানাগুলি প্রভূত উদ্বৃত্ত পণ্য উৎপাদন করতে থাকে। তা বিক্রীর জন্যে বাজার দখল না করলে জার্মানীতে অর্থনৈতিক ধস নামত। এজন্য কাইজার ব্রিটিশ ও ফরাসী উপনিবেশে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ উপনিবেশে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে বুয়ারদের যুদ্ধে বুয়ার প্রেসিডেন্ট ক্রুগারকে সাহায্যদানের প্রস্তাব দিয়ে টেলিগ্রাম পাঠান। ব্রিটেনের তীব্র প্রতিবাদের ফলে তিনি শেষ পর্যন্ত পিছু হঠেন। তিনি বার্লিন-বাগদাদ রেলপথ পরিকল্পনা করে মধ্যপ্রাচ্যে অনুপ্রবেশের জন্যে তুরস্কের সম্মতি আদায় করেন। এই রেলপথ তৈরি হলে মিশর ও ভারতে ব্রিটিশ স্বার্থ বিপন্ন হত। তিনি ফরাসী উপনিবেশ মরক্কোয় হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্যে জার্মান যুদ্ধজাহাজ প্যান্থারকে মরক্কোর ট্যাঞ্জিয়ার বন্দরে ঢুকিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত ইংলন্ড ও ফ্রান্সের বাধার ফলে প্যান্থারকে ফেরত নেন। কাইজারের এই ঔপনিবেশিক নীতিকে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি আগ্রাসী ও "পাশবিক কূটনীতি" বলে ঘোষণা করে।

জার্মানীর উপনিবেশিক ক্ষুধা : ইংলন্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে বিরোধ

আসলে কেবল জার্মানী নয়, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি সকল বৃহৎ শক্তিগুলি উপনিবেশবিস্তারের জন্যে চেষ্টা চালায়। ঐতিহাসিক রবার্ট এরগ্যাং (Robert Ergang) এর মতে বৃহৎ শক্তিগুলি পরস্পরের বিরুদ্ধে যে জোটগুলি গঠন করে তার মূলে ছিল নিজ নিজ জোটের দখলে সর্বোচ্চ সংখ্যক উপনিবেশে দখল রাখা। ফ্রান্স-ব্রিটেনের মধ্যে দ্বিশক্তি আঁতাতের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল এশিয়া-আফ্রিকায় তাদের উপনিবেশে যাতে জার্মানী না ঢুকতে পারে তার ব্যবস্থা করা। এই সঙ্গে জার্মানীর বিরুদ্ধে শক্তিসাম্য গঠন করা। রাশিয়া বলকানে তার ঔপনিবেশিক লক্ষ্যপূরণের আশায় ইঙ্গ-ফরাসী আঁতাতে যোগ দেয়। ফলে ত্রিশক্তি আঁতাত গঠিত হয়। জার্মানী বসে থাকেনি। অস্ট্রিয়া ও ইতালীর সঙ্গে ত্রিশক্তি জোট গঠন করে বলকানে অস্ট্রিয়ার সাহায্যে উপনিবেশ দখল এবং উত্তর আফ্রিকায় উপনিবেশ দখলে ইতালীকে উৎসাহ দেয়। উপনিবেশের ঝগড়ার ফলে ইওরোপ প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিজোটে বিভক্ত হয়।

কাইজার উপলব্ধি করেন যে, নৌশক্তি বৃদ্ধি না করলে জার্মানী উপনিবেশ-দখলে সক্ষম হবে না। এজন্যে তিনি নৌ-সেনাপতি তিরপিৎসের (Adm. Tirpitz) নেতৃত্বে জার্মান নৌবহর গড়ার কাজে হাত দেন। ব্রিটেন আশঙ্কা করে যে, একেই জার্মানীর স্থলশক্তি প্রায় অপরাজেয়। তদুপরি যদি জার্মানী নৌ-শক্তি গড়ে, তবে ব্রিটেনের উপনিবেশগুলি জার্মান জাহাজের পাল্লায় এসে যাবে। তাছাড়া ইংলন্ড ছিল দ্বীপময় দেশ। সমুদ্রে নৌ-আধিপত্যের ওপরেই ইংলন্ডের নিরাপত্তা নির্ভর করত। জার্মান নৌবহর উত্তর সমুদ্রে ঢুকলে ইংলন্ডের আর রক্ষা ছিল না। সুতরাং ব্রিটেন জার্মানীকে নৌবহর নির্মাণ না করতে অনুরোধ জানায়। ইংলন্ডের নৌ-মন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল কাইজারকে বলেন যে, "নৌবহর হল জার্মানীর পক্ষে বিলাসিতা মাত্র; ইংলন্ডের পক্ষে তা বাঁচা-মরার বিষয়। সুতরাং, জার্মানীর নৌ-নির্মাণ রদ করা উচিত।" জার্মানী এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করলে ব্রিটেন তার নৌশক্তি বাড়াতে থাকে। ফলে ইঙ্গ-জার্মান নৌ-প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। এইসঙ্গে বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে অস্ত্রপ্রতিযোগিতা চলতে থাকে। ১৮৭০ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের পর থেকে এই অস্ত্র-প্রতিযোগিতা চলছিল। ফ্রান্স জার্মানীর সমকক্ষ হওয়ার জন্যে তার বাহিনীকে ঢেলে সাজায়। অন্য শক্তিগুলিও পিছিয়ে ছিল না। ১৮৯৯ খ্রীঃ হেইগ (Haig) শহরে আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক ব্যর্থ হলে অস্ত্র-প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায়। ১৯০৭ খ্রীঃ হেইগের দ্বিতীয় সম্মেলনও বিফল হয়। অস্ত্র-প্রতিযোগিতার ফলে যুদ্ধ বেধে যায়।

জার্মানীর নৌ-নীতি : অস্ত্র-প্রতিযোগিতা

এদিকে বিসমার্কের আমল থেকে জার্মানী ত্রিশক্তি-চুক্তি (Triple Alliance) দ্বারা ফ্রান্সকে মিত্রহীন করার নীতি নেয়। বিসমার্ক ত্রিশক্তি-চুক্তিকে জার্মানীর আত্মরক্ষা ও আন্তর্জাতিক স্থিতাবস্থা রক্ষার জন্যে ব্যবহার করেন। কিন্তু কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম এই চুক্তিকে জার্মানীর আগ্রাসন তথা উপনিবেশবিস্তারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন। ত্রিশক্তি-চুক্তির প্রধান স্তম্ভ ছিল অস্ট্রো-জার্মান ত্রিশক্তি-চুক্তি। বলকানে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ১৮৭৮ খ্রীঃ বার্লিনের সন্ধির পর তীব্র হয়। দ্বিশক্তি-চুক্তির দ্বারা রাশিয়া অস্ট্রিয়াকে আক্রমণ করলে জার্মানী অস্ট্রিয়াকে সাহায্য দিতে বাধ্য ছিল। কাইজার এক্ষেত্রে অস্ট্রিয়ার আত্মরক্ষার পরিবর্তে আগ্রাসন-ঘটিত যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে সাহায্য দিতে রাজী হন। লোয়েস ডিকিন্সন নামে ঐতিহাসিকের মতে, ১৮ই জুলাই, ১৯১৪ খ্রীঃ কাইজারের সচিব এক গোপন নির্দেশনামার দ্বারা জার্মানীর সামরিক ও অসামরিক সকল দপ্তরকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে সাহায্য দিতে নির্দেশ দেন। কারণ কাইজার জানতেন যে, অস্ট্রিয়া হল একটি জার্মানরাজ্য, জার্মানীর ঘনিষ্ঠ মিত্রদেশ। তিনি অস্ট্রিয়াকে মুখপাত্র হিসাবে ব্যবহার করে বলকানে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের চেষ্টা করেন। এজন্যে রাশিয়ার সঙ্গে অস্ট্রিয়া ও জার্মানীর তীব্র বিরোধ দেখা দেয়।

কাইজারের অস্ট্রিয়া ও বলকান নীতি : ত্রিশক্তি চুক্তি

এদিকে ১৮৭০-১৮৭১ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের দ্বারা ফ্রান্স আলসাস ও লোরেন জার্মানীকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ফ্রান্স এই পরাজয় এবং আলসাস-লোরেন হস্তান্তরের ক্ষতিকে স্থায়িভাবে মেনে নিতে রাজী ছিল না। কারণ ফ্রান্সের বেশির ভাগ কয়লা ও লোহা আলসাসের খনি থেকে তোলা হত। এখন আলসাস হস্তচ্যুত হলে ফ্রান্সের শিল্প-কারখানাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া জার্মানীর সীমান্ত ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের নিকট পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ফ্রান্স এই পরাজয়ের প্রতিশোধগ্রহণে সচেষ্ট ছিল। এজন্যে ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে জোট গড়ার নিরন্তর চেষ্টা চালাতে থাকে। রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানীর সম্পর্কের অবনতি ঘটলে এবং রাশিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ-চুক্তি বা রি-ইনসিওরেন্স চুক্তি কাইজার নাকচ করলে রুশ-জার অত্যন্ত অপমানিত জ্ঞান করেন। তিনি এর ফলে জার্মানীর শত্রু ফ্রান্সের সঙ্গে ১৮৯৪ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-রুশ মৈত্রী স্থাপন করেন। ফ্রাঙ্কো-রুশ সামরিক চুক্তি (১৮৯৪ খ্রীঃ) দ্বারা স্থির হয় যে, জার্মানী যদি ফ্রান্সকে আক্রমণ করে, তবে রাশিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে সেনা সন্নিবেশ করবে। জার্মানী বা অস্ট্রিয়া যদি রাশিয়াকে আক্রমণ করে, তবে ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে সেনা সমাবেশ করবে। ফ্রাঙ্কো-রুশজোট তৈরি হলে ইওরোপে যুদ্ধের আবহাওয়া দেখা দেয়। কারণ জার্মান ত্রিশক্তি-জোট যথা জার্মানী-অস্ট্রিয়া-ইতালী জোটের বিরুদ্ধে ফ্রাঙ্কো-রুশ জোট গড়ে উঠে।

ফ্রাঙ্কো-রুশ চুক্তি

ব্রিটেন এই পরিস্থিতিতে মিত্রহীন হয়ে পড়ে। এদিকে কাইজারের নৌ-নির্মাণ নীতি এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে হস্তক্ষেপ-নীতি ব্রিটেনে দারুণ আশঙ্কা সৃষ্টি করে। কাইজারের ওয়েল্ট পলিটিক বা বিশ্ব-রাজনীতিতে জার্মানীকে শ্রেষ্ঠ স্থানদানের চেষ্টা ব্রিটেনের স্বার্থের ক্ষতিকর ছিল। ব্রিটেনের কোন কোন রাজনীতিজ্ঞ যথা—চেম্বারলেইন, হলডেন, সলিসবেরী প্রভৃতি মনে করতেন যে, ব্রিটেনের জার্মানীর সঙ্গে আপস করা উচিত। এজন্যে তাঁরা কয়েকবার ইঙ্গ-জার্মানী মৈত্রী-প্রস্তাব কাইজারের কাছে করলেও, কাইজার তাতে সাড়া দেন নাই।

জার্মানীর সঙ্গে ব্রিটেনের আপোষের বৃথা চেষ্টা

এর ফলে ব্রিটেন জার্মানীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ১৯০৪ খ্রীঃ ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তির দ্বারা উভয় দেশের ঔপনিবেশিক বিরোধ মিটিয়ে ফেলা হয় এবং

জার্মানীর বিরুদ্ধে যৌথ আত্মরক্ষার জোট তৈরি হয়। ১৯০৭ খ্রীঃ ইঙ্গ-রুশ চুক্তি সম্পাদিত হলে ব্রিটেন-ফ্রান্স-রাশিয়ার ত্রিশক্তি-আঁতাত গঠিত হয়। ঐতিহাসিক ল্যাংসামের মতে, ইওরোপ ত্রিশক্তি চুক্তি ও ত্রিশক্তি আঁতাত এই দুই শিবিরে বিভক্ত হলে "ইওরোপের শান্তি যে-কোন দুর্ঘটনার দ্বারা ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়" (The peace of Europe rested on accident)।

ত্রিশক্তি আঁতাত

ইওরোপে জাতীয়তাবাদী অসন্তোষ ইওরোপকে এক বারুদের স্তূপে পরিণত করে। প্রথমতঃ, অপরিতৃপ্ত বলকান জাতীয়তাবাদ উগ্র ও আক্রমণমুখী হয়ে উঠে। বার্লিন- চুক্তির (১৮৭৮ খ্রীঃ) দ্বারা এই জাতীয়তাবাদী অসন্তোষ প্রশমনের কোন চেষ্টা করা হয় নি। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা প্রদেশ দুটি অস্ট্রিয়া আত্মসাৎ করলে, সার্ব-জাতীয়তাবাদ ক্ষিপ্ত হয়। কারণ সার্বজাতির লোক এই প্রদেশে বসবাস করত। অস্ট্রো-সার্ব বিরোধ তীব্র হলে রাশিয়া সার্বিয়ার পক্ষ নেয়, অপরদিকে দ্বিশক্তি-চুক্তি অনুযায়ী জার্মানী অস্ট্রিয়ার পক্ষ নেয়। অস্ট্রো-সার্ব বিরোধকে উপলক্ষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। দ্বিতীয়তঃ, ম্যাসিডোনিয়ার উপর অধিকার উপলক্ষে সার্বিয়া ও বুলগেরিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। যেহেতু রাশিয়া ছিল সার্বিয়ার পক্ষে, সেহেতু অস্ট্রিয়া বুলগেরিয়ার পক্ষ নেয়। বৃহৎ শক্তিগুলি বলকানজাতির দ্বন্দ্ব-মীমাংসার চেষ্টা না করে এই দ্বন্দ্ব নিজ নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে।

ইওরোপে জাতীয়তাবাদের সমস্যা

পশ্চিম ইওরোপে আহত জাতীয়তাবাদের উগ্র আত্মপ্রকাশ যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে। ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধে (১৮৭০ খ্রীঃ) ফ্রান্সের শোচনীয় পরাজয়, জার্মানসেনার আক্রমণে ফ্রান্সের জাতীয় গর্বের কেন্দ্র প্যারিস নগরীর পতন এবং ফ্রাঙ্কফুর্টের সন্ধির দ্বারা ফ্রান্সের মূল্যবান কয়লা ও লোহার খনি অঞ্চল আলসাস ও লোরেন জার্মান অধিকার ফরাসী-জাতির হৃদয়ে কাঁটার মত বিঁধে থাকে। এজন্যে ফ্রান্স যুদ্ধের দ্বারা আলসাস-লোরেনের পুনরুদ্ধার ও ১৮৭০ খ্রীঃ-এর পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হয়। ফরাসী নেতা ক্লেমাঁসু ও পয়েনকারী ল্যাটিন সভ্যতার সঙ্গে জার্মানীর টিউটনিক সভ্যতার অনিবার্য সংঘাতের কথা প্রচার করে ফরাসীজাতির হৃদয়ে প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দেন। ফ্রান্স জার্মান-বিরোধী জোট তৈরি করে যুদ্ধের পথে পা বাড়ায়।

উগ্র ফরাসী ল্যাটিন জাতীয়তাবাদ

উগ্র, আত্মম্ভরী জাতীয়তাবাদ ইওরোপে সহনশীলতা, শান্তির চেষ্টাকে দূরে সরিয়ে দেয়। আত্মম্ভরী জাতিগুলি তাদের সামরিক শক্তির জোরে সকলকে পদানত করার স্বপ্ন দেখে। ব্রিটেনের এক শ্রেণীর নেতা সাম্রাজ্যের দম্ভে সকল কিছুই তুচ্ছবোধ করেন। হোমার লী এ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেন। জার্মানীর কাইজার টিউটনিক জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও জার্মানীর সামরিক শক্তির গৌরব সর্বদা উল্লেখ করেন। এই ধরনের উগ্র জাতীয়তাবাদ এক আন্তর্জাতিক অরাজকতার সৃষ্টি করে এবং পরিণামে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়।

জাতীয় আত্মম্ভরীতাবোধ

এই পরিস্থিতিতে কয়েকটি আন্তর্জাতিক সঙ্কট ইওরোপকে দ্রুত যুদ্ধের দিকে টেনে নিয়ে যায়। ত্রিশক্তি-আঁতাত, ত্রিশক্তি-চুক্তির বিরুদ্ধে গড়া হলে ইওরোপে "সশস্ত্র শান্তির যুগ" (Age of Armed Peace) দেখা দেয়। কয়েকটি ঘটনার ফলে এই শান্তি ভেঙে যায়।

মরক্কোর সঙ্কট : মরক্কো ছিল উত্তর আফ্রিকায় অটোমান তুর্কী সুলতানের একমাত্র অবশিষ্ট সাম্রাজ্য। মরক্কোর সুলতান অটোমান সুলতানের অধীনস্থ সামন্ত হিসেবে মরক্কো শাসন করতেন। মরক্কো ছিল আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে ও ভূমধ্যসাগরের সংযোগস্থলে এক সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ফ্রান্স মরক্কো দেশটিকে তার উপনিবেশে পরিণত করার চেষ্টা চালায়।

কিন্তু কাইজারের জার্মানী মরক্কোয় হস্তক্ষেপের জন্যে ব্যস্ত হয়। ১৯০৫ খ্রীঃ কাইজার অকস্মাৎ মরক্কোর ট্যাঞ্জিয়ার বন্দরে নেমে পড়েন এবং তিনি মরক্কোর সুলতানকে ফরাসী অধিকারমুক্ত স্বাধীন সুলতানের মর্যাদাদানের চেষ্টা করেন। এই উপলক্ষে দারুণ আন্তর্জাতিক সঙ্কট দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত জার্মানীর চাপে, ফ্রান্সের জার্মান-বিরোধী মন্ত্রী ডেলক্যাসিকে পদত্যাগ করতে হয়। আলজেরিয়ার্স কংগ্রেসে (১৯০৬ খ্রীঃ) বৃহৎ শক্তিদের সম্মতিতে মরক্কো সঙ্কটের আপাততঃ সমাধান হয় যে, মরক্কোর জাতীয় ব্যাঙ্ক জার্মান রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের অংশীদার থাকবে। ফ্রান্স মরক্কোয় স্থিতাবস্থা রক্ষা করতে স্বীকৃত হয়।

মরক্কোর সঙ্কট

১৯১১ খ্রীঃ পুনরায় মরক্কো সঙ্কট তীব্র হয়। মরক্কোয় অরাজকতা দেখা দিলে মরক্কোর ফেজ (Fez) শহরে ইওরোপীয় বিশেষতঃ ফরাসী নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্যে ফরাসী সেনা ফেজ অধিকার করে। জার্মানী এই ঘটনাকে আলজেরিয়ার্স চুক্তিভঙ্গ এবং জার্মান-স্বার্থ নষ্ট করার অজুহাতে জার্মান যুদ্ধজাহাজ প্যান্থারকে মরক্কোর আগাদির বন্দরে ঢুকিয়ে দেয়। জার্মানীর এই আগ্রাসী হস্তক্ষেপ ত্রিশক্তি-আঁতাতভুক্ত দেশগুলিতে যুদ্ধং দেহি মনোভাব সৃষ্টি করে। ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী লর্ড গ্রে জার্মান রাষ্ট্রদূতকে সতর্ক করেন যে, ব্রিটেনকে অগ্রাহ্য করে মরক্কো সমস্যার সমাধান ব্রিটেন সহ্য করবে না। ব্রিটেনের লড়াকু মনোভাবের ফলে ফ্রান্সও লড়াকু মনোভাব দেখায়। শেষ পর্যন্ত মরক্কোর উপর ফরাসী নিয়ন্ত্রণ জার্মানী স্বীকার করে। বিনিময়ে ফরাসী কঙ্গোর মরু-অঞ্চলে জার্মানীকে কিছু স্থান দেওয়া হয়। মরক্কোর ঘটনার পর জার্মানীর সঙ্গে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সম্পর্কের দারুণ অবনতি হয়।

আগাদির সঙ্কট ঃ দ্বিতীয় মরক্কো সঙ্কট

ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়া বসনিয়া অধিকার করায় সার্বিয়ার সঙ্গে অস্ট্রিয়ার তীব্র বিরোধ দেখা দেয়। রুশমন্ত্রী আইজোভস্কিকে দার্দানালিস প্রণালীতে রুশ-যুদ্ধজাহাজ চলাচলের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে সাহায্য করতে অস্ট্রিয়া প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি অস্ট্রিয়া রক্ষা না করায় অস্ট্রো-রুশ সম্পর্কের দারুণ অবনতি হয়। রাশিয়া সার্বিয়াকে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সাহায্য দেয়।

অস্ট্রো-রুশ বিরোধ ঃ বলকান সমস্যা

১৯১৪ খ্রীঃ ইওরোপের অধিকাংশ শক্তি যুদ্ধ আসন্ন বুঝতে পেরে অস্ত্রসজ্জায় মন দেয়। শান্তিরক্ষার জন্যে কূটনৈতিক তৎপরতায় ভাঁটা পড়ে। এই পরিস্থিতিতে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্কডিউক ফার্দিনান্দ ও তাঁর পত্নী সোফিয়া, গ্রাভ্রিলো প্রিন্সেপ নামে এক বসনিয় ছাত্রের হাতে সেরাজেভো শহরে নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা "ব্ল্যাক হ্যান্ড" (Black Hand) নামে এক সার্বিয় সন্ত্রাসবাদী দল করে। সার্বিয়ার মন্ত্রিসভা এই পরিকল্পনার কথা জানলেও তা প্রতিহত করার চেষ্টা করেন নাই। অস্ট্রিয়া এই হত্যাকাণ্ডের জন্যে সার্বিয়াকে দায়ী করে এবং সার্বিয়াকে একটি চরমপত্র দ্বারা কয়েকটি শর্তপূরণের জন্যে দাবি জানায়। সার্বিয়া কয়েকটি শর্ত মেনে নিতে রাজী হয় এবং বাকী শর্তপূরণের জন্যে সার্বিয়া পার্লামেন্ট ডাকার জন্যে সময় প্রার্থনা করে। সার্বিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে সেরাজেভো হত্যাকাণ্ডঘটিত সঙ্কটকে বলা হয় "জুলাই সঙ্কট" (July Crisis)। আধুনিক জার্মান গবেষকদের মতে অস্ট্রিয়া হয়ত সার্বিয়ার প্রস্তাব মেনে নিত। কিন্তু কাইজার যুদ্ধের জন্যে পূর্ণ প্রস্তুতি নেন। অস্ট্রিয়া যাতে সার্বিয়ার সঙ্গে আপস না করে, এজন্য তিনি অস্ট্রিয়াকে যুদ্ধঘোষণায় বাধ্য করেন। অস্ট্রিয়া ২৮শে জুলাই, ১৯১৪ খ্রীঃ সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে। জার্মান সেনাপতি মোল্টকের পরামর্শে অস্ট্রিয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে সেনা-সন্নিবেশ আরম্ভ করে। জার্মানী রাশিয়াকে চরমপত্র দেয় যে, রুশ যুদ্ধপ্রস্তুতি রদ করতে

সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণা

হবে এবং রাশিয়াকে জবাবদানের সময় না দিয়ে ১লা আগস্ট রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জার্মানী ফ্রান্সকেও একটি চরমপত্র পাঠায় এবং বেলজিয়ামকে জার্মান সেনা যাতায়াতের পথ দিতে দাবি করে। এই দাবি প্রত্যাখ্যাত হলে সেই দেশের ভিতর দিয়ে ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে জার্মানী ৩রা আগস্ট যুদ্ধঘোষণা করে। বেলজিয়াম ও ফ্রান্স ছিল ব্রিটেনের মিত্র। সুতরাং ব্রিটেন ৪ঠা আগস্ট জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্যে কাইজারের জার্মানীর দায়িত্ব (Responsibility of Kaiser's Germany for the outbreak of the World War I) : আঁতাত ঐতিহাসিকেরা কাইজারের জার্মানীকে বিশেষভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্যে দায়ী করেন। তাঁরা বলেন যে—(১) কাইজার ওয়েল্ট-পলিটিক বা বিশ্ব-রাজনীতিতে জার্মানীর প্রাধান্য স্থাপনের জন্যে বিসমার্কের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং শান্তিপূর্ণ মিত্রজোট ও শক্তিসাম্য নীতি বর্জন করেন। তিনি উগ্র এবং আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করেন। (২) তিনি রাশিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ-চুক্তি বা রি-ইন্সুর‍্যান্স চুক্তি নাকচ করায় রাশিয়া বুঝে নেয় যে, কাইজার অস্ট্রিয়াকেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে সমর্থন করতে চান। সুতরাং রাশিয়া বাধ্য হয়ে ১৮৯৪ খ্রীঃ ফ্রান্সের সঙ্গে পাল্টা জোট গড়ে। (৩) কাইজার ইংলন্ডের উপনিবেশে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করেন এবং বুয়ার যুদ্ধে বুয়ারদের সাহায্যদানের চেষ্টা করেন। তিনি মরক্কোয় ঢোকার চেষ্টা করলে ফ্রান্সের সঙ্গে তীব্র বিরোধ দেখা দেয়। (৪) কাইজার বলকান রাজনীতিতে অস্ট্রিয়ার আগ্রাসনকে সমর্থন করেন। জার্মানীর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল যে, বলকানে অস্ট্রিয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে রাজ্যবিস্তারে সফল হলে জার্মানীরই লাভ হবে। সুতরাং তিনি অস্ট্রিয়াকে সংযত না করে আরও বেশী আগ্রাসনে উৎসাহ দেন। সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণায় অস্ট্রিয়াকে প্ররোচনা দেওয়া হয়। ফলে সেরাজেভোর হত্যাকান্ডকে উপলক্ষ করে অস্ট্রিয়া চরমপত্র পাঠায়। ইম্যানুয়েল জাইস (Immuanuel Geis) প্রভৃতি ঐতিহাসিকের মতে সেরাজেভোর হত্যাকান্ডঘটিত সমস্যাকে অস্ট্রিয়া হয়ত আপসে মিটিয়ে নিত, কিন্তু কাইজার সরকার এই সঙ্কট বা জুলাই-সঙ্কট উপলক্ষ করে অস্ট্রিয়াকে যুদ্ধে নেমে পড়ার জন্যে চাপ দেন। জার্মানীও অস্ট্রিয়ার সহযোগী হিসাবে যুদ্ধের জন্যে পূর্ণ প্রস্তুতি নেয়। অস্ট্রিয়ার দ্বারা আক্রান্ত সার্বিয়ার পক্ষ রাশিয়া নিলে জার্মানী রাশিয়ার কাছে চরমপত্র পাঠায়। জার্মান সেনাপতি মোল্টকি আগুয়ান হয়ে রাশিয়া ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্মানসেনা সন্নিবেশ করায় আলাপ-আলোচনার দ্বারা মীমাংসার পথ বন্ধ হয়ে যায়।

সকল কথা বলা হলেও একথা বলা দরকার যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্যে একা কাইজারের জার্মানী দায়ী ছিল না। জার্মান জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের মতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্যে একতরফাভাবে ইঙ্গ-ফরাসী আঁতাত ঐতিহাসিকরা কাইজার সরকারের উপর দোষারোপ করেন। নিরপেক্ষ জার্মান ঐতিহাসিক ইম্যানুয়েল জাইসের মতে ১৮৯০-৯৫ খ্রীঃ পর্যন্ত কাইজার পুরোপুরি বিসমার্কের নীতি বর্জন করেন নি। এই পর্যায়ে তিনি Indecision বা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন। (২) ১৮৯৫ খ্রীঃ থেকে জার্মান বণিকগোষ্ঠী এবং যুদ্ধবাজ সেনাপতিরা তাঁর উপর ওয়েল্ট পলিটিক বা বিশ্ব-রাজনীতি ও উপনিবেশ দখল-নীতিগ্রহণের জন্য চাপ দেন। জার্মান মন্ত্রী ক্যাপ্রিভি ওয়েল্ট পলিটিক বা উপনিবেশ-নীতির পরিবর্তে মিটেল ইওরোপ বা পূর্ব ইওরোপে জার্মানীর বিস্তারনীতির প্রস্তাব দেন। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। (৩) কাইজার ছিলেন আসলে বেশ দুর্বল লোক। তিনি বাইরে কঠোরতা দেখালেও তাঁর মানসিক দৃঢ়তা ছিল কম।

তাঁর একটি হাত বিকল ছিল। এজন্য তিনি হীনমন্যতায় ভুগতেন। মুখে বড়বড় কথা বলে তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব জাহির করার চেষ্টা করতেন। সুতরাং জার্মানীর আগ্রাসী গোষ্ঠীর কাছে তিনি শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করেন। (৪) কাইজারের প্রধান কূটনৈতিক ত্রুটি ছিল যে, তিনি সর্বদা যুদ্ধং দেহি ভঙ্গীতে কথা বলতেন। তিনি তাঁর অলঙ্কারবহুল বাক্যের দ্বারা ইওরোপের প্রধান দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটান। বিসমার্কের মিষ্ট অথচ দৃঢ় যুক্তিপূর্ণ বাক্য তিনি ব্যবহারে অক্ষম ছিলেন। (৫) ১৮৯৬ খ্রীঃ থেকে জার্মান-পররাষ্ট্রনীতি ওয়েল্ট পলিটিক বা উপনিবেশ গ্রাসনীতি দ্বারা সূচিত হয়। (৬) এই ওয়েল্ট পলিটিক নীতি গ্রহণের পশ্চাতে জার্মানীর শিল্পে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের সমস্যা ছিল। এই বাড়তি মাল বিক্রির জন্যে জার্মানীর উপনিবেশ বা বাজার দখলের চাহিদা দেখা দেয়।

অন্যান্য শক্তির দায়িত্ব

কেবলমাত্র কাইজার তাঁর আগ্রাসী নীতির দ্বারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটান নাই। ইংলন্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলিও জঙ্গী জাতীয়তাবাদে প্রভাবিত হয়। (২) ত্রিশক্তি-আঁতাতের সামরিক শক্তি জার্মানীর ত্রিশক্তি-চুক্তি অপেক্ষা বেশী ছিল। এই প্রবল শক্তির দ্বারা আঁতাত-রাষ্ট্রগুলি জার্মানীকে বেষ্টন করার উপক্রম করে। (৩) ত্রিশক্তি-চুক্তির প্রধান অস্ট্রিয়া বলকানে নিজ খুশিমত কাজ করত। যুদ্ধের প্রথম দিকে অস্ট্রিয়ার উপর জার্মানীর নিয়ন্ত্রণ ছিল না। সুতরাং অস্ট্রিয়ার কাজের জন্যে জার্মানী দায়ী নয়। (৪) রুশমন্ত্রী আইজোভস্কি মনে করতেন যে, বড় রকমের যুদ্ধ বাধলে দার্দানালিস প্রণালী রুশ-যুদ্ধজাহাজের জন্যে খোলা যাবে। (৫) সার্বিয়াকে উগ্র নীতি গ্রহণে রাশিয়া প্ররোচনা দেয়। (৬) ব্রিটেন যুদ্ধের সম্ভাবনা বন্ধ করার জন্যে তার প্রভাব বিস্তার না করে অস্ত্রবৃদ্ধিতে মন দেয়। এই সকল কারণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গতি (The Course of the World War I) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল এক সর্বাত্মক যুদ্ধ। এই যুদ্ধ ১৯১৭ খ্রীঃ পর্যন্ত জার্মানীর পশ্চিম সীমান্তে ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও পূর্ব সীমান্তে রাশিয়ার সঙ্গে চলে। পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানী প্রথম দিকে বেলজিয়াম দখল করে প্যারিসের ১৫ মাইলের মধ্যে এসে যায়। কিন্তু ফরাসী ও ইংরাজদের পাল্টা আঘাতে মার্নে, সোমের যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় হয়। কিন্তু জার্মান সেনাপতি হিন্ডেনবুর্গ পুনরায় বেলজিয়ামের কিছু অংশ দখল করেন। পূর্ব সীমান্তে রাশিয়া টৌনেনবার্গের যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে পিছু হঠে। জার্মান সেনাপতি কার্ল লুডেনডর্ফ ইউক্রেন, ক্রিমিয়া দখল করেন। ১৯১৭ খ্রীঃ রুশ-বিপ্লবে জার সরকারের পতন হলে রুশ কমিউনিস্ট সরকার জার্মানীর সঙ্গে ব্রেস্টলিটভস্কের সন্ধি স্বাক্ষর করেন। পূর্ব-রণাঙ্গনে যুদ্ধ বন্ধ হয়।

পশ্চিম ও পূর্ব রণাঙ্গনের যুদ্ধ

পূর্ব-রণাঙ্গনের জার্মানসেনা পশ্চিম-রণাঙ্গনের যুদ্ধে যোগ দিলে জার্মানী প্রবল শক্তিতে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম আক্রমণ করে। যুদ্ধের এই সঙ্কটকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিত্রশক্তির পক্ষে যোগ দিলে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়। জার্মানীর ভিতর এক অভ্যুত্থানের ফলে কাইজারের পতন হয়। ১৯১৮ খ্রীঃ জার্মানী মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে।

জার্মানীর পতন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমুদ্রপথেও ঘোরতরভাবে চলে। জাটল্যান্ডের নৌযুদ্ধ প্রসিদ্ধি লাভ করে। জার্মান সাবমেরিণের আক্রমণে মিত্রশক্তির বহু জাহাজ নষ্ট হয়। শেষ পর্যন্ত মিত্রশক্তির নৌ-সেনাপতিদের রণকৌশলে জার্মান নৌ-বহর ধ্বংস হয়।

ইওরোপের বাইরে মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যেও প্রথম মহাযুদ্ধ ছড়ায়। জার্মানীর মিত্র তুরস্কের

বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনী মেসোপটেমিয়ায় এবং গ্যালিপোলিতে বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করে। দূরপ্রাচ্যে জাপান চীনে অবস্থিত জার্মান উপনিবেশ শাং-টুং ও ওয়াই-হ্যা-ওয়ে দখল করে। জার্মান আকাশযান জেপলিন আকাশপথে শত্রুকে আক্রমণ করে আকাশযুদ্ধের সূচনা করে।

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের কারণ (Causes of Germany's defeat in the World War I) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে জার্মানী বিস্ময়কর সফলতা লাভ করে। জার্মানীর কারিগরী বিদ্যার উৎকর্ষ এবং নূতন ধরনের মারণাস্ত্রের ক্ষমতা বিশ্ববাসীকে চমকিত করে। কিন্তু জার্মানী শেষ পর্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। প্রথমতঃ, সামরিক শক্তির দিক হতে ত্রিশক্তি-আঁতাতের তুলনায় জার্মানী ও তার মিত্রশক্তিগুলির ক্ষমতা দুর্বল ছিল। লোকবল, অর্থবল, সম্পদ প্রভৃতি ছিল আঁতাত-শক্তির অনেক বেশী। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জার্মানীর শক্তিক্ষয় হলে জার্মানী হীনবল হয়। ১৯১৮ খ্রীঃ মার্চ মাসে জার্মান সেনাপতি লুডেনডর্ফের পরিচালনায় জার্মানী ফরাসী বেলজিয়াম সীমান্তে শেষ আঘাত হানে। মার্ণের যুদ্ধে জার্মানী এক সপ্তাহে ২২৫,০০০ সেনা বন্দী করে ও প্রচুর রসদপত্র দখল করে। জার্মান সেনাদল মার্ণে যুদ্ধের পর হীনবল হয়ে পড়ায় এই যুদ্ধে জয়লাভ সত্ত্বেও তারা আর আগাতে সক্ষম হয় নি। ইতিমধ্যে মার্কিন সেনা ফ্রান্সে নামায় মিত্রশক্তির ক্ষতিপূরণ হয় এবং শক্তি বাড়ে। দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিলে জার্মানীর পরাজয় সুনিশ্চিত হয়। কারণ মার্কিন দেশের হাতে ছিল প্রচুর অস্ত্র, লোকবল এবং শিল্পসম্পদ। সুতরাং জার্মানীর পক্ষে আর আঁটিয়া উঠা সম্ভব ছিল না। তৃতীয়তঃ, জার্মানীর সাম্রাজ্য না থাকায় দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালানো জার্মানীর পক্ষে কঠিন ছিল। কারণ মিত্রশক্তি সাম্রাজ্য থেকে রসদপত্র, লোকবল, অর্থ যোগাড় করে যুদ্ধ চালায়। জার্মানীর সে সুযোগ ছিল না। চতুর্থতঃ, জার্মানীর নৌ-শক্তির দুর্বলতাবশতঃ জার্মানীর পরাজয় ঘটে। সাবমেরিণ বা ইউবোটের দ্বারা মিত্রশক্তির জাহাজগুলি ধ্বংস করার চেষ্টা করলে, মিত্রশক্তি ইউবোট প্রতিরোধকারী অস্ত্র আবিষ্কার করায় ইউবোটের ধ্বংসকারিতা-শক্তি কমে যায়। ইঙ্গ-মার্কিন নৌশক্তি জার্মানীকে অবরোধ করায় জার্মানীর সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়। মিত্রশক্তির নৌবাহিনীর অবরোধ ধীরে ধীরে জার্মানীকে নিঃশেষ করে দেয়। পঞ্চমতঃ, জার্মানীর defence of depth বা আত্মরক্ষার জন্যে যথেষ্ট জায়গা ছিল না। রাশিয়ার মত বিশাল ভূভাগ না থাকায় জার্মানীর পিছিয়ে যুদ্ধ করার জায়গা ছিল না। ষষ্ঠতঃ, জার্মানী কূটনীতির দ্বারা মিত্রশক্তির মধ্যে ভেদ ঘটাতে পারে নি। মিত্রশক্তি কূটনীতির দ্বারা জার্মানীর পক্ষ থেকে ইতালীকে নিজপক্ষে নেয় এবং মার্কিন দেশকে মিত্র হিসাবে পায়। সর্বশেষে জার্মানীর মিত্রশক্তির মধ্যে বুলগেরিয়া সর্বাগ্রে ভেঙ্গে পড়ে। পরে অস্ট্রিয়া ভেঙ্গে পড়ায়, যুদ্ধের সকল দায়িত্ব জার্মানীর উপর বর্তায়। জার্মানীর পক্ষে এই চাপ একক বহন করা সম্ভব ছিল না।

[খ] পঞ্চম পরিচ্ছেদ : প্যারিসের শান্তিসম্মেলন (The Peace Congress of Paris) : জার্মানীর পতন আসন্ন হলে মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসন জার্মানীর সঙ্গে প্রস্তাবিত সন্ধির শর্ত এবং ইওরোপের পুনর্গঠনের পরিকল্পনা রূপে চৌদ্দ দফা শর্ত (Fourteen Points) ৮ই জানুয়ারী, ১৯১৮ খ্রীঃ ঘোষণা করেন। এই চৌদ্দ দফার মধ্যে ছিল প্রধান কয়েকটি শর্ত, যথা (১) খোলাখুলি আলোচনার পর সন্ধি হবে। কোন গোপন চুক্তি গ্রহণ করা হবে না। (২) মহাসমুদ্রে নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ যুদ্ধের সময় অবাধ চলাচলের অধিকার পাবে। (৩) খোলা দ্বার নীতি মান্য করতে হবে। (৪) ঔপনিবেশিক সমস্যার পক্ষপাতহীন

সমাধান করা হবে। (৫) ফ্রান্সের অধিকৃত স্থান জার্মানী ফিরিয়ে দিবে। (৬) হ্যাপস্‌বার্গ ও তুর্কী সাম্রাজ্য "এক জাতি এক রাষ্ট্র" নীতি অনুসারে পুনর্গঠিত হবে। (৭) স্বাধীন, সার্বভৌম পোল্যাণ্ড গঠন করা হবে। (৮) লীগ অফ নেশনস স্থাপন করা হবে ইত্যাদি। কিন্তু শান্তিচুক্তি রচনার সময় ১৪ দফা শর্তের সকল শর্ত অন্য বিজয়ী শক্তিগুলি গ্রহণ না করায় মার্কিন রাষ্ট্রপতি আপসনীতি গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে জার্মানী ও তার মিত্রবর্গ আত্মসমর্পণ করে। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে একটি শান্তি-সম্মেলন ডেকে পরাজিত জার্মানী ও তার মিত্রশক্তিগুলির সঙ্গে সন্ধির শর্ত স্থির করা হয়। এই সম্মেলনে শান্তিচুক্তি-রচনায় মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসন, ফরাসী প্রধানমন্ত্রী ক্লেমাঁসু এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ ছিলেন প্রধান স্তম্ভ। ইতালীর প্রধানমন্ত্রী অরল্যাণ্ডো এই শান্তি-সম্মেলনে যোগ দিলেও ইতালীর স্বার্থ এই সম্মেলনে উপেক্ষিত হলে তিনি বিরক্ত হয়ে সম্মেলন পরিত্যাগ করেন। সুতরাং বলা হয় যে, প্যারিসের শান্তিচুক্তি বিশেষতঃ ভার্সাইয়ের সন্ধি ছিল "উইলসনের আদর্শবাদ, ক্লেমাঁসুর বাস্তবতাবাদ ও লয়েড জর্জের সুবিধাবাদের ফসল।"

▶ প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে জার্মানী ও তার মিত্রবর্গের সঙ্গে নিম্নলিখিত সন্ধিগুলি স্বাক্ষর করা হয়, যথা—(১) জার্মানীর সঙ্গে ভার্সাইয়ের সন্ধি (Treaty of Versailles) ; (২) অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সেন্ট জার্মেইন এন লাইয়ের সন্ধি (Treaty of St. Germain En. Lye) ; (৩) বুলগেরিয়ার সঙ্গে নিউলির সন্ধি (Treaty of Neulley ; (৪) হাঙ্গেরীর সঙ্গে ট্রিয়াননের সন্ধি (Treaty of Trianon) ; (৫) তুরস্কের সঙ্গে সেভরের সন্ধি (Treaty of Sevres) ; এবং পরে সেভরের চুক্তির বদলে ল্যাসেনের সন্ধি (Treaty of Lausanne), ১৯২৩ খ্রীঃ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ ভার্সাইয়ের সন্ধি, ১৯১৯ খ্রীঃ (Treaty of Versailles, 1919) ঃ প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে বিজয়ী মিত্রশক্তিবর্গ পরাজিত জার্মানীর সঙ্গে ভার্সাইয়ের সন্ধি স্বাক্ষর করে। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষদিকে কাইজারের বিরুদ্ধে এক প্রজাতন্ত্রী অভ্যুত্থান ঘটে এবং কাইজারের পতন হয়। প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে সন্ধির শর্ত আলোচনার জন্যে জার্মান প্রজাতন্ত্র প্যারিসে একটি প্রতিনিধিদল পাঠায়। বিজয়ী মিত্রশক্তিই ভার্সাই-সন্ধির খসড়া তৈরি করে এবং জার্মান প্রতিনিধিদের একবার মাত্র খসড়া দেখিয়ে তাদের আপত্তিগুলি জানাতে বলা হয়। জার্মান প্রতিনিধিদল এই খসড়ার বিরুদ্ধে ৪৪৩ পৃঃ ব্যাপী এক আপত্তিপত্র জমা দেয়। সেই আপত্তিগুলির সম্পর্কে কোন আলোচনা বা বিচার না করে সরাসরি নাকচ করা হয়। জার্মান প্রতিনিধিদলকে জার্মানীর উপর বিমান-আক্রমণের হুমকি দিয়ে সন্ধিস্বাক্ষরে বাধ্য করা হয়। বিজয়ী মিত্রশক্তি একতরফাভাবে জার্মানীকে যুদ্ধ-অপরাধী ঘোষণা করেন। অপরাধী জার্মানীর প্রতীক হিসাবে প্যারিসে জার্মান প্রতিনিধিদলকে কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে বাস করতে দেওয়া হয়। আরও নানাপ্রকার অসম্মান করা হয়।[১] সন্ধিস্বাক্ষরের পর প্রতিনিধিদলের নেতা মিত্রশক্তিকে সতর্ক করে বলেন যে, "জার্মানী এই অসম্মান সহ্য করবে না।"

জার্মান প্রতিনিধিদলকে সন্ধির শর্ত আলোচনায় বাধাদান ঃ জার্মানীকে যুদ্ধ অপরাধী ঘোষণা

ভার্সাই-সন্ধির শর্তগুলিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) ভৌগোলিক শর্তাবলী ঃ (১) জার্মানী তার পশ্চিম সীমান্তে আলসাস ও লোরেন ফ্রান্সকে ফিরিয়ে দেয়। (এই স্থান ১৮৭০-৭১ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের দ্বারা জার্মানী দখল করেছিল।) (২) সার (Saar) উপত্যকা জার্মানী ১৫ বছরের জন্যে ফ্রান্সকে ছেড়ে দেয়। ১৫ বছর পরে গণভোটে এই স্থানের ভাগ্যনির্ণয়ের ব্যবস্থা হয়। (৩) জার্মানী তার পশ্চিম সীমান্তে বেলজিয়ামকে ইউপেন, ম্যালমেডি

ও মরিসনেট জেলা ছেড়ে দেয়। (৪) উত্তর সীমান্তে জার্মানী শ্লেজভিগ প্রদেশ ডেনমার্ককে ফিরিয়ে দেয়। (১৮৩৪ খ্রীঃ ড্যানিশ যুদ্ধের পর জার্মানী এই প্রদেশ দখল করে।) (৫) মেমেল বন্দর লিথুয়ানিয়াকে জার্মানী ছেড়ে দেয়। (৬) জার্মানীর পূর্ব সীমান্তে পোল্যান্ড স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র হিসাবে গঠিত হয়। (৭) জার্মানীর পোজেন ও পশ্চিম প্রাশিয়া গণভোটের দ্বারা পোল্যান্ডের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। (৮) জার্মানীর ভিতর দিয়ে পোল্যান্ডকে সমুদ্রের সঙ্গে সংযোগের জন্যে রাস্তা দেওয়া হয়। এই রাস্তার নাম হয় পোলিশ করিডর। (৯) জার্মানীর ডানজিগ বন্দরকে উন্মুক্ত বন্দর হিসাবে ঘোষণা করে কার্যতঃ এই বন্দরে পোল্যান্ডকে অধিকার দেওয়া হয়। (১০) জার্মানীর পূর্ব সীমান্তে সাইলেশিয়া প্রদেশকে ব্যবচ্ছেদ করে একাংশ চেকোশ্লোভাকিয়াকে, অপরাংশ পোল্যান্ডকে, বাকী অংশ জার্মানীকে দেওয়া হয়। (১১) জার্মানীর উপনিবেশগুলি যা চীন ও আফ্রিকায় অবস্থিত ছিল, তা লীগের হাতে দেওয়া হয়। লীগ এই উপনিবেশগুলি ম্যান্ডেট হিসাবে ইংলন্ড ও ফ্রান্সকে ছেড়ে দেয়।

ভৌগোলিক শর্তাবলী

(খ) সামরিক শর্তাবলী ঃ (১) জার্মানীকে যুদ্ধ অপরাধী ঘোষণা করে জার্মানীর স্থল, জল ও বিমানবাহিনী ভেঙে দেওয়া হয়। (২) ভবিষ্যতে জার্মানীর কোন সামরিক সংগঠন করা নিষিদ্ধ হয়। (৩) জার্মান সেনাপতিমন্ডলীকে পদচ্যুত করা হয়। (৪) জার্মানীতে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষাদান নিষিদ্ধ করা হয়। (৫) জার্মানীতে সমরাস্ত্র নির্মাণ নিষিদ্ধ করা হয়। (৬) রাইন নদীর পূর্বতীর হতে জার্মানসেনা অপসারণ করে এই এলাকাকে অসামরিক অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

সামরিক শর্তাবলী

(গ) অর্থনৈতিক শর্ত হিসাবে জার্মানীকে যুদ্ধের জন্যে দায়ী ঘোষণা করে জার্মানীকে এক বিরাট অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতে বলা হয়। শেষ পর্যন্ত এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৬,০০০০০০০০ পাউন্ড। ক্ষতিপূরণ বাবদ জার্মানী ফ্রান্স ও ইতালীকে কয়লা সরবরাহ করতে বাধ্য হয়। জার্মানীর নদী বিশেষতঃ রাইন নদীকে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ভার্সাই-সন্ধির ২৩১নং ধারা অনুসারে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম এবং তাঁর সভাসদ ও সেনাপতিদের যুদ্ধ-অপরাধী ঘোষণা করে বিচারের জন্যে মিত্রশক্তির হাতে ছেড়ে দিতে বলা হয়। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্যে লীগ অফ্ নেশনস বা জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার কথাও ভার্সাই-সন্ধিতে বলা হয়।

অর্থনৈতিক ও অন্যান্য শর্তাবলী

ভার্সাই-সন্ধির মত বিতর্কিত সন্ধি আধুনিক যুগের ইতিহাসে খুব কম দেখা যায়। জার্মান ঐতিহাসিকেরা ভার্সাই-সন্ধিকে একটি "একতরফা, জবরদস্তি সন্ধি" এবং "একটি ম্যাকিয়াভেলিয় সন্ধি" বলে নিন্দা করেন। তাঁদের মতে এই সন্ধির পশ্চাতে মিত্রশক্তির প্রতিহিংসামূলক মনোভাব কাজ করে। এই সন্ধিরচনার সময় জার্মানীকে তার মতামত প্রকাশের কোন সুযোগ না দেওয়ায় এবং দুই পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সন্ধি রচিত না হওয়ায় এই সন্ধির কোন নৈতিক ভিত্তি ছিল না। এই সন্ধি একতরফাভাবে জার্মানীর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই সন্ধিপালনে জার্মানীর কোন নৈতিক বাধ্যবাধকতা ছিল না। জার্মানরা এই সন্ধিকে চাপিয়ে-দেওয়া সন্ধি (Dictated Peace) বলে অভিহিত করে।

ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে জার্মানীর সমালোচনা

জার্মানদের মতে ভার্সাই-সন্ধির শর্তগুলির পশ্চাতে একুইটি (Equity) বা ন্যায়বিচার নীতি প্রযুক্ত হয় নাই। জার্মানীর মত এক বৃহৎ দেশকে বেলজিয়ামের সমান অস্ত্র রাখার নির্দেশ দিয়ে সন্ধিকর্তারা জার্মানীর প্রতি ঘোর অবিচার করেন। অন্যান্য দেশের অস্ত্র হ্রাস না করে কেবল মাত্র

জার্মানীর অস্ত্র হ্রাস করা ছিল ঘোর বৈষম্যমূলক নীতি। ইংলন্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের উপনিবেশ হ্রাস না করে কেবলমাত্র জার্মানীর উপনিবেশ লোপ ছিল বৈষম্যমূলক কাজ। সর্বোপরি, জার্মান জাতীয়তাবাদকে উপেক্ষা করে জার্মানজাতির বসবাসযুক্ত অঞ্চলগুলিকে জার্মানী থেকে বিচ্ছিন্ন করে, প্রতিবেশী অ-জার্মান রাজ্যগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। উইলসন তাঁর চতুর্দশ নীতিতে সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথা বললেও জার্মানীকে সেই অধিকারে বঞ্চিত করা হয়। জার্মানী থেকে পশ্চিম প্রাশিয়া ও সাইলেশিয়ার অঞ্চলগুলি বিচ্ছিন্ন করায় জার্মানী ঘোর অসন্তুষ্ট হয়।

একুইটি বা ন্যায়বিচারের অভাব এবং বৈষম্যমূলক নীতি : চতুর্দশ নীতির অপলাপ

ভার্সাই-সন্ধির অর্থনৈতিক শর্তগুলি ছিল একুইটি (Equity) বা ন্যায়নীতি-বিরোধী। উইলসনের চতুর্দশ নীতিতে ক্ষতিপূরণের কোন শর্ত ছিল না। জার্মানী এই চতুর্দশ নীতির ভিত্তিতেই অস্ত্র সমর্পণ করে। সুতরাং চতুর্দশ নীতি অগ্রাহ্য করে বিরাট অঙ্কের ক্ষতিপূরণের দাবি ছিল একপ্রকার বিশ্বাসঘাতকতা। তা ছাড়া বিশ্বযুদ্ধের জন্যে জার্মানী একা দায়ী ছিল না। অথচ জার্মানীকেই যুদ্ধ-অপরাধী ঘোষণা করে ক্ষতিপূরণ দিতে বলা হয়। পরাজিত ও দুর্দশাগ্রস্ত জার্মানীর পক্ষে এই ক্ষতিপূরণ প্রদান ছিল অসম্ভব। জার্মানীর উপনিবেশ, নদীপথ প্রভৃতি দখল করে নিয়ে জার্মানীকে ক্ষতিপূরণ দিতে বলার অর্থ ছিল, "হংসীকে উপবাসী রেখে তার কাছে সোনার ডিম আশা করার" মতই নীতিহীন কাজ। ই· এইচ· কারের মতে, "জার্মানরা উপরোক্ত যুক্তি দেখিয়ে বলেন যে, ভার্সাই-সন্ধি ছিল একটি অন্যায় সন্ধি। এই সন্ধির পশ্চাতে কোন ন্যায়নীতি ছিল না।"

গ্যাথর্ন হার্ডি প্রভৃতি ঐতিহাসিক ভার্সাই-সন্ধির সমর্থনে বলেন যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চিরাচরিত প্রথা হল, যে দেশ জয়লাভ করে, সেই দেশ পরাজিত শক্তির উপর সন্ধি চাপিয়ে দেয়। জার্মানী যদি যুদ্ধে জয়লাভ করত, জার্মানীও তাই করত। সুতরাং, ভার্সাই-সন্ধির বিরুদ্ধে জার্মানীর অভিযোগের নায্যতা নেই। ভার্সাই-সন্ধির দ্বারা মোটামুটিভাবে জার্মানীর স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা হয়। সীমান্তে সামান্য কিছু স্থান জার্মানী থেকে হস্তান্তরিত হয় মাত্র। জার্মানী জয়লাভ করলে ক্ষতিপূরণের দাবি করত। পরাজিত হয়ে ক্ষতিপূরণের বিরোধিতা জার্মানী করছে। পরাজিত রাশিয়ার কাছ থেকে ব্রেস্টলিস্টভস্কের সন্ধিতে জার্মানী ক্ষতিপূরণ নেয়। সুতরাং ক্ষতিপূরণের দাবির বিরুদ্ধে কথা বলার নৈতিক অধিকার জার্মানীর নেই। তাছাড়া চতুর্দশ নীতি ঘোষণার পর মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্ষতিপূরণের শর্ত জুড়ে দেন।

ভার্সাই সন্ধির স্বপক্ষে যুক্তি

ভার্সাই-সন্ধির আসল ত্রুটি এই ছিল যে, সন্ধিরচনায় সোভিয়েত রাশিয়া ও জার্মানীর মতামত প্রকাশের কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। ফলে সোভিয়েত রাশিয়া এই সন্ধি সম্পর্কে তীব্র আপত্তি জানায়। জার্মানীও এই সন্ধিকে 'একতরফা, জবরদস্তি সন্ধি' বলে মনে করত। ১৯৩৮—৩৯ খ্রীঃ এই দুই শক্তি একযোগে ভার্সাই-সন্ধিকে তছনছ করে দেয়। ভার্সাই সন্ধি রচনার সময় সন্ধিকর্তারা আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলিকে ভালভাবে বিচার না করে অহেতুক দ্রুততার সঙ্গে কাজ সমাধা করার চেষ্টা করেন। এর ফলে সন্ধির শর্তগুলিতে অনেক অসঙ্গতি ও জটিলতা দেখা দেয়। বহুসংখ্যক জার্মান পিতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রতিবেশী রাজ্য পোল্যান্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার অন্তর্ভুক্ত হলে দারুণ গোলমাল দেখা দেয়। এরা জার্মান সংখ্যালঘু সমস্যা সৃষ্টি করে। পরবর্তী কালে নাৎসী নেতা হিটলার এর পূর্ণ সুযোগ নেন এবং ভার্সাই-সন্ধি ভেঙ্গে ফেলেন। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসনের মতে, ভার্সাই-সন্ধি রচনার সময় মিত্রশক্তি জার্মানীর প্রতি কঠোর মনোভাব

ভার্সাই সন্ধির বিফলতার কারণ

দেখালেও পরবর্তী কালে এই সন্ধি রক্ষার সময় দুর্বলতা দেখান। (Harsh in wrong place and lenient in wrong ways.) বিশেষতঃ ব্রিটেন পরবর্তী সময় ভার্সাই-সন্ধি রক্ষায় অবহেলা দেখায়। ফলে জার্মানী এই সন্ধি অগ্রাহ্য করতে সাহস পায়। তা ছাড়া ভার্সাই-সন্ধি রচনার সময় ইওরোপের শক্তিসাম্য রক্ষার জন্যে কোন মজবুত ব্যবস্থা হয় নাই। এক জাতি, এক রাষ্ট্রনীতি অনুযায়ী পূর্ব ইওরোপে অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গড়া হয়। কিন্তু এই রাষ্ট্রগুলির আত্মরক্ষার কোন ক্ষমতা ছিল না। পরে নাৎসী জার্মানী ও সোভিয়েত রাশিয়া এই রাজ্যগুলিকে গ্রাস করার চেষ্টা করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। জার্মানীর অসন্তোষ ও শক্তিসাম্য-নীতির সুষ্ঠু প্রয়োগের অভাবে ভার্সাইয়ের সন্ধি ভেঙে যায়। এজন্যে বলা হয়েছে ভার্সাই-সন্ধির মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ অন্যান্য শান্তি-চুক্তিসমূহ (Other Peace Treaties) ঃ (১) অস্ট্রিয়ার সহিত সেন্ট জার্মেইন এন লাইয়ের সন্ধির দ্বারা—(ক) হ্যাপ্‌সবার্গ সাম্রাজ্যের ব্যবচ্ছেদ করা হয়। এই সাম্রাজ্য ভেঙ্গে হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া গঠিত হয়। (খ) অস্ট্রিয়া একটি স্বাধীন, সার্বভৌম জার্মানরাষ্ট্রে পরিণত হয়। (গ) টাইরল, ডালমাশিয়া, ট্রিয়েস্ট প্রভৃতি স্থান ইতালীকে অস্ট্রিয়া ছেড়ে দেয়। (ঘ) বসনিয়া, হার্জেগোভিনা যুগোশ্লাভিয়াকে; বুকোভিনা রুমানিয়াকে; গ্যালিসিয়া পোল্যান্ডকে অস্ট্রিয়া ছেড়ে দেয়।

(২) বুলগেরিয়ার সহিত নিউলির সন্ধির দ্বারা বুলগেরিয়া, ম্যাসিডোনিয়া প্রদেশ যুগোশ্লাভিয়াকে; পশ্চিম থ্রেস গ্রীসকে ঃ দ্রোব্রুজা রুমানিয়াকে ছেড়ে দেয়।

(৩) ট্রিয়াননের সন্ধির দ্বারা হাঙ্গেরী, শ্লোভাকিয়া প্রদেশ চেকোশ্লোভাকিয়াকে; ট্রানসিলভ্যানিয়া রুমানিয়াকে; ক্রোশিয়া যুগোশ্লাভিয়াকে ছেড়ে দেয়।

(৪) তুরস্কের সহিত ১৯১৮ খ্রীঃ সেভরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। পরে তুর্কী জাতীয়তাবাদী নেতারা এই সন্ধি মানতে অস্বীকার করলে ১৯২৩ খ্রীঃ ল্যসেনের দ্বারা সন্ধির—(ক) তুরস্কের তুর্কীভাষী অঞ্চলের উপর তুরস্কের সার্বভৌম অধিকার স্বীকৃত হয়। (খ) কনস্টান্টিনোপল, স্মার্না, পূর্ব থ্রেস তুরস্কের সঙ্গে যুক্ত হয়। (গ) তুরস্কের আরব সাম্রাজ্য যথা জর্ডান, প্যালেস্টাইন, ইরাক, সিরিয়া ইঙ্গ-ফরাসী ম্যান্ডেটের অধীনে স্থাপিত হয়। (ঘ) হেজ্জাজ স্বাধীন আরব রাজ্যে পরিণত হয়। (ঙ) দার্দানালিস প্রণালী ও বস্‌ফোরাস উপসাগরকে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা ঃ জাতিসংঘের লক্ষ্য (The League of Nations—its aims) ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল একটি সর্বাত্মক যুদ্ধ। এই যুদ্ধে সম্পত্তির সীমাহীন ক্ষয়-ক্ষতি, অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি এবং যুদ্ধের ফলে সামাজিক ভাঙন, নৈতিক অবক্ষয় ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনে যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে ভাবনার উদ্রেক করে। অস্ত্রের ও সেনাবলের সাহায্যে যুদ্ধে জয়লাভ দ্বারা প্রকৃত শান্তি ও স্থিতি আসবে না, ঘন ঘন যুদ্ধের বিভীষিকা মানবজাতিকে আতঙ্কিত করবে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে। সুতরাং চিন্তাশীল লোকেরা মনে করেন যে, আন্তর্জাতিক বিরোধ যদি শান্তিপূর্ণ উপায়ে মিটিয়ে ফেলার এবং যুদ্ধকে বে-আইনী ঘোষণা করার উপায় না স্থির করা যায় তবে বারবার সর্বনাশা যুদ্ধ মানবজাতিকে গ্রাস করবে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন এজন্যে তাঁর চতুর্দশ নীতিতে বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্যে জাতিসঙ্ঘ বা লীগ অব্ নেশনস প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট উইলসনের বিশেষ উদ্যোগে প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে লীগ কভেন্যান্ট (League Covenant) বা লীগের চুক্তিপত্র গৃহীত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা ঃ লীগ কভেন্যান্ট রচনা

লীগ চুক্তিপত্রে জাতিসঙ্ঘের আদর্শ ও লক্ষ্যের বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। (১) জাতিসংঘের সদস্যদের মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সমবায় বৃদ্ধি করা, বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপন করা হল জাতিসঙ্ঘের প্রধান লক্ষ্য। (২) বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন, আন্তর্জাতিক আইনকে প্রয়োগ করার চেষ্টা ছিল লীগের অন্যতম লক্ষ্য। (৩) লীগের সদস্যরা যাতে আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিষ্পত্তি করে এবং আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ কার্যকরী করা যায়, এজন্যে চেষ্টা করা ছিল জাতিসঙ্ঘের অপর লক্ষ্য। (৪) বিশ্বের নারী, শিশু ও সমাজের অবহেলিত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা, শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি ন্যায্য ব্যবহার, বিশ্বস্বাস্থ্য-রক্ষা ও সেবাকার্যের জন্যে 'রেডক্রস' গঠন ছিল জাতিসঙ্ঘের অন্যতম উদ্দেশ্য।

লীগের আদর্শ ও লক্ষ্য

যুদ্ধবর্জন এবং আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি করা ছিল জাতিসংঘের প্রধান লক্ষ্য। লীগ চুক্তিপত্রের ১০—১৬ নং ধারায় লীগের সদস্যদের স্বাধীনতা ও ভৌমিক অখণ্ডতা রক্ষার আশ্বাস দেওয়া হয়। যদি লীগের কোন সদস্য-রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে সকল সদস্য সেই আক্রমণকে নিজেদের উপর আক্রমণ মনে করে আক্রান্ত রাষ্ট্রকে সাহায্য দিবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়। ১১ নং ধারায় এই শর্তের নাম ছিল 'যৌথ নিরাপত্তা শর্ত।' ১৩—১৫ নং ধারাগুলিতে আন্তর্জাতিক আদালত (P. C. I. J.) এবং লীগ কাউন্সিলের দ্বারা আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৬ নং ধারায় বলা হয় যে, যদি লীগের আদর্শ ও লক্ষ্য অগ্রাহ্য করে কোন সদস্যরাষ্ট্র আক্রমণকারীর ভূমিকা নেয় এবং উপরের শর্তগুলির বাধ্যবাধকতা মানতে অস্বীকার করে, তবে সেই সদস্যকে আক্রমণকারী ঘোষণা করে সকল সদস্য তার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ প্রয়োগ করতে বাধ্য থাকবে এবং সম্ভব হলে সামরিক ব্যবস্থা নিবে। এইভাবে জাতিসংঘ বিশ্বে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব নেয়।

আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি ও অন্যান্য লক্ষ্য

নবম পরিচ্ছেদ ঃ লীগের সংগঠন (The Organisation of the League of Nations) ঃ জাতিসংঘ বা লীগ অব নেশনস-এর কার্যপরিচালনার জন্যে লীগকে কয়েকটি সংস্থায় ভাগ করা হয়; যথা ঃ

১। **সাধারণ সভা (League Assembly) ঃ** লীগের সকল সদস্য-রাষ্ট্র এই সভার সদস্য হিসাবে গণ্য হত। এই সভার অধিবেশনে প্রতি সদস্যের একটি ভোট ছিল। লীগের সাধারণ সম্পাদক (Secretary General) যে বিষয়সূচী রচনা করতেন, সেইমত সাধারণ সভায় আলোচনা হত। লীগের এক্তিয়ারভুক্ত সকল বিষয়ে আলাপ-আলোচনা ও প্রস্তাবগ্রহণের অধিকার এই সভার ছিল। কোন নূতন রাষ্ট্রকে সাধারণ সভার ⅔ সদস্যের ভোটে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা যেত। আন্তর্জাতিক বিরোধ, বিশ্বশান্তি, সংখ্যালঘু সমস্যা প্রভৃতি সকল বিষয়ে সাধারণ সভা সিদ্ধান্ত নিতে পারত।

২। **লীগ পরিষদ (League Council) ঃ** লীগের কাজকর্ম পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব প্রধানতঃ লীগ পরিষদের হাতে ছিল। ৫ জন স্থায়ী ও ৪ জন অস্থায়ী এই ৯ জন সদস্য দ্বারা লীগ পরিষদ গঠিত হত। ইংলন্ড, ফ্রান্স, ইতালী, জাপান ছিল স্থায়ী সদস্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্থায়ী সদস্য হিসাবে বিবেচিত হলেও লীগে যোগ দেয় নাই। জাপান ১৯৩১ খ্রীঃ ও ইতালী ১৯৩৫ খ্রীঃ লীগের সদস্যপদ ত্যাগ করে। পরে জার্মানী ও রাশিয়া নূতন স্থায়ী সদস্য হিসাবে যোগ দেয়। লীগ পরিষদকে আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা, যুদ্ধবর্জনের উপায় উদ্ভাবন, াতিক সম্মেলন আহ্বান প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। লীগ পরিষদকে কোন

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে সকল সদস্যকে ঐক্যমত হয়ে সর্বসম্মত প্রস্তাব নিতে হয়। আন্তর্জাতিক সমস্যার কোন বিতর্কিত বিষয়ে লীগ পরিষদে ঐক্যমত না হলে সাধারণ সভায় বিষয়টি আনা যেত। কিন্তু সেখানেও সদস্যদের সিদ্ধান্ত নিতে হলে ৫ম ধারা অনুসারে ঐক্যমতে আসতে হত।

৩। **লীগের সচিবালয়** ছিল লীগের মহাসচিবের দপ্তর। লীগের গৃহীত সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করা, কোন রাষ্ট্রের অভিযোগ নথিভুক্ত করা, সভায় অধিবেশন ডাকা প্রভৃতি দায়িত্ব সচিবালয়কে নিতে হত।

৪। এছাড়া ১৪ নং ধারা অনুযায়ী একটি **আন্তর্জাতিক আদালত** (P.C.I.J.) আন্তর্জাতিক বিরোধের নিষ্পত্তির জন্যে গঠিত হয়। এই আদালত হল্যাণ্ডের হেইগ শহরের শান্তি-প্রাসাদে স্থাপন করা হয়। যে সকল আন্তর্জাতিক বিরোধ ছিল আইনের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিতর্কিত, লীগ সেই বিরোধের নিষ্পত্তির দায়িত্ব এই আদালতের হাতে দেয়। তা ছাড়া বিবদমান পক্ষ নিষ্পত্তির জন্যে স্বেচ্ছায় এই আদালতের মত নিতে পারত। তবে এই আদালতের সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক ছিল না। এই আদালতে ১৫ জন বিচারক ছিলেন।

৫। **আন্তর্জাতিক শ্রম দপ্তর** (I.L.O.) লীগের অধীনে স্থাপিত হয়। শ্রমিক-কল্যাণের জন্যে এই দপ্তর যে প্রস্তাব নিত, লীগের সদস্য-দেশগুলি তা মেনে চলার চেষ্টা করত।

দশম পরিচ্ছেদ : জাতিসংঘের বিফলতার কারণ ও কার্যকলাপ (The achievements and causes of the failure of the League) : জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর কিছুকাল এই প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বেশ উচু ছিল। কিন্তু বৃহৎ শক্তিগুলির স্বার্থপর নীতির ফলে লীগের মর্যাদা শীঘ্র বিনষ্ট হয় এবং এই প্রতিষ্ঠানের পতনের পথ তৈরি হয়।

লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিল জাপান। ১৯৩১ খ্রীঃ লীগের আদর্শ অগ্রাহ্য করে চীনের অধীনস্থ প্রদেশ মাঞ্চুরিয়াকে জাপান আক্রমণ করে। আক্রান্ত চীন লীগের কাছে আবেদন জানালে লীগ লিটন কমিশন নিয়োগ করে মাঞ্চুরিয়ার ঘটনার তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দেয়। জাপান এই কমিশনের সঙ্গে কোন সহযোগিতা না করে মাঞ্চুকুয়ো সরকার নামে এক তাঁবেদার হাতের পুতুল সরকার মাঞ্চুরিয়ায় স্থাপন করে। জাপান জানায় যে, চীনের বিরুদ্ধে মাঞ্চুরা বিদ্রোহ করে এই সরকার গঠন করেছে। মাঞ্চুকুয়ো সরকারের আমন্ত্রণে জাপানী সেনা মাঞ্চুরিয়ায় পাঠানো হয়েছে। লিটন কমিশন রিপোর্টে জাপানকে আগ্রাসনকারী সাব্যস্ত করে। কিন্তু তাদের সুপারিশ জাপানকে ১৬ নং ধারা অনুযায়ী শাস্তিদানের সুপারিশ করতে বিরত থাকে। লিটন রিপোর্টে বলা হয় যে, চীন ও জাপানের মধ্যে মীমাংসার ব্যবস্থা করা হোক। লীগের সকল সদস্য লিটন রিপোর্টের পক্ষে ভোট দেয়। থাইল্যান্ড নিরপেক্ষ থাকে। জাপান এই রিপোর্টের প্রতিবাদে লীগের সদস্যপদ ত্যাগ করে। মাঞ্চুরিয়ার ঘটনায় লীগের মর্যাদা নষ্ট হয়, লীগের উপর সদস্যদের আস্থা নষ্ট হয়।

জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ ও জাতিসংঘ ত্যাগ : লীগের বিফলতা

এর পর অন্য প্রতিষ্ঠাত্রী সদস্যা ইতালী লীগের আদর্শ অগ্রাহ্য করে ১৯৩৫ খ্রীঃ আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়া আক্রমণ করে। আবিসিনিয়া সংক্রান্ত বিরোধের বিষয় সম্পর্কে যখন লীগের নিযুক্ত কমিশন তদন্তে রত ছিল, তখন ইতালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করায় লীগের প্রতি ইতালীর উপেক্ষা তীব্রভাবে প্রকটিত হয়। এজন্যে ইতালীর বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত উত্তাল হয়। লীগ কাউন্সিল ১৬ নং ধারা অনুযায়ী ইতালীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক শর্ত প্রয়োগ করে এবং

অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা করে। কিন্তু ইংলন্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি লীগের প্রধান স্তম্ভ-রাষ্ট্রগুলি ইতালী-তোষণ নীতি গ্রহণ করায় এবং ইতালী লীগের সদস্যপদ ত্যাগ করায় লীগ পুনরায় ব্যর্থ হয়। আবিসিনিয়ার ঘটনায় লীগের মর্যাদা একেবারেই বিনষ্ট হয়। এতে উৎসাহ পেয়ে জার্মানী লীগের আদর্শকে উপেক্ষা করে অস্ত্র নির্মাণ করে এবং ১৯৩৯ খ্রীঃ পোল্যান্ড আক্রমণ করে। সোভিয়েত রাশিয়া ফিন্‌ল্যান্ড আক্রমণ করে। প্রতি বৃহৎ রাষ্ট্র নিজ সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল হলে লীগের পতন ঘটতে থাকে। অবশেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে লীগের পতন ঘটে।

ইতালীর আবিসিনিয়া আক্রমণ ও লীগের বিফলতা ও তার প্রতিক্রিয়া

লীগের পতনের অন্যান্য কারণের মধ্যে বলা যায় যে, বিশ্বের অন্যতম প্রধান শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগের সদস্যপদ গ্রহণ না করায় লীগের ক্ষমতা অনেক পরিমাণে কমে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনভাবে তার বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করে। ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিকেও জাতিসংঘের বাইরে থাকতে চাপ দেয়। আমেরিকার এই নীতির ফলে জাতিসঙ্ঘের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। ইতিমধ্যে জাপান ১৯৩১ খ্রীঃ ও ইতালী ১৯৩৫ খ্রীঃ লীগের সদস্যপদ ত্যাগ করে। জার্মানী ও রাশিয়া গোড়ার দিকে দীর্ঘকাল সদস্য ছিল না। সুতরাং বিশ্বের সকল বৃহৎ শক্তি কোন সময় এককালীন লীগের সদস্য ছিল না। লীগের এই ত্রুটি তার পতন ঘটায়।

বৃহৎ শক্তিগুলির অসহযোগ

(২) লীগ পরিষদ ও সাধারণ লীগের সভায় কোন আন্তর্জাতিক বিরোধের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে সকল সদস্যকে একমত হতে হত। কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যে সদস্যরা একমত হতে পারত না। ফলে লীগ অকার্যকরী হয়।

(৩) লীগে অন্য কোন বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রকৃত সমর্থন না থাকায় ইংলন্ড ও ফ্রান্সের সমর্থনের জোরে লীগকে চলতে হয়। কিন্তু ইংলন্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে মতবিরোধ হলে লীগের পক্ষে কোন সিদ্ধান্তগ্রহণ কঠিন ছিল।

লীগের সংবিধান ও সংগঠনের দুর্বলতা

(৪) লীগের সংবিধানের ১০—১৫ ধারায় বহু আইনগত ত্রুটি ছিল। এই ধারাগুলিতে যুদ্ধকে বে-আইনী ঘোষণা করা হলেও আগ্রাসনকে নিষিদ্ধ করা হয় নাই। খসড়া-চুক্তি ও জেনিভা প্রোটোকোল দ্বারা এই ত্রুটি দূর করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

(৫) লীগ সংবিধানের ১৬ নং ধারা ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। আগ্রাসনকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই ধারায় শাস্তিমূলক শর্ত ছিল। কিন্তু ১৬ নং ধারা ছিল ত্রুটিপূর্ণ। এতে আগ্রাসনকারীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থার দ্বারা আগ্রাসনকারীকে নিরস্ত করা কঠিন ছিল। সামরিক ব্যবস্থা এই ধারায় বাধ্যতামূলক না থাকায়, এই শাস্তিমূলক শর্ত মূল্যহীন হয়ে যায়। লিপসনের (Lipson) মতে "লীগ ছিল যেন এক বৃদ্ধা অসহায় বিধবা যাঁর দংশন করার মত দন্ত ছিল না"

(৬) লীগের সকল সদস্যের সমান অধিকার ছিল না। লীগ কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্যরা অস্থায়ী সদস্য অপেক্ষা বেশী অধিকার ভোগ করত।

(৭) ব্রিটেন ও ফ্রান্স লীগের আদর্শকে সমর্থন করা অপেক্ষা নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থরক্ষাকে অধিক গুরুত্ব দেয়। তা ছাড়া ব্রিটেন, জাপান ও ইতালীর প্রতি নমনীয় নীতি দেখালে এই রাষ্ট্রগুলিকে শাস্তি দান করা লীগের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। মোট কথা, বৃহৎ শক্তির স্বার্থপরতা লীগের পতন ঘটায়।

ব্রিটেনের ভূমিকা

সারণী

[ক] প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিভিন্ন কারণগুলির মধ্যে প্রধান ছিল উদীয়মান জার্মানীর সঙ্গে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া প্রভৃতি পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্ব। শিল্প-বিপ্লবের ফলে এই সকল দেশগুলিতে প্রচুর মূলধন জমা হয় এবং কারখানার উদ্বৃত্ত মাল বিক্রির জন্যে বাজারের দরকার হয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি শক্তিগুলি বিশ্বের অধিকাংশ উপনিবেশ দখল করায় নবোদিত জার্মানী উপনিবেশ দখলের চেষ্টা করলে বিরোধ দেখা দেয়। জার্মানীর নৌ-নির্মাণ ব্রিটেনের আশঙ্কা সৃষ্টি করে। কাইজার ত্রিশক্তি চুক্তির সাহায্যে অষ্ট্রিয়ার বলকান অঞ্চলে আগ্রাসী নীতিকে সমর্থন করেন যাতে অষ্ট্রিয়ার মিত্র জার্মানী বলকানকে তার উপনিবেশে পরিণত করতে পারে। রাশিয়া জার্মান সমর্থিত অষ্ট্রিয়ার আগ্রাসন প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। ১৮৯৪ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-রুশ চুক্তির দ্বারা ফ্রান্স ও রাশিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে জোট বাধে। ত্রিশক্তি দ্বারা আঁতাত ব্রিটেন এই জোটে যোগ দিলে ইওরোপ দুই শক্তি শিবিরে ভাগ হয়ে যুদ্ধের পথে এগিয়ে যায়। বলকানের অতৃপ্ত জাতীয়তাবাদ অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেয়। অবশেষে সেরাজেভো হত্যাকাণ্ডকে উপলক্ষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৪ খ্রীঃ আরম্ভ হয়।

[খ] জার্মানীর সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়াম বিসমার্কের শান্তি-নীতি নাকচ করায় এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের উপনিবেশ দখলের চেষ্টা করায় আন্তর্জাতিক সঙ্কট দেখা দেয়। কাইজার বলকানে অষ্ট্রিয়াকে মুখপাত্র করে বিস্তার নীতি নিলে রাশিয়ার সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ডের পর তিনি অষ্ট্রিয়াকে যুদ্ধঘোষণায় প্ররোচনা দেন। তবে কাইজার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্যে একমাত্র দায়ী ছিলেন না। ত্রিশক্তি আঁতাত গঠন দ্বারা ব্রিটেন, ফ্রান্স যুদ্ধনীতিকে গ্রহণ করে এবং সার্বিয়াকে উগ্রপন্থী কাজে রাশিয়া প্ররোচনা দেয়।

[গ] প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইওরোপে প্রধানতঃ চলে। তবে মধ্যপ্রাচ্যে ও দূরপ্রাচ্যেও এই যুদ্ধের প্রভাব সামান্যভাবে পড়ে। ১৯১৮ খ্রীঃ জার্মানীর পতন হলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়।

[ঘ] প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের প্রধান কারণ ছিল যে, দীর্ঘযুদ্ধে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে জার্মানীর দম ফুরিয়ে যায়। মিত্রশক্তির পক্ষে লোকবল, অস্ত্র ও অর্থবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যোগ দেওয়ার ফলে দারুণ বৃদ্ধি পায়।

[ঙ] প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান আসন্ন হলে মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসন তাঁর চতুর্দশ দফার দ্বারা ভবিষ্যৎ শান্তি-পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে জার্মানীর সঙ্গে ভার্সাই-চুক্তি ১৯১৯ খ্রীঃ ও জার্মানীর মিত্রশক্তির সঙ্গে অন্যান্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

[চ] ভার্সাই-এর সন্ধির ভৌগোলিক শর্তের দ্বারা জার্মানীর সীমান্ত অঞ্চলের প্রদেশগুলির ব্যবচ্ছেদ করে জার্মানীকে দুর্বল করা হয়। সামরিক শর্তগুলির দ্বারা জার্মানীকে নিরস্ত্র ও হীনবল করা হয়। অর্থনৈতিক শর্তের দ্বারা জার্মানীকে যুদ্ধাপরাধী ঘোষণা করে ক্ষতিপূরণ দিতে আদেশ দেওয়া হয়। জার্মানী ভার্সাই-সন্ধিকে একতরফা, প্রতিহিংসামূলক, জোর করে চাপিয়ে দেওয়া সন্ধি বলে সমালোচনা করে। ভার্সাই-সন্ধির স্বপক্ষে যুক্তি দেখানো হলেও এই সন্ধি বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। সন্ধিরক্ষার সময় কঠোরতা দেখানো হলেও পরে সন্ধির অসঙ্গতি স্পষ্ট হয় এবং সন্ধির প্রতি ব্রিটেনের সমর্থন হ্রাস পায়। মার্কিন দেশ এই সন্ধিকে সমর্থন করেনি।

[ছ] ভার্সাই-সন্ধির পর বিশ্বে শান্তিরক্ষা ও আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির জন্যে, নারী, শিশু, শ্রমিকের উন্নতিকল্পে লীগ অব নেশনস বা জাতিসংঘ স্থাপিত হয় (১৯১৯ খ্রীঃ)। যুদ্ধ বন্ধ করে আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির জন্যে জাতিসংঘের সংবিধানের ১০—১৬ নং ধারার শর্ত রাখা হয়। জাতিপুঞ্জকে সাধারণ সভা, লীগ পরিষদ, সচিবালয়, আন্তর্জাতিক আদালত, আন্তর্জাতিক শ্রমদপ্তর প্রভৃতি সমিতিতে ভাগ করে কার্যকরী করা হয়।

[জ] জাতিসংঘের পতনের কারণ ছিল কয়েকটি বৃহৎ শক্তির জাতিসংঘের আদর্শ লঙ্ঘন করে আগ্রাসী মনোভাব গ্রহণ। ১৯৩১ খ্রীঃ জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে প্রথম আগ্রাসনের সূত্রপাত করে। এর পর ১৯৩৫ খ্রীঃ ইতালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগের সদস্যপদ গ্রহণ না করায় লীগের সংবিধান ছিল ত্রুটিপূর্ণ। ব্রিটেন ও ফ্রান্স লীগকে সমর্থন না করে নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করে।

অনুশীলনী

১। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ হিসাবে হবসন তত্ত্ব সম্বন্ধে কি জান? (খ) ত্রিশক্তি-চুক্তির উদ্দেশ্য কি ছিল? (গ) ইওরোপের ইতিহাসে কোন্ সময়কে "সশস্ত্র শান্তির যুগ" বলা হয়? (ঘ) আগাদির সঙ্কট সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (ঙ) সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে যাহা জান লিখ এবং এই ঘটনা কেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্যে দায়ী ছিল লিখ। (চ) টোটেনবার্গ ও জাটল্যাণ্ডের নৌযুদ্ধের বিবরণ দাও। (ছ) উইলসন, ক্রেমাসুঁ, লয়েড জর্জ কে ছিলেন? (জ) কোন্ সন্ধিকে "একতরফা, জবরদস্তি সন্ধি" বলা হয়? (ঝ) "চতুর্দশ নীতির" রচয়িতা কে এবং কি উদ্দেশ্যে এই নীতি রচিত হয়? (ঞ) আন্তর্জাতিক শ্রমদপ্তরের উদ্দেশ্য কি? (ট) মাঞ্চুরিয়া সমস্যা এবং আবিসিনিয় সমস্যা জাতিসঙ্ঘের পতনের জন্যে কতখানি দায়ী ছিল?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(ক) ইওরোপীয় শক্তিগুলির ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্ব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্যে কতখানি দায়ী ছিল লিখ। (খ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্যে কাইজারের জার্মানীকে কি বিশেষভাবে দায়ী করা যায়? (গ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের কারণ কি? (ঘ) ভার্সাইয়ের সন্ধির শর্তাবলী আলোচনা করে দেখাও যে, এই সন্ধিকে "একতরফা, জবরদস্তি সন্ধি" বলা ঠিক কিনা। (ঙ) প্যারিসের শান্তি-বৈঠকে অন্যান্য যেসব সন্ধি হয় তার বিবরণ দাও। (চ) লীগের আদর্শ ও লক্ষ্য কি ছিল? (ছ) জাতিসঙ্ঘের সংস্থাগুলির বিবরণ দাও। (জ) জাতিসঙ্ঘের বিফলতার কারণ কি?

নবম অধ্যায়

আরব জাতীয়তাবাদ ও তুরস্কের জাগরণ : কামাল পাশা

প্রথম পরিচ্ছেদ : আরব জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও প্রসার (The birth and the spread of Arab Nationalism) : পশ্চিম এশিয়ার অন্যতম প্রধান অঞ্চল আরবদেশ হল ইসলামীয় সভ্যতার উদ্ভবক্ষেত্র। ইসলামধর্ম আরবদেশে জন্মলাভ করে খলিফাদের আমলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময়ে আরবজাতি বাগদাদের খলিফার অধীনে এক বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী হয়। তারপর ইতিহাসের প্রবহমান স্রোতে মোঙ্গল আক্রমণের ফলে বাগদাদের খলিফাতন্ত্রের পতন হয়। অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্য কন্‌স্টান্টিনোপলে প্রতিষ্ঠিত হলে আরবদেশ অর্থাৎ আরবীয় ভাষাভাষী, আরবজাতি তুর্কী সুলতানের অধীনে দীর্ঘকাল বসবাস করে। আরবজাতি আরবদেশ অর্থাৎ সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, জর্ডান, ইরাক ও মিশরে বসবাস করতে থাকে।

১৮৬০ খ্রীঃ-এর পরে আরবজাতির মধ্যে রেনেসাঁস বা জাগৃতি-আন্দোলন দেখা দেয়। শাসক তুর্কী ও শাসিত আরবরা ধর্মীয় দিক থেকে একই ধর্মমত অর্থাৎ ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলেও তাদের মধ্যে জাতিগত, ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত ব্যবধান ছিল। তুর্কীরা আরবদের নীচু চোখে দেখত এবং সমান মর্যাদা দিত না। ১৮৬০ খ্রীঃ পর সিরিয়াকে কেন্দ্র করে আরবী ভাষা, সাহিত্যের চর্চা আরম্ভ হয়। আরবজাতির অতীত গৌরব সম্পর্কে বহু রচনা লিখিত হলে তা আরবদের মনে সাড়া জাগায়। ক্রমে এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব সিরিয়া হতে মিশরীয় এবং অন্যান্য অঞ্চলের আরবদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে আরবজাতি তাদের নিজ ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হয়। শাসক তুর্কী জাতিসম্পর্কে আরবরা মোহমুক্ত হয়। তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ্ ছিলেন খুবই স্বৈরাচারী। তাঁর শাসনে তুর্কী সাম্রাজ্যের ভিতর বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর প্রজারা স্বাধীনতালাভের জন্যে ব্যস্ত হয়। আরবরাও পিছিয়ে ছিল না। সুলতান আবদুল হামিদের মৃত্যুর পর (১৯০৮ খ্রীঃ) তরুণ তুর্কী নেতাদের উদ্ধত আচরণ ও শোষণমূলক নীতির ফলে আরবদেশে বসবাসকারী মুসলিম আরব ও খ্রীষ্টান জাতীয়তাবাদীরা তুর্কী শাসন-মুক্ত হয়ে স্বাধীনতালাভের জন্যে বদ্ধপরিকর হন। স্বাধীনতালাভের পর আরবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার কথা আরব নেতারা প্রচার করেন। এইভাবে আরব জাতীয়তাবাদের (Arab Nationalism) জন্ম হয়।

আরব জাতীয়তাবাদের উদ্ভব

আরব জাতীয়তাবাদ মূলতঃ তুর্কী শাসন থেকে মুক্তি বা স্বাধীনতালাভ ও আরবজাতির ঐক্যের আদর্শকে আশ্রয় করে গড়ে উঠে। কোন কোন গোঁড়া মৌলবাদী আরব মনে করেন যে, ইসলামীয় জগতের ধর্মীয় নেতৃত্ব বা খলিফা-পদ অটোমান সুলতানের হাত থেকে পুনরায় আরব জাতির হাতে ফিরিয়ে আনা দরকার। কারণ নায্যভাবে বিচার করলে খলিফা পদ আরবরাই সৃষ্টি করেছিল। হজরত মহম্মদের বংশধর কোন আরব রাজবংশের হাতে এই পদ দেওয়াই নায্য কাজ। এর দ্বারা আরব জাতির জাতীয় সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে বলে মনে করা হয়। সুতরাং আরব জাতীয়তাবাদের পশ্চাতে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক প্রভাব কাজ করেছিল। বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা আরবদের ঐক্যবদ্ধ করাও ছিল আরব জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য।

আরব জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি

উনবিংশ শতকের প্রথম সাত দশক ব্রিটিশ সরকার তুর্কী সাম্রাজ্যকে রক্ষা ও এই সাম্রাজ্যে

ভাঙ্গন রোধ করার নীতি নেন। এজন্য আরবদের তুর্কী শাসন মুক্ত হয়ে স্বাধীনতালাভের স্বপ্ন সফল হয় নি। বার্লিন চুক্তির (১৮৭৮ খ্রীঃ) পর থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদের পরিকল্পনা নেয়। তুর্কী সাম্রাজ্য ভেঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কনস্টান্টিনোপল থেকে সুদূর ভারতবর্ষ পর্যন্ত একচেটিয়া সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মন অধিকার করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুর্কী সুলতান কাইজারের জার্মানীর পক্ষে যোগ দেন এজন্য তুর্কী সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদে তারা তৎপর হয়। আরবদের স্বাধীনতালাভের চেষ্টাকে এজন্য ব্রিটিশ সরকার কাজে লাগায়। ব্রিটিশের আসল উদ্দেশ্য ছিল তুর্কী সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদ তুরস্ককে শক্তিহীন করা। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আরবদের আশ্বাস দেওয়া হয় যে তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধের পর আরব জাতির স্বাধীন রাষ্ট্র আদায় করে দিবেন। যুদ্ধ চলার সময় আরবদের বিদ্রোহে তাঁরা সমর্থন দিবেন। ইংরাজের আসল উদ্দেশ্য ছিল তুর্কী সাম্রাজ্য তুর্কীদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে গ্রাস করা। আরব জাতিকে স্বাধীনতা দান তাদের লক্ষ্য ছিল না। কূটনৈতিক গোপনীয়তা ও দুরভিসন্ধির জন্যে ইংরাজ শক্তি সেই যুগে কুখ্যাত ছিল। কর্ণেল লরেন্স নামে এক এ্যাংলো-আরবীয় ব্রিটিশ সামরিক অফিসার আরবদের বিদ্রোহ প্ররোচনা দেন ও নানাবিধ সহায়তা করেন। আরব জাতির প্রধান নেতা, হজরত মহম্মদর বংশধর, মক্কার শেরিফ হুসেনকে মধ্যপ্রাচ্যের ইংরাজ সেনাপতির ম্যাকমোহন এক পত্র দ্বারা স্বাধীন আরব রাজ্য স্থাপনের আশ্বাস দেন। এই সঙ্গে আরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে হুসেনকেই স্বাধীন আরবদেশের রাজ্যপদ দেওয়া হবে। আরব জাতি তুর্কী সুলতানের বিরুদ্ধে রাজা হুসেনের ডাকে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সিরিয়ার মুসলিম ও খ্রীষ্টানরাও স্বাধীনতালাভের আশায় এই বিদ্রোহে যোগ দেয়। বহু আরব তুর্কী সেনার হাতে প্রাণ দেয়। ভারত থেকে ব্রিটিশ সেনা মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষতঃ মেসোপটেমিয়া বা ইরাকে পাঠান হয়। আরব বিদ্রোহ সফল হয়।

আরব জাতির তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ : ব্রিটেনের ভূমিকা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে শান্তি চুক্তির দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আরবদেশের অধিকাংশ অঞ্চল লীগের মাধ্যমে ম্যাণ্ডেট হিসাবে অধিকার করে। তুরস্ক সেভরের সন্ধি ও পরে ল্যাসেনের সন্ধির (১৯২৩ খ্রীঃ) দ্বারা মধ্যপ্রাচ্যের এই আরব সাম্রাজ্যের উপর দাবী ছেড়ে দেয়। (আগে অষ্টম অধ্যায় সপ্তম পরিচ্ছেদ পৃঃ ১৪২ দ্রষ্টব্য)। ম্যাণ্ডেট প্রথা ছিল আসলে সাম্রাজ্য বিস্তারের একটি আইনসম্মত কৌশল। ব্রিটেনের একচ্ছত্র অধিকারে অসন্তুষ্ট হয়ে ফ্রান্স আরবদেশের উপর ম্যাণ্ডেটের অংশ দাবী করে। আরবদেশের মাটির নীচে পেট্রোল ও অন্যান্য খনিজ তেলের প্রচুর সম্পদ আবিস্কৃত হওয়ায় আরবদের উপর ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ চেপে বসে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স আরবদেশকে ভাগ করে ম্যাণ্ডেট হিসাবে অধিকার করে। সিরিয়া ফরাসী ম্যাণ্ডেটে পরিণত হয়। প্যালেস্টাইন, ইরাক ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেটে পরিণত হয়। জর্ডানে ব্রিটিশের নিয়ন্ত্রণের অধীনে হুসেনের পুত্র আবদুল্লাহকে রাজা হিসাবে বসানো হয়। হেজাজ রাজ্যটিকে স্বাধীনতা দিয়ে রাজা হুসেনকে দান করা হয়। এছাড়া নেজদ অঞ্চলে ইবনে সৌদ রাজত্ব করেন। আরবদেশ এভাবে বিভিন্ন অংশে সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা বিভক্ত হয়। আরবভূমির বিভিন্ন খণ্ডে ব্রিটিশ ও ফরাসী শক্তি ম্যাণ্ডেট নাম দিয়ে শাসন চালায়। ম্যাণ্ডেটের বাইরে অবশিষ্ট অংশকে নামমাত্র স্বাধীনতা দেওয়া হয়। ব্রিটিশের আরবদেশে সামরিক ও অর্থনৈতিক গভীর স্বার্থ ছিল। আরবদেশের তৈলসম্পদের উপর তাদের লুব্ধ দৃষ্টি ছিল। ভারতে আসার জন্যে মধ্যপ্রাচ্যের উপর দখলকারী রাখার দরকার হয়।

শান্তি চুক্তির দ্বারা আরব জাতির স্বাধীনতা হরণ : ব্রিটিশ-ফরাসী ম্যাণ্ডেট স্থাপন

আরবজাতি পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের হীন চক্রান্ত ও শোষণ নতশিরে মেনে নেয় নি। আরবদেশে প্যান-আরব আন্দোলন এবং আরব মুক্তি-আন্দোলন তীব্রতর হয়। সিরিয়ায় ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার দাবি প্রবল হয়ে উঠে। বিদ্রোহ, বিক্ষোভে ফরাসী কর্তৃপক্ষ বেসামাল হন। অবশেষে ফরাসী কর্তৃপক্ষ সিরিয়ার জাতীয়তাবাদকে দমনের জন্যে সিরিয়াকে, সিরিয়া ও লেবানন এই দুভাগে ব্যবচ্ছেদ করেন। নবগঠিত লেবাননে মারোনাইট খ্রীষ্টানসম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। আরব মুসলিমরা সংখ্যালঘু হয়ে যায়। এছাড়া উত্তর সিরিয়ার কিছু অংশ ব্যবচ্ছেদ করে তুর্কীভাষী অঞ্চলে আলেক্সান্দ্রেত্তা নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করা হয়। এই সকল ব্যবচ্ছেদ দ্বারা সিরিয়ার জাতীয়তাবাদকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয়। আরবদেশের অধিবাসীদের ধর্মীয় ও জাতিগত ব্যবধানকে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে ব্যবহার করা হয়। আরব জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে দমননীতি ব্যাপকভাবে চালানো হয়।

সিরিয়ায় ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের ভূমিকা

এত চেষ্টা করেও সিরিয়ার জাতীয়তাবাদকে দমানো যায় নি। সিরীয় গেরিলারা গ্রামাঞ্চল অধিকার করে নেয়। ফরাসী সেনা দামাস্কাসে বোমাবর্ষণ করলেও কোন ফল হয় নি। সিরিয়ার খ্রীষ্টান ও মুসলিম একযোগে স্বাধীনতার যুদ্ধ চালায়। শেষ পর্যন্ত ফরাসী সরকার একটি সংবিধান-সভা ডাকার অনুমতি সিরীয় জাতীয়তাবাদীদের দেন। এই সংবিধান-সভা স্বাধীন সার্বভৌম সিরীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব নেয়। এই প্রস্তাবকে কার্যকরী না করার জন্যে ফরাসী সরকার বিবিধ চেষ্টা করেন। কিন্তু ফরাসী সরকার ক্রমে ক্রমে সিরীয় জাতীয়তাবাদীদের বেশির ভাগ দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ফ্রান্স জার্মান আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই সুযোগে সিরিয়া বহুল পরিমাণে অধিকার আদায় করে নেয়।

সিরিয়ার স্বায়ত্ব শাসন লাভ

প্যালেস্টাইনের উপর ব্রিটিশ সরকার লীজ ম্যান্ডেট স্থাপন করে। প্যালেস্টাইনের বৃহত্তর অধিবাসীরা ছিল মুসলিমধর্মাবলম্বী আরব এবং ইহুদিরা ছিল সংখ্যালঘু। ব্রিটিশ সরকার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ধনী ইহুদি ব্যাঙ্ক মালিকদের কাছে ঋণ পাওয়ার জন্যে এবং ভেদনীতি খাটাবার জন্যে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের বাসভূমি দানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ব্রিটিশমন্ত্রী লর্ড ব্যালফ্যুর এক ঘোষণা (১৯১৭ খ্রীঃ) দ্বারা প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের বাসস্থান দানের সিদ্ধান্ত জানান। যুদ্ধ শেষ হলে ব্যালফ্যুর ঘোষণার বলে দলে দলে ইহুদি ইওরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে প্যালেস্টাইনে চলে আসতে থাকে। নবাগত ইহুদিরা প্যালেস্টাইনে স্থায়ী বসবাসকারী ইহুদিদের সঙ্গে যোগ দিয়ে দ্রুত ইহুদিদের সংখ্যা বাড়ায়। ইহুদিদের বক্তব্য ছিল যে, প্রাচীন যুগে ইহুদিরাই ছিল প্যালেস্টাইনের আদিবাসী। বাইবেলে সে কথা আছে। প্রাচীন মিশরের এক রাজা বা ফ্যারাও ইহুদিজাতিকে প্যালেস্টাইন থেকে বিতাড়িত করেন। এজন্য ইহুদিরা পিতৃভূমি হারায়। এখন তারা পিতৃভূমি পুনর্দখল করবে। ইহুদিদের এই পিতৃভূমি দখলের জন্যে ইহুদি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নাম ছিল 'বিশ্ব জিওনিস্ট' (Zionist) আন্দোলন। এদিকে নবাগত ইহুদিরা ছিল ধনবান, বিদ্বান ও কারিগরী জ্ঞানে সমৃদ্ধ। তাদের পশ্চাতে ছিল ইওরোপের বৃহৎ শক্তিগুলির সমর্থন। তুলনামূলকভাবে প্যালেস্টাইনের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম আরব অধিবাসীরা ছিল দরিদ্র, অসহায় ও নিরক্ষর। সুতরাং নবাগত ইহুদিরা দরিদ্র আরবদের জমিগুলি উচ্চমূল্যে কিনে নিয়ে সেগুলিকে তামাকচাষের খামারে পরিণত করে এবং তামাক রপ্তানি করে বহু মুনাফা পায়। ভূমিহীন আরব বা প্রান্তিক আরব চাষী ইহুদি মালিকের খামারে দিনমজুরি করে।

প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট স্থাপন : ইহুদীদের অনুপ্রবেশ

ব্রিটিশের ভেদ-নীতির ফলে আরব জাতীয়তাবাদ প্যালেস্টাইনে সংগ্রামী চরিত্র নেয়। প্রথমতঃ, আরবদের স্বাধীনতাদানের স্থলে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট স্থাপন ছিল ঘোর প্রবঞ্চনা। রাজা হুসেন এজন্যে হুসেন-ম্যাকমেহন পত্রের আশ্বাস যথা "আরবদেশে আরবজাতিকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে"—এই আশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ করেন। এর উত্তরে ব্রিটিশ সরকার জানান যে, আরবদেশের মধ্যে প্যালেস্টাইন অন্তর্ভুক্ত বলে তাঁরা মনে করেন না। সুতরাং প্যালেস্টাইনে আরবদের স্বাধীনতার প্রশ্ন আসে না। দ্বিতীয়তঃ, প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের অনুপ্রবেশকে আরবরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত বলে অভিহিত করে। প্যালেস্টাইনকে ইহুদিমুক্ত ও ব্রিটিশ অধিকার থেকে মুক্ত করে আরবরা তাদের স্বাধীনতালাভের জন্যে বদ্ধপরিকর হয়।

ব্রিটেনের প্যালেস্টিনীয়দের প্রতি প্রতারণা

ব্রিটিশ সরকর প্যালেস্টাইনে আরব ও ইহুদিদের সমান নাগরিক অধিকার দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান করার অপচেষ্টা করলে প্যালেস্টেনিয় আরবরা নির্বাচন বয়কট করে। ১৯২৮ খ্রীঃ বিভিন্ন আরবদেশের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত আরব জাতীয় কংগ্রেস ডেকে কেবলমাত্র আরবদের নাগরিক অধিকার-মূলক নির্বাচনের ভিত্তিতে প্যালেস্টাইনে পার্লামেন্ট গঠনের দাবি জানানো হয়। এই কংগ্রেসে আরব জাতীয়তাবাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটে এবং ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক নীতিকে নিন্দা জানানো হয়। ১৯২৯ খ্রীঃ প্যালেস্টাইনে ভয়ঙ্কর আরব-ইহুদি দাঙ্গা আরম্ভ হয় এবং ব্রিটিশ সেনার সাহায্যে এই দাঙ্গা থামানো হয়। এর পর আরব জাতীয় মুসলিম ও খ্রীষ্টানরা ব্যাপক ধর্মঘট চালায়। নারীরাও প্রকাশ্যে ধর্মঘটে যোগ দেন। এই অবস্থায় ব্রিটিশ সরকার একটি রয়্যাল কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশন প্যালেস্টাইন দেশটিকে ব্রিটিশ-আরব ও ইহুদিদের মধ্যে ভাগ করার প্রস্তাব করলে আরবরা তা অগ্রাহ্য করে।[১] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট বহাল থাকে।

আরব-ইহুদি দাঙ্গা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ শক্তি U.N.O. বা জাতিপুঞ্জের হাতে প্যালেস্টাইনের ম্যান্ডেট ১৯৪৮ খ্রীঃ হস্তান্তরিত করে। ইতিমধ্যে জাতিপুঞ্জ মার্কিন প্রভাবে প্যালেস্টাইন ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব দেয়। ১৯৪৮ খ্রীঃ ইহুদিরা জাতিপুঞ্জের প্রস্তাবমত প্যালেস্টাইনের একাংশে ইস্রায়েল রাষ্ট্র (১৯৪৮ খ্রীঃ) ঘোষণা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইস্রায়েলকে স্বীকৃতি দেয়। সোভিয়েত রাশিয়াসহ অন্যান্য দেশগুলিও ইস্রায়েলকে স্বীকতি দেয়। প্যালেস্টাইনের একাংশে ইহুদি রাষ্ট্র স্থাপিত হলে মিশর, সিরিয়া, জর্ডান ও প্যালেস্টাইনের আরবরা ভয়ানক হতাশ হয়। পশ্চিমী দেশগুলির এই বঞ্চনার প্রতিবাদে আরবদেশগুলি আরব লীগ গড়ে। মিশর এই আরব লীগকে নেতৃত্ব দেয়। আরব লীগ ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলে। কিন্তু মার্কিন সমর্থনপুষ্ট ইস্রায়েলকে ধ্বংস করা আরব জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগুলির পক্ষে সম্ভব হয়নি। অপরদিকে ইস্রায়েল রাষ্ট্র থেকে বহু লক্ষ আরবকে বহিষ্কৃত করায় তারা গৃহহীন হয়ে শরণার্থীতে পরিণত হয়েছে। এই শরণার্থীদের ইস্রায়েল এখনও ফেরত নেয় নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিণ পৃষ্ঠপোষকতায় ইহুদিদের ইস্রায়েল রাষ্ট্র গঠন

প্যালেস্টাইন সংলগ্ন জর্ডান নদের অপর পারে আরবদেশের এক ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে প্রথম মহাযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার জর্ডান রাজ্য স্থাপন করেন। জর্ডানের তৎকালীন লোকসংখ্যা ছিল মাত্র তিন লক্ষ। ব্রিটিশ সরকার জর্ডানে রাজা হুসেনের পুত্র আবদুল্লার অধীনে এক তাঁবেদার সরকার স্থাপন করে। জর্ডানে আবরবা পার্লামেন্টারী শাসন ও স্বাধীনতা দাবি করলে ব্রিটিশ সরকার তা দমন করেন। ১৯২৮ খ্রীঃ রাজা আবদুল্লা এক চুক্তি স্বাক্ষর করলে জর্ডান কার্যতঃ

১· E.M. Carr—International Relations Between Two World Wars.

একটি ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি ও উপনিবেশে পরিণত হয়। জর্ডানীয় মুসলিম ও খ্রীষ্টানরা এক জাতীয় চুক্তির দ্বারা যৌথভাবে ব্রিটিশের বিরোধিতা করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত এই অবস্থা চলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জর্ডান স্বাধীনতা পায়।

জর্ডানের সমস্যা

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ইরাক ও মেসোপটেমিয়ায় রাজা হুসেনের পুত্র ফৈজলকে তাঁবেদার হিসাবে স্থাপন করে। ইরাকী আরবরা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চালায়। ব্রিটিশ শাসনকর্তারাও প্রচন্ড দমননীতির দ্বারা ইরাকী জাতীয়তাবাদকে দমনে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত ১৯৩০ খ্রীঃ এক চুক্তির দ্বারা ব্রিটিশ সরকার কতকগুলি শর্ত-সাপেক্ষে ইরাকের স্বাধীনতা স্বীকার করেন।

ইরাকের সমস্যা

মিশর আরবদেশের ভৌগোলিক সীমার বাইরে হলেও, এই দেশে আরবজাতি বসবাস করে। উনবিংশ শতকে মিশরে তুর্কী সুলতানের শাসনকর্তা পাশা মহম্মদ আলি ও তাঁর পুত্র ইব্রাহিম আলি বহু আধুনিক অসামরিক ও সামরিক সংস্কার চালু করেন। ফলে মিশর অন্যান্য আরবদেশের তুলনায় যথেষ্ট উন্নত ও আধুনিক ছিল। মিশরে সুয়েজ খাল খোদাই হলে এই আন্তর্জাতিক জলপথের দরুন মিশরের গুরুত্ব দারুণ বেড়ে যায়। ব্রিটিশ সেনা ১৮৮১ খ্রীঃ মিশরে অবতরণ করে এবং নানা অজুহাতে মিশরে ও সুয়েজ খালে আধিপত্য স্থাপন করে।

মিশরে আরব জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি

মিশরীয় জাতীয়তাবাদীরা ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে ব্রিটিশ সামরিক শক্তির দ্বারা তা দমিয়ে দেয়। ১৮৮১-৮২ খ্রীঃ মিশরীয় নেতা আরবি পাশার বিদ্রোহ দমন করা হয়। মিশরে শিল্প-বাণিজ্য এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারের ফলে শিক্ষিত বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত দেশপ্রেমিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়। মিশরীয় জাতীয়তাবাদ এদের মাধ্যমে বিকশিত হয়। আরবি পাশার পর তাঁর শিষ্য সাদ জগলুল পাশা মিশরীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালনা করেন। প্রায় ৪৫ বছর তিনি একাদিক্রমে মিশরীয় জাতীয়তাবাদীদের মুকুটহীন সম্রাট ছিলেন। যদিও তিনি ছিলেন কৃষকসন্তান, গোটা জাতি তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেয়। তিনি মিশরের জাতীয় দল—"ওয়াফদ" দলের প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রিটিশ সরকার জগলুল পাশাকে বন্দী করলে মিশরে জাতীয় বিদ্রোহ দেখা দেয়। মিশরীয় ছাত্ররা ইস্তিকলাল-এম-তাম ধ্বনি দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।

জগলুল পাশা ও ওয়াফদ দল

শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার মিলনার কমিশন নিয়োগ করেন। ১৯২২ খ্রীঃ কতকগুলি শর্ত-সাপেক্ষে ব্রিটেন মিশরের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিতে রাজী হয়। এই শর্ত-সাপেক্ষ ঘোষণার ভিত্তিতে ব্রিটেন একতরফাভাবে মিশরের স্বাধীনতা ১৯২২ খ্রীঃ ঘোষণা করে। ব্রিটিশ সরকার 'ফৌদ' (Faud) নামে এক প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিকে মিশরকে রাজা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। এই ফৌদ সরকারের উপর পুনরায় ব্রিটিশ তাঁবেদারী শর্ত চাপায়। ফৌদের পর রাজা ফারুক মিশরের শোষণ করেন। তিনি ব্রিটিশ তোষণ, ভোগবিলাস ও ঘোড়দৌড়ে অকাতরে অর্থব্যয় করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মিশরীয় জাতীয়তাবাদী সেনাপতি কর্নেল নাসেরের নেতৃত্বে মিশরে জাতীয় বিপ্লব ঘটে। ফারুক সরকারের পতন হয়। সুয়েজ খালের জাতীয়করণ করা হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মিশরে অস্তমিত হয়।

মিশরে জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি

আরবদেশে হেজাজের রাজা হুসেন নিজেকে খলিফা হিসাবে ঘোষণা করলেও তিনি ব্রিটিশ

শক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্যে আরব জাতীয়তাবাদীদের সমর্থন পান নাই। মক্কায় ইসলামীয় সম্মেলনের পর সৌদির রাজা ইবন সৌদ আরবজাতি ও জাতীয়তাবাদের মুখপাত্র হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি হেজাজ অধিকার করেন এবং বৈদেশিক শক্তিগুলি তাঁকে আরবদেশের রাজা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়।

রাজা ইবন সৌদের উত্থান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আধুনিক তুরস্কের উত্থান : মুস্তাফা কামাল পাশা (Rise of Modern Turkey : Rise of Mustafa Kamal Pasha) : ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ এমন কি তারপরেও তুরস্ক ছিল মধ্যযুগীয় ভাবধারায় আচ্ছন্ন। তুরস্কের সমাজ মধ্যযুগীয় মৌলবাদী শরীয়তী নিয়মের পাশে আবদ্ধ ছিল। তুর্কী সেনা ও শাসন বিভাগকে আধুনিক ভাবধারায় সংগঠন না করার ফলে তুরস্ক দুর্বল হয়ে পড়ে। ইওরোপীয় শক্তিগুলির হাতে ঊনবিংশ শতকে তুরস্কের পরাজয় ঘটতে থাকে। তুর্কী সাম্রাজ্যে বহু জাতির, বহু ভাষার ও বহু ধর্মের লোক ছিল। এই সাম্রাজ্যে সংহতি স্থাপনের জন্যে তুর্কী সুলতান ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রদর্শন না করে মৌলবাদী নীতি অনুযায়ী অ-মুসলিমদের উপর ইসলামীয় নিয়মকানুন চাপাবার চেষ্টা করেন। ফলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে জাতীয়তাবাদী বিক্ষোভ দেখা দেয়। তুরস্ককে "ইওরোপের রুগ্ন মানুষ" (sick man of Europe) বলে অভিহিত করা হত। কারণ তুরস্কের সমাজ ছিল মধ্যযুগীয়, রক্ষণশীল। তুরস্ক ছিল আত্মরক্ষায় অক্ষম। ইওরোপীয় বৃহৎ শক্তিগুলির পারস্পরিক বিরোধের ফলে শক্তিসাম্যের স্বার্থে তুরস্ককে ব্যবচ্ছেদ না করে, কোনক্রমে টিকিয়ে রাখা হয়।

১৮৭৮ খ্রীঃ বার্লিন সন্ধির পর ইওরোপীয় শক্তিগুলির তুরস্ক সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী বদলে যায়। ব্রিটেন তুরস্কের ব্যবচ্ছেদ নীতি নেয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তুর্কী সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্নে মশগুল হয়ে উঠে। এই উদ্দেশ্যপূরণের জন্যে তারা তুরস্কের সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদে উদ্যম নেয়। তুর্কী সুলতান আবদুল হামিদ ব্রিটিশ চক্রান্তের বিরুদ্ধে তুরস্কের স্বার্থরক্ষায় ব্যর্থ হন। এজন্য তুর্কী জাতীয়তাবাদীরা তাঁর নেতৃত্বের বিরোধী হন।

ব্রিটেনের তুরস্কের সাম্রাজ্য দখলের পরিকল্পনা

এই নবীন জাতীয়তাবাদীদের নাম ছিল ইয়ং টার্ক বা তরুণ তুর্কী (Young Turk)। এনভার পাশা, তালাত বেগ প্রভৃতি ছিলেন "তরুণ তুর্কী" দলের নেতা। তাঁরা "ঐক্য ও অগ্রগতি সমিতি" (Committee of Union and Progress) স্থাপন করেন। ১৯০৮ খ্রীঃ তাঁরা সুলতান ষষ্ঠ মহম্মদকে তুরস্কে আধুনিক শিক্ষা-প্রবর্তনের জন্যে উদ্যোগ নিতে, সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণ করতে রাজী করান। তরুণ তুর্কী দলের এই উদ্যম প্রশংসনীয় হলেও শীঘ্রই তাঁরা উগ্র তুর্কী জাতীয়তাবাদে আচ্ছন্ন হন। তুর্কী সাম্রাজ্যকে রক্ষার উদ্দেশ্যে তরুণ তুর্কী নেতারা তুর্কী সাম্রাজ্যের অ-তুর্কী ও অ-মুসলিম খ্রীষ্টীয় প্রজাদের উপর তুর্কীকরণ নীতি প্রয়োগ করলে গণ্ডগোল দেখা দেয়। যাঁরা নিজেদের স্বাধীনতা চান, তাঁরা অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করায় বিষম সঙ্কট দেখা দেয়। খ্রীষ্টীয় প্রজারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইতিমধ্যে বলকান যুদ্ধ ১৯১২ খ্রীঃ আরম্ভ হলে তুরস্কের ইওরোপীয় সাম্রাজ্যের বৃহৎ ভাগ হস্তচ্যুত হয়। (সপ্তম অধ্যায় ১১৯ পৃঃ বিশদ বিবরণ দেখ)

ইয়ং টার্ক আন্দোলন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের চক্রান্তে তুরস্কের অধীনস্থ আরবদেশের সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিশ্বযুদ্ধে তুর্কীসেনা মিত্রশক্তির হাতে পরাস্ত হলে মিত্রশক্তি তুরস্কের উপর সেভরের সন্ধি (Treaty of Sevres) চাপিয়ে দেয়। কনস্ট্যান্টিনোপল ছাড়া তুরস্কের হাতে সেভরের সন্ধি দ্বারা ইওরোপে আর কোন স্থান রাখা হয় নি। গ্রীসকে স্মার্না ও আর্মেনিয়াকে স্বাধীনতা দান

করার ফলে সেভরের সন্ধি দ্বারা তুরস্ক এক ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হতে চলে। (আগে ৭ম অধ্যায়, ১০ম পরিচ্ছেদ পৃঃ ১২৫ দ্রষ্টব্য)। ব্রিটিশ এজেন্টরা তুরস্কের ভিতর ঢুকে তুর্কী দুর্গগুলি ভেঙে ফেলতে থাকে এবং তুর্কী সেনাদলকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। তুর্কী জাতীয়তাবাদী নেতারা এনভার পাশা, তালাত বেগ অন্য দেশে পালিয়ে যান। তুর্কী সুলতান ওয়াহিদউদ্দিন নিজের সিংহাসন রক্ষার জন্যে সেভরের সন্ধি মেনে নিতে উদ্যত হন। ব্রিটিশ সরকার তাঁদের তাঁবেদার এক ব্যক্তিকে সুলতানের মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করতে বাধ্য করেন। তুর্কী পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া হয়। এভাবে তুরস্ককে পদানত করতে ব্রিটিশ সরকার উদ্যত হন।

সেভয়ের সন্ধি : ব্রিটেনের চক্রান্ত

তুরস্কের এই সঙ্কটপূর্ণ সময়ে মুস্তাফা কামাল পাশা তুর্কীজাতির নতুন নেতারূপে জাতিকে পথ দেখান। তুর্কী সুলতান কামাল পাশাকে রাজধানী কনস্টান্টিনোপল থেকে দূরে পূর্ব আনাতোলিয়া প্রদেশে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই বিপজ্জনক জাতীয়তাবাদীকে মফঃস্বলে অজ্ঞাতবাসে রেখে অকার্যকরী করে দেওয়া। কিন্তু আনাতোলিয়া থেকে মুস্তাফা কামাল সেভরের সন্ধির শর্তগুলির কুফল বুঝতে পারেন। তিনি আনাতোলিয়ায় তুর্কী জাতীয়তাবাদীদের একত্র সমবেত করেন এবং সেভরের সন্ধির প্রতিবাদ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি তুরস্কের সেনাপতি হিসাবে গ্যালিপোলির যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব দেখান। এজন্যে তিনি খ্যাতি পান। সুতরাং কামাল পাশার নেতৃত্ব তুর্কী জাতীয়তাবাদীরা মেনে নেন।

কামাল পাশার সেভরের সন্ধির বিরোধিতা

ব্রিটিশ সরকারের প্ররোচনায় গ্রীক প্রধানমন্ত্রী ভেনিজেলোস এবং বেসিল জাহারোফ নামে এক ধনী ব্যক্তি তুরস্কের স্মার্না, কনস্টান্টিনোপল প্রভৃতি নগর গ্রীক-সেনার দ্বারা অধিকার করার পরিকল্পনা করেন। ব্রিটিশ সরকার মনে করেন যে, গ্রীক-সেনার সাহায্যে তুরস্ককে সেভরের সন্ধি স্বীকারে বাধ্য করবেন। গ্রীসের প্রধান মন্ত্রী ভেনিজেলোস আশা করেন যে, কনস্টান্টিনোপল অধিকার করে গ্রীসের সাম্রাজ্য স্থাপন করবেন। বেসিল জাহারোফ যুদ্ধের সুযোগে অস্ত্র বিক্রি ও একচেটিয়া বাণিজ্যের লাইসেন্স পাওয়ার আশা করেন। দরিদ্র দেশগুলির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীরা এই ধরনের চক্রান্ত করতে অভ্যস্ত ছিল। গ্রীকবাহিনী স্মার্না অধিকার করে এবং তারা তুর্কী অধিবাসীদের উপর নিষ্ঠুর আচরণ করে। তুর্কীদের ব্যাপক হত্যা এবং নারীদের অপমান করায় তুরস্কে গ্রীকবিরোধী জনমত তীব্র হয়।

সেভরের সন্ধির সমর্থনে তুরস্কে গ্রীক আক্রমণ

মুস্তাফা কামাল পাশা এই সুযোগে আনাতোলিয়ার আঙ্কারা নগরে ১৯২০ খ্রীঃ এক জাতীয়তাবাদী তুর্কী কংগ্রেস ডাকেন। তুর্কীরা গণভোট দ্বারা এই কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের নির্বাচন করে। এই কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা নিজেদের তুর্কীজাতির ন্যায্য প্রতিনিধি বলে দাবি করেন এবং কংগ্রেসকে তুর্কী পার্লামেন্ট হিসাবে ঘোষণা করা হয়। কামাল পাশাকে এই পার্লামেন্ট তুরস্কের রাষ্ট্রপতি হিসাবে ঘোষণা করে। কামাল পাশার নেতৃত্বে এই কংগ্রেসে ন্যাশনাল প্যাক্ট বা জাতীয় চুক্তি গ্রহণ করা হয়। তুরস্ক মিত্রশক্তির সঙ্গে কি শর্তে সন্ধি করতে পারে এবং তুরস্কের স্বাধীনতা কিভাবে অক্ষুণ্ণ থাকবে তা এই "জাতীয় চুক্তি"র দ্বারা জানিয়ে দেওয়া হয়। ব্রিটিশ সরকারের প্ররোচনায় সুলতান কামাল পাশাকে ইসলামধর্মবিরোধী ঘোষণা করেন। এই জাতীয় চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী জাতীয় নেতাদের সুলতান বন্দী করার চেষ্টা করেন। ফলে অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী নেতা আনাতোলিয়ায় কামাল পাশার সঙ্গে যোগ দেন। তুরস্কে গৃহযুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়।

কামাল পাশার বিদ্রোহ

কামাল পাশা এই সময় মাথা ঠাণ্ডা রেখে লক্ষ্য স্থির করেন। বৈদেশিক শক্তির গ্রাস হতে

তুরস্ককে রক্ষা করাই তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য বলে তিনি স্থির করেন। তিনি ধ্বনি তোলেন "হয় বিদেশীর বিরুদ্ধে যুদ্ধজয় অথবা ধ্বংস" (win or perish)। তুর্কী জাতীয় বাহিনীতে দেশপ্রেমিক সুলতানী সেনারা যোগ দেয়। গ্রীক সেনা তুরস্কের রাজধানী এ্যাঙ্গোরা দখলের চেষ্টা করে। কিন্তু স্যাকারিয়া নদের (Saquriah) যুদ্ধে কামাল পাশা গ্রীক সেনাদলকে ছত্রভঙ্গ করেন। গ্রীকদের বহু ক্ষয়-ক্ষতি হয়। সোভিয়েত রাশিয়া কামাল পাশাকে অস্ত্রসাহায্য দিলে তাঁর পক্ষে জয়লাভ সহজ হয়। গ্রীসের প্রধান সেনাপতি যুদ্ধে বন্দী হন। এই জাতীয় জয়কে উপলক্ষ করে বাংলার কবি কাজী নজরুল গান "কামাল তুমি কামাল কিয়া ভাই।" কামাল পাশা তাঁর সেনাদল সহ দার্দানালিস পার হয়ে স্মার্না বা থ্রেস আক্রমণের উদ্যোগ নেন। কিন্তু দার্দানালিসে ব্রিটিশ নৌবহর তাঁর গতিরোধ করে। ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পাবেন যে, জেগে ওঠা তুর্কী জাতীয়তাবাদকে প্রতিহত করতে হলে অনেক রক্ত ঝরবে। তাঁরা অবস্থা খারাপ বুঝে গ্রীসের পক্ষ ত্যাগ করেন।

গ্রীক-তুরস্ক যুদ্ধ : স্যাকারিয়ার যুদ্ধ

বিজয়ী কামাল পাশা "গাজি" অর্থাৎ বিজয়ী নামে সম্মানিত হন। তিনি আঙ্কারা প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন। সুলতান ষষ্ঠ মহম্মদকে পদচ্যুত করা হয়। সুলতানী শাসনকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। যদিও ইংরাজের পরামর্শে সুলতান কামাল পাশাকে বিধর্মী ঘোষণা করে হত্যার আদেশ দেন, তাতে কোন ফল হয় নি। তুর্কীজাতির বৃহত্তর অংশ, নবীন প্রজন্মের তুর্কীরা মুস্তাফা কামালকে সমর্থন জানায়। ইতিমধ্যে ফরাসী সরকার কামাল পাশার আঙ্কারা প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দিলে কামাল পাশার অবস্থার দারুণ উন্নতি হয়। সোভিয়েত রাশিয়া আগেই স্বীকৃতি দিয়েছিল। ফ্রান্স স্বীকৃতি দেওয়ায় ব্রিটেন উদ্যম হারিয়ে ফেলে। ব্রিটেন বুঝতে পারে যে, ফ্রান্সের সহযোগিতা ছাড়া ব্রিটেনের পক্ষে এককভাবে তুরস্ক অধিকার করা সম্ভব হবে না।

এর ফলে মিত্রশক্তি কামাল পাশার আঙ্কারা সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। সেভরের সন্ধি পরিবর্তন করে ল্যাসেনের সন্ধি, ১৯২৩ খ্রীঃ তুরস্কের সঙ্গে স্বাক্ষর করে। (ল্যাসেনের সন্ধির শর্তাবলী ৮ম অধ্যায়, ৭ম পরিচ্ছেদ পৃঃ ১৪২ দ্রষ্টব্য)। ল্যাসেনের সন্ধি-স্বাক্ষরের সময় কামাল পাশা রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় দেন। তিনি তুরস্কের সাম্রাজ্যের অ-তুর্কী আরব প্রজাদের উপর দাবি ত্যাগ করে কেবলমাত্র তুর্কী ভাষাভাষী তুর্কীদের দ্বারা জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগঠনের নীতি নেন। তুরস্কে যে সকল গ্রীক বাস করত, তাদের গ্রীসে পাঠিয়ে গ্রীসে বসবাসকারী তুর্কীদের তিনি স্বদেশে ফিরিয়ে নেন। স্মার্না বা পূর্ব-থ্রেস তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর্মেনিয়া ভাগ করে তুরস্ক ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে দেওয়া হয়। দার্দানালিস প্রণালীর উপর তুরস্কের একচেটিয়া দাবি সীমিত করা হয়। এর পর তিনি তুর্কী সংবিধান রচনা ও অন্যান্য সংস্কারের কাজে হাত দেন। কামাল পাশা হলেন আধুনিক তুরস্কের জনক। "কামাল তুমি কামাল কিয়া ভাই" কবি নজরুলের এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। কামাল পাশার বা কামাল আতাতুর্কের জন্ম ১৮৮০ খ্রীঃ এবং মৃত্যু ১৯৩৮ খ্রীঃ হয়।

ল্যাসেনের সন্ধি ১৯২৩ খ্রীঃ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : তুরস্কের আধুনিকীকরণ (Modernisation of Turkey) : সাম্রাজ্যবাদী, রাজ্যলোলুপ ইওরোপীয় শক্তিগুলির আক্রমণ থেকে তুরস্কের স্বাধীনতা রক্ষা এবং ল্যাসেনের শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর মুস্তাফা কামাল পাশার একমাত্র কৃতিত্ব ছিল না। "ইওরোপের রুগ্নমানুষ" (sick man of Europe) বলে কথিত তুরস্ককে আধুনিক ভাবধারায় ও জাতীয়তাবাদে অনুপ্রাণিত তুরস্ক রূপে গঠন করা ছিল তাঁর প্রধান কর্মকৃতি। এজন্যে কামাল পাশাকে 'আধুনিক তুরস্কের' জনক বলা যায়।

১৯২২ খ্রীঃ তিনি জাতীয় সভার সাহায্যে তুরস্কের সুলতানের পদ লোপের প্রস্তাব পাস করান। সুলতান ষষ্ঠ মহম্মদকে দেশদ্রোহিতার জন্যে বিচারের আদেশ দেওয়া হলে তিনি ইংলন্ডে পালান। (২) তুরস্ক একটি প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষিত হয়। কামাল পাশা এই প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত হন। বাস্তবপক্ষে সংবিধানে কামাল পাশার হাতে এত বেশী ক্ষমতা দেওয়া হয় যে, তিনি ইচ্ছা করলে স্বৈরাচারী হতে পারতেন। কিন্তু তিনি বিরল কর্তব্যনিষ্ঠা দেখান।(৩) মুস্তাফা কামাল জানতেন যে তুরস্কের আধুনিকীকরণের পথে প্রধান বাধা হল তার ধর্মীয় গোঁড়ামি। এজন্য তিনি পুরাতনতন্ত্রকে ভেঙ্গে ফেলেন। তুর্কী সুলতান যে খলিফা বা ধর্মগুরুর পদ ভোগ করতেন তা ১৯২৪ খ্রীঃ লোপ করা হয়। এই পদ লোপের ফলে মধ্যযুগের ধর্মীয় শাসনব্যবস্থার সঙ্গে তুরস্কের সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে যায়। (৪) তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়। কোরান ও শরীয়তের ভিত্তিতে প্রচারিত পুরাতন আইনগুলি রদ করা হয়। সরকারী কর্মচারীদের রাষ্ট্রের নামে শপথ নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ধর্মীয় প্রচার নিষিদ্ধ হয়। (৫) তুরস্কের ইসলামীয় মঠ, দরগাগুলির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্কে আধুনিক সংস্কার

ওয়াকফ বাজেয়াপ্ত করা হয়। দরগার দরবেশদের গঠনমূলক কাজকর্মের দ্বারা জীবিকা অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়। (৬) ধর্মীয় বিদ্যালয় লোপ করে ধর্মনিরপেক্ষ সরকারী বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। ইওরোপীয় অধ্যাপকদের পাঠদানের জন্যে নিয়োগ করা হয়। বিজ্ঞানচর্চা, ফরাসী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। (৭) তুরস্কের আইনব্যবস্থার আমূল সংস্কার করা হয়। সুইজারল্যান্ডের দেওয়ানী আইন, ইতালীর ফৌজদারী আইন ও জার্মানীর বাণিজ্যিক আইনের আদলে তুরস্কে নূতনভাবে আইন প্রণয়ন করা হয়। (৮) তুরস্কে গোঁড়ামি ও পুরাতনতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্যে ইসলামের প্রতীক হিসাবে "ফেজ টুপি" ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। ইওরোপীয় টুপি ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়। পুরাতনপন্থীরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধালে তা কঠোর হাতে দমন করা হয়। (৯) পুরুষের বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হয়। (১০) নারীদের পর্দা নিষিদ্ধ হয়। নারীদের চাকুরি, শিক্ষা, ভোটদান ও সর্বক্ষেত্রে পুরুষদের সমান অধিকার দান করা হয়। নারীদের বোরখা ছেড়ে পাশ্চাত্য পোশাক পরার অধিকার দেওয়া হয়। (১১) বিবাহের জন্যে নারী ও পুরুষের নিম্নতম বয়স ধার্য করা হয়। বাল্য-বিবাহ নিষিদ্ধ হয়। (১২) আরবী ও ফারসী হরফ বন্ধ করে ল্যাটিন হরফে তুর্কী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করা হয়। ফলে তুর্কীভাষা প্রচারের জন্যে টাইপরাইটার ব্যবহার সহজ হয়। এই হরফ চালু হলে তুরস্কে নিরক্ষরতা দূর করা সহজ হয়। বয়স্ক শিক্ষার জন্যে নৈশ বিদ্যালয় এবং ৭ বছরের শিশুর জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়। (১৩) স্বাধীনতার বিচারালয় নামে বিশেষ আদালত স্থাপন করে রাষ্ট্রবিরোধী সকল ব্যক্তি ও প্রথাকে দমন করা হয়। (১৪) এছাড়া দশমিক মুদ্রা, দশমিক প্রথায় ওজন, মাপ ও আধুনিক কারিগরী বিদ্যার প্রয়োগ, আধুনিক প্রথায় কৃষির প্রচলন করা হয়। ইসলামীয় চান্দ্রমাসের বর্ষপঞ্জী ত্যাগ করে ইওরোপীয় গ্রোগারীয় বর্ষপঞ্জী চালু করা হয়। (১৫) প্রতি তুর্কী নাগরিককে তার পারিবারিক উপাধি গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়। এই নিয়ম অনুসারে কামাল পাশার উপাধি হয় আতাতুর্ক। (১৬) কামাল পাশা তুরস্কের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে শিল্প-কারখানা ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের নীতি নেন। রাশিয়ার অনুকরণে তুরস্কে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু করা হয়। এর ফলে ১৯৩৯ খ্রীঃ তুরস্ক তার প্রয়োজনীয় বস্ত্রের ৮০%, পশম-বস্ত্রের ১০০% ভাগ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। লোহা, কয়লা, ইস্পাত প্রভৃতি ভারী শিল্পের প্রভূত অগ্রগতি হয়। তুরস্ক নবজীবন লাভ করে।

এভাবে কামাল পাশা আধুনিক তুরস্কের ভিত্তি স্থাপন করেন। তবে মুস্তাফা কামাল পাশার

সংস্কারের ফলে তুরস্কের সমাজব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন হয় নি। ধনীরা ধনী ও গরীবরা গরীবই থাকে। তিনি সমাজে যাদের হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ ও সম্পদ ছিল, তা রাষ্ট্রীয়করণ করার আইনের কোন ব্যবস্থা করেন নি। যদিও সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে তাঁর মিত্রতা ছিল, তিনি রাশিয়ার অর্থনৈতিক সংস্কার থেকে কোন শিক্ষা নেন নি। তিনি জমিদারী প্রথা লোপ করেন নি। ফলে তুরস্কে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য থেকেই যায়। যদিও তিনি কামালবাদের ছয়টি নীতি ঘোষণা করেন, যথা—প্রজাতন্ত্রবাদ, জাতীয়তাবাদ, জনসার্বভৌমত্ববাদ, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, বিপ্লববাদ; কিন্তু তিনি সমাজতন্ত্রবাদের অথবা অর্থনৈতিক সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শকে উপেক্ষা করেন।

কামাল পাশার সংস্কারের সমালোচনা

সারণী

[ক] ১৯০৮ খ্রীঃ থেকে আরব দেশগুলি তুরস্কের শাসনমুক্ত হতে চেষ্টা করে। এর ফলে আরব জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়। আরব জাতীয়তাবাদীরা তুরস্কের সুলতানের হাত থেকে খলিফার পদ হজরত মহম্মদের কোন বংশধরের হাতে দিতে স্থির করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের প্ররোচনায় ব্রিটিশের শত্রু তুর্কী সুলতানের বিরুদ্ধে আরবরা বিদ্রোহ করে। যুদ্ধের পর ল্যসেনের সন্ধির দ্বারা তুর্কী সুলতান আরবদেশের উপর তাঁর অধিকার ছেড়ে দেন। ব্রিটেন ও ফ্রান্স লীগের ম্যাণ্ডেটের মাধ্যমে তৈল সমৃদ্ধ আরবদেশকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। প্যালেস্টাইন, ইরাক ও জর্ডান ব্রিটিশ ও সিরিয়া ফরাসী ম্যাণ্ডেটে পরিণত হয়। সিরিয়ার জাতীয়তাবাদকে দমনের জন্যে ফরাসী কর্তৃপক্ষ সিরিয়াকে, সিরিয়া ও লেবানন এই দুই ভাগে ভাগ করে। শেষ পর্যন্ত ফরাসী সিরিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার লাভ করে। প্যালেস্টাইনে ব্রিটেনের সহযোগিতায় ইহুদীরা অনুপ্রবেশ করে তাদের বাসভূমি গঠনের চেষ্টা করে। ১৯২৮-১৯৩৯ খ্রীঃ পর্যন্ত এজন্যে আরব-ইহুদি দাঙ্গা চলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন সহযোগিতায় ও জাতিপুঞ্জের প্রস্তাব অনুসারে ইহুদিরা প্যালেস্টাইনের একাংশে ১৯৪৮ খ্রীঃ ইসরায়েল নামে এক স্বাধীন ইহুদি রাষ্ট্র স্থাপন করলে আরব দেশগুলির সঙ্গে অনুপ্রবেশকারী ইহুদিদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। জর্ডানে ব্রিটিশ শক্তি রাজা হুসেনের পুত্র আবদুল্লাকে সিংহাসনে বসিয়ে কার্যতঃ ব্রিটেনের ক্রীড়ানক শাসন চালাতে থাকে। ইরাকে ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেট স্থাপিত হওয়ার পরে ইরাকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চাপে ১৯৩০ খ্রীঃ ব্রিটিশ সরকার শর্তসাপেক্ষে ইরাকের স্বাধীনতা মেনে নেয়। মিশরে সুয়েজ খাল ও মিশরের উপর ব্রিটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে সাদ জগলুল পাশা ওয়াফদ দলের মাধ্যমে আন্দোলন চালান। ১৯২২ খ্রীঃ মিশর তার স্বাধীনতা ঘোষণা করলেও ব্রিটিশ সরকার ফৌদ ও তারপর ফারুককে ক্রীড়ানক হিসাবে মিশরের সিংহাসনে রাখে। অবশেষে কর্ণেল নাসেরের নেতৃত্বে মিশরীয় জাতীয়তাবাদীরা ফারুককে বিতাড়িত করে মিশরে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে ও সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করে।

[খ] তুরস্ককে "ইওরোপের রুগ্ন মানুষ" বলে অভিহিত করা হত। মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ ও সংস্কার বিমুখিতা থেকে "তরুণ তুর্কী" সংগঠন মুক্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু তরুণ তুর্কী বা অ-তুর্কী প্রজাদের উপর তুর্কীকরণ নীতি চাপিয়ে দিলে গণ্ডগোল দেখা দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক পরাজিত হলে তুরস্কের উপর সেভরের সন্ধি চাপিয়ে দেয়। ব্রিটিশ সরকার তুরস্ককে আশ্রিত দেশে পরিণত করার চেষ্টা করেন। তুরস্কের এই সঙ্কটের সময় মুস্তাফা কামাল পাশা সেভরের সন্ধির প্রতিবাদ করেন এবং ইংরাজের সহযোগী গ্রীকদের তুরস্ক আক্রমণে বাধা দেন। তিনি তুর্কী জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস ডেকে সেভরের সন্ধি নাকচ করেন এবং "হয় বিদেশীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ অথবা তুরস্কের ধ্বংস" এই ধ্বনি তোলেন। আক্রমণকারী গ্রীক সেনাদলকে পরাজিত করে তিনি গাজী উপাধি পান এবং তুর্কী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন। শেষ পর্যন্ত ল্যসেনের সন্ধির দ্বারা কামাল পাশার প্রজাতন্ত্রকে মিত্রশক্তি স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

[গ] "ইওরোপের রুগ্ন মানুষ" তুরস্ককে আধুনিক সংস্কার দ্বারা নবজীবন দানের উদ্দেশ্যে তুরস্কে প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান প্রবর্তিত হলে কামাল পাশা রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন। তুরস্কের সুলতান পদ লুপ্ত হয়। তুরস্ক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হয়; মঠ ও দরগা বাজেয়াপ্ত করা হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন, আইন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, ল্যাটিন ভাষা ও দশমিক মুদ্রা, কারিগরী বিদ্যার প্রসার দ্বারা নবীন তুরস্ক গঠন করা হয়। তবে কামাল পাশা ধনবণ্টনে বৈষম্য দূর করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা থেকে বিরত থাকেন। তিনি নবীন তুরস্কের জন্যে ছয়টি নীতি ঘোষণা করেন।

অনুশীলনী

১। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

(ক) আরবজাতি কোন্ কোন্ দেশে বসবাস করে? (খ) কখন আরবজাতির মধ্যে রেনেসাঁস বা জাগৃতি-আন্দোলন দেখা দেয়? (গ) কে আরবজাতিকে বিদ্রোহে প্ররোচনা দেয়? (ঘ) আরবজাতি কার নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে? (ঙ) ম্যাণ্ডেট কাকে বলে? (চ) আরবদেশের উপর ব্রিটেনের কেন লুব্ধ দৃষ্টি ছিল? (ছ) কোন্ সালে এবং কার প্রভাবে ইস্রায়েল রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়? (জ) কোন্ সালে ইরাক স্বাধীনতা লাভ করে? (ঝ) কে মিশরীয়দের "মুকুটহীন সম্রাট" ছিলেন? (ঞ) মিশরের জাতীয় দলের নাম কি ছিল? (ট) কার নেতৃত্বে মিশরে জাতীয় বিপ্লব ঘটে? (ঠ) কাকে "ইওরোপের রুগ্ণ মানুষ" বলা হত? (ড) ইয়ং টার্ক বা তরুণ তুর্কী কাদের বলা হয়? (ঢ) কয়েকজন বিশিষ্ট তরুণ তুর্কী নেতার নাম কর। (ণ) কোন্ যুদ্ধে কামাল পাশা গ্রীকদের পরাস্ত করেন? (ত) কামাল পাশার কোন্ সালে জন্ম ও কোন্ সালে মৃত্যু হয়? (থ) কাকে 'আধুনিক তুরস্কের জনক' বলা হয়?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

(ক) কিভাবে আরব জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয় তাহা বর্ণনা কর। (খ) বার্লিন-চুক্তির পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা কিভাবে তুর্কী সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদের পরিকল্পনা করে তার বিবরণ দাও। (গ) ম্যাণ্ডেট প্রথা কি? আরবদেশের উপর ব্রিটিশ ও ফরাসীরা কিভাবে ম্যাণ্ডেট প্রথা প্রয়োগ করে? (ঘ) কিভাবে সিরিয়ার আরবরা ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে তাদের দেশকে মুক্ত করে? (ঙ) প্যালেস্টেনীয় সমস্যা কি এবং পশ্চিমী শক্তিগুলি কিভাবে এই সমস্যা সৃষ্টি করে তাহা বর্ণনা কর। (চ) মিশরে জাতীয়তাবাদীদের উত্থান ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিবরণ দাও। (ছ) মুস্তাফা কামাল পাশা কে ছিলেন এবং তিনি কিভাবে তুরস্ককে বৈদেশিক শক্তির গ্রাস হতে রক্ষা করেন তার বিবরণ দাও। (জ) কিভাবে কামাল পাশার নেতৃত্বে আধুনিক সংস্কার প্রবর্তন হয়?

দশম অধ্যায়

রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের সংস্কার-নীতি : রুশ-বিপ্লব (১৮৬১ খ্রীঃ—১৯২৮ খ্রীঃ)

প্রথম পরিচ্ছেদ : জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের ভূমিদাস-মুক্তির আইন, ১৮৬১ খ্রীঃ (The Emancipation of the Serfs by Czar Alexander II, 1861) : রাশিয়ায় সপ্তদশ শতকের গোড়ায় মিখাইল রোমানভ নামে এক ব্যক্তি রোমানভ রাজবংশের পত্তন করেন। প্রায় তিনশত বছরের বেশী এই রাজবংশ রাশিয়ায় স্বৈরতন্ত্রী শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন করে। রোমানভ বংশের রাজারা "জার" (Czar অথবা Tzar) উপাধি নেন। 'জার' কথাটি রোমান সিজারের (Caesar) রুশ-রূপ। জার সরকারের শাসনে রাশিয়ায় সকল প্রকার উদারতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক দাবি দমিত হয়। সংবিধান প্রবর্তনের জন্যে ডেকাব্রিস্ট বিদ্রোহীরা জার প্রথম নিকোলাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় তাদের কড়া হাতে দমন করা হয়।

জারের শাসনকালে রুশ-কৃষকদের অবস্থা ছিল খুবই করুণ। ব্রুম (Broom) নামক অর্থনীতিবিদের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, রাশিয়ার মোট জনসংখ্যার $\frac{৩}{৪}$ অংশ ছিল কৃষক। ব্রুমের পরিসংখ্যানের মতে এই কৃষকদের মধ্যে ৪৪·৫ শতাংশ ছিল ভূমিদাস। বাকী কৃষকদের বেশির ভাগ ছিল প্রান্তিক, গরীব, কায়ক্লেশে চলা স্বাধীন কৃষক। রুশ ভূমিদাসদের অবস্থা ছিল সর্বাপেক্ষা খারাপ। পশ্চিম ইওরোপের ভূমিদাসরা কেবলমাত্র জমিসংক্রান্ত বিষয়ে জমিদারের অধীন ছিল, কিন্তু রুশদেশের ভূমিদাসরা ছিল প্রকৃতপক্ষে ক্রীতদাস। কারণ, জমি সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ তারা বহন করত, তদুপরি তারা জমি-মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হত। ভূস্বামীরা তাদের কারখানায় ভাড়া খাটাতে পারত। দরকার হলে উদ্বৃত্ত ভূমিদাসদের ভূস্বামী বিক্রি করতেও পারত। ভূমিদাসরা নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে বংশানুক্রমিকভাবে ভূমিদাস হিসাবেই জীবন কাটাতে বাধ্য হত। গ্রাম ছেড়ে বাইরের জগতে অন্য জীবিকা খোঁজার তাদের অধিকার ছিল না। কারণ ভূমিদাস ছিল সামন্ত-প্রভুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সামন্ত-প্রভুর খামারে তাকে বেগার খাটতে হত। বিনিময়ে সামন্ত-প্রভু তাকে কিছু জমি চাষের জন্যে দিতেন। কিন্তু সেই জমির মালিকানা তার হাতে ছিল না। সেই জমির জন্যে তাকে নানা প্রকার কর দিতে হত। সুতরাং ভূমিদাসের জীবনে অন্ধকার ছাড়া আলোকের কোন অনুপ্রবেশ ঘটত না। ভূমিদাসদের এই দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ জীবনের চিত্র লিও টলস্টয় তাঁর 'রিসারেকসান' নামে উপন্যাসে, তুর্গেনিভ "স্পোর্টসম্যান স্কেচেস" নামক গল্পে চিত্রিত করেছেন।

রুশ ভূমিদাসদের অবস্থা

পশ্চিম ইওরোপে ফরাসী-বিপ্লব ও শিল্প-বিপ্লবের ফলে সমাজে যে পরিবর্তন হয়, তার ফলে ভূমিদাস-প্রথা লোপ পায়। কিন্তু রাশিয়া ছিল পশ্চিম ইওরোপের তুলনায় দারুণ অনগ্রসর দেশ। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে জারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন জার প্রথম নিকোলাস বা প্রথম নিকি। তিনি ছিলেন ভয়ানক রক্ষণশীল ও স্বৈরতন্ত্রী। সুতরাং রাশিয়ার বুদ্ধিজীবী ও

জাতীয়তাবাদীরা রাশিয়ায় গণতন্ত্র, সংবিধান প্রবর্তন ও ভূমিদাস-প্রথার উচ্ছেদ দাবি করলে তিনি প্রচণ্ড দমননীতির দ্বারা এই দাবির কণ্ঠরোধ করেন। ফলে রুশ-ভূমিদাসশ্রেণী নিরতিশয় দারিদ্র্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারহীন দাসত্বের মধ্যে জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। ভূমিদাস ও কৃষকরা রুশ-সামন্ত প্রথা ও শোষণের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করত। রাশিয়ার কৃষক-বিদ্রোহ ও ভূমিদাস-বিদ্রোহ ছিল প্রায় একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কারণ রুশ-জনসংখ্যার ৫·৮% ভাগ ভূস্বামী বাকী কৃষক ও ভূমিদাসদের পদানত করে রেখেছিল। কিন্তু জার নিকোলাস পুরাতনতন্ত্রকে রক্ষা করা তাঁর পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করতেন। যদি সামন্ত-প্রভু কৃষক-বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হত, তবে সরকারী কশাক সেনার তীক্ষ্ণ তরবারি কৃষকের কণ্ঠনালী ছেদ করত।

ভূমিদাস বিদ্রোহ ও জার প্রথম নিকোলাসের দমন নীতি

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ও শিল্প-বিপ্লবের ধাক্কা রুশ-সমাজব্যবস্থা ও ভূমিদাস-প্রথার অচলায়তনে বিরাট ফাটল সৃষ্টি করে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে (১৮৫৫-৫৬ খ্রীঃ) জার প্রথম নিকোলাস রুশ-সেনাদের শোচনীয় পরাজয়ের পর অনুভব করেন যে, রুশ-সমাজব্যবস্থায় একটি বড় রকমের গণ্ডগোল থাকার জন্যে রাশিয়ার এই অপমানজনক পরাজয় ঘটেছে। নেপোলিয়ন-বিজয়িনী রাশিয়া ক্রিমিয়ার যুদ্ধে নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র তৃতীয় নেপোলিয়নের হাতে পর্যুদস্ত হয়েছে। ভূমিদাসদের নিয়ে গঠিত সেনাদল দ্বারা আধুনিক যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব হবে না,—একথা নিকোলাস ও তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আলেকজাণ্ডারের বুঝতে দেরী হয় নাই। কারণ ভূমিদাস-সেনা যুদ্ধে উদ্যম দেখায় না। যুদ্ধে জয় বা পরাজয় তাদের প্রভাবিত করে না।। ভূমিদাস-সেনা শারীরিকভাবে দুর্বল ও অপটু এবং আধুনিক অস্ত্রব্যবহারে অশক্ত। সুতরাং জার নিকোলাস ও তাঁর পুত্র যুবরাজ আলেকজাণ্ডার ভূমিদাস-প্রথার উচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা সম্যক উপলব্ধি করেন। দ্বিতীয়তঃ, রাশিয়ায় বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ-আবাদ ও ক্ষুদ্রাকারে শিল্প-বিপ্লব ঘটছিল। বংশানুক্রমে জমি চাষ করে ও ভূস্বামীদের শাসনে আধমরা জীবন কাটিয়ে ভূমিদাস-শ্রমিক এমনই অকর্মণ্য হয়ে যায় যে, তাদের দ্বারা ক্ষেতে-খামারে বেশী উৎপাদন ও কলে-কারখানায় কাজ করানো কঠিন ছিল। ভূমিদাসরা মালিকদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন আর তেমনভাবে মেটাতে পারছিল না। স্বাধীন, ভাড়াটিয়া মজুররা ক্ষেতে-খামারে ও কারখানায় ভূমিদাসদের অপেক্ষা অনেক বেশী উৎপাদন করতে সক্ষম ছিল। সুতরাং, অনেক মালিক ভূমিদাস প্রথাকে যুগের অনুপযোগী বলে মনে করতে থাকে। দক্ষিণ রাশিয়ার কালোমাটি অঞ্চলে বড় খামার-মালিকরা খামারে ব্যাপক হারে গম উৎপাদন করত ও গম রপ্তানি করত। তারা বেতনভোগী শ্রমিক নিয়োগ করে কম খরচায় বেশী উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। তাদের কাছে ভূমিদাসরা বোঝার মতই হয়ে যায়। এভাবে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে ভূমিদাস-প্রথার উপযোগিতা কমতে থাকে। কিন্তু তখনও রাশিয়ার জনসংখ্যার ৪৪·৫% ছিল ভূমিদাস।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয় ও ভূমিদাস-প্রথার উচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি

জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার সকল দিক পর্যালোচনা করে রাশিয়ায় ভূমিদাস-প্রথা উচ্ছেদের সঙ্কল্প নেন। জার আলেকজান্ডার কেন ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদ করেন, এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। জারবিরোধী ঐতিহাসিক পেক্রোভিকের মতে, ভূমিদাস-প্রথা আর লাভজনক ছিল না। সুতরাং সরকারের স্তম্ভ-স্বরূপ অভিজাত বা জমিদারের স্বার্থরক্ষার জন্যে জার সরকার ভূমিদাস-প্রথা উচ্ছেদ করে তার বদলে জমিদারদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা

জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদ নীতি গ্রহণের কারণ

করেন। কোন কোন রুশ ঐতিহাসিক[১] এই মত সমর্থন করে বলেছেন যে, "এই তথাকথিত মহাসংস্কারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল বৃহৎ ভূস্বামীদের সর্বাধিক আর্থিক লাভের বন্দোবস্ত করা।'—এই মত অনেক ঐতিহাসিক মানেন না। কারণ এই সংস্কারের ফলে জমিদারশ্রেণী বিশেষতঃ উত্তর রাশিয়ায় জমিদারশ্রেণী প্রকৃতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা ভূমিদাসদের সাহায্যে কারখানা প্রভৃতি চালু রেখেছিল। উত্তর রাশিয়ার জমি ছিল অনুর্বর। এজন্য ভূমিদাসদের কারখানার কাজে লাগানো হত। এজন্য তারা বেতন পেত না। ভূমিদাসরা মুক্ত হলে তাদের বিনা বেতনে কাজের লোক খোয়া যায়। আসলে ভূমিদাস-প্রথা উচ্ছেদের জন্যে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় ছিল একটি বড় কারণ। এ বিষয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থায় উন্নত কৃষির প্রয়োজনে ও বেশী উৎপাদনের তাগিদে ভূমিদাস-প্রথা তার উপযোগিতা হারায়। কারণ ভূমিদাস শ্রমিক ছিল উদ্যমহীন, উৎপাদন-বিমুখ। ভূমিদাসদের ভবিষ্যৎ কিছু না থাকায় কর্মে তাদের উৎসাহ ছিল না। সুতরাং রাশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যেই ভূমিদাস-প্রথার উচ্ছেদ আবশ্যিক ছিল। তৃতীয়তঃ, মানসিক কারণও কাজ করেছিল। সাহিত্যিকরা, সমাজসংস্কারকরা, মানবতাবাদী লোকেরা ভূমিদাস-প্রথার নিন্দা করেন। শিক্ষিত দেশপ্রেমিক রুশরা এই প্রথার বিরোধিতা করতে থাকেন। টলস্টয়ের 'রিসারেকসান' উপন্যাসের অভিজাত যুবক শিক্ষিত নায়ক ছিলেন এর দৃষ্টান্ত।চতুর্থতঃ, ভূমিদাস ও কৃষক-বিদ্রোহ ঘন ঘন হতে থাকায় তা দমনের জন্যে সরকারকে বারে বারে সামরিক হস্তক্ষেপ করতে হয়। এজন্যে সরকারের ব্যয় বাড়ে। জার প্রথম নিকোলাসের আমলে অন্ততঃ ৫০০ ভূমিদাস-বিদ্রোহ ঘটে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের প্রাক্‌কালে এই যুদ্ধে যোগদানের আদেশের বিরোধিতা করে ভূমিদাসরা বিদ্রোহ করে। সুতরাং ভূমিদাস-প্রথা আর যুগোপযোগী ছিল না। জার আলেকজাণ্ডার মনে করেন যে, একটি পচনশীল, গলিত, যুগের অনুপযোগী ব্যবস্থাকে ধরে রাখার জন্যে জার-সরকারের আর চেষ্টা করা উচিত নয়। এই অন্তঃসারশূন্য, শোষণমূলক ব্যবস্থার অবসান ঘটানো দরকার। নাহলে হয়ত রাশিয়ায় বৃহত্তর বিপ্লব ঘটে যেতে পারে। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার বলেন যে, "এখন এমন সময় এসেছে যে, যদি উপরতলা থেকে সংস্কার ও সামাজিক বৈষম্য লোপ না করা হয়, তবে তা নিচের তলা থেকেই করা হবে। নিচের তলা থেকে এই সংস্কার ও বিলুপ্তি হওয়া অপেক্ষা উপর থেকে তা হওয়াই ভাল।"

ভূমিদাস-প্রথা কিভাবে উচ্ছেদ করা যাবে এ সম্পর্কে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করেন। তিনি এই বিশেষজ্ঞ কমিটির সাহায্যে ভূমিদাস মুক্তির ঘোষণাপত্র (Emancipation Act) জারী করেন। এই আইনটি পাঁচটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, যথা—(ক) ভূমিদাসদের মুক্ত ও স্বাধীন নাগরিক হিসাবে গণ্য করা; (খ) মুক্ত ভূমিদাসদের জীবিকার জন্যে জমি দান করা; (গ) অভিজাত বা সামন্তদের জমির ক্ষতিপূরণ দান করা; (ঘ) সমগ্র ব্যবস্থাটি শান্তিপূর্ণ উপায়ে সম্পন্ন করা। (ঙ) ভূমিদাসদের মুক্তির জন্যে ভূস্বামীদের কোন ক্ষতিপূরণ না দিয়ে, ভূমিস্বামীদের ৫০% জমি ভূমিদাসদের দান করা। সেজন্য ক্ষতিপূরণ দান। এই পাঁচটি নীতিকে কার্যে পরিণত করার জন্যে ভূমিদাস-আইনে বলা হয় যে—(১) রাশিয়ায় সকল ভূমিদাস এখন থেকে মুক্ত বা স্বাধীন নাগরিকে পরিণত হবে। জারের নিজস্বখাস জমিতে যে সকল ভূমিদাস ছিল তারাও মুক্তি পাবে। ভূমিদাসরা জমিদারদের হাতছাড়া হওয়ার দরুন কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না। (২) মুক্ত ভূমিদাসরা জমিদারের যে জমি আগে আবাদ করত তার অর্ধেক জমির উপর অধিকার পাবে। (৩) বাকী অর্ধেক জমি

ভূমিদাস উচ্ছেদ আইন ১৮৬১ খ্রীঃ

১ Gusev and Naumov—Short History of U. S. S. R.

জমিদারের স্বত্বে থাকবে। (৪) এই জমির জন্যে জমিদারদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। (৫) ল্যান্ড ম্যাজিস্ট্রেট নামক কর্মচারীরা জমিদার ও মুক্ত ভূমিদাসের মধ্যে জমি ভাগ করে দিবেন এবং জমিদারকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণ ধার্য করবেন। (৬) জমির মালিকানা ভূমিদাসদের হাতে না দিয়ে গ্রামের 'কমিউন' বা মীরগুলির হাতে দেওয়া হবে। (৭) সরকার আপাততঃ জমিদারদের ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধ করবেন। (৮) মুক্ত ভূমিদাসরা সরকারকে ৪৯ বছরের কিস্তিতে বার্ষিক ৬ $\frac{১}{২}$% হার সুদে এই অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। (৯) কয়েকটি কমিউন বা মীরের সমন্বয়ে 'ক্যান্টন'গঠিত হবে। ক্যান্টন আদালতে জমিসংক্রান্ত বিরোধের বিচার হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ভূমিদাসমুক্তি আইনের ফলাফল (Effects of the Emancipation Act) : দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের ভূমিদাস উচ্ছেদ আইনকে ঐতিহাসিকরা রাশিয়ায় আধুনিক যুগে প্রবেশের প্রথম পদক্ষেপ বলে মনে করেন। এই সংস্কারকে জারের দরবারের ঐতিহাসিকরা "মহাসংস্কার" (Great Reform) নামে অভিহিত করেন। জার এজন্যে "মুক্তিদাতা জার" (Czar Liberator) নামে পরিচিত হন। কিন্তু তাঁর এই আইনের বহু ত্রুটি থাকায় তা সফল হয় নি। মুক্ত ভূমিদাসদের যে জমি দেওয়া হয়, সেই জমির জন্যে যে অর্থ ধার্য করা হয় তা জমির ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। ১৮৬১ খ্রীঃ এই জমির বাজারদাম ছিল ৫৪৪ মিলিয়ন রুবল। কিন্তু ক্ষতিপূরণের অর্থ ধার্য করা হয় ৮৬৭ মিলিয়ন রুবল।[১] অপর একটি মত হল যে, ভূমিদাসদের যে জমি দেওয়া হয়, তার মোট দাম ২৮৪ মিলিয়ন রুবলের বেশী ছিল না। অথচ শুধু উত্তর রাশিয়ার জমির জন্যে ভূমিদাসদের ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে হয় ৩৪১ মিলিয়ন রুবল।[২] ভূমিদাসরা বছর বছর ক্ষতিপূরণের কিস্তির টাকা ও অন্যান্য সরকারী কর দিতে বাধ্য হয়। উৎপন্ন ফসলের ২/৩ অংশ ছিল সরকারের ভূমিকর। তদুপরি, ক্ষতিপূরণের অর্থের চাপে ভূমিদাসরা প্রায় সর্বস্বান্ত হয়। এই কারণে মুক্তির আইনকে ভূমিদাসরা ঘৃণা করে। দ্বিতীয়তঃ, জমিগুলি ভাগ করার সময় ভাল উর্বরা জমিগুলি জমিদারদের ভাগে চলে যায়। জলসেচের কূপ, পুষ্করিণী, পশুচারণের জায়গা সকল কিছুই জমিদারের ভাগে পড়ে। মুক্ত ভূমিদাসদের ভাগে পড়ে বন্ধ্যা, বালুকাময় বা জলাজমি, যাতে ফসল খুব কম ফলত। তদুপরি, ক্ষেত বা জমির খণ্ডগুলিকে এমনভাবে ভাগ করা হত যে, জমিদারের ভাগের জমির জল, জলনিকাশী নালা, চারণক্ষেতের সাহায্য ছাড়া ভূমিদাস জমি আবাদ করতে পারত না। এই অসুবিধায় পড়ে মুক্ত ভূমিদাসদের নতশিরে আলাদা কর দিতে স্বীকৃতি দিয়ে জমিদারদের কাছে এই সকল সুযোগ নিতে হত। অথচ এই নিকৃষ্ট জমির জন্যে কৃষকদের বছর বছর মোটা টাকা ক্ষতিপূরণের জন্যে খোরাকির খাদ্যশস্য বিক্রি করে মেটাতে হত। মুক্ত ভূমিদাসদের যে জমি দেওয়া হয়, তা ছিল তাদের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এই জমির আয়ে মুক্ত-ভূমিদাসদের সারা বছরের ভরণপোষণ হত না। ফলে জমিদারদের হাতে যে ৫০% অবশিষ্ট জমি ছিল, তা চাষ করার জন্যে তারা বাধ্য হত। এই জমিচাষের জন্যে তাদের জমিদারদের চড়া হারে খাজনা দিতে হত।

ভূমি দাস উচ্ছেদ আইনের ফলাফল

মুক্ত-ভূমিদাসদের ক্ষোভের আর একটি কারণ এই ছিল যে, তারা জমির জন্যে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করলেও জমির মালিকানা তাদের হাতে এই আইনে দেওয়া হয় নি। গ্রামের কমিউন বা মীরগুলি সরকারের প্রাপ্য কর আদায়, সেনাসংগ্রহ প্রভৃতি কাজ করে দিত। এজন্যে কমিউনগুলির হাতে ভূমিদাসদের পাওনা অর্ধেক জমির মালিকানা ও বণ্টনের অধিকার দেওয়া

১ Gusev and Naumov—Short History of U. S. S. R.
২ Seton Watson.

হয়। মুক্ত-ভূমিদাসরা জমি দান, বিক্রি বা হস্তান্তরের অধিকার পায় নি। ফলে জমিদারের মালিকানার স্থলেগ্রাম কমিউনের যৌথ মালিকানা তাদের মেনে নিতে হত। এই মীর বা কমিউনগুলি ক্ষমতার অপব্যবহার করত। এই সভাগুলিতে জমিদারদের প্রাধান্য ছিল। জমির উপর কমিউনের মালিকানার ফলে কৃষির উন্নতি ব্যাহত হয়।

গ্রাম কমিউনের মালিকানা প্রথা

ভূমিদাস-মুক্তি আইনের পরেও গ্রামগুলিতে জমিদারদের আধিপত্য অক্ষুণ্ন ছিল। কারণ জমিদারদের সংখ্যাধিক্য মোট জনসংখ্যার ০·৮% অর্থাৎ ৩০ হাজার, অথচ এই স্বল্পসংখ্যক জমিদারের হাতে ছিল ৯৫ মিলিয়ন ডেসিয়াটিন সেরা জমি, ক্ষতিপূরণের প্রভূত অর্থ এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি। এছাড়া জমিদাররা ভোগ করত সরকারী চাকুরির অধিকার। আর ২ কোটি মুক্ত-ভূমিদাসের হাতে ছিল মাত্র ১১৬ মিলিয়ন ডেসিয়াটিন নিকৃষ্ট জমি, ক্ষতিপূরণের বোঝা, পেটে ক্ষুধার জ্বালা ও মনে হতাশা। স্বভাবতঃই তারা ক্রুদ্ধ হয়। ঘন ঘন বিদ্রোহের দ্বারা জার সরকারের এই অবাস্তব, অন্যায় আইনকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করে। মুক্তি-আইন পাস হওয়ার অব্যবহিত পরে অন্ততঃ ৪৬৯ বার কৃষক-বিদ্রোহ ঘটে।[১] শেষ পর্যন্ত ১৯০৫ খ্রীঃ বিদ্রোহের পর যখন ক্ষতিপূরণ-ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে, ততদিনে ভূমিদাসরা ³/₄ ভাগ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করেছিল।

কৃষক বিদ্রোহ

সকল কথা বলার পর একথা বলা দরকার যে, মুক্তিদাতা জারের ভূমিদাস-মুক্তির আইনের ত্রুটিগুলি বাস্তব সত্য ছিল সন্দেহ নেই। তথাপি, রাশিয়ার আধুনিক সমাজব্যবস্থার বিকাশের পথ এই আইন রচনা করে। বহু ভূমিদাস গ্রাম ছেড়ে শহর চলে আসে। তারাই শিল্প-শ্রমিকের জীবিকাবনেয়। রাশিয়ার পুঁজিবাদের বিকাশ, শিল্প-বিপ্লব ভূমিদাস-মুক্তি আইনের পর দ্রুত লয়ে ঘটতে থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজনৈতিক ও অন্যান্য সংস্কার (The Political and other reforms of Czar Alexander II) : জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার তাঁর পিতা জার প্রথম নিকোলাস অপেক্ষা উদার ও প্রগতিশীল স্বভাবের লোক ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার দমননীতিমূলক, রক্ষণশীল শাসনব্যবস্থাকে উদারতান্ত্রিক শাসনে পরিবর্তন করার চেষ্টা করেন। প্রথম নিকোলাসের রাজত্বের গোড়ার দিকে রাশিয়ায় সংবিধান ও উদারতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তনের দাবিতে এক বিদ্রোহ হয়। এই বিদ্রোহকে 'ডেকাব্রিস্ট' বিদ্রোহ বলা হয়। জার নিকোলাস ডেকাব্রিস্ট বিদ্রোহীদের কারাদণ্ড ও নির্বাসনদণ্ড দেন। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার এই সকল দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের মুক্তি দেন। তিনি প্রথম নিকোলাস স্থাপিত 'থার্ড সেকশন' নামে গুপ্ত পুলিশবাহিনী ভেঙে দেন এবং নিয়ন্ত্রণপরিষদ বা 'বোর্ড অফ সেন্সরশিপ' লোপ করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার ফিরিয়ে দেন। সংবাদপত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ লোপ করেন।

দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজনৈতিক সংস্কার

জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার রাশিয়ায় জারতন্ত্রের ক্ষমতা হ্রাস না করেও গ্রাম ও প্রদেশে কিছু পরিমাণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে রাজী হন। তিনি মনে করতেন যে, রাশিয়ার জার সরকার হলেন জাতীয় ঐক্যের প্রতিমূর্তি। তাঁর ক্ষমতা হ্রাস করলে জাতীয় ঐক্য ভেঙে যাবে। সুতরাং কেন্দ্রে জারতন্ত্রের ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রেখে প্রদেশগুলিতে (১৮৬৪ খ্রীঃ) তিনি কিছু পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন দেন। মীর বা গ্রাম-কমিউনগুলির ভোটে জেলা-পরিষদ বা 'ভোলোস্ট' (Volost) নির্বাচিত হয়। জেলা-পরিষদের ভোটে

স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তন

১ L. Kochan. History of Russia.

প্রাদেশিক সভা বা জেমেষ্টভোর নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। জেলা ও প্রাদেশিক সভাগুলির হাতে স্থানীয় শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ত্রাণ, রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতি দায়িত্ব দেওয়া হয়। এছাড়া আংশিক প্রথায় কৃষির জন্যও জেলাসভাগুলিকে কাজ করতে হত। কিন্তু প্রাদেশিক সভাগুলির কর আদায়ের ক্ষমতা না থাকায় এই সকল কাজের ব্যয়নির্বাহের জন্যে কেন্দ্রের অনুদানের উপর এই সভাগুলিকে নির্ভর করতে হত। কেন্দ্র যৎসামান্য অর্থবরাদ্দ করায় প্রাদেশিক সভাগুলি সঠিক কাজ করতে পারত না। সরকারী আমলারা ঘন ঘন জেলা ও প্রদেশের নির্বাচিত স্থানীয় সভাগুলির কাজে হস্তক্ষেপ করত। অর্থাভাব ছিল এই সভাগুলির প্রধান সমস্যা। এছাড়া এই সভাগুলিতে অভিজাতরাই প্রাধান্য ভোগ করত। ১৮৭০ খ্রীঃ অপর এক আইন দ্বারা জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার শহরের করদাতাদের ভোটে শহরের পৌরসভা বা মিউনিসিপ্যালিটি গঠনের ব্যবস্থা করেন। এই পৌরসভাগুলির হাতে শহরের জনস্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট, জলসরবরাহ প্রভৃতি চালু রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার রাশিয়ার বিচারব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করেন। তিনি ফৌজদারী আইন ঢেলে সাজান, জুরী-প্রথা চালু করেন। বিচারকদের সম্মানজনক বেতন ও চাকুরির নিরাপত্তা দেন। 'জাস্টিসেস অফ পিস' নামে অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা ছোটখাট মামলার বিচারের ব্যবস্থা করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্যে চেষ্টা করেন।

বিচার ব্যবস্থা ও অন্যান্য সংস্কার

জার আলেকজান্ডার রাশিয়ায় রেলপথ নির্মাণ ও শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের জন্যে চেষ্টা করেন। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের উপরোক্ত সংস্কারগুলি বিশেষ সফল হয়নি। কারণ বুদ্ধিজীবী, দেশপ্রেমিকরা রাশিয়ায় একটি সংবিধান ও নির্বাচিত পার্লামেন্ট গঠনের দাবি জানায়। জার তাঁদের সেই আশা পূরণ না করায় অসন্তোষ দেখা দেয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ১৯০৫-এর বিপ্লব (The Revolution of 1905) : ঊনবিংশ শতকের রুশ বুদ্ধিজীবী ও জাতীয়তাবাদীরা জারের স্বৈরতন্ত্র, অভিজাতসমাজের বিশেষ অধিকার, সামন্তশ্রেণীর শোষণ, কৃষকদের দুরবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তাঁরা রাশিয়ায় সাংবিধানিক শাসন প্রবর্তন, পার্লামেন্ট আহ্বান, ভোটাধিকার ব্যবস্থার প্রবর্তন, ভূমিব্যবস্থার সংস্কার, সামন্তপ্রথা লোপের জন্যে দাবি জানান। জার প্রথম নিকোলাসের সিংহাসনে বসার সময় ডেকাব্রিস্ট বিপ্লবীরা প্রথম সংবিধান প্রবর্তনের দাবি তোলেন। জার নিকোলাস দমন-নীতির দ্বারা ডেকাব্রিস্ট বিদ্রোহকে পিষ্ট করেন।

জার প্রথম নিকোলাস ও জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের রাজত্বকালে রাশিয়ায় নিহিলিস্ট বা নৈরাজ্যবাদী আন্দোলন দেখা দেয়। ল্যাটিন 'নিহিল' (Nihil) কথাটির অর্থ হল "শূন্য" (Nothing)। নিহিলিস্ট মতবাদের প্রবর্তক মাইকেল বাকুনিন বলেন যে, রাশিয়ার ক্ষেত্রে নিহিলিজমের অর্থ হল পুরাতনতন্ত্রের সমূলে ধ্বংসসাধন। ভাল-মন্দ সকল প্রতিষ্ঠান ও প্রথাকে ধ্বংস করা। কারণ পুরাতনতন্ত্রের ভাল প্রথাগুলি রক্ষা করলে তাকে আশ্রয় করে পুরাতনতন্ত্রের খারাপ প্রথাগুলি পুনরায় দেখা দেবে। নৈরাজ্যবাদী বা শূন্যবাদীরা ছিলেন ঘোর বাস্তববাদী। তাঁরা যুক্তি ও স্বাধীনতাকেই মূল্যবান মনে করতেন। প্রচলিত সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থা, ভদ্রতা, আচরণকে তাঁরা কৃত্রিম, ভঙ্গুর মনে করে ভেঙে ফেলতে চাইতেন। এটাই ছিল তাঁদের প্রতিবাদের পন্থা। নৈরাজ্যবাদীরা জার সরকারের কর্মচারীদের হত্যা এবং জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে হত্যার দ্বারা পুরাতনতন্ত্র ধ্বংস করার বিফল চেষ্টা করেন। পরবর্তী জার তৃতীয় আলেকজান্ডার নৈরাজ্যবাদীদের দমিয়ে ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল শাসন চালু

নিহিলিষ্ট আন্দোলন

করেন। তিনি দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের উদারতন্ত্র লোপ করেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যু হলে শেষ জার দ্বিতীয় নিকোলাস রুশ সিংহাসনে বসেন।

নৈরাজ্যবাদী আন্দোলনের পরে আসে জনতাবাদী আন্দোলন বা 'পপুলিজম'। এর সঙ্গে নৈরাজ্যবাদীরা মিশে যান। ১৮৭০-এর দশকে জনতাবাদ বা পপুলিজম বিশেষ প্রসার লাভ করে। রুশ চিন্তাবিদ হার্জেন, বাকুনিন, কার্নিসেভস্কি প্রভৃতির চিন্তাধারায় পুষ্ট হয়ে নৈরাজ্যবাদীরা ও জনতাবাদীরা রুশ কৃষকের দ্বারা রাশিয়ায় বিপ্লব ও পরিবর্তন ঘটাবার স্বপ্ন দেখেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, গ্রাম-কমিউনগুলিকে বা গ্রাম-পঞ্চায়েত সভাগুলিকে আশ্রয় করে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের বিকাশ লাভ ঘটবে। ১৮৭৬ খ্রীঃ "জমি ও স্বাধীনতা" (Land and Liberty) নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়। পরে এই সমিতি ভেঙে দুভাগ হয়; তার একটির নাম হয় নারদনিয়া ভলিয়া বা জনতার ইচ্ছা (People's will)। এই সমিতির আন্দোলনকে এজন্যে 'নারোদনিক আন্দোলন' বা জনতার আন্দোলন বলা হয়। ১৮৭৮ খ্রীঃ নারোদনিকরা ব্যাপক হিংসাত্মক আন্দোলন আরম্ভ করেন। যদিও কৃষকরা তাদের ডাকে সাড়া দেননি, তাতে তারা দমে নি। ভেরা জাসুলিয় নামে এক মেডিকেল ছাত্রী সেন্ট পিটার্সবার্গের শাসনকর্তা জেনারেল ট্রেপভকে হত্যা করেন। ভেরার বিচারের সময় জুরীরা তাঁকে দণ্ড দিতে রাজী হন নি। নারোদনিকরা জারের স্বৈরতন্ত্রকে অচল করার জন্যে উচ্চ সরকারী কর্মচারীদের ব্যাপক হত্যা করার চেষ্টা চালান। এমনকি স্বয়ং সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারও এক নারোদনিকি নিহিলিস্ট বা নৈরাজ্যবাদীর হাতে ১৮৮১ খ্রীঃ নিহত হন।

জনতাবাদী বা নারোদনিক বা পপুলিষ্ট আন্দোলন

নারোদনিকিরা যে বিদ্রোহের সূচনা করেন তা সফল না হলেও, বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিপ্লবীরা বুঝতে পারেন যে বিপ্লব বা বিদ্রোহ ছাড়া স্বৈর্যচারী জার সরকারের পতন ঘটানো যাবে না। নারোদনিকিরা রাশিয়ায় যে গুপ্তসমিতি গঠনের পথ দেখান, শীঘ্রই তা শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয়। মধ্যপন্থীদের গোষ্ঠীর নাম ছিল ক্যাডেট দল। এই দল ছিল বুর্জোয়াদের সংগঠন। এই দল রাশিয়ায় সংবিধান প্রবর্তনের দাবি জানায়। ১৮৯৮ খ্রীঃ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক দল গঠিত হয়। এই দলে মার্কসপন্থীরাই ছিল প্রধান। ১৯০৩ খ্রীঃ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক দল ভেঙে দুই শাখায় পরিণত হয়, যথা সংখ্যালঘু বা মেনশেভিক এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ বা বলশেভিক।শেষোক্ত গোষ্ঠী রাশিয়ায় শ্রমিকদের মধ্যে দ্রুত প্রভাব বিস্তার করে এবং শ্রমিকদের মধ্যে সংগ্রামী মনোভাব গড়ে তোলে।

নারোদনিকিদের পন্থা ভুল হলেও তাঁরা একথা প্রমাণ করেন যে, রাশিয়ায় সংস্কারের দ্বারা পরিবর্তন হওয়ার কোন আশা নেই। সুতরাং সংস্কার দ্বারা যখন পরিবর্তনের আশা নেই, তখন বিপ্লবই একমাত্র পথ। নারোদনিকিদের ভুল এই ছিল যে, তাঁরা কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য পাওয়ার আশা করেন। সেই আশা ফলবতী হয় নি। পরে তাঁরা গুপ্তহত্যা ও সন্ত্রাসের পথ ধরেন। কিন্তু জার সরকার তা দমিয়ে ফেলেন। কিন্তু জনমানসে বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁরা ছাপ রেখে যান।

ইতিমধ্যে ভূমি-ঘটিত সমস্যা আরও তীব্রতর হয়। জমির মালিকানা ১৮৬১ খ্রীঃ ভূমিদাস-মুক্তি আইনে মীর বা গ্রাম-কমিউনগুলির হাতে দেওয়া হয়। কিন্তু ওই কমিউনগুলি কৃষকদের জীবনকে অসহনীয় করে তুলে। তারা কৃষকদের সেনাদলে যোগ দিতে, নানারকম কর দিতে বাধ্য করে। গ্রাম ছেড়ে ইচ্ছামত অন্যত্র যেতে ও অন্য জীবিকা নিতে বাধা দেয়। অথচ গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যা বাড়ার ফলে ভূমিসংস্কার

কৃষকদের ক্ষোভ

অবিলম্বে দরকার হয়। জার সরকার এ ব্যাপারে উদাসীন থাকায় বিপ্লবের পরিবেশ দেখা দেয়।

জার দ্বিতীয় নিকোলাসের রাজত্বকালে রাশিয়ায় শিল্প দ্রুত হারে বাড়ছিল। কারণ জার দ্বিতীয় নিকোলাসের মন্ত্রী কাউন্ট উইটি পুঁজিবাদী শিল্পবিকাশের নীতি নেন। শিল্প-শ্রমিকদের সমস্যার দিকে জার সরকার কোন দৃষ্টি দেন নি। জার শিল্পপতিদের স্বার্থই বড় করে দেখতেন। রুশ-শিল্পে বিদেশী মূলধনের বিনিয়োগ বাড়ায় শিল্পের প্রসার হয়। কিন্তু বিদেশী মূলধনীদের স্বার্থরক্ষার জন্যে শ্রমিকদের দাবিগুলিকে দমিয়ে রাখা হয়। রুশ-শ্রমিকরা ঘোর দারিদ্র্য এবং অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে বাস করতে বাধ্য হত। ১৮৯৬ খ্রীঃ রাশিয়ার বড় কারখানাগুলিতে মোট শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১,৭৪২,০০০। কারখানায় শ্রমিকদের নিম্নতম কাজের সময় ছিল প্রত্যহ ১২ ঘন্টা। কারখানাগুলিতে কোন আলো বা বাতাসের ভাল ব্যবস্থা ছিল না। মল-মূত্র ত্যাগের ভাল ব্যবস্থাও ছিল না। বলশেভিকদের প্রচারের ফলে শ্রমিকদের মধ্যে এই চেতনা দেখা দেয় যে, মালিকশ্রেণী সরকারের সহায়তায় তাদের শোষণ করছে। এজন্যে শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। মস্কোর কাছে কাপড়ের কলগুলিতে এবং আরও নানা স্থানে ধর্মঘট হয়।

শ্রমিকদের সমস্যা

রাশিয়ায় এই বিস্ফোরক অবস্থা লক্ষ্য করে রুশ সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দল বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুতি চালায়। সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা শ্রমিকদের সাহায্যে বিপ্লব ঘটাবার পরিকল্পনা করেন। বলশেভিকরা বিশ্বাস করত যে, দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমিকদের বিপ্লব দ্বারা জারতন্ত্রের পতন ঘটানো যাবে। মেনশেভিকরাও বিপ্লব চায়। কিন্তু তারা ছিল তত্ত্ববাদী কমিউনিস্ট। তারা মনে করত যে, বিপ্লবের উপযুক্ত সময় আসতে দেরী আছে। যাই হোক, রাশিয়ার বৈপ্লবিক পরিস্থিতি লক্ষ্য করে সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দল বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। অন্যান্য বিপ্লবী দলগুলি 'সোস্যাল রেভোল্যুশনারীজ' নাম নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। এই দলগুলি কৃষকদের সাহায্যে বিপ্লব সংগঠনের কথা ভাবে।

বিপ্লবী দলের কর্মসূচী

ইতিমধ্যে রুশ-জাপান যুদ্ধে ১৯০৪-১৯০৫ খ্রীঃ ক্ষুদ্রাকৃতি জাপানের কাছে দৈত্যের মত বিরাট রাশিয়া শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়। এর ফলে ঘরে-বাইরে সর্বত্র দারুণ চাঞ্চল্য দেখা দেয়। রাশিয়ার এই অবিশ্বাস্য পরাজয়ের ফলে রুশদেশের ভিতর জার সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল জনমতের জোয়ার জেগে উঠে। দেশপ্রেমিক রুশীরা জার সরকারের অকর্মণ্যতার বিরুদ্ধে গর্জে উঠে।

রুশ-জাপান যুদ্ধেব প্রভাব

এই সুযোগে বিপ্লবীরা জার সরকারের পতন ঘটাবার জন্যে প্রস্তুত হয়। রদেনস্টাইন নামক প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের মতে, যদিও বলশেভিকরা ১৯০৫-এর বিপ্লবে মুখ্য ভূমিকা নেয় নি, তবুও তাঁরা এই বিপ্লবে উল্লেখযোগ্য অংশ নেন। মুখ্য ভূমিকা নেন অন্যান্য সোস্যাল ডেমোক্র্যাট-গোষ্ঠী ও অন্যান্য বিপ্লবীরা। রুশ-জাপান যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের দ্বারা সংগঠিত শ্রমিক ইউনিয়নগুলি প্রকাশ্য ঘোষণা দেয় যে, জার সরকারের হাতে রুশদেশের শাসনভার রাখা উচিত নয়। ১৯০৪-১৯০৫ খ্রীঃ সেন্ট পিটার্সবার্গের শ্রমিকরা ধর্মঘট চালায়।

১৯০৫ খ্রীঃ ৫ই জানুয়ারী মতান্তরে ২২শে জানুয়ারী রবিবার পেট্রোগ্রাড শ্রমিকরা ফাদার গ্যাপন নামে এক জাল পুরোহিতের নেতৃত্বে তাদের দাবি জানাবার উদ্দেশ্যে জারের প্রাসাদের দিকে শোভাযাত্রা করে। জারের পুলিশ এই শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর গুলি চালিয়ে ১৩০ জন শ্রমিককে নিহত করে ও বহু শ্রমিক আহত হয়। পরে জানা যায় ফাদার গ্যাপন ছিল পুলিশের

গোয়েন্দা। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে রুশ বুদ্ধিজীবী, জাতীয়তাবাদী ও সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা জার সরকারের পতন ঘটাবার জন্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। রাশিয়া শ্রমিক ধর্মঘটে প্রায় অচল হয়ে পড়ে। রিগা শহরে প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিক রাস্তায় বিক্ষোভ দেখায়। কৃষকরাও বিদ্রোহ ঘোষণা করে। জারের সেনাদলের একাংশ বিদ্রোহীদের পক্ষ নেয়। রুশ যুদ্ধজাহাজ পোটেমকিনের (Battleship Potemkin) নাবিকরাও বিদ্রোহ ঘোষণা করে। রাশিয়ায় ১৯০৫ খ্রীঃ ২০শে—৩০শে অক্টোবর টানা ১১ দিন সাধারণ ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। এই ধর্মঘট এমন ব্যাপকভাবে হয় যে, এর আগে রাশিয়ায় কখনও এরূপ ধর্মঘট হয়নি। এই ধর্মঘটের সময় সেন্ট পিটার্সবার্গের শ্রমিকশ্রেণী ট্রটস্কির নেতৃত্বে বিখ্যাত সেন্ট পিটার্সবার্গ সোভিয়েত গঠন করে।

১৯০৫ খ্রীঃ বিপ্লব

মন্ত্রী কাউন্ট উইটির পরামর্শে জার দ্বিতীয় নিকোলাস আপাততঃ আপস-নীতি নেন। বেত-গাছ যেমন ঝড়ের সময় নুয়ে পড়ে, পরে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, জার নিকোলাস সেরূপ বেতসী বৃত্তির আশ্রয় নেন। তিনি অক্টোবর ঘোষণাপত্র দ্বারা রুশ পার্লামেন্ট বা ডুমা (Duma) আহ্বানের প্রতিশ্রুতি দেন। রুশদের নাগরিকদের ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার প্রভৃতি দিতে প্রতিশ্রুতি দেন। জারের ঘোষণার ফলে বিপ্লবীদের মধ্যে যারা মধ্যপন্থী বা আপসপন্থী ছিল, তারা সন্তুষ্ট হয়ে বিদ্রোহ বন্ধ করতে রাজী হয়। অপরদিকে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা কোন মৌলিক পরিবর্তন ছাড়া বিপ্লব রদ করতে রাজী হয়নি। এই অন্তর্বিরোধের ফলে বিপ্লবীদের শক্তি ক্ষয় পায়। শহুরে মধ্যবিত্তশ্রেণী বেশিদিন বিপ্লব চললে বিপ্লব তাদের হাতের বাইরে চলে যাবে বুঝতে পারে। এজন্য তারা আপসে রাজী হয়। গ্রামের জমির মালিকশ্রেণী যারা গোড়ায় বিপ্লবকে সমর্থন করে, তারাও পিছিয়ে যায়। এদিকে জারের উপর রক্ষণশীল অভিজাতরা চাপ দেয় যে, আপসপন্থী মন্ত্রী কাউন্ট উইটিকে বরখাস্ত করা হোক। জার নিকোলাস এই সুযোগে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সেনাদল নিয়োগ করেন এবং সেন্ট পিটার্সবার্গের সোভিয়েতের সদস্যদের গ্রেপ্তার করার আদেশ দেন। সেনারা সোভিয়েতের সদস্যদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করলে সোভিয়েতের শ্রমিক সদস্যরা সেনাদলের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ দেন। ১৯০৫-এর বিপ্লব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অক্টোবর-ঘোষণাপত্র দ্বারা প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলি অতঃপর জার নিকোলাস নাকচ করেন। কাউন্ট অপোইকিন নামে এক উদারতন্ত্রী অভিজাতের দিনপঞ্জী থেকে জানা যায় যে, জার এই রক্ষণশীল আভিজাতদের কাছে নতিস্বীকারে বাধ্য হন। কাউন্ট উইটি নামক উদারপন্থী মন্ত্রী পদচ্যুত হন। ব্ল্যাক কোম্পানি বা 'কালো দল' নামে এক রক্ষণশীলগোষ্ঠী সন্ত্রাসবাদ দ্বারা বিপ্লব-পন্থীদের নির্বিচারে হত্যা করে। প্রোগ্রম (Progrom) নামে সন্ত্রাসবাদী ফৌজ দ্বারা বিপ্লবীদের ও তাদের সমর্থকদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। প্রায় ৩৫০০ সোস্যাল ডেমোক্র্যাট এই প্রোগ্রম দ্বারা নিহত হন।

১৯০৫ খ্রীঃ বিপ্লবের বিফলতা

১৯০৫-এর বিপ্লবের মূল্যায়ন করে বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা ট্রটস্কি বলেন যে, এই বিপ্লব ছিল "১৯১৭ খ্রীঃ রুশ-বিপ্লবের মহড়া বা ড্রেস রিহার্সাল।" এই বিপ্লব জারতন্ত্রের ভিত্তিতে ফাটল সৃষ্টি করে। শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে জারের এতদিন প্রত্যক্ষ সংঘাত হয় নি। ১৯০৫ খ্রীঃ থেকে এই সংঘাত শুরু হয়। জারের পতনের জন্যে রাশিয়ায় দ্বিতীয় বৃহত্তম শ্রেণী বা শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়। বলশেভিক দল ১৯০৫-এর বিপ্লব থেকে যে শিক্ষা নেয়, তা তারা ১৯১৭ খ্রীঃ বিপ্লবে কাজে লাগায়। রাশিয়ার বিপ্লবীরা এ বিষয়ে একমত হন যে, জার সরকারের পতন না ঘটলে রাশিয়ার উন্নতির কোন আশা নেই। তা ছাড়া ১৯০৫-এর বিপ্লবের ফলেই সেন্ট পিটার্সবার্গে ও মস্কোতে প্রথম

১৯০৫ খ্রীঃ বিপ্লবের ফলাফল

সোভিয়েত গঠিত হয়। ১৯০৫-এর শ্রমিক সোভিয়েত, ১৯১৭ খ্রীঃ বিপ্লবে শ্রমিক-কৃষক-সেনাদলের সোভিয়েতে পরিণত হয়। ১৯০৫ খ্রীঃ যা ছিল বীজের আকারে, ১৯১৭ খ্রীঃ তা বৃক্ষে পরিণত হয়। ১৯০৫ খ্রীঃ বিপ্লবে শ্রমিক ধর্মঘটের সঙ্গে যুক্ত হয় কৃষক-বিদ্রোহ। বলশেভিকরা এই থেকে শিক্ষা নেন যে, কৃষকশ্রেণীর মিত্রতা নিয়ে শ্রমিকদের বিপ্লবের পথে আগাতে হবে। মোট কথা ১৯১৭ খ্রীঃ বিপ্লবের ইঙ্গিত ও ছায়া ১৯০৫-এর বিপ্লবে দেখা যায়।

[খ] পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ ১৯১৭ খ্রীঃ বলশেভিক বা ১৯১৭ খ্রীঃ রুশ-বিপ্লবের কারণ (Causes of the Russian Revolution of 1917) ঃ উনবিংশ শতকের শেষদিক থেকে রাশিয়ার সকল ক্ষেত্রে পচনের চিহ্ন দেখা দেয়। ১৯০৫-এর রুশ-বিপ্লব যাকে ঐতিহাসিকরা "প্রথম বিপ্লব" (First Revolution) বলেন, তার ফলে রাশিয়ার জারতন্ত্রের পতনের ঘন্টা বেজে যায়। বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা লিও ট্রটস্কি এজন্যে ১৯০৫-এর বিপ্লবকে ১৯১৭ খ্রীঃ "বিপ্লবের মহড়া" (ড্রেস রিহার্সাল—Dress Rehearshal) বলে অভিহিত করেছেন। এই বিপ্লবের ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। জারের স্বৈরতন্ত্রী সরকার এই বিপ্লবের ফলে রুশ ডুমা বা পার্লামেন্টের অধিবেশন ডাকতে বাধ্য হয়। যদিও জার সরকার এই ডুমাকে কোন মূল্য দেননি, তথাপি এই বিপ্লব সর্বপ্রথম স্বৈরতন্ত্রের মুখে একটি লাগাম পরাতে সক্ষম হয়। এজন্যে কোন কোন পণ্ডিত অভিমত দেন যে, ১৯০৫-এর পর থেকে রাশিয়ার স্বৈরতন্ত্রের ঘন রং ক্রমশ ফিকে হচ্ছিল। ১৯০৭-এর নির্বাচনী আইন পাসে হওয়ার পর বোঝা গিয়েছিল যে, ডুমাকে বাদ দিয়ে জার সরকার একক নিরঙ্কুশ স্বৈরতন্ত্র আর চালাতে সক্ষম হবেন না। কিন্তু অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যৎসামান্য খাদ্য খেলে যেমন তার ক্ষুধা দ্বিগুণ হয়ে উঠে, তেমনই ডুমার আহ্বানের ফলে রাশিয়ায় মুক্তসমাজ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি এবং শ্রমিক ও কৃষকদের অসন্তোষগুলি দূর করার দাবি প্রবল হয়ে উঠে। যদিও জার সরকার ১৯০৫ খ্রীঃ বিপ্লবকে (আগে পৃঃ ১৬৭ দ্রষ্টব্য) দমন করতে সক্ষম হন, কিন্তু এই বিপ্লবের পর জার সরকারের পচনশীলতা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

১৯০৫-এর বিপ্লবের প্রভাব

১৯০৫ খ্রীঃ পর রুশ কৃষকদের অবস্থার কোন প্রকৃত উন্নতি হয় নি। যদিও জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ভূমিদাস-প্রথা লোপ করেন, তার জন্যে সাধারণ কৃষকের দুঃখদুর্দশা কমে নি। বরং মুক্তিপ্রাপ্ত ভূমিদাসরা ক্ষতিপূরণের টাকা ও সরকারী কর এবং সামন্তপ্রভুদের অন্যান্য পাওনা মেটাতে সর্বাস্বান্ত হয়। (আগে জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের ভূমিদাস আইনের ত্রুটি পৃঃ ১৬২ দ্রষ্টব্য)। ১৯০৫ খ্রীঃ বিপ্লবের ফলে যদিও ক্ষতিপূরণ প্রদান লোপ করা হয়, ততদিনে মুক্ত ভূমিদাসরা ক্ষতিপূরণের $\frac{৩}{৪}$ ভাগ প্রদান করে ফেলেন। কিন্তু ততদিনে প্রচণ্ড লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমির ক্ষুধা বেড়ে যায়। কৃষকদের উপর সরকারী করের বোঝা ও আমলাতন্ত্রের জুলুম বাড়ে।

কৃষকদের অসন্তোষ

১৯০৫ খ্রীঃ পর জারের মন্ত্রী স্টোলিপিন (Stolypin) কয়েকটি ভূমিসংস্কার আইন পাস করেন। ১৮৬১ খ্রীঃ ভূমিদাস-মুক্তি আইনে ভূমিদাসদের প্রদত্ত জমির মালিকানা মীরগুলির হাতে দেওয়া হয়েছিল। তিনি মীর বা কমিউনগুলির হাত থেকে জমির মালিকানা কেড়ে নিয়ে জমিগুলি কৃষকের মালিকানায় দিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। এর ফলে ১৯১০ খ্রীঃ নাগাদ প্রায় সকল কৃষকপরিবার তাদের জমি কমিউন থেকে বের করে নেয়।[১] কিন্তু দরিদ্র কৃষকরা জমিগুলি ও মালিকানা পাওয়ার পর জমি তাদের হাতে ধরে রাখতে পারে নি। অভাবের তাড়নায় ও জিনিসপত্রের দাম বাড়ায় তারা জমিগুলির বেশির ভাগ বিক্রি করে ফেলে। এই জমি

১· Grgansky.

কিনে নিয়ে এক সচ্ছল জোতদারশ্রেণী গড়ে উঠে যাদের বলা হত কুলাক (Kulaks)। এই কুলাকশ্রেণীর হাতে প্রায় ১০০ ডেসিয়াটিন জমি চলে যায়। এই শ্রেণী ছিল সমগ্র জনসংখ্যার ০.৬% ভাগ। সমগ্র কৃষকশ্রেণীর ২০% ভাগ মাত্র। কুলাকশ্রেণীর হাতে জমি কেন্দ্রীভূত হলে অধিকাংশ কৃষক ভূমিহীন মজুর বা ভাগচাষীতে পরিণত হয়। যদিও গারশেনক্রন প্রভৃতি অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, বিংশ শতকের গোড়ায় রাশিয়ায় কৃষির উন্নতি ঘটেছিল; আসলে স্টোলিপিন প্রভৃতি মন্ত্রী কিছুটা চেষ্টা করলেও কৃষি ও কৃষকের কোন উন্নতিসাধন সম্ভব হয় নি।

স্টোলিপিনের সংস্কার : কুলাকশ্রেণীর বিস্তৃতি

বিংশ শতকের গোড়ায় সাধারণ রুশ কৃষকদের দুরবস্থা সীমাহীন ছিল। শতকরা ৩৩% ভাগ কৃষকের লাঙ্গল টানার জন্যে ঘোড়া ছিল না। এর বাকী ৩৩% ছিল মাত্র একটি করে ঘোড়া। চাষের যন্ত্রপাতি, সার কেনার পয়সা অনেকেরই ছিল না। অধিকাংশ কৃষকপরিবারের সারা বছরের খোরাকি জুটত না। এক কথায় বলা যায় কৃষকরা ছিল ক্ষুধার্ত। "গুজফুট" নামে এক ধরনের শাকসেদ্ধ খেয়ে জীবনধারণ করত। শিঙ্গারেভ (Shingarev) তাঁর "ডায়িং কান্ট্রিসাইড" (Dying Countryside) গ্রন্থে কৃষকের 'হা-অন্ন' অবস্থার মর্মন্তুদ বিবরণ দিয়েছেন। ফলে "ডি-পেজান্টাইজেশন" অর্থাৎ কৃষকের বিলুপ্তি ঘটতে থাকে। প্রায় ১০ মিলিয়ন লোক কাজের সন্ধানে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। অনেক কৃষক জমি আবাদ লাভজনক নয় দেখে আবাদ বন্ধ করে। কৃষকরা ঘন ঘন বিদ্রোহের দ্বারা জার সরকারকে তাদের দুরবস্থার প্রতিকারের জন্যে বাধ্য করতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি। বিদ্রোহের জবাবে তারা পায় কশাক-সেনার চাবুকের আঘাত ও রুশ-বাহিনীর গরম বুলেটের মরণচুম্বন।

কৃষক-বিদ্রোহ

১৯০৫ -এর বিদ্রোহের পর রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর অসন্তোষ সক্রিয়ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। রুশ শ্রমিকশ্রেণী ধর্মঘট ও বিদ্রোহের দ্বারা ১৯০৫ খ্রীঃ বিপ্লবে প্রধান ভূমিকা নেয়। ১৯০৫ খ্রীঃ পর কাউন্ট উইটির পতন হলেও তাঁর শিল্পসংগঠন-নীতি চালু থাকে। রুশ শ্রমিকের অবস্থা ছিল সীমাহীনভাবে খারাপ। শ্রমিকের সীমাহীন দারিদ্র্য শ্রমিককে বিপ্লবমুখী করে। ১৯১০ খ্রীঃ বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে রাশিয়ায় শ্রমিকের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৮ মিলিয়ন।[১] যুদ্ধ আরম্ভ হলে এই সংখ্যা আরও বেড়ে যায়। ১৯০৫ খ্রীঃ পর শ্রমিকদের জন্য কাজের সময় কমিয়ে দিনে ১৭ ঘণ্টা, রাতে ১১ ঘণ্টা করা হয়। এই সংস্কার ছিল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। দ্রব্যমূল্য বাড়ার জন্যে সামান্য মজুরি বাড়ায় শ্রমিকের কোনই উপকার হয়নি। শ্রমিকের ৮ ঘণ্টা কাজের সময় দাবি অগ্রাহ্য হয়। শ্রমিকের অসন্তোষের আরও বিভিন্ন কারণ ছিল। (১) ধাতু ও যন্ত্রশিল্পের শ্রমিকরা যে হারে মজুরি পেত, বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকরা তার থেকে প্রায় ৪০% মজুরি কম পেত। (২) ধর্মঘট করা ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে যোগদান শাস্তিযোগ্য অপরাধ ছিল। (৩) শ্রমিককে তার পরিবারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কারখানার বিপণি থেকে নিম্নমানের জিনিস চড়া দামে কিনতে বাধ্য করা হত। (৪) শ্রমিকের বাসস্থান ছিল খুবই অস্বাস্থ্যকর, সঙ্কীর্ণ, স্যাঁৎসেতে, ঘিঞ্জি ও অন্ধকার। (৫) সন্তানসন্ততির শিক্ষার ও ভালভাবে বেড়ে ওঠার কোন পরিবেশ ছিল না। (৬) রাশিয়ার কলকারখানাগুলিতে শ্রমিককে ইচ্ছামত ছাঁটাই করা যেত। এ সকলের প্রতিবাদে, রাশিয়ায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও ধর্মঘট তীব্র হচ্ছিল।

শ্রমিক অসন্তোষের কারণ

শ্রমিক অসন্তোষ

শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বলশেভিক প্রভৃতি বিপ্লবী দলগুলি প্রচার ও সংগঠন চালায়।

১· Gusev and Naumov

শ্রমিকশ্রেণী উপলব্ধি করে যে, জারতন্ত্রের পতন এবং শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সরকার স্থাপিত না হলে শ্রমিকের সুদিন কখনও আসবে না। সুতরাং শ্রমিকরা ক্রমে আপস-বিরোধী ও বিপ্লবমুখী হয়ে উঠে। ১৯১৫ খ্রীঃ বস্ত্রশিল্পে ধর্মঘট হয়। এর পর থেকে রাশিয়ায় ঘনঘন ধর্মঘট হতে থাকে। ১৯১৬ খ্রীঃ অক্টোবরে পেট্রোগ্রাডে যে শ্রমিক ধর্মঘট হয়, তাতে শ্রমিকরা তাদের অর্থনৈতিক দাবির সঙ্গে রাজনৈতিক দাবি জুড়ে দেয়। শ্রমিকশ্রেণীর এই জাগরণ ও আন্দোলন ছিল আসন্ন বিপ্লবের অশনিসঙ্কেত। জার দ্বিতীয় নিকোলাস এ সম্পর্কে ছিলেন পুরা অচেতন। ঐতিহাসিক রবার্ট এর গ্যাংএর মতে তিনি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের পর সংবাদপত্র পড়া ছেড়ে দেন। দেশে যে কি ঘটছে এ সম্পর্কে তিনি খোঁজ রাখা আবশ্যক মনে করতেন না। জার নিজেই বুঝতেন না যে তিনি এক ফুটন্ত আগ্নেয়গিরির চূড়ায় বসে আছেন। যে-কোন সময়ে বিস্ফোরণে তিনি এবং তাঁর শাসনব্যবস্থা উড়ে যেতে পারে। এই ফুটন্ত-আগ্নেয়গিরি ছিল রাশিয়ার অসন্তুষ্ট শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী।

শ্রমিকদের রাজনৈতিক চেতনা : ধর্মঘট

রাশিয়ার সাম্রাজ্যে পোল, ফিন, ইউক্রেনীয়, তুর্কী, বাইলোরাশীয় প্রভৃতি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোক বাস করত। প্রতি জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও হরফ ছিল। রাশিয়ার জনসংখ্যার ২০% ভাগ ছিল এই সকল ভিন্ন ভাষাভাষী লোক। যে অঞ্চলে এই অ-রুশ জাতিগোষ্ঠী বাস করত সেই অঞ্চলের জমি ছিল খুব উর্বরা ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। ১৯০৫ খ্রীঃ পর জার সরকার এই অঞ্চলের ৩৬ মিলিয়ন ডেসিয়াটিন জমি অধিগ্রহণ করেন। এই সকল অ-রুশ জাতিগুলির উপর প্রায় তিনগুণ বেশী হারে কর চাপিয়ে দেন। স্থানীয় রুশ সেনাদলে এই সকল অ-রুশ প্রজাদের যোগ দিতে বাধ্য করা হত। অ-রুশ ছাত্রদের বাধ্যতামূলকভাবে রুশভাষা লিখতে হত। আরও নানাভাবে অ-রুশ প্রজাদের রুশীকরণ করার চেষ্টা চালানো হয়। এজন্যে বলা হত যে, "জার-শাসিত রাশিয়া হল বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর কারাগার" (Czarist Russia is a prison of nations)। জাতিগোষ্ঠীগুলি জার সরকারের এই দমনমূলক ও রুশীকরণ নীতি নতশিরে মেনে নেয়নি। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে তাদের স্বাধীন জাতীয় সত্তার রক্ষার জন্যে ও গণতান্ত্রিক সংবিধান ও সম-অধিকারের জন্যে লড়াই চালায়। বলশেভিক দল এই জাতিগোষ্ঠীগুলিকে আশ্বাস দেয় যে, যদি তারা ক্ষমতায় আসে তবে তারা এই সকল জাতিকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিবে।

সংখ্যালঘু জাতিগুলির অসন্তোষের কারণ : রুশীকরণ নীতি

জার-শাসিত রাশিয়ার অর্থনৈতিক ক্ষেত্র ছিল ঘোরতর বৈষম্যে পূর্ণ। একদিকে ছিল আধুনিক শিল্পস্থাপনের চেষ্টা, অন্যদিকে ছিল শিল্পগুলিকে একচেটিয়া মালিকানার অধীনে রাখা। উদাহরণ-স্বরূপ মেড সোসাইটির (Med) তামার কারখানার নাম করা যায়। রুশ বৃহৎ ব্যাঙ্কগুলিও একচেটিয়া মালিকানা গঠনে সাহায্য করত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, পিটার্সবার্গ ইন্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্ক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কারখানাগুলি একমাত্র যুদ্ধজাহাজ তৈরি করত। আর কোন কোম্পানি করতে পারত না। রুশ-শিল্পের অধিকাংশ ছিল বিদেশী মূলধন দ্বারা তৈরী। ফলে রাশিয়ার বৈদেশিক ঋণ ও তার সুদের পরিমাণ ছিল পর্বতপ্রমাণ। রাশিয়ার ধাতু ও কয়লা শিল্পে ফরাসী ও বেলজিয়াম, তেলশিল্পে ব্রিটিশ মূলধন খাটত এবং রসায়ন ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে জার্মান মূলধন খাটত। ১৯১৪ খ্রীঃ রাশিয়ার বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ৫৪০০ মিলিয়ন রুবল। রুশ অগ্রগতির ছবি ছিল ফাঁপা, চমকপ্রদ, অন্তঃসারশূন্য। এই তথাকথিত অর্থনৈতিক অগ্রগতির সুফল কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় শিল্পপতি ও বিদেশী মালিকরা ভোগ করত।

অর্থনৈতিক অবক্ষয় : বৈদেশিক শক্তির অর্থনৈতিক আধিপত্য

রাশিয়ার সামন্তপ্রথা, ভূমিব্যবস্থায় কৃষকের অসন্তোষ, শ্রমিকের দুর্গতি, মধ্যবিত্তের দুঃখকষ্টের প্রতিকার একমাত্র করতে পারতেন জার সরকার আমূল সংস্কার দ্বারা। কিন্তু জার সরকার ছিলেন পরিবর্তন-বিরোধী। জারের সাম্রাজ্যশাসনের দায়িত্ব একটি আমলাতন্ত্রের হাতে ছিল। এই আমলাতন্ত্র জারের দরবারের একটি শক্তিজোটের ইঙ্গিতে চলত। এর কেন্দ্রে ছিল রাসপুটিন নামে জর্জিয়া থেকে আগত এক ভণ্ড সন্ন্যাসী। রানী আলেকজান্দ্রোভা ছিলেন রাসপুটিনের দ্বারা প্রভাবিত। এই ভণ্ড ও ক্ষমতালোভী লোকটি যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতি নিয়োগ থেকে আমলাদের কাজকর্মের মূল্যায়ন করে সর্বদাই নিজের আধিপত্য স্থাপন করত। এর ফলে প্রশাসন স্বৈরাচার ও অকর্মণ্যতার চাপে তলিয়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত কয়েকজন সেনাপতি রাসপুটিনকে হত্যা করেন। কিন্তু প্রশাসনের অবনতি রোধ করা যায়নি।

রাসপুটিন চক্রের ভূমিকা

এই পরিস্থিতিতে জার সরকার ত্রিশক্তি আঁতাতের সদস্য হিসাবে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়। রাশিয়ার জনগণের এই যুদ্ধের জন্যে কোন উৎসাহ ছিল না। রুশ-শিল্পের পক্ষে এই যুদ্ধের ভার বহনের ক্ষমতা ছিল না। রুশ-কৃষি ছিল অনগ্রসর। রুশ সেনাদলের হাতে আধুনিক বন্দুক বা কামান ছিল না। সুতরাং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মত একটি সর্বাত্মক ক্ষয়কারী যুদ্ধের ভার-বহনের ক্ষমতা রাশিয়ার ছিল না। এই অবস্থায় জার সরকারের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া ছিল ঘোর অদূরদর্শিতা। প্রায় ১০ মিলিয়ন সেনার খাবার, রসদ ও বেতন যোগাতে রাজকোষ শূন্য হয়। বৈদেশিক সরকারের কাছে জার সরকারের ৩০০ মিলিয়ন রুবল ঋণ নিতে হয়। রাশিয়ার গ্রাম ও কৃষিক্ষেত্র থেকে লোকদের যুদ্ধে যেতে হয়। ফলে কৃষিতে উৎপাদন কমে যায়। শিল্পশহরগুলিতে খাদ্যসরবরাহে ঘাটতি দেখা দেয়। খাদ্যের দাম ও অন্যান্য জিনিসের দাম দারুণ বেড়ে যায়। এদিকে রেলগুলিকে সেনাদলের ও অস্ত্রকারখানার মাল পরিবহণের কাজে লাগাতে হয়। ফলে কয়লা সরবরাহে ও কয়লা উৎপাদনে দারুণ ঘাটতি দেখা দেয়। কয়লা বা জ্বালানির অভাবে রাশিয়ার ৫১টি লোহা গালাবার চুল্লীর মধ্যে ৩৬টি চুল্লী বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণ গৃহস্থ কয়লা বা জ্বালানির সঙ্কটে দিশেহারা হয়ে পড়ে। সেনাদলে অস্ত্রের ও গোলা-বারুদের যোগান কমতে থাকে। এরূপ অবস্থায় রুশ সেনার মনোবল ভেঙে পড়ে এবং জার্মানবাহিনীর হাতে তার শোচনীয় পরাজয় ঘটে। ৭৭ হাজার অফিসার ও ৪ মিলিয়ন সেনা নিহত হয়। রাশিয়ার ভূমিখণ্ডের বৃহৎ অংশ জার্মানরা দখল করে নেয়। দেশের ভিতর খাদ্যাভাব ও মূল্যবৃদ্ধির দরুন বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। এরূপ অবস্থায় বলশেভিক দল যুদ্ধবিরোধী প্রচার চালায় এবং শান্তিস্থাপনের জন্যে দাবি জানাতে থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জারের পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া

জাতির এই বিপর্যয়কর অবস্থায় বলশেভিক দলের দাবি এই ছিল যে, জার সরকারকে অবিলম্বে যে-কোন মূল্যে এমনকি দরকার হলে রাশিয়ার কিছু ভূমিখণ্ড ছেড়ে দিয়ে জার্মানীর সঙ্গে শান্তিস্থাপন করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকদের কাজের সময় কমিয়ে মজুরি বাড়াতে হবে। মূল শিল্পগুলিতে শ্রমিক ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণ দিতে হবে। কৃষকদের হাতে জমি বন্টন করতে হবে। শাসনযন্ত্রকে পুরা বদলে গণমুখী করতে হবে। লেনিন ছিলেন বলশেভিকদের প্রধান চিন্তাবিদ্। ১৯১২ খ্রীঃ থেকে বলশেভিক দলীয় সংগঠন জোরদার হয় এবং দলীয় পত্রিকা 'প্রাভদা' প্রকাশিত হয়। ১৯১৬ খ্রীঃ যুদ্ধে রাশিয়ার বিপর্যয় নেমে এলে বলশেভিক দল দৃঢ়ভাবে "যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" (war

বলশেভিক দলের ভূমিকা

against war) বলে ঘোষণা করে। যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধে ও শ্রমিকের দাবিগুলিকে সফল করার জন্যে বলশেভিকদের ডাকে রাশিয়ায় ঘনঘন ধর্মঘট চলতে থাকে।

১৯১৭ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে রাশিয়ায় বিপ্লবের ঘন্টা বেজে উঠে। ২২শে থেকে ২৫শে ফেব্রুয়ারী পেট্রোগ্রাড শহরের শ্রমিক-সংগঠন লাগাতার ধর্মঘট চালায়। বলশেভিক দল তাদের বিপ্লবী ইস্তাহার ছড়াতে থাকে। ২৬শে ফেব্রুয়ারী পুলিশ ও সেনাদল শ্রমিকদের উপর গুলি চালালে খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হয়। জারের সেনাদলের পাভ্‌লোভস্কি রেজিমেন্ট এবং মস্কোর ভলিনস্কি রেজিমেন্ট বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয়। শ্রমিক ও সেনাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা একটি সোভিয়েত বলশেভিকরা গঠন করে।

পেট্রোগ্রাড ধর্মঘট : সেনা বিদ্রোহ

জার দ্বিতীয় নিকোলাস উপায় না দেখে চতুর্থ ডুমার অধিবেশন ডেকে সমগ্র পরিস্থিতি জানান। এই ডুমার সদস্যরা বুর্জোয়াশ্রেণীর লোক ছিল। তারা রুশ-জারকে পদত্যাগে ৮ই মার্চ, ১৯১৭ খ্রীঃ বাধ্য করে। অতঃপর ডুমার সম্মতিক্রমে লুভভের নেতৃত্বে রাশিয়ায় একটি অস্থায়ী প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়। রুশ-বিপ্লবের প্রথম পর্যায় শেষ হয়। এই বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে একটি অস্থায়ী প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। জার সরকারের বা রোমানভ রাজবংশের পতন ঘটে। যদিও ১৯১৭ খ্রীঃ-এর ফেব্রুয়ারী-বিপ্লবে প্রধান ভূমিকা ছিল রুশ-শ্রমিক ও বলশেভিক দলের, কিন্তু অস্থায়ী প্রজাতন্ত্র গঠিত হওয়ায় ক্ষমতা তাদের হাতে আসে নি। সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার দ্বারা নির্বাচিত ডুমার সদস্যরা ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর লোক। তাঁরা বলশেভিকদের বঞ্চিত করে বুর্জোয়াশ্রেণীর লোক দ্বারা অস্থায়ী প্রজাতন্ত্র স্থাপন করে।

ডুমার অধিবেশন : জারের পদত্যাগ

অস্থায়ী প্রজাতন্ত্রের শাসন : ১৯১৭ অক্টোবর বিপ্লব (The Provisional Republic : The October Revolution) : ১৯১৭ খ্রীঃ মার্চ থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত এই ৮ মাস রাশিয়ায় কার্যতঃ দ্বৈত-শাসনব্যবস্থা চলতে থাকে। ডুমার বুর্জোয়াপন্থী সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত অস্থায়ী প্রজাতন্ত্র কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে। কিন্তু বলশেভিকরা এই সরকারকে মানত না। তারা পেট্রোগ্রাডে বিপ্লবী সোভিয়েত গঠন করে। এই সোভিয়েতের অনুকরণে বিভিন্ন শহর ও গ্রামে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা সোভিয়েত গড়ে। এখন প্রশ্ন দেখা দেয় এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির মধ্যে কোন্ শক্তি শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা অধিকার করতে সক্ষম হবে। এই দ্বৈরথে শেষ পর্যন্ত লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরাই জয়ী হন। ডুমার প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রী সরকারের কোন শিকড় ছিল না। চতুর্থ ডুমা সর্বসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হয় নি। সম্পত্তির ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত এই ডুমা প্রকৃতপক্ষে জাতির প্রতিনিধিত্ব করত না। তাছাড়া প্রজাতন্ত্রী সরকার রাশিয়ার চার প্রধান সমস্যা যুদ্ধ, ভূমিসংস্কার, শ্রমিকের দাবি, অ-রুশ জাতিগুলির স্বায়ত্ত-শাসনের দাবি কোন সমাধান করে নি। (১) রুশ-সেনাদল শান্তিস্থাপনের দাবি জানালেও রুশ-ভূমি মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রজাতন্ত্র যুদ্ধ চালাবার সঙ্কল্প নেয়। (২) কৃষকরা কুলাক-প্রথা লোপ করে ভূমিসংস্কারের দাবি জানায়। প্রজাতন্ত্রী সরকার জানায় যে, জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ হলে তারপর ভূমিসংস্কারের কথা ভাবা যাবে। (৩) শ্রমিকদের মজুরি সংস্কার ও ৮ ঘন্টা কাজের দাবি অস্থায়ী সরকার আমল দেয় নি। (৪) রাশিয়ায় অ-রুশ জাতিগুলি স্বায়ত্তশাসনের দাবি সম্পর্কে এই সরকার জনস্বার্থবিরোধী নীতি নেয়। যুদ্ধ শেষ হলে তবে এই সকল প্রশ্নের সমাধান হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়।

অস্থায়ী প্রজাতন্ত্র বনাম পেট্রোগ্রাড কমিউন

অপরদিকে বলশেভিকরা পেট্রোগ্রাড সোভিয়েতের মাধ্যমে এখনই শান্তিস্থাপন, ভূমিসংস্কার ও শ্রমিকদের দাবিপূরণে আশ্বাস দেন।

বলশেভিক দলের সদস্যরা প্রথমে প্রজাতন্ত্রী সরকার সম্পর্কে তাদের নীতি কি হওয়া উচিত এ নিয়ে দ্বিধায় দুলছিল। শেষ পর্যন্ত লেনিন তাঁর 'এপ্রিল থিসিস' দ্বারা বলশেভিক কর্মী ও শ্রমিকদের বুঝান যে, আর অপেক্ষা করা উচিত নয়। এখনই বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের হাত থেকে ক্ষমতা অধিকারের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। তাঁর এই পরামর্শ বলশেভিকরা মেনে নেয়। মেনশেভিকরা মানতে রাজী হয় নি। শেষ পর্যন্ত বলশেভিকরা অস্থায়ী প্রজাতন্ত্রের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে প্রতিজ্ঞা নেয়। লেনিন বলেন যে, ১৯১৭ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী-বিপ্লবে জার সরকারের পতন বলশেভিকদের প্রচেষ্টার ফলেই সফল হয়েছে। সুতরাং রাষ্ট্রক্ষমতা তাদেরই প্রাপ্য। বলশেভিকরা ধ্বনি তুলেন যে—"সকল ক্ষমতা সোভিয়েতগুলির হাতে দিতে হবে" (All power to the Soviets)। ২৪-২৫শে অক্টোবর বলশেভিকদের নেতৃত্বে তাদের অনুগত পেট্রোগ্রাডের সেনা ও শ্রমিক কমিউনগুলি রাজধানী পেট্রোগ্রাডের সরকারী অফিসগুলি দখল করে নেয়। প্রজাতন্ত্রী সরকারের প্রধান কেরেনেস্কি রাজধানী থেকে পালান। বলশেভিকদল রাষ্ট্র-ক্ষমতা অধিকার করে। এই বিপ্লব ঘটে ২৫শে অক্টোবর, ১৯১৭ খ্রীঃ। এজন্যে এই বিপ্লবকে 'অক্টোবর বিপ্লব' বলা হয়। নূতন বিপ্লবী দিনপঞ্জী অনুসারে এই দিন ছিল ৬ই নভেম্বর। এজন্যে কেহ কেহ এই বিপ্লবকে 'নভেম্বর বিপ্লব' বলেন।

লেনিনের ভূমিকা : এপ্রিল থিসিস : সকল ক্ষমতা সোভিয়েতে যাবে নীতি ঘোষণা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : অক্টোবর বিপ্লবে বলশেভিকদের জয়লাভের কারণ : রুশ প্রজাতন্ত্রের পতনের কারণ (Causes of the victory of the Bolsheviks : Causes of the failure of the Russian Republic) : ১৮৯৮ খ্রীঃ রুশ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি গঠিত হওয়ার পর, ১৯৩০ খ্রীঃ ব্রাসেল্স সম্মেলনে এই পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়। লেনিনের অনুগামীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে বলশেভিক নাম নেয় এবং তাঁর বিরোধীরা মেনশেভিক বা সংখ্যালঘু নামে পরিচিত হয়। ১৯১২ খ্রীঃ প্রাগে বলশেভিকরা সমবেত হয়ে তিনটি লক্ষ্য নেয়। যথা—(১) রাশিয়ায় একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা করা; (২) শ্রমিকদের প্রত্যহ ৮ ঘন্টা কাজের সময় স্থির করা; (৩) জমিদারি ও সামন্তপ্রথাকে লোপ করা। প্রাগ-সম্মেলনের পর বলশেভিক দলের মুখপত্র হিসাবে "প্রাভদা" পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রাশিয়ায় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বলশেভিক দলই ছিল সর্বাপেক্ষা সংগঠিত, শক্তিশালী এবং বিপ্লবের প্রাক্কালে তাদের লক্ষ্য ও কর্তব্য সম্পর্কে মোটামুটিভাবে ধ্রুব। তুলনামূলকভাবে বুর্জোয়াপন্থী ক্যাডেটগোষ্ঠী ছিল অসংগঠিত, দ্বিধাপূর্ণ। মেনশেভিকরা ছিল তত্ত্ববাদী আর বলশেভিকরা ছিল বাস্তববাদী। স্বভাবতঃই তারা সংগঠন শক্তি ও বাস্তববাদের জোরে ১৯১৭ খ্রীঃ বিপ্লবে নেতৃত্ব দান করে।

প্রাগ সম্মেলন : বলশেভিক দলের কর্মধারা

১৯০৫ খ্রীঃ বিপ্লবের পর থেকে শ্রমিকদের মধ্যে বলশেভিক দল সক্রিয় সংগঠন গঠন করে। শ্রমিক কমিউনগুলির শিল্প জাতীয়করণের দাবি, ৮ ঘন্টা কাজের সময় নির্দিষ্ট করে আইনরক্ষার দাবি বলশেভিকরা সর্বশক্তি দিয়ে সমর্থন করে। এর ফলে রাশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শ্রেণী অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর উপর বলশেভিকদের প্রভাব স্থাপিত হয়। বলশেভিক দল শ্রমিকদের ক্লাব, ট্রেড ইউনিয়ন, পাঠচক্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সমিতি গঠন দ্বারা শ্রমিকদের রাজনৈতিক ও সংগ্রামী চেতনা বৃদ্ধি করে। ১৯১৭ খ্রীঃ বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। অন্য

কোন দলের হাতে এই প্রকার সংগঠিত শক্তি ছিল না। রুশ-বুদ্ধিজীবীদের একটি বড় অংশ, বলশেভিক দলের সমর্থক ছিল। বিপ্লব শুরু হলে সেনাদলের মধ্যে বলশেভিকদের সমর্থকরা ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১৭ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারীতে বিপ্লব ঘোষিত হলে পেট্রোগ্রাডের পাভলোভস্কি রেজিমেন্ট ও মস্কোর ভলিনস্কি রেজিমেন্ট বলশেভিক দলের ডাকে বিদ্রোহে যোগ দেয়। এই দলের কর্মীরা সৈনিকদের মধ্যে কমিউন গঠন করে। ফলে সেনাদলের উপরেও বলশেভিকদের প্রভাব স্থাপিত হয়। অফিসারদের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে যায়। ফেব্রুয়ারী-বিপ্লবের পর অস্থায়ী প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বলশেভিক দল এই সকল অনুগত সেনাদের ব্যবহার করতে সক্ষম হয়।

বলশেভিকদের শ্রমিক ও সেনাদলের উপর প্রভাব : কমিউন গঠন

জার সরকারের পচনশীল অবস্থার জন্যেই ১৯১৭ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী-বিপ্লবে জারতন্ত্রের পতন হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার সরকারের শোচনীয় পরাজয় ও যুদ্ধজনিত অর্থনৈতিক সঙ্কট এই পতনকে ত্বরান্বিত করে। বলশেভিক দল এই সুযোগের পুরা সদ্ব্যবহার করে। ১৯১৭ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী-বিপ্লবে জারতন্ত্রের পতন হলে শ্রমিক ও সেনা-প্রতিনিধিদের সাহায্যে পেট্রোগ্রাড সোভিয়েত এবং এই সোভিয়েত দ্বারা একটি বিকল্প সরকার করা হয়।[১] ১৯১৭ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী-বিপ্লবের পর থেকে রাশিয়ায় কার্যতঃ ৮ মাস ধরে দ্বৈত-সরকার চলতে থাকে। একদিকে ছিল চতুর্থ ডুমার অনুমোদিত অস্থায়ী প্রজাতন্ত্র, অপরদিকে ছিল বলশেভিক দলের দ্বারা পরিচালিত পেট্রোগ্রাড সোভিয়েত। রাশিয়ার গ্রাম ও শহরগুলিতে অনুরূপ সোভিয়েত গঠিত হয়। এই উভয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতাদখলের লড়াই আরম্ভ হয়। উভয় সরকারের কোনটিরই প্রকৃত বৈধ স্বত্ব (Legitimacy) তখন ছিল না। অস্থায়ী প্রজাতন্ত্র যে ডুমার দ্বারা গঠিত হয়, সেই ডুমার সদস্য ছিল সম্পত্তির ভিত্তির ভোটে নির্বাচিত। রুশ জনমত প্রজাতন্ত্র সমর্থন করে কিনা তা গণভোট দ্বারা তা জানা দরকার ছিল। কিন্তু তা করা হয় নি। ফলে এই প্রজাতন্ত্রের প্রকৃত বৈধ স্বত্ব ছিল না। জনসাধারণের মধ্যে এই সরকারের শিকড়ও ছিল না।

ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর বলশেভিক দলের গণসংযোগ : অস্থায়ী প্রজাতন্ত্রের বিচ্ছিন্নতা

অপরদিকে, বলশেভিক দলের প্রতিষ্ঠিত পেট্রোগ্রাড সোভিয়েতকেও বৈধ স্বত্বদানের জন্যে রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের সোভিয়েতগুলির প্রতিনিধিদের কংগ্রেস ডেকে এই প্রতিনিধিদের ভোটে পেট্রোগ্রাড সোভিয়েতকে বৈধ কেন্দ্রীয় সরকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই সরকার বৈধ কিনা সে প্রশ্নও ছিল সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে। মেনশেভিক ও অন্যান্য সমাজতন্ত্রীরা এই মত প্রকাশ করেন যে, রাশিয়াতে প্রলিতারিয় বিপ্লব ও শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত সময় এখনও আসে নি। এখন গ্রামের সর্বহারা বা প্রলিতারিয়েত প্রস্তুত হয় নি। মার্কসীয় তত্ত্ব অনুসারে গ্রামের ও শহরের প্রলিতারিয়েত একযোগে বিপ্লব করবে। সুতরাং অপেক্ষা প্রয়োজন। এর ফলে বলশেভিক দলে দ্বিধা দেখা দেয়। তাছাড়া প্রজাতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা আইনগত কাজ হবে কিনা সে প্রশ্নও অনেকের মনে ছিল। এই দ্বিধাকে লেনিন তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দ্বারা দূর করেন। তাঁর যুক্তিগুলি বলশেভিক দলকে অনুপ্রাণিত করে।

বলশেভিক দল ও পেট্রোগ্রাড সোভিয়েত সমস্যা

বলশেভিক নেতা ভি-আই- লেনিন তাঁর এপ্রিল থিসিস দ্বারা মেনশেভিক ও অন্যান্য সংশয়বাদীদের যুক্তি নাকচ করে দেন। (১) তিনি মেনশেভিকদের এই তত্ত্ব, জারতন্ত্রের পর রাশিয়ায় বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতা দখল করতে দেওয়া উচিত নস্যাৎ করেন। তিনি বলেন যে, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি একটি ঐতিহাসিক অবিচার স্থায়ী হতে

১· Gusev and Naumov.

চলেছে।[১] এই বিপ্লব রুশ শ্রমিক-সেনা-কৃষকরাই এনেছে. কিন্তু মাঝখান থেকে বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতা দখল করে নিচ্ছে। এটা চলতে দেওয়া যায় না। (২) "বুর্জোয়াশ্রেণীকে এখন সরকার গঠনের সুযোগ দেওয়া হোক" এই মতবাদ যে সকল সোস্যাল ডেমোক্র্যাট প্রচার করেন তাঁরা ভ্রান্ত, অপরিণামদর্শী, অন্ধ তত্ত্ববাদী, মোটেই বাস্তববাদী নন। (৩) লেনিন তাঁর বিখ্যাত এপ্রিল থিসিসে বলেন যে, ১৯১৭ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী-মার্চ বিপ্লবে বুর্জোয়া বিপ্লবের স্তর অতিক্রম করা হয়েছে। কারণ এই বিপ্লবের দ্বারা যেমন একদিকে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়েছে, তেমন অপরদিকে পেট্রোগ্রাড ও অন্যান্য স্থানে শ্রমিক, কৃষক, সেনাদল সোভিয়েত স্থাপিত হয়েছে। এখন প্রলিতারিয় বিপ্লবের ডানায় ভর দিয়ে আবার বুর্জোয়া বিপ্লবের নীতিতে ফিরে যাওয়া উচিত হবে না। (৪) রাশিয়ার শ্রমিকরা বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত, সেনারা বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার যে বিরল সুযোগ ইতিহাস দিয়েছে তাকে হারালে আর পাওয়া যাবে না। (৫) এখন যদি পিছিয়ে আসা যায় তবে বুর্জোয়া-বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে পায়ের তলায় পিসে ফেলবে। (৬) বুর্জোয়া-বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে উত্তরণের যে সকল স্তর মার্কসীয় মতে আছে, রাশিয়ায় তার সকল স্তর পূর্ণ না হলেও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব গ্রহণই করা দরকার। নতুবা আর কখনও সম্ভব হবে না। (৭) সর্বশেষে, তিনি বলেন যে, ক্ষমতাভোগী সামন্ত শ্রেণীর হাত থেকে বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতা দখল করায়, বিপ্লবের মূল শর্ত পূর্ণ হয়েছে। বিপ্লবের প্রথম স্তর এখন শেষ, দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে আগানো দরকার।

লেনিনের বিপ্লবতত্ত্ব : এপ্রিল থিসিস

অস্থায়ী প্রজাতন্ত্রের পতন এই সরকারের অদূরদর্শিতার ফলে ত্বরান্বিত হয়। এই প্রজাতন্ত্র জনমত অগ্রাহ্য করে যুদ্ধ পরিচালনা করায় সেনাদল, জনসাধারণ ও শ্রমিকদের সহানুভূতি হারায়। ভূমিসংস্কার ও শ্রমিকের দাবি পূরণের প্রশ্ন যুদ্ধ শেষ হলে সমাধান করা হবে বলে এরা আশ্বাস দেয়। তাতে কোন কাজ হয় নি। অস্থায়ী সরকারের প্রধান কেরেনেস্কি জার্মানীর বিরুদ্ধে সমর অভিযান (জুলাই, ১৯১৭ খ্রীঃ) পরিচালনা করে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। এর ফলে অস্থায়ী প্রজাতন্ত্র ধিক্কৃত হয়। সেনাদল রণাঙ্গন ছেড়ে চলে আসতে থাকে।[২] কেরেনেস্কির বিরুদ্ধে ক্ষমতা দখলের জন্যে তাঁর সেনাপতি কর্নিলোভ বিদ্রোহ করেন। কর্নিলোভ ছিলেন পুঁজিপতিদের এজেন্ট, সমাজতন্ত্রবাদী কেরেনেস্কিকে তিনি উচ্ছেদের চেষ্টা করেন। এই গৃহযুদ্ধে প্রজাতন্ত্র এর ফলে অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে।

অস্থায়ী প্রজাতন্ত্রের ভ্রান্ত জনস্বার্থ বিরোধী নীতি

লেনিন আর দেরী করতে চান নি। জুন, ১৯১৭ খ্রীঃ পেট্রোগ্রাডে সমগ্র রাশিয়ার সোভিয়েতগুলির প্রতিনিধিদের সমবায়ে সর্ব-সোভিয়েত রুশ-কংগ্রেস ডাকা হয়। এই কংগ্রেসে পেট্রোগ্রাড সোভিয়েতকে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব নিতে ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৯১৭ খ্রীঃ ২৫শে অক্টোবরে পেট্রোগ্রাড সোভিয়েতে অনুগত শ্রমিক ও সেনা প্রতিনিধিদের দ্বারা রাজধানী পেট্রোগ্রাডের সরকারী অফিসগুলি অধিকার করে নিলে বলশেভিক বিপ্লব সফল হয়। কেরেনেস্কি প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটে। বলশেভিক দল — জনসাধারণ; শ্রমিক ও কৃষকদের তিনটি প্রতিশ্রুতি দেয়, যথা—রুটি, জমি ও শান্তি। পূর্বে প্রজাতন্ত্র এই প্রতিশ্রুতি না দেওয়ায় তাদের জনপ্রিয়তা ছিল না।

অক্টোবর বিপ্লব

সেন্ট্রাল-ইনসিন —"১৯১৪"।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ নব প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত সরকার ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (The New Soviet Government and the First World War) ঃ

I. বলশেভিক দল "শান্তি, ভূমি ও রুটি (Peace, Land and Bread) দানের প্রতিশ্রুতি দান করে অক্টোবর বিপ্লবের দ্বারা সরকারী ক্ষমতা অধিকার করে। সর্ব রুশীয় সোভিয়েত কংগ্রেস অক্টোবর বিপ্লবের সময় "শান্তির ঘোষণাপত্র" (Decree of Peace) প্রচার করে। এই ঘোষণাপত্রে বলা হয় যে, সোভিয়েত সরকারের মতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হল মানবজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। বলশেভিক সরকার সকল জাতির সমান অধিকারের নীতিতে শান্তি স্থাপনে আগ্রহী।

শান্তির ঘোষণাপত্র

II. এরপর বলশেভিক সরকার রাশিয়ায় পুরাতনতন্ত্রকে ধ্বংস করার কাজে হাত দেয়। (ক) চতুর্থ ডুমা বা সংবিধানসভাকে বাতিল করা হয়। প্রজাতন্ত্রী সরকারের বিপ্লববিরোধী বহু সদস্যকে নির্বাসিত করা হয়। (খ) মস্কো ও পেট্রোগ্রাড শহরের মিউনিসিপ্যালিটিগুলি ভেঙে দেওয়া হয়। (গ) জারের আমলের সিনেটসভা ভেঙে দেওয়া হয়। (ঘ) জেমেস্টভো বা জেলা পরিষদগুলিও ভেঙে দেওয়া হয়। (ঙ) সেনাদলে অফিসার নিয়োগের নিয়ম বদলে ফেলা হয়। (চ) সেনাদলে শৃঙ্খলারক্ষার জন্যে পুরাতন নিয়মকানুন নাকচ করা হয়। সেনাদের মধ্যে পুরাতন শ্রেণীবিভাগ লোপ করা হয়। (ছ) রাশিয়ার গীর্জার সম্পত্তি জাতীয়করণ করা হয় এবং গীর্জাকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করা হয়। (জ) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুরাতনতন্ত্র লোপের ব্যবস্থা তীব্রতর হয়। কলকারখানা, খামার, ভূ-সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করে জাতীয় সম্পত্তি হিসাবে রাষ্ট্রের অধীনে আনা হয়। (ঝ) ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ করা হয়। ব্যাঙ্কে যে সকল টাকা লোকে আমানত করে সুদ ভোগ করত সেই টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। সাধারণ আমানতকারীদের মাত্র ১৫০০ শত রুবল ব্যাঙ্ক থেকে তোলার অনুমতি দেওয়া হয়। (ঞ) উৎপাদন বন্টনব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করা হয়। (ট) বৃহৎ জমিদারি, কুলাকদের ভূ-সম্পত্তি, খামার রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। (ঠ) সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্যে কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নি। (ড) সরকারী ঋণ ও বৈদেশিক ঋণ বাতিল করা হয়। (ঢ) ব্যবসা-বাণিজ্যের জাতীয়করণ করা হয়। বিশেষতঃ চিনি-শিল্পকে রাষ্ট্রের অধীনে আনা হয়।

সোভিয়েত সরকার দ্বারা পুরাতনতন্ত্র ধ্বংস

III. পুরাতনতন্ত্র ধ্বংস করার পর বলশেভিক সরকার নূতন সমাজব্যবস্থা গড়ার কাজে হাত দেন। (ক) জমিদার, গীর্জার বাজেয়াপ্ত জমি স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়। (খ) জমিবন্টনের জন্যে স্থানীয় সোভিয়েতগুলিকে ভার দেওয়া হয়। (গ) সর্ব সোভিয়েত কংগ্রেসের নির্দেশে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা লেনিনের নেতৃত্বে গঠিত হয়। (ঘ) কংগ্রেসের নির্দেশে সর্বরুশীয় কেন্দ্রীয় পরিচালক সমিতি আপাততঃ ১০১ জন সদস্য সহ স্থাপিত হয়। এই সমিতিতে ৬২ জন বলশেভিক, বাকী সেনা, শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধি ছিল।

ভূমি বন্টন ঃ কেন্দ্রীয় সরকার গঠন

IV. (১) কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে প্রায় ১৫০ মিলিয়ন ডেসিয়াটিন জমি ও ৩০০ মিলিয়ন রুবল মূল্যের কৃষির যন্ত্রপাতি জমিদারদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়। (২) শ্রমিকদের যে জমি দেওয়া হয়, তার দরুন প্রায় ৭০০ মিলিয়ন রুবল খাজনা মকুব করা হয়। (৩) জনসাধারণের শ্রেণীবিভাগ লোপ করা হয়। সকল নাগরিক সমান ঘোষিত হয়। (৪) ধর্মীয় স্বাধীনতা আইন দ্বারা রাষ্ট্র থেকে গীর্জাকে পৃথক করা হয়। (৫) স্কুল-কলেজগুলিতে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাপ্রসারের নিয়ম চালু করা হয়।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার

(৬) বিদ্যাভবনের উপর গীর্জার নিয়ন্ত্রণ লুপ্ত হয়। (৭) নাগরিকদের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস ও ধর্ম-আচরণে কোন হস্তক্ষেপ না-করার আশ্বাস দেওয়া হয়।

V. "রুশ জনসাধারণের অধিকার-পত্র" নামে ঘোষণার দ্বারা : (১) রুশ জনগণের সার্বভৌমত্বের অধিকার ঘোষিত হয়। (২) রাশিয়ায় যে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোক ছিল, তাদের সমান অধিকার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হয়। (৩) কোন বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর বিশেষ অধিকার লোপ করা হয়। (৪) সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর পূর্ণ বিকাশের আশ্বাস দেওয়া হয়।

সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর প্রতি ন্যায় বিচার প্রদর্শন

VI. (১) প্রশাসনযন্ত্রকে জনকল্যাণমুখী কাজের উপযোগী করার জন্যে ঢেলে সাজানো হয়। (২) প্রশাসন ও সামরিক বিভাগ থেকে জারতন্ত্রী, মেনশেভিক ও প্রজাতন্ত্রী ষড়যন্ত্রকারীদের বহিষ্কার করা হয়। (৩) সাচ্চা বলশেভিক বা শ্রমিক পটভূমিকাযুক্ত নিবেদিত কর্মীদের প্রশাসনের বিভিন্ন শাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়। (৪) প্রতিবিপ্লবী ও অন্তর্ঘাতবিরোধী কমিশন বা চেকা (cheka) নামে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশন ও পুলিশবাহিনী স্ট্যালিনের নেতৃত্বে গড়া হয়। চেকা দৃঢ় ও নির্মম হাতে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সন্ত্রাসের দ্বারা নির্মূল করে ফেলে। চেকার নির্মম সন্ত্রাস ও হত্যার জনমত নিন্দা করায়, এর বিকল্প হিসাবে ১৯২২ খ্রী· G.P.U বা সরকারী রাজনৈতিক দপ্তর গঠিত হয়।

প্রশাসন যন্ত্রের দলীয় করণ

VII. (১) উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থাকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনার পর শ্রমিকদের নির্বাচিত সমিতির দ্বারা প্রতি কারখানার উৎপাদনকে চালু রাখার ব্যবস্থা করা হয়। (২) যে কারখানাগুলি ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকে, সেখানে শ্রমিক সমিতির দ্বারা উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যাতে মালিকরা উৎপাদন কমিয়ে সরকারকে বিপাকে না ফেলে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। (৩) যে কারখানার মালিকরা শ্রমিক সমিতির নিয়ন্ত্রণে বাধা দেয়, সেগুলি জাতীয়করণ করা হয়। (৪) শ্রমিকদের প্রত্যহ ৮ ঘণ্টা কাজের সময় বেঁধে দেওয়া হয়। ১৮ বছরের কম বয়সীদের জন্যে কাজের সময় ৬ ঘণ্টা বাঁধা হয়। শ্রমিকদের বছরে পুরো কাজের জন্যে সবেতন ছুটি, বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হয় এবং শ্রমিকদের বাসগৃহের ভাড়া নিম্নতম হারে বেঁধে দেওয়া হয়। (৫) শ্রমিকদের সন্তান-সন্ততিদের জন্যে বিদ্যালয়ের দরজা খুলে দেওয়া হয়।

শিল্প-কারখানার নীতি : শ্রমিক নীতি

VIII. (১) সমাজতন্ত্রী রুশ সরকার জাতীয় শিক্ষাপ্রসারের পরিকল্পনা রচনা করেন। (২) গবেষকদের পারিশ্রমিক বা সম্মান-মূল্যে অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। (৩) গবেষণা ও সংস্কৃতির চর্চাকে উৎসাহ দেওয়া হয়। ১৯১৮ খ্রীঃ তৃতীয় সর্ব রুশ সোভিয়েতের কংগ্রেস আহূত হয়। এই কংগ্রেসে শ্রমিক, কৃষক, সেনাদল, বুদ্ধিজীবী সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিরা যোগ দেন। তাঁরা বলশেভিক সরকারের সংস্কারকে সাধুবাদ জানান।

শিক্ষা নীতি

অক্টোবর-বিপ্লবের দ্বারা ক্ষমতা অধিকারের পর সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র জার্মানীর সঙ্গে শান্তি স্থাপনের নীতি নেয়। জার্মানী শান্তির জন্যে অত্যন্ত কঠোর শর্ত দাবি করলে রুশীয় সোভিয়েতের নেতারা যে-কোন মূল্যে এমন কি রুশ-ভূমিখণ্ড ছেড়ে দিয়ে শান্তি ক্রয় করার উপর জোর দেন। ফলে জার্মানীর সঙ্গে ব্রেস্ট লিটভস্কের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির দ্বারা (১) রুশ অধিকৃত পোল্যান্ড, তিনটি

ব্রেষ্ট লিটভস্কের সন্ধি : শান্তি স্থাপন

বাল্টিক রাজ্য, ফিন্‌ল্যান্ড, বাইলো রাশিয়া, ইউক্রেন ও ট্রান্স-ককেশিয়ার একাংশ জার্মানীকে ছেড়ে দিতে রাশিয়া বাধ্য হয়। (২) জার্মানীকে যুদ্ধের জন্যে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। ব্রেস্ট লিটভস্কের সন্ধির ফলে জার্মানীর সঙ্গে বলশেভিক সরকারের যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ হয়। বলশেভিক সরকার অভ্যন্তরীণ সংগঠনের কাজে মন দিতে সক্ষম হয়। লেনিন এই সন্ধিকে সাময়িক মনে করতেন। নয় মাস পরে জার্মানী মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করলে তিনি এই সন্ধি নাকচ করেন। কিন্তু প্যারিসের শান্তিবৈঠকে সমবেত মিত্রশক্তি রাশিয়াকে যোগ দিতে দেয় নি। তারা বলে যে, জার্মানীর সঙ্গে ব্রেস্ট লিটভস্কের সন্ধি করায়, প্যারিসের শান্তিবৈঠকে যোগদানের অধিকার হারিয়েছে। ব্রেস্ট লিটভস্কের সন্ধিতে যে স্থানগুলি রাশিয়া ছেড়ে দেয়, ভার্সাই-সন্ধির দ্বারা তার বেশির ভাগ রাশিয়াকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় নি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ ১৯১৭ খ্রীঃ বলশেভিক বিপ্লবের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব (The International significance of the Bolshevik Revolution of 1917) ঃ ১৯১৭ খ্রীঃ রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা। মানবজাতির ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লব ছাড়া বলশেভিক বিপ্লবের মত এত গভীর মূল, সুদূর প্রসারী, আলোড়নকারী ঘটনা আর ঘটেনি। ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব প্রধানতঃ ইওরোপে সীমাবদ্ধ ছিল। বলশেভিক বিপ্লবের প্রভাব সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়। ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি সফল হতে অনেক সময় লেগেছিল। ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারাগুলি বীজরূপে রয়ে যায় এবং কয়েক দশক পরে তা নতন ভাবে জন্মলাভ করে। বলশেভিক বিপ্লবের ফল ছিল প্রত্যক্ষ। রুশ জনগণ, শ্রমিক, কৃষকশ্রেণী চিরতরে জারতন্ত্র ও বুর্জোয়া-শাসনকে প্রত্যাখ্যান করে। ফরাসী বিপ্লব সর্বপ্রথম মানুষের মুক্তি, সমান অধিকারের বাণীকে উচ্চারণ করে। দার্শনিক রুশোর বেদনাময় উক্তি—"মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে, সকল ক্ষেত্রে তাকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়" ফরাসী বিপ্লবের শিকল ভাঙ্গার গান হয়ে বেজে উঠে। কার্ল মার্কসের বাণী "দুনিয়ার সর্বহারাশ্রেণী এক হও, তোমাদের শৃঙ্খল ছাড়া আর কিছু হারাবার ভয় নেই" ছিল রুশ-বিপ্লবের শিকল ভাঙ্গার গান। রুশ শ্রমিকদের বিজয় বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নূতন চেতনা, আত্মবিশ্বাস, অধিকারবোধ ও নূতন ভবিষ্যতের স্বপ্ন জাগায়।

রুশ বিপ্লবের প্রত্যক্ষ প্রভাব

রুশ বিপ্লব দরিদ্র, ভূমিহীন কৃষক, প্রান্তিক চাষী, নিম্ন মজুরিভোগী, মৃতপ্রায় শ্রমিককে নূতন মুক্তির বার্তা এনে দেয়। সমাজের ধনবন্টন দ্বারা অর্থনৈতিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং খেটে-খাওয়া মেহনতী মানুষের প্রতিনিধিদের দ্বারা সরকার গঠনের পথ রুশ-বিপ্লব দেখিয়ে দেয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মেহনতী মানুষের জন্যে রুশ-বিপ্লবের বার্তা পৌঁছেযায়। তার ফলে ধনতন্ত্রী দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর যে জাগরণ দেখা দেয়, তা পুঁজিবাদী সমাজকে ধসিয়ে দিতে থাকে। অক্টোবর বিপ্লবের আন্তর্জাতিক প্রভাব ছিল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ।

সমাজের পদদলিত শ্রেণীর জাগরণ

(১) অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাবে জার্মানীর হোহেনজোলার্ন রাজবংশের পতন হয়। কাইজারের বিরুদ্ধে জার্মানীতে যে প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে তাতে জার্মান সমাজতন্ত্রীদের উল্লেখ্য ভূমিকা ছিল। (২) অক্টোবর বিপ্লবের ধাক্কায় হ্যাপ্‌সবার্গ রাজবংশের পতন ঘটে।[১] ১৯১৯ খ্রীঃ হাঙ্গেরী, ব্যাভেরিয়া ও শ্লোভাকিয়া রাজ্যে সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত গঠিত হয়। এর ফলে জার্মানীর ও

১ Gusev and Naumov

বলশেভিক বিপ্লবের আন্তর্জাতিক প্রভাব

অস্ট্রিয়ার স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের পতন ঘটে। জার্মানবাহিনী ব্রেস্ট লিট্‌ভস্কের সন্ধিস্বাক্ষরের পরেও সীমান্তরেখা না মেনে রুশভূমিতে অনুপ্রবেশ ও গণ্ডগোলের চেষ্টা চালায়। কিন্তু রুশ-বিপ্লবের আদর্শ জার্মানী বাহিনীর ভিতর মড়কের মত ছড়িয়ে পড়লে, কাইজার সরকার সেনাদলের শৃঙ্খলা ভাঙ্গার ভয়ে রাশিয়া থেকে হাত গোটাতে বাধ্য হন।

ধনতন্ত্রী দেশগুলির সোভিয়েত সরকারকে আক্রমণ ও পরাজয় বরণ

১৯১৯ খ্রীঃ গঠিত বিপ্লবী হাঙ্গেরী, স্লোভাকিয়া ও ব্যাভেরিয়ার কমিউনিস্ট সরকারের পতন ঘটে। কিন্তু এই ধরনের বিপ্লবের ভীতি ধনতন্ত্রী দেশগুলিকে আশঙ্কিত করে। ফলে ইওরোপের ধনতন্ত্রী দেশগুলি রাশিয়ার বিপ্লবী সরকারকে আক্রমণ করে [illegible] [illegible] চেষ্টা চালায়। রাশিয়ার উপর ইংরাজ, ফরাসী, আমেরিকান, জাপানী, চেক সেনারা একযোগে আক্রমণ চালায়। এই বৈদেশিক আক্রমণ শিশুবলশেভিক প্রজাতন্ত্রকে বিশেষ বিপন্ন করে। কিন্তু লেনিনের দৃঢ় নেতৃত্ব, রুশসেনা ও জনসাধারণের দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ রাশিয়াকে জয় এনে দেয়।

রুশ-বিপ্লব কেবলমাত্র রুশদেশের শোষিত শ্রেণীকে মুক্তি দিয়ে নিঃশেষ হয় নি। কার্ল মার্ক্সের আদর্শ অনুযায়ী রুশ-বিপ্লবকে বিশ্ব-বিপ্লবের সূচনা বলে গণ্য করা হয়। বিশ্বের শ্রমিক ও শোষিত মানুষের মুক্তিযুদ্ধে রুশী কমিউনিস্ট সরকার সহযোগিতা ও সহমর্মিতার আশ্বাস দেন। সমগ্র বিশ্বে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা, ধনতন্ত্রের বিকাশ এই বিপ্লবের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করা হয়। ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে বলশেভিক বিপ্লব এক নূতন মুক্তির বার্তা বয়ে আনে।

বলশেভিক বিপ্লবের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চিন্তাধারা

সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলির ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে রুশ সমাজতান্ত্রিক সরকার ধিক্কার জানান। তুরস্কের কামাল পাশাকে ব্রিটিশ ও গ্রীক সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সরকার অকুণ্ঠ সাহায্য দেন। তার ফলে কামাল পাশা সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারীদের পরাস্ত করে তুরস্কের স্বাধীনতা রক্ষা করতে সক্ষম হন। ঔপনিবেশিক দেশগুলির মুক্তি-র জন্যে এবং বিশ্ব-বিপ্লবের আদর্শ প্রচারের জন্যে তৃতীয় আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী কংগ্রেসের বা তৃতীয় ইন্টারন্যাশনালের (Third International) অধিবেশন রাশিয়াতে ডাকা হয়; তাতে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে মানবেন্দ্রনাথ রায় যোগ দেন। রাশিয়ার সমাজতন্ত্রীদের সহায়তায় কমিন্টার্ন বা আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলন জোরদার হয়। চীনে বোরোদিন ও গ্যালেন্‌সের সহায়তায় চীনা কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্রী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বাড়ে। বিভিন্ন দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বলবতী হয়। ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলি তাদের দেশের শ্রমিকদের শান্ত রাখার জন্যে শ্রমিক কল্যাণমূলক সংস্কার চালু করতে বাধ্য হয়। রুশ-বিপ্লব থেকে বিশ্ব-বিপ্লব আরম্ভ হওয়ার ভয়ে তারা নিজ নিজ দেশে কিছু পরিমাণ সমাজতান্ত্রিক সংস্কার দ্বারা বিপ্লবের সম্ভাবনা বন্ধ করার চেষ্টা করে। এভাবে বলশেভিক বিপ্লব পৃথিবীতে এক নূতন সমাজব্যবস্থা ও নূতন সভ্যতার পত্তন করে।

[গ] নবম পরিচ্ছেদ : সমাজতান্ত্রিক রুশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লব : রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধ, ১৯১৮—১৯২১ খ্রীঃ (The Counter Revolution and Civil war against the Socialist Government) : রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবের ফলে বলশেভিক দল শাসনক্ষমতা অধিকার করে। এই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য এক মারাত্মক প্রতি-বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ ও তৎসহ বৈদেশিক আক্রমণ শুরু হয়। রাশিয়ার বিভিন্ন

অঞ্চলের সামন্ততান্ত্রিক শাসনকর্তারা বা আতামানরা বলশেভিক প্রজাতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য জানাতে অস্বীকার করে। বলশেভিক সরকার এই বিদ্রোহ সহজে দমন করে। আতামানরা পরাজিত, নিহত হন। অনেকে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করেন। বলশেভিক সরকারের প্রাথমিক বিপদ কেটে যায়।

সামন্ত বা আতামান বিদ্রোহ

১৯১৮ খ্রীঃ নাগাদ আবার প্রবল আকারে গৃহযুদ্ধ ও বৈদেশিক আক্রমণ একযোগে আরম্ভ হয়। এই যুগ্ম আক্রমণের সাঁড়াশির চাপে বলশেভিক রাষ্ট্রকে পিষে ফেলার চেষ্টা করা হয়। এটাই ছিল সমাজতান্ত্রিক সরকারের সর্বাপেক্ষা বড় সঙ্কটের কাল। বৈদেশিক শক্তিগুলি রাশিয়ার ভিতর বিদ্রোহী প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিশক্তিকে বিদ্রোহ করার জন্যে প্ররোচনা ও অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সাহায্য করে। অপরদিকে রুশ-সীমান্ত দিয়ে এই বৈদেশিক শক্তির সেনাদল পূর্ণবেগে মস্কো ও পেট্রোগ্রাড লক্ষ্য করে ছুটে যেতে চেষ্টা করে।

কাইজারের জার্মানীর সন্ধিভঙ্গের চেষ্টা

(১) ১৯১৮ খ্রীঃ মার্চ মাসে ব্রিটিশ রণতরী গ্লোরী (Glory) উত্তর রাশিয়ার মুরমানস্ক বন্দরে ঢুকে পড়ে। এই রণতরীর কামানের আশ্রয়ে ব্রিটিশ সেনা রুশভূমিতে নেমে পড়তে থাকে। (২) এপ্রিল মাস থেকে জাপানী সেনা প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে ভ্লাডিভোস্টক বন্দরে নামে ও সাইবেরিয়ায় ঢুকে পড়ে। (৩) ২ হাজার মার্কিন সেনা 'টমাস' যুদ্ধজাহাজ থেকে একই বন্দরে নামে। (৪) ভারত থেকে পাঠানো ব্রিটিশ সেনা ইরানের পথে রুশ তৈলকেন্দ্র বাকু ও তুর্কমেনিয়া অধিকার করে। (৫) আঁতাত-শক্তি ভ্লাডিভোস্টক বন্দরকে আন্তর্জাতিক বন্দর বলে ঘোষণা করে এবং এই বন্দরে সেনা নামায়। জাপানের ৭০-৭৫ হাজার এবং ১০-১২ হাজার মার্কিন সেনা এই বন্দরে নামে। (৬) চেকোস্লোভাকিয়াকে মিত্রশক্তি যুদ্ধের শেষে এই শর্তে-স্বাধীনতা দিতে রাজী হয় যে, চেকোস্লোভাকিয়া তার জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী দ্বারা সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যভাগ আক্রমণ করবে ফলে ৫০ হাজার চেক-সেনা মধ্য-রাশিয়া আক্রমণ করে।

ত্রিশক্তি আঁতাত, মার্কিন দেশ ও জাপানের আক্রমণ

বৈদেশিক আক্রমণের সুযোগে রাশিয়ার প্রতি-বিপ্লবী শক্তি বলশেভিক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই প্রতিবিপ্লবীদের মধ্যে ছিল অস্থায়ী প্রজাতন্ত্রের প্রতি অনুগত কিছু সৈন্য ও সেনাপতি। এঁদের মধ্যে ছিলেন সেনাপতি কোলচাক, সেনাপতি ডেনিকিন প্রভৃতি। এছাড়া ছিলেন কিছু জারতন্ত্রী সেনাপতি, জমিদার ও ধনীব্যক্তি। এই প্রতিবিপ্লবীরা বলশেভিক সরকারের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ শুরু করে। প্রথমদিকে তারা বেশ সফল হয়। এই প্রতিবিপ্লবীদের সেনাদলকে বলা হত শ্বেতবাহিনী। কমিউনিস্ট 'লাল ফৌজ' ছিল বিপ্লবের প্রতীক। তাদের পতাকা ছিল লাল এবং শ্রমিকের প্রতীক কাস্তে-হাতুড়ি খচিত। কমিউনিস্ট বাহিনীকে এজন্য বলা হয় লাল ফৌজ। বৈদেশিক শক্তিগুলি প্রতিবিপ্লবীদের অস্ত্রসরবরাহ ও অর্থসাহায্য দেয়। রাশিয়ায় প্রায় $\frac{3}{4}$ ভাগ ভূমি প্রতিবিপ্লবীরা অধিকার করে। প্রতিবিপ্লবীরা চারদিক থেকে সমাজতান্ত্রিক সরকারকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে। তারা রেলপথ ও পুলগুলি ধ্বংস করে খাদ্য ও রসদ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে দিতে চেষ্টা করে। বলশেভিক নেতাদের গুপ্তঘাতক দ্বারা হত্যা করা হয়। লেনিনের উপর ১০ই আগস্ট, ১৯১৮ খ্রীঃ একটি আক্রমণ চালানো হয়। সৌভাগ্যক্রমে তিনি রক্ষা পান।

প্রতি-বিপ্লবী প্রতিক্রিয়া গৃহযুদ্ধ

লেনিন এই সঙ্কটে হতোদ্যম না হয়ে বলশেভিক সরকারকে রক্ষার জন্যে কৃতসঙ্কল্প হন। দেশপ্রেমিক রুশ জনসাধারণ, রুশ শ্রমিক ও বলশেভিক কর্মীরা এই সরকারকে রক্ষার জন্যে আত্মোৎসর্গে প্রস্তুত হন। রুশ কৃষকরা শীঘ্রই বুঝতে পারেন যে, যদি প্রতিবিপ্লবীরা জয়লাভ

করে, তবে জমিদারি বা কুলাক-প্রথা আবার ফিরে আসবে। কারণ প্রতিবিপ্লবীদের অনেকেই ছিল কুলাক। প্রতিবিপ্লবীদের বৈদেশিক শক্তির চর বলে রুশ-জনগণ সন্দেহ করে। সুতরাং শীঘ্রই রুশ কৃষক ও সাধারণ লোক প্রতিবিপ্লবীদের পক্ষ ছেড়ে বলশেভিকদের সমর্থন জানায়। জার সরকারের ভূতপূর্ব সেনাদলের একটি বৃহৎ অংশ অফিসার সহ প্রায় ৩৫ হাজার সেনা দেশের এই দুর্দিনে দেশরক্ষার জন্যে বলশেভিক সরকারের পাশে দাঁড়ায়। লেনিনের সহকারী টস্কি বলশেভিক আদর্শে দীক্ষিত শ্রমিকদের দ্বারা লাল ফৌজ বা Red Army গঠন করেন। লাল ফৌজ শীঘ্রই যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষতা লাভ করে। লাল ফৌজের বৃহৎ অংশ ছিল ভূতপূর্ব শ্রমিক। এঁদের মধ্যে থেকেই লাল ফৌজের অনেক প্রখ্যাত সেনাপতির উদ্ভব হয়। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত কামেনেভ, মিখাইল, ফ্রুঞ্জ, মার্শাল ভরোশিলভ প্রভৃতি। এছাড়া বলশেভিক নেতা স্ট্যালিন চেকা নামে গুপ্তপুলিশবাহিনী গড়েন। এই প্রস্তুতির সাহায্যে গৃহযুদ্ধের সঙ্কট অতিক্রম করা বলশেভিক সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়। প্রায় ৩ লক্ষ নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট কর্মী লাল ফৌজের সামনের সারির নেতা হিসাবে যুদ্ধ করেন। প্রায় ৪০ হাজার পার্টি-কর্মী গৃহযুদ্ধে শহীদ হন।

লাল ফৌজের সংগঠন ও পাল্টা আক্রমণ

ডন উপত্যকার কশাক ও ইউক্রেনের কৃষকরা বিদ্রোহীদের পক্ষ নিলে বলশেভিক সরকার বিপদে পড়েন। কারণ এই অঞ্চল ছিল রাশিয়ার শস্যভাণ্ডার। লেনিন ইউক্রেন রক্ষার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। লাল ফৌজ ডন উপত্যকার বিদ্রোহ দমন করে। রুশ সেনাপতি বোঝেঙ্কো কিয়েভ বন্দর অধিকার করার পর বৈদেশিক আক্রমণকারীরা হতবল হয়। বলশেভিকদের আদর্শ ফরাসী সেনাদলে ছড়িয়ে পড়লে ফরাসী কর্তৃপক্ষ আতঙ্কিত হন। বৈদেশিক আক্রমণকারীরা এরপর হাত গুটিয়ে নেয়। কিন্তু বিদ্রোহী প্রতিবিপ্লবীদের তারা সাহায্য দিতে থাকে। সাইবেরিয়া অঞ্চলে ভূতপূর্ব রুশ সেনাপতি কোলচাক নিজেকে সামরিক শাসনকর্তা ঘোষণা করেন। ব্রিটিশ-ফরাসী-মার্কিন কর্তৃপক্ষ তাঁকে ৭ লক্ষ রাইফেল ও ৩৬৫০টি মেশিনগান সাহায্য দেন। কোলচাক ভল্গা উপত্যকায় ঢুকে পড়েন। ১৯১৯ খ্রীঃ নাগাদ লাল ফৌজ কোলচাকের বাহিনীকে ধ্বংস করে।

ডন, ইউক্রেন ও সাইবেরিয়া যুদ্ধ

দক্ষিণ রাশিয়ায় প্রতিবিপ্লবী সেনাপতি ডেনিকিন পেট্রোগ্রাড লক্ষ্য করে আক্রমণ চালান। ব্রিটেনের যুদ্ধমন্ত্রী ডেনিকিনের সেনাদলকে "ব্রিটিশ সেনাদলের অঙ্গ" বলে বক্তৃতা দেন। ডেনিকিন কুরস্ক, ওরেল প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করে মস্কো নগরীকে বিপদগ্রস্ত করেন। লেনিন রুশ সোভিয়েতগুলিকে সর্বস্ব পণ করে ডেনিকিনকে প্রতিহত করার ডাক দেন। তীব্র, তীক্ষ্ণ, রক্তাক্ত সংঘর্ষের পর ডেনিকিনের বাহিনী পর্যুদস্ত হয়।

স্কোর যুদ্ধ ঃ ডেনিকিনের পরাজয়

প্রতিবিপ্লবী, শ্বেত বিদ্রোহীরা রুশ গ্রাম, নগর, রেলস্টেশন, জাতীয় সম্পত্তি ধ্বংস করে পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করে। ইচ্ছাপূর্বক রাশিয়ার জাতীয় সম্পত্তিগুলিকে অযথা ধ্বংস করতে থাকে। এই ক্ষয়ক্ষতি রোধ করার জন্যে লেনিন জনসাধারণকে প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার ডাক দেন। শত শত কৃষক ও শ্রমিক, কারিগর দেশরক্ষার ডাকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রুশ যুবসঙ্ঘ বা কমসোমল কর্মী ও লাল ফৌজ অক্লান্ত চেষ্টায় এই দস্যুদের দমন করে।

প্রতিবিপ্লবীদের পোড়া মাটি নীতির পরাজয়

রাশিয়ার জনসাধারণের তীব্র প্রতিরোধের ফলে গৃহযুদ্ধ ১৯২১ খ্রীঃ শেষ হয়। বলশেভিক সরকার জয়ী হয়ে নিরাপদ হয়। বৈদেশিক আক্রমণকারীরা হতোদ্যম হয়ে নিজ নিজ দেশে ফিরে যায়।

[ঘ] দশম পরিচ্ছেদ : লেনিনের নব অর্থনীতি (New Economic Policy of Lenin) : লেনিন ছিলেন একাধারে চিন্তাবিদ ও কর্মবীর। বলশেভিক দলকে দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থা থেকে মুক্ত করে অক্টোবর বিপ্লব দ্বারা ক্ষমতাদখলের জন্যে তিনি পরামর্শ দেন। তিনি তাঁর নেতৃত্ব ও সংগঠন-শক্তির দ্বারা বৈদেশিক আক্রমণ ও গৃহযুদ্ধের সঙ্কট থেকে এই শিশু-সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করেন। গৃহযুদ্ধের ধারালো নখর থেকে রাশিয়া আত্মরক্ষায় সক্ষম হয়। বলশেভিক বিপ্লবের অব্যবহিত পরে সমাজতন্ত্রী সরকার যে উগ্র সমাজতন্ত্রবাদী অর্থনীতি চালু করেন, তা গৃহযুদ্ধের প্রয়োজনে করা হয়। (সপ্তম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এখন এই ব্যবস্থাকে লেনিন নমনীয় করে যে নূতন অর্থনীতি গ্রহণ করেন, তার নাম নব অর্থনীতি বা N.E.P. বা New Economic Policy।

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, লেনিন অবস্থার চাপে বাধ্য হয়ে এই উদারতান্ত্রিক অর্থনীতি বা N. E. P. গ্রহণ করেন। যুদ্ধকালীন কমিউনিজমের প্রথাকে রাশিয়ার কারখানাগুলির পরিচালনার দায়িত্ব শ্রমিক ইউনিয়নগুলির হাতে দেওয়া হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে কারখানার উৎপাদন ১৭% কমে যায়। শিল্পদ্রব্যের দাম অত্যধিক বাড়ে। বহু শ্রমিক কাজ ছেড়ে সুলভে খাদ্য পাওয়ার আশায় গ্রামে চলে যায়। কৃষকদের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত শস্য ন্যায্য দর না দিয়ে লেভি হিসাবে সরকার নিতে থাকায় কৃষকরা বাড়তি জমি চাষ-আবাদ করা লাভজনক মনে করেন নি। সুতরাং তাঁরা শস্য উৎপাদনের হার কমিয়ে দেন। বাড়তি জমি চাষ বন্ধ করে দেন। রাশিয়ায় ৬০% জমি অনাবাদী হয়। ৪৭% ফসল কম উৎপাদন হয়। এর ফলে রাশিয়ায় খাদ্যসঙ্কট ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বিখ্যাত লেখক ম্যাক্সিম গোর্কির আবেদনে সাড়া দিয়ে মার্কিন জাতি দরাজ হাতে সাম্যবাদী রাশিয়াকে সাহায্য পাঠায়। ইওরোপের অন্যান্য দেশগুলিও পিছিয়ে থাকে নি। দুর্ভিক্ষ থেকে পরিত্রাণের পর লেনিন তাঁর ভূমিনীতি ও অর্থনীতিতে পরিবর্তন আনেন।[১] N.E.P-র কারণ হিসাবে দ্বিতীয় মত দেখা যায়। এই মত অনুসারে বলা হয় যে, নব-গঠিত সোভিয়েত রাষ্ট্রকে সমাজতন্ত্রের অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। লেনিন ছিলেন অত্যন্ত বাস্তববাদী মানুষ। উৎপাদনবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরে এবং "যুদ্ধকালীন সমাজতন্ত্রের" (War Communism) আর দরকার নেই বুঝতে পেরে, তিনি নব অর্থনীতির (N.E.P.) পথ ধরেন।

রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (C.P.S.U.) দশম কংগ্রেসে লেনিনের ভাষণের পর সদস্যরা স্থির করেন যে : (১) কৃষকরা জমির খাজনা ফসল দ্বারা মিটিয়ে দেবে। (২) তারপর তাদের হাতে যে উদ্বৃত্ত শস্য ও ফসল থাকবে, তা ইচ্ছামত বিক্রি করতে পারবে। (৩) আগের মত খোরাকির শস্য রেখে বাকী সমগ্র শস্য লেভি হিসাবে সরকারকে দিতে হবে না। (৪) কৃষকরা খোলা-বাজারে ফসল বিক্রি করতে পারবে। (৫) নব অর্থনীতি অনুসারে ছোট ব্যবসায়ীদের খোলা-বাজারে ব্যবসার অধিকার দেওয়া হয়, কৃষকদের কৃষি-পণ্যের বিনিময়ে শিল্পদ্রব্য কেনার অনুমতি দেওয়া হয়। (৬) ছোট ও মাঝারি শিল্পগুলির পরিচালনা বেসরকারী মালিকের পরিচালনায় ছেড়ে দেওয়া হয়।[২] (৭) শ্রমিকদের উপযুক্ত মজুরি ও সবেতন ছুটি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। (৮) মূল শিল্পগুলি যথা লোহা, কয়লা, ইস্পাত এবং রেলপথ, বৈদেশিক বাণিজ্য সরকারী মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। (৯) জনসাধারণকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখার অধিকার

নব অর্থনীতির মূল শর্তগুলি

---

১. Langsham—Worldsince 1919.
২. Gusev and Naumov.

দেওয়া হয়। (১০) ১৯২৪ খ্রীঃ সোভিয়েত নূতন সংবিধান গৃহীত হয়। এই সংবিধানে কেন্দ্র এবং ইউনিয়নে যোগদানকারী প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করা হয়। দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, বৈদেশিক বাণিজ্য, মুদ্রা, কেন্দ্রীয় বাজেট প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে। এছাড়া ভূমিস্বত্ব পরিবর্তনের অধিকার, বিচারব্যবস্থার পরিবর্তন, ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন রচনার অধিকার কেন্দ্রের হাতে থাকে। (১১) নব অর্থনীতি অনুসারে শিল্পগুলির আধুনিকীকরণের চেষ্টা করা হয়। বিখ্যাত পুটিলোভের লোহার কারখানায় বিরাট আধুনিকীকরণ ব্যবস্থা চালু করা হয়।

এখানে প্রশ্ন আসে যে, নব অর্থনীতির দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকার করে লেনিন মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদকে ক্ষুণ্ণ করেন কি না? লেনিনের পশ্চিমী সমালোচকরা মনে করেন যে, লেনিন সামান্যভাবে হলেও ব্যক্তিগত সম্পত্তি মেনে আপস করতে বাধ্য হন। স্বয়ং লেনিন এই মত স্বীকার করেন না। লেনিন মস্কো সোভিয়েতে প্রদত্ত তাঁর শেষতম বক্তৃতায় বলেন যে "নব অর্থনীতিতে আস্থাশীল রাশিয়া হবে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া" (N. E. P. Russia will become Socialist Russia)। তিনি নব অর্থনীতি দ্বারা মার্কসবাদের মূলনীতি অক্ষুণ্ণ রাখেন। তবে অবস্থা বুঝে মার্কসবাদের আক্ষরিক প্রয়োগ অপেক্ষা ব্যবহারিক প্রয়োগের উপর তিনি গুরুত্ব দেন। এখানেই ছিল তাঁর নেতৃত্বের মহিমা। তিনি পুঁথি পড়া কমিউনিজম অপেক্ষা বাস্তব কমিউনিজমকে অনেক বেশী গুরুত্ব দেন। এজন্যে তাঁর চিন্তাধারাকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বলা হয়। নব অর্থনীতির ফলে ১৯২২ খ্রীঃ থেকে রাশিয়ায় কৃষি-উৎপাদন ৫০% বাড়ে। শিল্প উৎপাদন শুধু তুলাশিল্পে ১৯২১ খ্রীঃ অপেক্ষা ৪৪% উৎপাদন বাড়ে। অন্যান্য শিল্পেও উল্লেখযোগ্য উৎপাদন বাড়ে। তেল উৎপাদন ৪২% বাড়ে। রাশিয়া দ্রুত অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার পথে এগিয়ে যায়। ২১শে জানুয়ারী, ১৯২৪ খ্রীঃ লেনিনের মৃত্যু হয়।

মার্কসবাদ ও নব অর্থনীতি : লেনিনবাদ

একাদশ পরিচ্ছেদ : লেনিনের কৃতিত্ব (A Critical estimate of Lenin) : রুশ-বিপ্লবের প্রধান নায়ক লেনিনের আসল নাম ছিল ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ। লেনিন ছিল তাঁর বিপ্লবী ছদ্মনাম। ১৮৭০ খ্রীঃ কাজান প্রদেশের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তিনি কাজান বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইনশাস্ত্রে ডিগ্রী নেন এবং সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দলে যোগ দেন। তিনি মার্কসবাদ সম্পর্কে গভীরভাবে পড়াশোনা করেন এবং এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া রাশিয়ার উন্নতি সম্ভব হবে না। তিনি ইস্কারা (Iskara) পত্রিকায় রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সম্পর্কে বহু প্রবন্ধ লেখেন। রুশ শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী-চেতনা বিস্তারের উপর তিনি বিশেষ জোর দেন। ইতিমধ্যে তিনি জার সরকারের কোপে পড়ে নির্বাসনে যেতে বাধ্য হন।

কোন কোন মার্কসবাদী ইতিহাসে ব্যক্তির গুরুত্বকে স্বীকার করেন না। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ব্যক্তি ইতিহাসের গতিকে তার নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে। জার-শাসিত রাশিয়া যখন চূড়ান্ত পচনশীল অবস্থায় উপনীত হয়, তখন তাকে সংস্কারের দ্বারা রক্ষা করার কোন উপায় ছিল না। ইতিমধ্যে ১৯১৭ খ্রীঃ বিপ্লব এসে যায়। কিন্তু এই বিপ্লবের লক্ষ্য ও পরিণতি সম্পর্কে জনগণের মনে তখন কোন ধারণা বা ছবি ছিল না। রুশ-বিপ্লব ফরাসী বিপ্লবের মতই বুর্জোয়া বিপ্লবে অবসিত হবে অথবা বুর্জোয়া বিপ্লবের স্তর অতিক্রম করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে তার উত্তরণ ঘটবে, অনেকে তা স্থির করতে পারে নি। ইতিহাসের দেয়ালের লিখন সকলের পক্ষে পড়ে উঠার ক্ষমতা নেই, কারণ সকলের তৃতীয় নয়ন থাকে না। মহামতি লেনিনের এই তৃতীয়

রুশবিপ্লবীদের পথনির্দেশ ও নেতৃত্ব দান

নয়ন ছিল। ইতিহাসের ইঙ্গিত তিনিই একমাত্র বুঝেছিলেন। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা যখন অনিশ্চিত, বলশেভিক ও মেনশেভিকরা দ্বিধাবিভক্ত, বলশেভিকরা দ্বিধাগ্রস্ত, তখন লেনিন তাঁর "এপ্রিল থিসিস" দ্বারা বলশেভিকদের সঠিক পথনির্দেশ করেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে জানান যে, রাশিয়ায় বুর্জোয়া-বিপ্লব সম্পূর্ণ হয়নি বলে বসে থাকলে চলবে না। রাশিয়ায় ফেব্রুয়ারী বিপ্লব বলশেভিক ও সংগ্রামী শ্রমিকদের আত্মত্যাগের ফলে ঘটেছে। ফেব্রুয়ারী বিপ্লব বুর্জোয়া স্তর অতিক্রম করে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে গেছে। পেট্রোগ্রাড সোভিয়েত ও অন্যান্য সোভিয়েত প্রতিষ্ঠাই তার প্রমাণ। তিনি ডাক দেন "সোভিয়েতের হাতে সকল ক্ষমতা অর্পণ" (All power to the soviets) এখন বিপ্লবের লক্ষ্য হওয়া দরকার। "What is to be Done" "কি করতে হবে" নামে এক প্রবন্ধে তিনি জাতিকে সঠিক পথ দেখান।

"রুটি, জমি, শান্তি" তিনটি প্রতিশ্রুতি নিয়ে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক দল অক্টোবর বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ক্ষমতাদখলে সক্ষম হয়। নবগঠিত রাষ্ট্রকে ধ্বংসের জন্যে বৈদেশিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি এবং দেশের ভিতরে প্রতিবিপ্লবী শক্তি একযোগে আক্রমণ ও গৃহযুদ্ধ চালায়।

'রুটি জমি কর্ম' তিন শর্ত পালন : গৃহযুদ্ধ দমন, উদার ও বাস্তবতামুখী নীতি

এর ফলে এই শিশু সমাজতন্ত্র ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। লেনিন জার্মানীর সঙ্গে ব্রেস্টলিটভস্কের সন্ধি স্বাক্ষর করে শান্তি স্থাপন করেন। তিনি গৃহযুদ্ধ ও বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করার কাজে হাত দেন। লেনিনের সমাজতান্ত্রিক সংস্কার ও অধঃপতিত শ্রেণীর হাতে অধিকার দান রুশ জনগণের মনে অভূতপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টি করে। বৈদেশিক আক্রমণ পরাস্ত করে ও গৃহযুদ্ধ দমন করে লেনিন রুশ-সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করেন। তিনি নিতান্ত প্রয়োজন না হলে পরাজিত ও ভ্রান্ত বিদ্রোহীদের প্রতি কখনও কঠোরতা দেখান নি। ভুল বুঝতে পারলে তাঁদের রুশজাতির মূল সমাজতান্ত্রিক জীবনস্রোতে মিশে যেতে তিনি সুযোগ দেন। প্রতিশোধের ইচ্ছায় অযথা রক্তক্ষয়ে তিনি তাঁর হস্ত রঞ্জিত করেন নি।

লেনিনের সর্বশেষ কৃতিত্ব ছিল নব অর্থনীতি প্রবর্তন ও রুশ সংবিধান প্রবর্তন (এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা দশম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। নব অর্থনীতি প্রবর্তন দ্বারা লেনিন প্রমাণ করেন যে, তিনি এক দূরদর্শী মহান নেতা। ভাল চিকিৎসক যেমন রোগীর অবস্থা ও স্বাস্থ্য বুঝে ঔষধের

নব অর্থনীতি প্রবর্তন ছিল তাঁর শেষ কীর্তি

তালিকা ও মাত্রা নির্ধারণ করেন, দূরদর্শী রাষ্ট্রনীতিবিদ তেমনই দেশবাসীর অবস্থা ও দেশের প্রয়োজন বুঝে সংস্কার প্রবর্তন করেন। লেনিন মার্কসবাদী হলেও, পুঁথি পড়া, তত্ত্ববাদী (Copy book) কমিউনিস্ট ছিলেন না; তিনি ছিলেন রুশজাতির মহান নায়ক, সমাজতন্ত্রী রাশিয়ার জনক। দেশের বাস্তব অবস্থা বুঝে তিনি কমিউনিজমের বাস্তব রূপ দিতে জানতেন। তিনি অন্ধ গোঁড়ামি দেখাতেন না। ১৯১৭ খ্রীঃ এর বিপ্লবের দিন থেকে ১৯২৪ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই নবগঠিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গঠনের জন্যে তিনি কঠোর পরিশ্রম করায় তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। ১৯২৪ খ্রীঃ ২১শে জানুয়ারী এই মহানায়কের মহাপ্রয়াণ ঘটে। জারশাসিত রাশিয়ার ভগ্নস্তূপ দূর করে তিনি নব রাশিয়ার ভিত্তি স্থাপন করেন। রাশিয়ায় সামন্ত-শাসনের স্থলে তিনি এক নব-সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা ও সমাজের পত্তন করেন। ১৯২৩ খ্রীঃ লিখিত তাঁর রাজনৈতিক উইল বা Political Testament এ তিনি ট্রটস্কিকে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনয়ন করেন বলে জানা যায়। রাশিয়ার পক্ষে যা দরকার তাই তিনি করেন। তিনি দাবি করেন "রাশিয়ায় এর ফলে সমাজতন্ত্রের মূল শক্ত হবে।"

[ঙ] দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : নব নেতা যোসেফ স্ট্যালিন ও স্ট্যালিনের কর্মধারা (Death of Lenin : Joseph Stalin–The new leader) : ১৯২৪ খ্রীঃ

লেনিনের মৃত্যুর ফলে যে শূন্যতা দেখা দেয় তা পূরণ করা লেনিনের মত আর কোন নেতা বলশেভিকদের মধ্যে ছিলেন না। লেনিনের দুই প্রধান সহকর্মী যোসেফ স্ট্যালিন ও ট্রটস্কি বিপ্লবের গোড়া থেকে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করেন। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কোন একজন লেনিনের শূন্যস্থান পূরণ করবেন এটাই ছিল প্রত্যাশিত। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, লেনিন তাঁর শেষ রাজনৈতিক উইলে (Political Testament) ট্রটস্কিকেই তাঁর উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্য বলেন। লেনিনের মৃত্যুকালে ট্রটস্কি রোগভোগের পর ককেসাসে বিশ্রামরত থাকায় লেনিনের সমাধি-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন নি। এদিকে স্ট্যালিন ছিলেন বলশেভিক দলের সাধারণ সম্পাদক ও দলের সংগঠনের কর্ণধার। তাঁকে হঠিয়ে দেওয়া ট্রটস্কির পক্ষে সহজ ছিল না। কারণ ট্রটস্কি ছিলেন বাক্যবাগীশ আর স্ট্যালিন ছিলেন নীরবকর্মী। উভয় নেতার মধ্যে তীব্র আদর্শগত বিরোধ দেখা দেয়। এই আদর্শগত বিরোধের আড়ালে ব্যক্তিগত ক্ষমতালাভের জন্যে দ্বন্দ্ব ছিল কি না তা বলা যায় না। তবে কিছুদিন স্ট্যালিন-ট্রটস্কি বিরোধ বলশেভিক দলকে আলোড়িত করে। ট্রট্স্কী ছিলেন আন্তর্জাতিক বিপ্লবের আদর্শে বিশ্বাসী। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, কেবলমাত্র রুশদেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হলে বিপ্লবের লক্ষ্য পূরণ হবে না। যতক্ষণ না ধনতন্ত্রী দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে ধনতন্ত্রকে ধ্বংস করা যায় ততক্ষণ রুশ সোভিয়েত সরকারের নিরাপত্তা নেই। নচেৎ ধনতন্ত্রী দেশগুলি সোভিয়েত সরকারকে ধ্বংস করে ফেলবে। সমাজতন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক ছিল বলে তিনি মনে করতেন। এখন সোভিয়েত সরকারের উচিত বিশ্ব-বিপ্লবের জন্যে কাজ করা। স্ট্যালিন এই মত অগ্রাহ্য করে "একক রাষ্ট্রে সাম্যবাদ গঠন" তত্ত্ব প্রচার করেন। তিনি বলেন যে, যদি রাশিয়ায় সাম্যবাদী বিপ্লবকে দৃঢ় ও স্থায়ী করা যায়, তবে এই বিপ্লব পরে বিশ্ব-বিপ্লবের ভিত্তি হতে পারে। আপাততঃ রাশিয়ার নিজেকে শক্তিশালী করা দরকার। শেষ পর্যন্ত রুশ কমিউনিস্টদের গরিষ্ঠ অংশ স্ট্যালিনকে সমর্থন করায় স্ট্যালিন নেতা নির্বাচিত হন। ট্রটস্কি ও তাঁর সমর্থকরা বহিষ্কৃত হন। ১৯৫৩ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত স্ট্যালিন একাদিক্রমে রাশিয়ায় অপ্রতিহত ক্ষমতা ভোগ করেন। মার্শাল স্ট্যালিনের জন্ম হয় জর্জিয়া প্রদেশের গোরী গ্রামে (১৮৭৯ খ্রীঃ)। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রট্স্কী তাঁকে খাঁটি রুশ বলে মনে করতেন না। তাঁর মতে স্ট্যালিনের দেহে এশিয়ার রক্ত ছিল। গৃহযুদ্ধের সময় তিনি চেকা বা গুপ্তপুলিশসংগঠন দ্বারা প্রতিবিপ্লবীদের নিষ্ঠুরভাবে দমন করেন। ১৯১২ খ্রীঃ তিনি বলশেভিক দলের মুখপত্র প্রাভদার সম্পাদক হন। তাঁর আসল নাম ছিল জোসেফ জুগাসভিলি। তিনি স্ট্যালিন অর্থাৎ "ইস্পাত" এই ছদ্মনাম নেন। স্ট্যালিন অনেকাংশে ছিলেন স্বয়ংশিক্ষিত। অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি বেশী শিক্ষা নেন। তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী না থাকায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁর শিক্ষা-সংস্কৃতির বিষয়ে কটাক্ষ করেন। কিন্তু স্ট্যালিন ছিলেন যথেষ্ট চিন্তাশীল, সংস্কৃতিমনা লোক। তাঁর শাসনেই রাশিয়া বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে চলে যায়। তিনি দর্শনশাস্ত্রের অনুরাগী ছিলেন বলে জানা যায়।

স্ট্যালিন ও ট্রট্স্কী বিরোধ

স্ট্যালিনের লক্ষ্য ছিল রাশিয়াকে দৃঢ়হাতে নিজ আদর্শ অনুযায়ী গড়া। N. E. P. বা নব অর্থনীতির নমনীয়তাকে স্ট্যালিন সাময়িক পশ্চাদপসরণ বলে মনে করতেন। রাশিয়ায় একটি

আদর্শ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর স্বপ্ন। সুতরাং রুশ কৃষি ও শিল্পক্ষেত্র থেকে তিনি কুলাক ও নেপমেন (Nepmen) দের বহিষ্কার করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নেন। এজন্য তিনি ১৯২৮ খ্রীঃ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বা পিয়াতিলেত্কা (Piatiletka) চালু করেন। তিনি মোট তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু করেন। তৃতীয় পরিকল্পনা চলার সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তিনি রাশিয়ায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৬·৬ বিলিয়ন রুবল থেকে বাড়িয়ে ২৫·৮ বিলিয়ন রুবলে পরিণত করার লক্ষ্য নেন। এজন্য ২৬ মিলিয়ন ক্ষুদ্রচাষীদের ছোট ছোট ক্ষেত্র দিয়ে যৌথ খামার বা কোলখোজি গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কুলাক ও ক্ষুদ্র কৃষকরা যৌথ খামারে যোগ দিতে রাজী না হলে স্ট্যালিন তাদের বিরুদ্ধে দমননীতির প্রয়োগ করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় কৃষকরা যৌথ খামারের ভাল দিকগুলি বুঝতে শুরু করে। ইতিমধ্যে স্ট্যালিন যৌথ খামারের আইন বদল করে কৃষকদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করেন। প্রতি কোলখোজকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য সরকারকে সরবরাহ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। অবশিষ্ট শস্য খরচ-খরচা বাদ দিয়ে যৌথ খামারের সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। কৃষক তার ভাগের শস্য তার প্রয়োজন অপেক্ষা উদ্বৃত্ত হলে তা খোলাবাজারে বিক্রির অধিকার পায়। এর ফলে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৫ খ্রীঃ এক আইন দ্বারা কৃষকদের বাসগৃহসংলগ্ন ক্ষুদ্র বাগান, গৃহপালিত পশুপাখীর মালিকানা দান করা হয়। শিল্পের ক্ষেত্রে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি বিশেষ সফলতা লাভ করে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় ইস্পাত ১৭%, লৌহ ১৪·৫%, কয়লা ১৩%, পেট্রল ৩০·৫%, কাপড় ৩৪৪৭·০% উৎপাদন বাড়ে। স্ট্যালিন ভারি শিল্প-উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দেন। তিনি জাতিকে দেশগড়ার জন্যে ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার কমিয়ে ত্যাগস্বীকারের আহ্বান জানান। এইসঙ্গে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করা হয়। শ্রমিকদের সবেতন ছুটি ও ভাল বাসগৃহের বন্দোবস্ত করা হয়। রাশিয়ায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়। রাশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জ্ঞান-বিজ্ঞানে দ্রুত আগাতে থাকে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে বেকার-সমস্যা লোপ পায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসী জার্মানীকে পরাস্ত করে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে রাশিয়া আত্মপ্রকাশ করেছে।

স্ট্যালিনের সমাজতন্ত্রের সংস্কার সমূহ যৌথ খামার প্রথা

স্ট্যালিন ও তাঁর নীতির সঠিক মূল্যায়ন এখনও হয়নি। অনেকে তাঁকে লৌহমানব, রুশ ডিক্টেটর বলেন। বর্তমান রাশিয়ায় তিনি বহুনিন্দিত ব্যক্তি। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে দেখলে তাঁর স্বৈরতন্ত্র স্বত্ত্বেও তাঁর কৃতিত্বকে খাটো করা যায় না। আইজ্যাক ডয়েটট্সারের মতে, "ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অনুভূতি-প্রবণ লোক।" চার্চিলের মত সাম্রাজ্যবাদী, দাম্ভিক লোক তাঁর গ্যাদারিং ষ্টর্ম (Gathering storm) গ্রন্থে স্ট্যালিনের আতিথেয়তা ও রুচিবোধের প্রশংসা করেছেন।

কৃতিত্ব

সারণী

[ক] রাশিয়া ছিল স্বৈরতন্ত্রী জার ও সামন্তশ্রেণীর শাসিত একটি পিছিয়ে-পড়া দেশ। ভূমিদাস প্রথা ছিল রাশিয়ার একটি সামাজিক অভিশাপ। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ১৮৬১ খ্রীঃ ভূমিদাস উচ্ছেদ আইন দ্বারা রাশিয়ার ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ করেন। জমিদারদের জমির অর্ধেক মুক্ত ভূমিদাসদের দেওয়া হয় এবং জমিদারদের এজন্যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। ক্ষতিপূরণের অর্থ কৃষকরা ৪৯ বছরের কিস্তিতে ৬½% সুদে সরকারকে পরিশোধ করে। ভূমিদাস উচ্ছেদ আইনের বেশ কয়েকটি ত্রুটি ছিল। ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান ও জমির মূল্য অত্যধিক ধার্য করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ায় কৃষকদের তীব্র ক্ষোভ ও বিদ্রোহ দেখা দেয়।

[খ] জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ভূমিদাস উচ্ছেদ আইন ছাড়া বহু উদারনৈতিক সংস্কার চালু করেন। তিনি জারতন্ত্রের স্বৈরক্ষমতা অব্যাহত রেখে জেলা পরিষদ গঠন করে এই পরিষদকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রাস্তাঘাট প্রভৃতির ব্যাপারে স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার দেন। তিনি ডেকাব্রিষ্ট বিদ্রোহীদের মুক্তি দেন। তিনি বিচার ব্যবস্থার সংস্কার করেন।

[গ] জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার উদারনীতি দেখালেও রাশিয়াতে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিরত থাকেন। রুশ বিপ্লবী দল নিহিলিষ্ট বা নৈরাজ্যবাদীরা পুরাতনতন্ত্রকে ভেঙে ফেলাব চেষ্টা করে। পরে নৈরাজ্যবাদীরা পপুলিষ্ট বা জনতাবাদী দলের সঙ্গে মিশে যায়। নৈরাজ্যবাদী ও জনতাবাদীরা গ্রাম কমিউন প্রতিষ্ঠার কথা ভাবেন এবং ১৮৭৮ খ্রীঃ নারোদনিকি দল গঠিত হয়। নিহিলিষ্টদের দ্বারা জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ১৮৮১ খ্রীঃ নিহত হন। নারোদনিকি বিপ্লব বিফল হয়। জার দ্বিতীয় নিকোলাসের আমলে শ্রমিক ও কৃষকদের তীব্র অসন্তোষ ও রুশ-জাপান যুদ্ধে জার সরকারের পরাজয়ের ফলে রাশিয়ায় বিপ্লবের পরিস্থিতি দেখা দেয়। পেট্রোগ্রাডের শ্রমিকদের উপর পুলিশ গুলি চালালে রাশিয়ায় ১৯০৫ খ্রীঃ টানা ১৯ দিন সাধারণ ধর্মঘট চলে এবং সেন্ট পিটার্সবার্গে শ্রমিকরা সোভিয়েত গঠন করে। শেষ পর্যন্ত জার নিকোলাস ডুমা বা জাতীয় সভা আহ্বানের প্রতিশ্রুতি দিলে বিপ্লব আপাততঃ থামে। ১৯০৫ খ্রীঃ এর বিপ্লবকে বলশেভিক বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্ব বলা যায়।

[ঘ] ১৯১৭ খ্রীঃ রুশ বিপ্লবে জারতন্ত্রের পতন ঘটে। এই বিপ্লব আকস্মিক ভবে ঘটেনি। ১৯০৫ খ্রীঃ এর বিপ্লবের সময় থেকে জারের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিল। কৃষকদের অসন্তোষ ষ্ট্যালিপিন ভূমি সংস্কারের পর আরও বেড়ে যায়। কুলাক শ্রেণীর হাতে বেশীর ভাগ জমি চলে যায়, কৃষকরা ভাগচাষীতে পরিণত হয়। রাশিয়ায় ১৯১৪ খ্রীঃ শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৮ মিলিয়নেরও বেশী। মজুরী বৃদ্ধি ও দিনে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবী শ্রমিকরা জানালে জার সরকার তা গ্রাহ্য করেন নি। রাশিয়ার ভিতর যে সকল সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী ছিল তাদের বশীকরণ নীতির দ্বারা পিষে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়। জার সরকারের অর্থনীতি ছিল ক্ষয় ধরা। বিরাট অঙ্কের বৈদেশিক ঋণ রাশিয়ার অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয়। ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া যোগ দিলে লোকেব দুঃখ-দুর্দশা বাড়ে এবং যুদ্ধে জার সরকারের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। এই সময় বলশেভিক দল জার সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গড়তে থাকে। শ্রমিক সংগঠনগুলি লাগাতর ধর্মঘট ও সেনাদলের একাংশ বিদ্রোহ করায়, জার বাধ্য হয়ে ডুমা বা জাতীয় সভার অধিবেশন ডাকেন। ডুমা জারকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। ১৯১৭ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী থেকে রাশিয়ায় ডুমার সমর্থনে একটি অস্থায়ী প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়। এই প্রজাতন্ত্র ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর সমর্থক। বলশেভিক দল যারা ছিল ১৯১৭ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রধান রূপকার তারা লেনিনের নেতৃত্বে এই বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রকে মেনে নিতে রাজী হয় নি। মেনশেভিকরা "এখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় নয়" এই মত প্রকাশ করলেও লেনিন তাঁর এপ্রিল থিসিস দ্বারা এখনই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উপযুক্ত সময় এই মত প্রকাশ করেন। ২৪-২৫ অক্টোবর বলশেভিকরা পেট্রোগ্রাড শহরের শাসন কেন্দ্রগুলি অধিকার করলে অস্থায়ী প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটে। বলশেভিক বিপ্লব সফল হয়।

অনুশীলনী

১। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) সপ্তদশ শতকে রাশিয়ায় কোন রাজবংশ রাজত্ব করতেন? (খ) লিও টলস্টয়ের কোন্ উপন্যাসে ভূমিদাসদের জীবনের করুণ চিত্র পাওয়া যায়? (গ) কে ভূমিদাস-মুক্তির ঘোষণাপত্র জারী করেন? (ঘ) কাকে "মুক্তিদাতা জার" বলা হয়? (ঙ) নিহিলিস্ট আন্দোলন কি? (চ) নারোদনিক আন্দোলনের কারণ কি? (ছ) ১৯০৫ খ্রীঃ বিপ্লবে কে নেতৃত্ব দেন? (জ) রুশ পার্লামেন্টের নাম কি? (ঝ) রুশ জোতদার শ্রেণীর কি নাম ছিল? (ঞ) জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে রাশিয়ার শ্রমিকরা কোথায় ধর্মঘট করে? (ট) কোন্ সালে রাশিয়ায় প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়? (ঠ) লেনিন তাঁর এপ্রিল থিসিস দ্বারা বলশেভিক কর্মীদের কি আহ্বান করেন? (ড) কোন্ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব ঘটে? (ঢ) কোন্ কোন্ রাষ্ট্রের মধ্যে ব্রেস্টলিটভস্কের সন্ধি স্থাপিত হয়? (ণ) কাদের নিয়ে এবং কার নেতৃত্বে লাল ফৌজ গঠিত হয়? (ত) লেনিনের নব অর্থনীতি কাকে বলে? (থ) লেনিনের আসল নাম কি? (দ) লেনিনের পর কে রাশিয়ার নেতা হন?

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

(ক) জার-শাসিত রাশিয়ার রুশ কৃষকদের অবস্থা বর্ণনা কর। (খ) ১৮৬১ খ্রীঃ ভূমিদাস-মুক্তির ঘোষণাপত্রকে "মহা সংস্কার" বলা যায় কি? (গ) জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের উদারনৈতিক সংস্কারগুলি আলোচনা কর। (ঘ) ১৯০৫ খ্রীঃ বিপ্লবের কারণ কি? ১৯০৫ খ্রীঃ বিপ্লবকে "১৯১৭ খ্রীঃ রুশ বিপ্লবের মহড়া" বলা যায় কি? (ঙ) ১৯১৭ খ্রীঃ বলশেভিক বিপ্লবের কারণ বর্ণনা কর। (চ) অক্টোবর বিপ্লবে বলশেভিকদের জয়লাভের কারণ কি ছিল? (ছ) নব প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত সরকারের মূল নীতির বিবরণ দাও। (জ) বলশেভিক বিপ্লবের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব নির্ণয় কর। (ঝ) লেনিনের নব অর্থনীতি ব্যাখ্যা কর। (ঞ) মহামতি লেনিনকে কেন "মহান নেতা" বলা হয়? (ট) স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত রাশিয়ার অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিবরণ দাও।

একাদশ অধ্যায়

দূর প্রাচ্যের কথা : চীন ও জাপান

[ক] প্রথম পরিচ্ছেদ : চীনের বিচ্ছিন্নতাবাদ বা অবরুদ্ধ দ্বার প্রথা বা ক্যান্টন প্রথা (The Closed Door Policy of China or the Canton System) : ভারতবর্ষের মতই মহাচীন এক প্রাচীন দেশ ও প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি। ভারতের মতই চীনের আছে বিরাট সমুদ্র-উপকূল, বিরাট আন্তর্দেশীয় সমতলভূমি এবং বিরাট লোকসংখ্যা। ভারতের মতই চীন ছিল উনবিংশ শতকে আধুনিক বিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা ও শিল্পে অনুন্নত। উনবিংশ শতকের গোড়ায় চীনের সিংহাসনে মাঞ্চু বা চীং রাজবংশ অধিষ্ঠিত ছিল। এই রাজবংশের আমলে চীনে বৈদেশিক শক্তির প্রবেশের সম্ভাবনা বন্ধ করার জন্যে মাঞ্চু সম্রাট চীনের বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বহু বাধা-নিষেধ আরোপ করেন। চীনের দক্ষিণে ম্যাকাও, ক্যান্টন প্রভৃতি বন্দর ছিল সমৃদ্ধ বাণিজ্য বন্দর। চীনের দামী সাদা রেশম, সবুজ চা, খনিজ দ্রব্য প্রভৃতি রপ্তানী করার লোভে ইওরোপীয় বণিকরা এই সকল বন্দরের পথে চীনের ভিতর ঢোকার চেষ্টা চালায়। চীনের দেশীয় ব্যবসায়ীরা সমুদ্রপথে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে পালতোলা জাহাজের দ্বারা বাণিজ্য করত। ইওরোপীয় বণিকরা চীনে ঢুকলে প্রতিযোগিতায় দেশীয় চীনা বণিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে চীং সম্রাট মনে করতেন।

▸মহাচীনের ভৌগোলিক ও বাণিজ্যিক অবস্থান

চীং সম্রাট চীনের অভ্যন্তরে বিদেশী ইওরোপীয় বণিকদের প্রবেশ নিষেধ করেন। বিশেষ অনুমতি ছাড়া কোন ইওরোপীয়কে চীনের ভিতর ঢুকতে দেওয়া হত না। চীং সম্রাট এই সঙ্গে ট্রিবিউট প্রথা বা রাজস্ব প্রথা চালু করেন। কোন বৈদেশিক দূত চীং সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে উপঢৌকন দিয়ে চীং সরকারের সঙ্গে সমান শর্তে বাণিজ্য করার অনুমতি চাইলে তা দেওয়া হত না। এই দূতের প্রদত্ত উপঢৌকনকে 'ট্রিবিউট' বা রাজস্ব হিসাবে গণ্য করা হত এবং দূতকে সম্রাটের সমীপে "কাও-তাও" (Kow-tow) বা আভূমি প্রণত হতে বলা হত। এর দ্বারা চীং সম্রাট ইওরোপীয় দেশটিকে চীনের প্রতি বশ্যতা প্রদর্শনের দাবি জানাতেন।

চীনের অবরুদ্ধ দ্বার প্রথা : বিচ্ছিন্নতা : ট্রিবিউট প্রথা বা অধীনতা দাবী

ক্যান্টন বন্দরে ইওরোপীয় বণিকদের বাসস্থানের জন্যে প্রধান ফটকের বাইরে একটি এলাকা নির্দিষ্ট করা ছিল। প্রধান ফটক পেরিয়ে কোন ইওরোপীয় বণিককে নগরের ভিতরে অবাধে যেতে দেওয়া হত না। চীনের রেশম, চা প্রভৃতি জিনিস এই সকল বণিকরা "কো-হং" (Co-hong) নামে সরকারি লাইসেন্স-প্রাপ্ত চীনা বণিকসঙ্ঘের কাছে কিনতে বাধ্য হত। চীনদেশের ভিতরে সস্তাদরে জিনিসপত্র বিক্রি হলেও, ইওরোপীয়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকায় তার সুযোগ তারা পেত না। তাছাড়া চীনা ফৌজদারী ও বাণিজ্যিক আইন ক্যান্টনের ইওরোপীয় বণিকদের মেনে চলতে হত। এই প্রথাকে ক্যান্টন-প্রথা বলা হয়। চীং সরকার এই সকল বাধা-নিষেধের বেড়ার দ্বারা চীনের ভিতর ইওরোপীয় অনুপ্রবেশ বেশ কিছুকাল রোধ করে রাখেন।

ক্যান্টন-প্রথা : ক্যান্টন বন্দরে ইওরোপীয় বণিকদের বাণিজ্য করার কঠোর নিয়ম

চীনের সামরিক শক্তি, শাসনব্যবস্থা ও অর্থনীতি ছিল অনগ্রসর, সামন্ততান্ত্রিক ছাঁচে তৈরি। চীনের ভূমি ছিল সামন্তপ্রভু বা জমিদারশ্রেণীর হাতে। মাঞ্চু-সম্রাটের কাছে সাধারণ চীনাদের আবেদন-নিবেদন করার কোন উপায় ছিল না। সম্রাট তাঁর গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদে প্রজাদের নাগালের বাইরে তাঁর মহিমা নিয়ে বিরাজ করতেন। সাধারণ চীনারা বলত, "আকাশ বড়ই উঁচু;

সম্রাট তা অপেক্ষাও দূরে থাকেন"। (The heaven is high and the Emperor far away). চীং বা মাঞ্চু সরকার স্বদেশে স্বৈরাচারী হলেও, চীনের উন্নয়নের জন্যে তাঁরা কোন সংস্কার প্রবর্তন করেন নাই। চীন ছিল এক ভয়ানক অনগ্রসর দেশ। চীনের সামরিক বাহিনী ছিল সেকেলে অস্ত্রদ্বারা সজ্জিত। চীনের অর্থনীতি ছিল অনগ্রসর। কৃষি ছিল চীনবাসীদের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু পীত নদী বা ইয়াংসি নদীর বন্যায় বছর বছর লোকের ঘর বাড়ী ডুবে যেত, কাঁচামাল নষ্ট হত। এজন্য পীত নদীর নাম ছিল "চীনের অভিশাপ"। বন্যার জল নিকাশীর জন্যে পীত নদী থেকে যে খাল বা 'বড় খাল" (Great Canal) ছিল, তা পলি পড়ে মজে যায়। চীং সরকার এই খালের সংস্কার করা দরকার মনে করতেন না। চীনের শাসনের কাজ ছিল সামন্তশ্রেণীর হাতে। তারা ছিল ঘোর অত্যাচারী। সাধারণ চীনাদের জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ। চীনে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের ছায়া পড়ত ও এজন্যে বহু লোক মারা যেত। চীং সম্রাট রাজধানী পিকিং-এ (চীনা উচ্চারণ বেইজিং) বসে তার মাণ্ডারিণ ও সামন্ত কর্মচারীদের দ্বারা দেশ শাসন করতেন। এই অনগ্রসর ব্যবস্থার দ্বারা দেশরক্ষা করা সম্ভব ছিল না।

চীনের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ : চীনা সরকারের রক্ষণশীলতা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : অহিফেন যুদ্ধ : ইঙ্গ-চীন যুদ্ধ : চীনে ইওরোপীয় অনুপ্রবেশ

(The Opium War : Anglo-Chinese War : Opening of China by Europeans) : ইওরোপে, বিশেষতঃ ইংলন্ডে শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংলন্ডের উদ্বৃত্ত শিল্পজাত পণ্য বিক্রির জন্যে বাজার খোঁজার চেষ্টা আরম্ভ হয়। ভারতবর্ষে ইংরাজের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে স্বভাবতঃই ইংরাজ বণিকদের দৃষ্টি ভারত থেকে প্রতিবেশী দেশগুলির উপর পড়ে। চীনের সাদা রেশম ও সবুজ চায়ের চাহিদা ইওরোপের বাজারে বিশেষভাবে ছিল। চীনের এই সকল দামী কাঁচামালের ইওরোপে একচেটিয়া রপ্তানীর অধিকার পাওয়ার জন্যে ইংরাজ বণিকরা ব্যস্ত হযে পড়ে। বাংলায় ইংরাজ আধিপত্য স্থাপিত হলে ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার চাষিদের ধানের বদলে আফিমের চাষ করতে বাধ্য করে। এই আফিম চীনে রপ্তানি করে, আফিমের বিনিময়ে সবুজ চা ও রেশম নিয়ে, তারা ইওরোপে রপ্তানী করে প্রচুর মুনাফা [illegible]। ইংলন্ডে শিল্প-বিপ্লবের ফলে কলকারখানায় বাড়তি মাল তৈরী হলে সেই মাল [illegible] বিক্রির জন্যে ইংলন্ডের বণিকরা ব্যস্ত হয়। ইংরাজরা ছিল ভয়ানক সাম্রাজ্যবাদী, [illegible] অন্য দেশে উপনিবেশ স্থাপন ও একচেটিয়া বাজার দখল ছিল তাদের নীতি। চীনের বাজার দখলের জন্যে ইংরাজ বণিক গোষ্ঠী ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু চীনে ঢোকা সহজ কাজ ছিল না।

চীনে শিল্প দ্রব্যের বাজার স্থাপনের চেষ্টা

কান্টন প্রথার (আগের পরিচ্ছেদ পৃঃ ১৮৯ দ্রষ্টব্য) বাধা-নিষেধের দ্বারা চীং সরকার বিদেশী ইওরোপীয় বণিকদের চীনে অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ করেন। তাদের যা কিছু বাণিজ্য তা ক্যান্টন বন্দরের প্রধান প্রাচীরের বাইরে কো-হং বণিকদের সঙ্গে করতে হত। কো-হং ছিল সরকারের লাইসেন্স প্রাপ্ত বণিকসঙ্ঘ। এরা ইওরোপীয় বণিকদের কাছে বেশ চড়া দামে ও ইচ্ছামত শর্তে মাল বিক্রি করত। চীনের আইনে অন্য কোন বণিক ইওরোপীয়দের মাল বিক্রি করতে পারত না। সুতরাং কো-হং বণিকদের একচেটিয়া বাণিজ্য এবং ইচ্ছামত মুল্য নির্ধারণ ইংরাজ বণিকদের মুনাফা বৃদ্ধির পথে বাধা হয়। এই বাধা-নিষেধ ভাঙার জন্যে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও অন্যান্য ইংরাজ বণিকরা তাদের স্বদেশীয় সরকারের সাহায্য [illegible] খ্রীঃ ব্রিটিশ সরকার লর্ড ম্যাকার্টনের নেতৃত্বে একটি মিশন পিকিং-এ চিং সম্রাটের

ক্যান্টন প্রথার বাধা নিষেধ : আমহার্স্ট দৌত্য প্রেরণ

দরবারে বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনার জন্যে পাঠান। কিন্তু চীং সম্রাট ম্যাকার্টনের এই উপঢৌকনকে ট্রিবিউট বা রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করেন এবং ক্যান্টন প্রথা বহাল রাখেন। ১৮১৬ খ্রীঃ লর্ড আমহার্স্টের নেতৃত্বে পুনরায় একটি মিশন চীনে পাঠান হয়। এই মিশনের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ বাণিজ্যের জন্যে চীনের অবরোধ প্রথা তুলে নিতে চীং সরকারকে রাজী করান এবং চীনে সম-মর্যাদার ভিত্তিতে ব্রিটিশ বণিকদের বাণিজ্যের অধিকার লাভ করা। লর্ড আমহার্স্টকে চীনা সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় "কাও-তাও" করার জন্যে চাপ দেওয়া হয়। কিন্তু স্বাধীন সার্বভৌম ব্রিটিশ সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে লর্ড আমহার্স্ট্ তাতে রাজী না হওয়ায় এই দৌত্য ব্যর্থ হয়।

আমহার্স্ট্ দৌত্য ব্যর্থ হলে ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পারেন যে, কূটনৈতিক উপায়ে চীনের দরজা খোলা যাবে না। অতঃপর ব্রিটিশ বণিকরা চীং সরকারের আইন ও নিষেধাজ্ঞা ইচ্ছাপূর্বক ভেঙে ফেলে চীং সরকারকে যুদ্ধে নামতে বাধ্য করার চেষ্টা করে। ১৮৩২ খ্রীঃ আমহার্স্ট জাহাজের ক্যাপটেন লিনসে (**Linsay**) চীনের দক্ষিণ উপকূলের নিষিদ্ধ বন্দরগুলিতে জোর করে ঢুকে পড়ে ইচ্ছামত অবস্থান করেন। লিনসে অভিযানের পর এই নিষিদ্ধ বন্দরগুলিতে ইংরাজ বণিকরা বে-আইনীভাবে আফিম চালান দিতে আরম্ভ করে। ১৮৩৩ খ্রীঃ পর ব্রিটিশ বণিকশ্রেণী পঙ্গপালের মত চীনের বন্দরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা প্রচুর আফিম চীনে রপ্তানি করতে থাকে। অহিফেনের চোরাই আমদানীর ফলে চীং সরকার প্রাপ্য বাণিজ্য শুল্ক থেকে বঞ্চিত হয়। অধিকন্তু চীনদেশের লোকেরা আফিং সেবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। অহিফেনের প্রভাবে তারা ক্রমে কর্মদক্ষতা ও নৈতিক শক্তি হারাতে থাকে।

চীনে ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণীর বল প্রয়োগের চেষ্টা ও আফিম আমদানী

চীনের বাজার ব্রিটিশ বাণিজ্যের জন্যে উন্মুক্ত করতে ব্রিটিশ বণিকসঙ্ঘগুলি ইংলন্ডের সরকারের উপর চাপ দেয়। ইংলন্ডের পার্লামেন্টে এই বণিকদের বহু সমর্থক ছিল। তারা ব্রিটিশ সরকারকে সক্রিয় হতে অনুরোধ জানায়। লর্ড পামারস্টোন ইংলন্ডের বিদেশমন্ত্রীর পদে বসলে চীনের সঙ্গে ইংলন্ডের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। পামারস্টোন ছিলেন ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী শাসক। তিনি এশিয়ার দেশগুলিকে ইংরাজের পদানত করার কথা সবসময় ভাবতেন। এখন ইংলন্ডের স্বার্থে, ইংরাজ বণিকদের জন্যে তিনি চীনকে অস্ত্রের দ্বারা তার বাজার খুলে দিতে বাধ্য করার নীতি নেন। ঐতিহাসিক লাটিমোরের মতে, "যে জাতির ছিল মালভর্তি বাণিজ্য-জাহাজ এবং তাকে পাহারা দিত যুদ্ধ-জাহাজ, সেই জাতি চীনে হানা দিতে এগিয়ে আসে।"

চীনে বাণিজ্যের জন্যে ব্রিটিশ সরকারের বলপ্রয়োগ নীতি গ্রহণ

প্রথম ইঙ্গ-চীন যুদ্ধের উপলক্ষে ছিল অবশ্য আফিম ঘটিত ঝগড়া। এজন্য এই যুদ্ধকে **Opium War** বা আফিমের যুদ্ধ বলা হয়। চীং সরকার ক্যান্টন ও দক্ষিণ চীনের বন্দরে চোরাই আফিমের আমদানির ফলে উদ্বিগ্ন হন। অহিফেনসেবনের ফলে চীনের অধিবাসীদের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটায় সম্রাট এই বিষ দ্রব্য আমদানী বন্ধের জন্যে দরবারের মন্ত্রীদের আদেশ দেন। তিনি একটি আদেশনামার দ্বারা চীনে আফিম ক্রয়, বিক্রয়, আমদানি, রপ্তানি নিষিদ্ধ করেন। অহিফেনসেবন নিষিদ্ধ করা হয়। কমিশনার লিন (Lin) নামে এক অভিজ্ঞ দেশভক্ত উচ্চ কর্মচারীকে আফিমের চোরাচালান বন্ধ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কমিশনার লিন ক্যান্টন বন্দরের দেশী-বিদেশী বণিককে তাদের জমা রাখা আফিম এবং চীনের জলসীমায় অবস্থিত সকল জাহাজকে তাদের কাছে গচ্ছিত আফিম সরকারের কাছে দিতে নির্দেশ দেন। ভবিষ্যতে আর চীনে কোন আফিম আমদানী না করার

চীং সরকার কর্তৃক আফিমের চোরাই-চালান নিষিদ্ধকরণ এবং ক্যান্টনে ইওরোপীয় কুঠী অবরোধ

জন্যে তিনি বিদেশী বণিকদের অঙ্গীকারপত্র দিতে আজ্ঞা দেন। ব্রিটিশ বণিকরা তাঁর হুকুম অমান্য করলে কমিশনার লিন ক্যান্টনে ব্রিটিশসহ সকল বৈদেশিক বণিকদের মালখানা ও বাসগৃহ অবরোধ করেন। অবশেষে ২,১১৯ বেইল আফিম লিনের হাতে জমা পড়ে। তিনি এগুলি দাহ করে দেন।

ব্রিটিশ সরকার এই অবরোধের ঘটনাকে ব্রিটিশ পতাকার প্রতি অসম্মান বলে মনে করেন। আসলে ব্রিটিশ সরকার একটি যুদ্ধের উপলক্ষ তৈয়ারি করেন। নৌবহর ও সেনাদল দ্বারা দক্ষিণ চীনে আক্রমণের সূচনা করেন। চীং সরকারও বাধা দেন। ব্রিটিশ সরকার এই যুদ্ধকে "অহিফেন যুদ্ধ" বলে ঘোষণা করলেও, অহিফেন ছিল এই যুদ্ধের উপলক্ষ মাত্র। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে বোস্টন বন্দরে চায়ের পেটি জাহাজ থেকে জলে নিক্ষেপ যেমন যুদ্ধের মূল কারণ ছিল না, অহিফেনও এই যুদ্ধের মূল কারণ ছিল না। আসলে ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের অর্থনৈতিক শোষণের জন্যে চীনকে উন্মুক্ত করতে অহিফেনের ঘটনাকে উপলক্ষ হিসাবে ব্যবহার করে।

প্রথম অহিফেন যুদ্ধের প্রকৃত কারণ

প্রথম ইঙ্গ-চীন যুদ্ধে অনগ্রসর চীনা সেনাদল ব্রিটিশের আধুনিক বাহিনীর হাতে নতজানু হতে বাধ্য হয়। ১৮৪০ খ্রীঃ নান্‌কিং-এর সন্ধি (Threaty of Nanking) দ্বারা প্রথম অহিফেন-যুদ্ধ বা প্রথম ইঙ্গ-চীন যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। (১) চীনের পাঁচটি বন্দর ব্রিটিশ বাণিজ্য ও বসবাসের জন্যে খুলে দেওয়া হয়। এই পাঁচটি বন্দর ছিল ক্যান্টন, এ্যাময়, ফুচাও, নিংপো, সাংহাই। (২) চীনের দক্ষিণে হংকং দ্বীপ ইংরাজ সরকারকে চীন ছেড়ে দেয়। (৩) কো-হং প্রথা লোপ করা হয়। চীনের বন্দরগুলিতে ও চীনের ভিতরে ব্রিটিশ বণিকদের মাল খরিদ-বিক্রির অধিকার স্বীকার করা হয়। (৪) চীনে ব্রিটিশ আমদানি-রপ্তানি মালের উপর ৫% হারে শুল্ক ধার্য করা হয়। অর্থাৎ চীং সরকারের ইচ্ছামত শুল্ক ধার্য করার স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়। এর অর্থ ছিল চীং সরকারের সার্বভৌমত্বের আংশিক ক্ষয়। (৫) ক্যান্টনে আফিম ধ্বংস করার জন্যে চীং সরকার ৬,০০০,০০০ ডলার ক্ষতিপূরণ এবং যুদ্ধের খরচা বাবদ ১২,০০০,০০০ ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হন। (৬) ব্রিটিশ বণিকদের চীং সরকার চীনা বণিকদের সমান মর্যাদা দিতে স্বীকার করেন। পাঁচটি সন্ধি বন্দরে বিদেশীদের অতিরাষ্ট্রিক অধিকার দিতে সরকার অঙ্গীকার করে। অতিরাষ্ট্রিক (Exterritoriality) কথাটির অর্থ ছিল ব্যাপক। অতিরাষ্ট্রিক অধিকার লাভ করে পাঁচটি সন্ধি বন্দরে চীনের আইন, পুলিশ, বিচারের অধিকার ছেড়ে দেয়। এখানে ব্রিটিশের আইন, বিচার চালু হয়। চীনাদের কোন অভিযোগ থাকলে তা এই বন্দরের ব্রিটিশ কন্‌সালকে জানাতে হয়। তিনি ব্রিটিশ আইন অনুযায়ী সেই অভিযোগের বিচার করেন। অর্থাৎ সন্ধিবন্দরগুলি কাগজেকলমে চীং সরকারের অধীনে থাকলেও, হাতেকলমে হাতছাড়া হয়ে যায়। চীনের আইন থেকে রক্ষা পেতে চীনা অপরাধীরা সন্ধিবন্দরে আশ্রয় নিতে থাকে। লক্ষ্য করার বিষয় যে, নান্‌কিং-এর সন্ধিতে অহিফেনের উল্লেখ ছিল না। সন্ধির শর্তের বাইরে ইংরাজ বণিকরা অহিফেনের ব্যবসা চালাতে থাকে।[১]

নান্‌কিং-এর সন্ধি, ১৮৪০ খ্রীঃ

নানকিং-এর সন্ধি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কীলকের প্রান্তভাগ মাত্র। এরদ্বারা চীনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ প্রবলতর হয়। অন্যান্য ইওরোপীয় জাতিগুলি নানকিং-এর সন্ধির অনুবর্তী হয়ে চীনের উপর অনুরূপ শর্তে বৈষম্যমূলক সন্ধি (Unequal treaties) চাপিয়ে দেয়। মার্কিন দেশ ওয়াং-শিয়ার সন্ধি ১৮৪৪ খ্রীঃ, ফ্রান্স হোয়ামপোয়ার সন্ধি ১৮৪৪ খ্রীঃ, চীনের উপর চাপায়। এই সন্ধির শর্তগুলি ছিল নানকিং-এর সন্ধির মতই।

অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী সন্ধিগুলি

১· S.L Tikhiv in sky—History of China.

নানকিং-এর সন্ধির শর্তপূরণে চীং সরকার টালবাহানা করায় এবং বাণিজ্যের স্বার্থে অনুপ্রবেশের জন্যে ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা চীনের উপর আরও একটি যুদ্ধ চাপায়। এই যুদ্ধের অজুহাত ছিল খ্রীষ্টান মিশনারী হত্যা ও ব্রিটিশ জাহাজ লর্চা এ্যারোর (Lorcha Arrow) উপর চীনা সেনাদের গোলা বর্ষণের অজুহাতে দ্বিতীয় অহিফেন যুদ্ধ বা ইঙ্গ-ফরাসী বনাম চীন যুদ্ধ (১৮৫৬—৬০ খ্রীঃ) চলে। ১৮৫৮ খ্রীঃ টিয়েন্টসিনের সন্ধি, এবং ১৮৬০ খ্রীঃ পিকিং-এর (Peking) সন্ধির দ্বারা দ্বিতীয় ইঙ্গ-চীন যুদ্ধের অবসান হয়। (১) চীনের রাজধানী পিকিং-এ[১] ব্রিটিশ দূতাবাস স্থাপিত হয়। (২) ব্রিটিশ ও অন্যান্য ইওরোপীয়দের চীনের ভিতর অবাধ যাতায়াত ও ইওরোপীয় বণিকদের চীনে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দেওয়া হয়। চীনের ভিতর ব্রিটিশ মালের উপর চলাচল-শুল্ক (লিকিন শুল্ক) লোপ করা হয়। (৩) বিনিময়ে এই মালের দামের উপর ২·৫% হারে শুল্ক ব্রিটিশ বণিকরা দিতে অঙ্গীকার করে। (৪) চীনের আরও ছয়টি বন্দর—ইওরোপীয় বাণিজ্যের জন্যে খুলে দেওয়া হয়। (৫) চীনের ইয়াং-সি নদীতে ব্রিটিশ বাণিজ্য স্টীমার যাতায়াতের অধিকার দেওয়া হয়। (৬) ফ্রান্সকেও অনুরূপ সুবিধা চীন দেয়। (৭) ১৮৬০ খ্রীঃ পিকিং-এর সন্ধির দ্বারা টিয়েন্টসিন সন্ধির শর্তগুলিকে চীং সরকার চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়। (৮) কৌলুন উপদ্বীপ ব্রিটেনের অধিকারে যায়। (৯) চীন ৮,০০০,০০০ লিয়াং ক্ষতিপূরণ ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিকে দেয়। চীনের বন্ধ দরজা এভাবে খুলে যায়। দুটি ইঙ্গ-চীন যুদ্ধের ফলে ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা চীনে অনুপ্রবেশ করে।

দ্বিতীয় অহিফেন যুদ্ধ : পিকিং-এর সন্ধি, ১৮৬০ খ্রীঃ

প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : চীনে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবচ্ছেদের প্রয়াস : চীনা তরমুজের বাঁটোয়ারা (Attempt at Partition of China : Cutting of the Chinese melon) : পিকিং-এর সন্ধির পর (১৮৬০ খ্রীঃ) চীনে বৈদেশিক শক্তির ক্রমাগত অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। ১৮৬০ খ্রীঃ পর থেকে ইওরোপে সাম্রাজ্যবাদের ক্ষুধা তীব্র হয়ে উঠে। এজন্যে ইওরোপের ইতিহাসে ১৮৬০-এর পরবর্তী যুগকে Age of Imperialism বলা হয়। ইওরোপীয় জাতিগুলি চীনে কেবলমাত্র বাণিজ্যের অধিকারে সন্তুষ্ট না হয়ে, নিজ নিজ এলাকাভুক্ত অঞ্চল বা Spheres of influence তৈরি করার চেষ্টা আরম্ভ করে। অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক হব্‌সন বলেছেন যে, শিল্পসমৃদ্ধ পুঁজিবাদী দেশগুলির নিজদেশে মূলধনের পাহাড় জমে গেলে, তা অন্য দেশে খাটাবার জন্যে উপনিবেশ স্থাপন করে। চীনের ক্ষেত্রে সেই মতের সত্যতা বুঝা যায়। ১৮৬৯ খ্রীঃ সুয়েজ খাল নৌ-চলাচলের জন্যে উন্মুক্ত হয় এবং এই সময় চীনের সাংহাই বন্দরের সঙ্গে বহির্জগতের সংযোগের জন্যে টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপিত হয়। এর ফলে চীনে আধিপত্যবিস্তারের জন্যে ইওরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়।

Spheres of Influences বা এলাকাভুক্ত অঞ্চল গঠনের নীতি

(১) ১৮৮৬ খ্রীঃ ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশের অধীনে আসে।উত্তর-ব্রহ্ম থেকে ইংরাজ বণিকরা চীনের ইউনান প্রদেশে ঢোকার চেষ্টা চালায়। (২) জার-শাসিত রাশিয়া ১৮৭৯ খ্রীঃ চীনের উত্তরে মোঙ্গোলিয়া সীমান্তে ইলি উপত্যকা অধিকার করে। (৩) ১৮৮১ খ্রীঃ জাপান রি-ই-কিউ দ্বীপ অধিকার করে। (৪) ১৮৮৫ খ্রীঃ লি-ইটো চুক্তির দ্বারা চীন ও জাপান উভয়ে কোরিয়ায় আধিপত্য না করার জন্যে চুক্তি করে। (৫) ১৮৮৫ খ্রীঃ চীং সরকার ফ্রান্সের হাতে ভিয়েৎনাম বা ইন্দোচীন ছেড়ে দিতে বাধ্য

চীনে এলাকাভুক্ত অঞ্চল গঠন

১· অধুনা পিকিং-এর নামের উচ্চারণ বেইজিং।

হন। এভাবে ১৮৬০—১৮৮৫ খ্রীঃ পর্যন্ত চীনের সীমান্ত-অঞ্চলের দেশগুলি একে একে বৈদেশিক শক্তির হাতে চলে যায়। চীনের অধীনস্থ অঞ্চলের প্রায় ২/৩ অংশ বিদেশী জাতিগুলি নিজ নিজ এলাকাভুক্ত অঞ্চলে (Spheres of Influence) পরিণত করে। অধ্যাপক ভিন্যাকের (Vinacke) মতে, লোকে তরমুজ কেটে যেমন টুকরো করে বিতরণ করে, সেইরূপ তরমুজের আকৃতি চীনকে (Chinese Melon) টুকরো করে ইউরোপীয় জাতিগুলি উপনিবেশে পরিণত করতে থাকে।

(৬) অবশেষে ১৮৯৪—৯৫ খ্রীঃ প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধে চীনের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। চীন-জাপান যুদ্ধের প্রধান কারণ ছিল কোরিয়ার উপর উভয় দেশের পরস্পর-বিরোধী দাবি। চীন দীর্ঘকাল কোরিয়ার উপর অধিরাষ্ট্রের (Suzerainty) অধিকার ভোগ করে এসেছিল। অর্থাৎ চীনের সীমান্তবর্তী কোরিয়াকে চীন দীর্ঘকাল তার সামন্ত-রাজ্য বলে গণ্য করত। কোরিয়া ছিল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, শান্তিপ্রিয় কোরীয় জাতির বাসভূমি। জাপান শক্তিশালী হওয়ার পর কোরিয়ার দিকে লোলুপ দৃষ্টি দেয়। জাপান দাবি করে যে, কোরিয়ার উপর জাপানের অধিকার থাকা উচিত। কারণ চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে কোরিয়া জাপানের সর্বাধিক নিকটবর্তী। জাপান প্রথমে কূটনীতির আশ্রয় নেয়। কোরিয়ায় চীনের অধিরাজত্বের দাবিকে কূটনীতির দ্বারা বিনষ্ট করে। ১৮৮৫ খ্রীঃ লি-ইটো চুক্তির দ্বারা চীন অঙ্গীকার করে যে, জাপান ও চীন উভয়েই কোরিয়া থেকে সেনা সরিয়ে নিবে। এক শক্তি অপর শক্তির বিনা সম্মতিতে কোরিয়ায় সৈন্য পাঠাবে না। এর ফলে চীন কোরিয়ায় জাপানের সমমর্যাদায় নেমে আসে।কোরিয়ার উপর চীনের অধিরাজত্বের দাবি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একশ্রেণীর চীনা জাতীয়তাবাদী এজন্যে মন্ত্রিসভাকে দোষ দেন। মন্ত্রিসভা তার নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্যে কোরিয়ায় চুংহক বিদ্রোহ দমনের অজুহাতে কোরিয়ায় চীনা সৈন্য পাঠায়। জাপান লি-ইটো চুক্তিভঙ্গের দায়ে কোরিয়ায় চীনকে আক্রমণ করে। কোরিয়ার যুদ্ধে ১৮৯৪—৯৫ খ্রীঃ চীন শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়। সিমনোসেকির সন্ধির দ্বারা প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধের উপর যবনিকা পড়ে।

প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধ, ১৮৯৪-৯৫ খ্রীঃ

১৮৯৫ খ্রীঃ সিমনোসেকির সন্ধির দ্বারা (১) চীন কোরিয়ার স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা স্বীকার করে, অর্থাৎ কোরিয়ার উপর চীন তার দাবি ত্যাগ করে। (২) পেস্কাডোরেস, তাইওয়ান, লিয়াও টুং উপদ্বীপ ও পোর্ট-আর্থার বন্দর জাপানকে চীন ছেড়ে দেয়। এই বন্দর ও দ্বীপগুলি জাপান অধিকার করে নেয়। (৩) চীনের অভ্যন্তরে আরও কতকগুলি বন্দর জাপানকে খুলে দিতে হয়। (৪) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ চীন জাপানকে প্রচুর অর্থ দিতে বাধ্য হয়। সিমনোসেকির সন্ধির দ্বারা চীনের মাঞ্চুরিয়া প্রদেশের লিয়াও-টুং উপদ্বীপ জাপান দখল করায় জারের রাশিয়া অসন্তুষ্ট হয়। কারণ মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ দখলের জন্যে জার সরকারের লোভ ছিল। সন্ধি-স্বাক্ষরের পর জার-শাসিত রাশিয়া জাপানকে লিয়াং টুং উপদ্বীপ চীনকে ফেরত দিতে বাধ্য করে। শীঘ্রই রাশিয়া লিয়াও টুং উপদ্বীপ নিজেই দখল করে নেয়। লি-লোভানভ চুক্তির দ্বারা রাশিয়া এই উপদ্বীপ চীনের হাত থেকে নেয়। এই উপদ্বীপের ভিতর দিয়ে দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথ রাশিয়া নির্মাণ করে। লিয়াও টুং উপদ্বীপের পোর্ট আর্থার বন্দরকে রাশিয়ার ট্রান্স-সাইবেরীয় রেলপথের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

সিমনোসেকির সন্ধি, ১৮৯৫ খ্রীঃ

প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধে চীনের পরাজয় ঘটলে, ইওরোপীয় শক্তিগুলি ভয় পায় যে, জাপান একাই হয়ত গোটা চীন গ্রাস করে নিবে। তাদের ভাগ কম পড়বে। এজন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি চীনকে ব্যবচ্ছেদের চেষ্টা চালায়। ঐতিহাসিক ভিন্যাকের মতে "চীনা তরমুজকে ফালি

করে বাঁটোয়ারা" আরম্ভ হয়। (১) ব্রিটেন ইয়াং-সি উপত্যকায় ও দক্ষিণ চীনে তার Spheres of interest বা স্বার্থ-সংযুক্ত অঞ্চল গঠন করে। অর্থাৎ এই অঞ্চলে ব্রিটেন তার একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার এবং অতিরাষ্ট্রিক অধিকার স্থাপন করে। (২) ফ্রান্স, য়ুনান, গুয়াংডং, গুয়াংজি অঞ্চলে খনিজ সম্পদের উপর তার একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করে। (৩) জাপান সিমনোসেকি সন্ধির পর চীনের সন্ধি-বন্দরে কনসাল অফিস খোলে। (৪) কাইজারের জার্মানীও পিছিয়ে থাকেনি। জার্মানী চীনের শাং-টুং প্রদেশে, হ্যাং-কাও ও তিয়ান জিনে তার আধিপত্য স্থাপন করে। (৫) জার-শাসিত রাশিয়া বহিঃ-মোঙ্গোলিয়া ও আমুর-উসুরী নদী অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে। (৬) চীনের ভিতর ইওরোপীয় কোম্পানিগুলি রেলপথ নির্মাণ আরম্ভ করে। এই রেলপথগুলির মুনাফা ইওরোপীয় দেশগুলি ভোগ করে। রেলপথ রক্ষার ছলে রেলস্টেশনগুলিতে নিজ নিজ সৈন্য স্থাপন করে। এই রেলযোগে চীনের রেশম, চা ও খনিজ সম্পদ তারা রপ্তানি করে। মার্কিন সরকার দেখেন যে, জাপান ও ইওরোপীয় দেশগুলি চীনকে ভাগ করে নিচ্ছে। আমেরিকা চীনে তার অবাধ বাণিজ্যের অধিকার স্থাপন করতে ইচ্ছা করে। এজন্য ১৮৯৯ খ্রীঃ মার্কিন বিদেশমন্ত্রী স্যার জন হে তাঁর বিখ্যাত "খোলা দ্বার" নীতি ঘোষণা করেন (Open Door)। এই নীতির মর্ম ছিল যে বৈদেশিক শক্তিগুলি চীনের যে সকল স্থান অধিকার করছে, সেখানে আমেরিকাকে বাণিজ্যের জন্য দরজা খুলে দিতে হবে। যে দেশ সেই স্থান অধিকার করেছে তার মতই বাণিজ্যের সকল সুযোগ আমেরিকাকে দিতে হবে। খোলা দ্বার নীতি না মানলে আমেরিকা সামরিক শক্তি প্রয়োগ করবে। এর ফলে চীনের ব্যবচ্ছেদে ভাঁটা পড়ে।

চীন ব্যবচ্ছেদের চেষ্টা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : চীনের প্রতিক্রিয়া : তাই-পিং বিপ্লব (Chinese Reaction : The Taiping Revolt) : চীনা ভাষায় 'তাই-পিং' কথাটির অর্থ হল "স্বর্গীয় শান্তি" (Heavenly Peace) অথবা "মহা-শান্তি" (Great Peace)। মহাচীনে এক বিরাট অন্তর্বিপ্লব ১৮৫০-১৮৬৫ খ্রীঃ চীং সরকার এবং চীনা সামন্ততান্ত্রিক সমাজকে আলোড়িত করে। এই বিপ্লবীদের আদর্শ ছিল চীনের মহাজ্ঞানী দার্শনিক কনফুসিয়াসের এবং খ্রীষ্টীয় আদর্শে চীনে এক সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। এই সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে চীনে "মহা শান্তি" বা "তাই-পিং" যুগ প্রতিষ্ঠিত হবে বলে তাঁরা বিশ্বাস করতেন। এজন্যে এই বিপ্লবের নাম হয় তাই-পিং বিপ্লব।

চীনে তাই-পিং বিপ্লব ঘটার নানাবিধ কারণ ছিল। চীনে বৈদেশিক শক্তিগুলির অনুপ্রবেশ চীন সরকার রুখতে ব্যর্থ হলে বহু দেশভক্ত লোকের চীং সরকার সম্পর্কে আস্থা নষ্ট হয়। Treaty Ports বা সন্ধি-বন্দরের ভিতরে এবং দেশের অভ্যন্তরে যাতে এই "বিদেশী শয়তান" বা (Foreign devil) ঢুকতে না পারে এজন্যে দেশভক্ত সমিতিগুলির ডাকে বহু চীনা বিদেশীদের সশস্ত্র প্রতিরোধ করেন। এই প্রতিরোধ ব্যর্থ হলে অনেকে তাই-পিং বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগ দেন। দেশভক্ত চীনা জনগণ ভাবতে শুরু করেন যে মাঞ্চু বা চীং শাসনব্যবস্থা আর চীনকে রক্ষা করতে পারবে না। এই সরকার দেশরক্ষায় অক্ষম। (২) চীনে বৈদেশিক অনুপ্রবেশের ফলে চীনের অর্থনীতি ভয়ানকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। (ক) ইঙ্গ-চীন যুদ্ধের ব্যয় ও প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের অর্থ মেটাবার জন্যে চীং সরকার দরিদ্র কৃষকদের করভারে জর্জরিত করেন। (খ) বিজয়ী ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিকে ক্ষতিপূরণের অর্থ চীং সরকার রূপায় প্রদান করেন। এছাড়া

তাই-পিং বিপ্লবের কারণ: বৈদেশিক অনুপ্রবেশের প্রতিক্রিয়া

আফিম ক্রয় বাবদ চীন থেকে প্রচুর রূপা বিদেশীদের হাতে চলে যায়। ফলে চীনে রূপার অভাবে মুদ্রাসঙ্কট দেখা দেয়। সাধারণ গরীব চাষী, মজুরদের হাতে মুদ্রা না থাকায় তাদের পক্ষে জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের বিরাট অসুবিধা দেখা দেয়। এজন্যে তারা চীং সরকারকে দায়ী করে। (গ) ইওরোপীয় বণিকরা ইওরোপের কারখানায় তৈরী সস্তা শিল্পদ্রব্য চীনের বাজারে আমদানি করায় চীনা কারিগরদের হাতের তৈরী শিল্পদ্রব্যের চাহিদা কমে যায়। চীনা কারিগররা বেকার হয়ে যায়। (ঘ) চীনের সমুদ্রবন্দরগুলি এবং চীনের অভ্যন্তরের নদী বন্দরগুলি সর্বত্র ইওরোপীয় বণিকরা ছড়িয়ে পড়ে এবং এই সকল বন্দরে যে চীনা বণিক, নাবিক, মালবহনকারী, ফড়ে, আড়তদার, জলদস্যু প্রভৃতি শ্রেণী কাজ করত, তারা এর ফলে বেকার, জীবিকাহীন হয়ে দারিদ্র্যদশাগ্রস্ত হয়। (ঙ) ক্যান্টন অঞ্চল ছিল চীনা জাতীয়তাবাদের বীজক্ষেত্র। এই ক্যান্টন অঞ্চলে বৈদেশিক অনুপ্রবেশ ঘটলে তার প্রতিরোধে পিকিং-এ অবস্থিত চীং সরকার আপ্রাণ চেষ্টা না করায়, দক্ষিণের বহু লোকের মনে ক্ষোভ দেখা দেয়। এইভাবে বৈদেশিক অনুপ্রবেশের ফলে চীং সরকার এবং বিদেশী বণিকদের বিরুদ্ধে চীনা জনসাধারণের ক্রোধ দেখা দেয়।

এদিকে চীনের গ্র্যান্ড ক্যানাল বা প্রধান খাল, যার দ্বারা ইয়াং-সি নদীর বন্যায়—জলনিকাশী হত, তা মজে যায়। ফলে ইয়াংসি বা পীত নদের বন্যার প্রভাবে চীনের চাষী ও গ্রামবাসীদের 'হা-অন্ন' দশা দেখা দেয়। সরকারী কর্মচারীরা ছিল অকর্মণ্য ও দুর্নীতিপরায়ণ। খালটির পলি কেটে জলনিকাশীর কোন ব্যবস্থা এই কর্মচারীরা করেনি। 'সেন্সি' অর্থাৎ এই উচ্চমার্গের ম্যান্ডারিণ কর্মচারীরা বেতনগ্রহণ, প্রজানির্যাতন ও অলস জীবনে অভ্যস্ত ছিল। এই অকর্মণ্য কর্মচারীদের শাসিত চীং সরকারের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা নষ্ট হয়। এই অবস্থায় চীনারা বলতে থাকেন যে "চীং সরকারের উপর থেকে ঈশ্বরের কৃপা প্রত্যাহৃত হয়েছে" (Mandate of Heaven has been withdrawn)। চীনের দুর্দশাগ্রস্ত কৃষকসমাজ ধ্বনি তুলেন, "চীংদের পতন হোক, মীংদের ফিরিয়ে আনা হোক" (Overthrow the Ching, bring back the Ming)। চীং বলতে চীনের মাঞ্চু-রাজবংশ বুঝায়। মীং বলতে খাঁটি-চীনা-রাজবংশ বুঝায়।

অর্থনৈতিক কারণ

চীনা জনগণের বিভিন্ন অংশ যখন চীং সরকার ও বৈদেশিক বণিকদের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ ছিল, সেই সময়ে তাদের নেতৃত্ব দিতে এক নেতার উদ্ভব হয়। এই সময় হুং-সিউ-চুয়ান নামে[১] এই নেতার উদ্ভবে তাই-পিং বিপ্লব আরম্ভ হয়। হুং (১৮১৪-১৮৬৪ খ্রীঃ) ছিলেন এক কৃষক-সন্তান, পেশায় স্কুল-শিক্ষক। তিনি সেন্সি বা সরকারী অফিসারের চাকুরি লাভের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে হতাশাগ্রস্ত হন। ক্যান্টনে পড়াশোনার সময় তিনি খ্রীষ্টান যাজকদের সংস্পর্শে আসেন এবং বাইবেল থেকে আদি খ্রীষ্টীয় সমাজতন্ত্র ও 'দশ নীতি' সম্পর্কে শিক্ষা নেন। তাঁর চিন্তাধারার উপর খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের প্রভাব ছিল।

হুং-সিউ-চুয়ানের ভূমিকা

হুং-সিউ-চুয়ান প্রচার করেন যে, সমাজে ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে বর্তমান চীং বা মাঞ্চু-সরকারের অবসান ঘটানো দরকার। এইসঙ্গে চীনে জমিদারী-প্রথা বা সামন্ত-প্রথা অবসানের দ্বারা নূতন সমাজব্যবস্থা গঠনের লক্ষ্যও তিনি ঘোষণা করেন। হুং ছিলেন প্রধানতঃ চিন্তাবিদ। তাঁর চিন্তাধারা অনুসরণ করে প্রথম তাই-পিং বিদ্রোহীদের সংগঠন করেন তাঁরই আত্মীয় ও শিষ্য ফেং-য়ুন-সান। তিনিই তাই-পিং অনুগামীদের সামরিক নিয়মে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন ও সামরিক শিক্ষা দেন। রুশ ঐতিহাসিক টিস্‌ভিনস্কির মতে—তাই-পিং বিপ্লব ছিল মূলতঃ কৃষক-বিপ্লব। তাই-পিং সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ সদস্য ছিল কৃষক। তাই-পিং বিপ্লবীদের লক্ষ্য ছিল চীং সরকারকে উৎখাত করে তাই-পিং বা স্বর্গীয় শান্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয়তঃ,

তাই-পিং সংগঠন : কৃষক বিপ্লব : ভূমি-সংস্কার নীতি

১. চীনা উচ্চারণ হুং-জিউ কুয়ান।

তাই-পিং-গোষ্ঠী ভূমি-ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করতে চায়। তাই-পিং নেতারা তাদের ভূমি-নীতি সম্পর্কে একটি পুস্তিকা প্রচার করে। এই পুস্তিকার নাম ছিল—"দৈবস্বত্ব সরকারের ভূমি-নীতি"। গ্রামীণ পুরুষ ও নারীকে মাথাপিছু জমি ভাগ করে দেওয়ার প্রস্তাব তাই-পিংরা দেয়। উর্বরতা অনুসারে জমিগুলিকে ৯টি স্তরে ভাগ করা হয়। জমির উৎপন্ন ফসলের অংশ কৃষকের জীবনধারণের জন্যে রেখে বাকী ফসল সাধারণের জন্যে প্রতিষ্ঠিত ধর্মগোলায় জমা দিতে বলা হয়। তাই-পিংদের সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা দার্শনিক কন্‌ফুসিয়াসের চৌলি এবং দার্শনিক মেন্‌শিয়াসের রচনা থেকে গৃহীত হয়।

তাই-পিং নেতারা নানকিং অধিকার করার পর ইয়াং-শিউ-চিং-এর নেতৃত্বে তাই-পিং সংস্কারগুলিকে কার্যে পরিণত করে। (১) তারা কৃষক পরিবারগুলিকে মাথা-পিছু জমি বন্টন করে। (২) সর্বসাধারণের নৈতিক চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়। (৩) পরিবারগুলি ভেঙে দিয়ে পুরুষ ও নারীদের আলাদাভাবে বাস করতে বাধ্য করা হয়। (৪) পুরুষ ও নারীদের বিভিন্ন শিল্পের কাজের জন্যে শ্রমিকবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। তাদের তৈরী শিল্পদ্রব্যগুলির সর্বসাধারণের জন্যে রক্ষিত গুদামে জমা করা হয়। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরও শ্রমিকবাহিনীর সঙ্গে সাধ্যমত কাজ করতে হয়। (৫) এই কাজের জন্যে কোন পারিশ্রমিক দেওয়া হত না। খাদ্য, বস্ত্র, অন্যান্য দ্রব্য নির্দিষ্ট হারে বিনামূল্যে বিতরণ করা হত। (৬) মোট কথা কৃষি, শিল্প ও শ্রমের জাতীয়করণ করা হয়। (৭) নানকিং শহরের ভিতর ব্যক্তিগত ব্যবসায় নিষিদ্ধ করা হয়। (৮) নারী ও পুরুষদের সমানভাবে শ্রমিক ও সৈনিকের কাজ করতে হয়। নারীদের স্বতন্ত্র বাহিনী তৈরি হয়। (৯) চীনাদের মাথায় লম্বা বেণী রাখা নিষিদ্ধ করা হয়।

নানকিং-এ তাই-পিং সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা

তাই-পিং বিপ্লব বন্যার জলের মত দক্ষিণ চীন হতে ইয়াং-সি উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ে। নানকিং অধিকারের পর তাই-পিং নেতাদের মধ্যে দুর্নীতি ও অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। প্রতি নেতা সর্বোচ্চ ক্ষমতা পাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হন। তাই-পিং নেতা হুং-সি চুয়ান তাঁর দলের নেতাদের ঝগড়া দূর করার জন্যে ফেং প্রভৃতি বিখ্যাত সহকারীদের প্রাণদণ্ড দিলে তাই-পিংরা দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে চীং সরকারের সেনাপতি লি-হাং-চাং তাঁর পাশ্চাত্য রণকৌশলে শিক্ষিত বাহিনীসহ তাই-পিং বাহিনীকে ঘিরে ফেলেন। অপর সেনাপতি সেং-কুয়ো-ফান হুনান প্রদেশে তাই-পিংদের উৎখাত করেন। ফলে তাই-পিং বিপ্লবীরা ধ্বংস হয়। চীনে চীং সরকারের পুরাতনতন্ত্র পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই-পিং বিপ্লবীরা শিল্প-বিপ্লবের যুগে কৃষক-বিপ্লবের পথে সমাজ-বিপ্লবের পরীক্ষা চালান। কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁদের সমাজতন্ত্রবাদকে এজন্যে ভ্রান্ত বলে মনে করেন। তাই-পিং চিন্তাবিদরা তাঁদের বিপ্লবে ধর্মীয় প্রভাব এবং সমাজ-সংগঠনে পুরুষ-নারীর একত্র থাকার অধিকার হরণ প্রভৃতি কয়েকটি ভুল নীতি নেন। তাঁরা পুরাতন প্রাচীন মরচে-পড়া কন্‌ফুসীয় ও খ্রীষ্টীয় আদর্শ দ্বারা আধুনিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেন। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ও গণতন্ত্রের কথা তাঁরা চিন্তা করেন নি। তথাপি অনেকে তাই-পিং বিপ্লবকে চীনে কমিউনিস্ট বিপ্লবের প্রভাতরশ্মি বলে মনে করেন।

তাই-পিং নেতাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ঃ তাই-পিং বিপ্লবের পতন

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ বক্সার বিদ্রোহ (The Boxer uprising) ঃ চীনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সদম্ভ অনুপ্রবেশ চীনা জনসাধারণের মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তারা আশঙ্কা করে যে, চীন শীঘ্রই বিদেশী শক্তিগুলির উপনিবেশে পরিণত হবে। এজন্যে

আগ্রাসী বৈদেশিক জাতিগুলির বিরুদ্ধে প্রবল ঘৃণার প্রকাশ রূপে বক্সার-বিদ্রোহ দেখা দেয়। বক্সার-বিদ্রোহে ধ্বনি তোলা হয়, "বিদেশী শক্তিকে ধ্বংস কর, চীং শাসনকে রক্ষা কর।" মূলতঃ বক্সার-বিদ্রোহ চীং বা মাঞ্চু-সরকারের বিরোধী ছিল। কিন্তু চীং বা মাঞ্চু সাম্রাজ্ঞী জুসি সুকৌশলে বক্সারদের বিদ্রোহকে বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়।

বক্সার বিদ্রোহের প্রকৃতি

বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে বক্সার-বিদ্রোহ ঘটার অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, ইওরোপীয় খ্রীষ্টীয় যাজকরা চীনাদের ধর্মমতে আঘাত করে। তারা বহু চীনবাসীকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করে। এই ধর্মান্তরিত চীনা খ্রীষ্টানরা ইওরোপীয় পোশাক, ভাবধারা অনুসরণ করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করে। এজন্য চীনা-সমাজের সংহতি বিনষ্ট হয়। বক্সার-বিপ্লবের একটি দিক ছিল খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের বিরোধিতা। ফলে চীং বা মাঞ্চু সরকারের বিরোধিতা, বৈদেশিক শক্তির বিরোধিতা, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের বিরোধিতা এই তিন ধারার মধ্যে প্রথম ধারাটি লুপ্ত হয়। সাম্রাজ্ঞী জুসির নীতির ফলে মাঞ্চু-বিরোধিতা লুপ্ত হয়। বৈদেশিক শক্তির বিরোধিতার অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণও ছিল। (১) শাং-টুং ও চিলি প্রদেশে ইওরোপে তৈয়ারী শিল্পদ্রব্য গ্রামের বাজারগুলি ভরে ফেলে। এর ফলে চীনাদের হাতে তৈরী জিনিসের কদর নষ্ট হয়। চীনা শিল্পী, কারিগররা বেকার দশায় পড়ে। (২) চীন-জাপান যুদ্ধের পর বৈদেশিক শক্তিগুলি চীন ব্যবচ্ছেদের চেষ্টা চালায়। এজন্য দেশপ্রেমী চীনারা বৈদেশিক শক্তিগুলিকে বিতাড়ন করতে চায়। (৩) চীনাদের উপর ইওরোপীয় বণিকদের অত্যাচার সম্পর্কে গুজব চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে লোকে উত্তেজিত হয়। (৪) ১৮৯৮ খ্রীঃ ইয়াং-সি নদীর বন্যায় ও দুর্ভিক্ষে শাং-টুং ও চিলি প্রদেশে বহু কৃষক গৃহহীন ও অন্নহীন অবস্থায় পড়ে। এই কৃষকরা বক্সার-বিদ্রোহীদের দলে যোগ দেয়। (৫) জার্মান বণিকরা শাং টুং প্রদেশে ১৮৯৭ খ্রীঃ তাদের আধিপত্য বিস্তার করে এবং রেলপথ তৈরি আরম্ভ করে। এজন্যে স্থানীয় চীনারা ক্ষিপ্ত হয়। এই সকল কারণ মিলিতভাবে বক্সার-বিদ্রোহ সৃষ্টি করে। বক্সার-বিদ্রোহীরা চীনের প্রাচীন সভ্যতা ও চীনের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করত। এই বিদ্রোহীরা ধর্মীয় ভাবধারায় ও কনফুসিয় মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। আধুনিক গণতন্ত্রবাদ প্রভৃতির সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল না। বিভিন্ন গুপ্তসমিতির মাধ্যমে বক্সার-বিদ্রোহীরা সংগঠিত হয়।

বক্সার বিদ্রোহের কারণ

বক্সার-বিদ্রোহীদের অধিকাংশ ছিল কৃষকশ্রেণীর লোক। কিছুসংখ্যক গ্রামীণ মধ্যবিত্ত, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, ফেরিওয়ালা, ভবঘুরে শ্রেণীর লোকেরাও এই বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয়। বক্সার-বিদ্রোহীদের অনুপ্রাণিত করে কয়েকটি গোপন সমিতি। এই সমিতিগুলির মধ্যে প্রধান ছিল আই-হো-চুয়ান বা "ন্যায় ও সাম্য সমিতি" নামে এক গুপ্তসমিতি। এই সমিতির সদস্যরা বিশ্বাস করত যে, "চুয়ান" বা "কুয়ান" অর্থাৎ মুষ্টিযুদ্ধের দ্বারা শারীরিক শক্তি ও স্নায়ুর দৃঢ়তা লাভ করা যায়। এই নাম থেকেই গোটা আন্দোলনটি "বক্সার" বা মুষ্টি-যোদ্ধাদের আন্দোলন বলে পরিচিত হয়। আই-হো-চুয়ান গোষ্ঠীর মতবাদে বৌদ্ধধর্ম, কনফুসিয়বাদ ও তাওবাদের সম্মিলন ছিল। বক্সার-বিদ্রোহীরা মন্ত্র-তন্ত্র, তুক-তাকে বিশ্বাস করত। মাঞ্চু-সরকারের বহু রক্ষণশীল কর্মচারী বক্সারদের গোপনে সাহায্য দেয়। "চীংবংশকে রক্ষা কর, বিদেশীদের ধ্বংস কর" এই ধ্বনি নিয়ে বক্সাররা খ্রীষ্টান ও বিদেশীদের আক্রমণ করে।

গোপন সমিতির প্রভাব

সাম্রাজ্ঞী জুসি দেখেন যে জনসাধারণের বিক্ষোভ বিদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত না করলে তা তাঁর নিজ সিংহাসনকেই বিপন্ন করবে। সুতরাং তিনি বক্সার-বিদ্রোহীদের সহায়তা করেন। বক্সার-বিদ্রোহীরা পিকিং-এর বিদেশী দূতাবাসগুলি অবরোধ

করে। গ্রামাঞ্চলে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত চীনাদের নিহত অথবা বিতাড়িত করা হয়। ইওরোপীয় দ্রব্য এবং ইওরোপীয় কায়দায় তৈরি ঘরবাড়িগুলি ধ্বংস করা হয়। শাং টুং প্রদেশের মাঞ্চু-সরকারের শাসনকর্তা য়ুআন-শি-কাই বক্সার-বিদ্রোহীদের দমন করেন। কিন্তু পিকিং-এ বক্সার-বিদ্রোহীরা বৈদেশিক দূতাবাসগুলিকে বিপদগ্রস্ত করে। শেষ পর্যন্ত বৈদেশিক শক্তিগুলি ব্রিটিশ নৌসেনাপতি সেমুরের নেতৃত্বে এক সেনাদল আনে এবং বক্সার-বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ করে দূতাবাসগুলি অবরোধমুক্ত করে। বৈদেশিক শক্তিগুলি বক্সার-বিদ্রোহের জন্য মাঞ্চু বা চীং সরকারকে দায়ী করে। বক্সার প্রোটোকোল অনুসারে চীং সরকারকে প্রচুর ক্ষতিপূরণ বৈদেশিক শক্তিগুলিকে দিতে বাধ্য করা হয়। সাম্রাজ্ঞী জুসি কিছুদিনের জন্যে সিংহাসন ত্যাগ করেন। বক্সার-বিদ্রোহীদের আদর্শ ছিল মধ্যযুগীয়। তারা ধর্মীয় ভাবধারা আশ্রয় করায় আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্রবাদ তাদের চিন্তায় স্থান পায় নি। তাই-পিং বিপ্লবীদের মত তারা ভূমিসংস্কারের কথাও ভাবে নি।

বক্সার বিদ্রোহের বিফলতা ঃ প্রকৃতি

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ ডাঃ সান-ইয়াৎ সেনের অভ্যুদয় (The Rise of Dr. Sun Yat Sen) ঃ ইতিহাসে দেখা যায় যে, মাঝে মাঝে এমন একটি মানুষের জন্ম হয়, যিনি তাঁর আপন চিন্তা, কল্পনা ও কর্মশক্তির দ্বারা ইতিহাসের গতিকে প্রভাবিত করেন। আধুনিক চীনের জনক ডাঃ সান ইয়াৎ সেন ছিলেন এই রকম একটি বিরল কর্মবীর ও প্রতিভাধর মানুষ। সান ইয়াৎ সেনের শিয়াং-শান জেলায় এক কৃষকের গৃহে জন্ম হয়। তাঁর পিতৃব্য তাঁকে এক ইংরাজী মিশনারী বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন। পরে তিনি হনলুলুতে স্কুলশিক্ষা সাঙ্গ করেন এবং এই সময় খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং পাশ্চাত্য ভাবধারা ও আধুনিক গণতন্ত্রবাদী চিন্তাধারায় প্রভাবিত হন। তিনি হনলুলুতে চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ নেন এবং ছাত্রঅবস্থায় বিপ্লবীদলে যোগ দেন। তিনি ক্যান্টনে ফিরে আসার পর কিছুকাল ট্রিয়াড গুপ্তসমিতির সদস্য ছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ শিং-চুং-হুই বা চীনের 'পুনর্জাগরণ সমিতি' নামে তিনি একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেপ্তার এড়াবার জন্যে তিনি জাপানে পলায়ন করেন।

সান ইয়াৎ সেনের স্বাদেশিকতা ও বিপ্লববাদ

জাপানে থাকার সময় ডাঃ সান তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করেন এবং চীনে চীং সরকারের উৎখাতের জন্যে বিপ্লবের প্রস্তুতি চালান। ডাঃ সান-ইয়াৎ সেন বলেন যে, চীনকে বৈদেশিক শাসনমুক্ত হয়ে, এক আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলা দরকার। এজন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন মাঞ্চুবা চীং সরকারকে উৎখাত করা। এই সরকারের শাসনের ফলেই চীনের অধঃপতন দেখা দিয়েছে। বিদেশে অবস্থিত চীনাদের আর্থিক সাহায্য এবং সদস্যপদ দিয়ে তিনি তাঁর বিপ্লবী দলকে পুষ্ট করেন। তিনি বিভিন্ন পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক চীনা যুবক এবং বিভিন্ন চীনা গুপ্তসমিতিগুলিকে তাঁর নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেন।

তিনি চীনের জাতীয়তাবাদীদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে সান-মিন-চু-আই বা সান ইয়াৎ সেনের তিনটি নীতি ঘোষণা করেন। এই তিনটি নীতি ছিল জন-জাতীয়তাবাদ (Peoples' nationalism), জন-গণতন্ত্রবাদ (Peoples' Democracy), জন-জীবিকাবাদ বা জন-সমাজতন্ত্রবাদ (Peoples' Livelihood)। গণ-জাতীয়তাবাদের অর্থ ছিল চীনের মাঞ্চু-শাসনের বিরোধিতা এবং চীনে স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। জন-গণতন্ত্রবাদ ছিল চীনের বহুপ্রচলিত কনফুসিয়াসের মতবাদের বিরোধিতা। চীনে গণতন্ত্র ও সকল নাগরিকের সমান অধিকার স্থাপন। ডাঃ সান একটি সংবিধান দ্বারা এই গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। জন-সমাজতন্ত্রবাদ

সান-মিন-চু-আই বা ডাঃ সানের তিন নীতি

মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র ছিল না। মার্কসবাদে শ্রেণীসংগ্রাম-তত্ত্ব এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ করার কথা বলা হয়। ডাঃ সান যে সমাজতন্ত্র প্রচার করেন, তাতে শ্রেণীসংস্কারের চিন্তাধারা ছিল না। সকল প্রকার ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ করার কথাও তিনি বলেন নি। ডাঃ সান রাষ্ট্রের অধীনে কোন কোন দ্রব্য ও শিল্পের উৎপাদনব্যবস্থা আনার পরিকল্পনা করেন।

ডাঃ সান জাপানে টুং-মেং-হুই নামে এক দেশপ্রেমী গুপ্তসমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতি দক্ষিণ চীনে চীং সরকারের বিরুদ্ধে ও প্রজাতন্ত্রবাদের স্বপক্ষে প্রচার চালায় এবং তাঁর ত্রি-নীতি প্রচার করে। মিনপাও নামে এক পত্রিকার দ্বারা ডাঃ সানের মতবাদ প্রচার করা হয়। টুং-মেং হুইয়ের আদর্শ দক্ষিণ চীনের দেশভক্ত চীনা সেনাদলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১১ খ্রীঃ দক্ষিণ চীনের উ-চাং দুর্গে চীনা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে সেনাদল চীন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ক্রমে এই বিদ্রোহ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লে চীং সরকারের পতন হয়। (বিস্তৃত বিবরণ পরের পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। চীং সরকারের পতন হলে চীনে ১৯১১ খ্রীঃ প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। চীনে এই প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নায়ক ছিলেন ড়াঃ সান-ইয়াৎ সেন।

টুং-মেং-হুই গঠন : ১৯১১ খ্রীঃ প্রজাতন্ত্রী বিদ্রোহ

প্রজাতন্ত্রী চীন সরকার সকল চীনবাসীর আনুগত্য পায় নি। উচ্চাকাঙ্ক্ষী সেনাপতি ও নেতারা নিজ নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে এই সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চালায়। এই-সকল সেনাপতিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন য়ুয়ান-শি-কাই। প্রজাতন্ত্রী চীন উচ্চাকাঙ্ক্ষী সেনাপতিদের মধ্যে গৃহযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হলে, ডাঃ সান রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করেন। তিনি সামরিক নেতা উচ্চাভিলাষী য়ুয়ান-শি-কাইকে এই পদ ছেড়ে দেন। তাঁর মৃত্যুকালে (১৯২৫ খ্রীঃ) তাঁর সান-মিন-চু-আই বা ত্রি-নীতির লক্ষ্য অপূর্ণ থেকে যায়। সান চীনা জনসাধারণের মধ্যে যে জাতীয়তাবাদ, গণতান্ত্রিক জাগরণ ঘটান, তা আধুনিক চীনের জন্ম দেয়। ডাঃ সান-ইয়াৎ সেনকে আধুনিক চীনের জনক বলা হয়। তাঁর সংস্কার-নীতির ফলে গোটা চীনাজাতি মধ্যযুগের তন্দ্রা ও কুসংস্কার ত্যাগ করে জেগে উঠে। তিনিই চীনা কৃষকদের দেশপ্রেম, গণতন্ত্রবাদ, প্রজাতন্ত্রবাদ, অর্থনৈতিক সংস্কারে দীক্ষা দেন। অহিফেনসেবী হতাশাগ্রস্ত চীনা কৃষকশ্রেণী নবজীবনের লক্ষ্যে এগিয়ে চলে। অহিফেন সেবন ত্যাগ করে তারা কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : ১৯১১ খ্রীঃ-এর প্রজাতন্ত্রী বিপ্লব (The Republican Revolution of 1911) : চীং বা মাঞ্চু রাজবংশ চীনে দীর্ঘকাল রাজত্ব করার পর ১৯১১ খ্রীঃ প্রজাতন্ত্রী বিপ্লবের ফলে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়। ১৯১১ খ্রীঃ এই প্রজাতন্ত্রী বিপ্লবের বিভিন্ন কারণ ছিল। চীং রাজবংশ চীনে কোন জনকল্যাণমূলক সংস্কার প্রবর্তনের চেষ্টা চালায় নি। চিরাচরিত সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও আমলাতান্ত্রিক শাসন জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই সামন্ততন্ত্র বা জমিদারশ্রেণী কৃষকদের নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করত। চীং সরকার তার কোন প্রতিকার করে নি। তাই-পিং ও বক্সার-বিদ্রোহের দ্বারা এই রাজবংশকে উচ্ছেদ করার জন্যে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান চীং সরকার নির্মম হাতে দমিয়ে দেয়। দ্বিতীয়তঃ, চীং সরকার কোন আধুনিক সংস্কার দ্বারা শাসন-ব্যবস্থাকে গণমুখী করার চেষ্টা করেন নি। কোন কোন চীনা দেশপ্রেমিক যথা কাং-ইউ-ওয়ে ও লিয়াং-চি-চাও প্রভৃতি আধুনিক সংস্কার প্রবর্তন দ্বারা চীং শাসনব্যবস্থা ও চীনের সমাজকে যুগোপযোগী করার চেষ্টা করে বিফল হন। রক্ষণশীল মাঞ্চু-সাম্রাজ্ঞী জু-সি ও তাঁর পরামর্শদাতারা সকল প্রকার সংস্কারের দাবি অগ্রাহ্য করে স্থিতাবস্থা

চীং সরকারের সংস্কার বিরোধিতা: জু-সি-র রক্ষণশীলতা

বহাল রাখেন। সংস্কারের দাবি অগ্রাহ্য হওয়ার ফলে বিপ্লব অনিবার্য হয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে চীং সরকার এমন কতকগুলি জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী নীতি নেয় যে, যার ফলে বিপ্লব ত্বরান্বিত হয়। (১) চীং সরকার বৈদেশিক ঋণ নিয়ে বৈদেশিক কোম্পানিগুলিকে সে-চুয়ান প্রদেশের রেলপথ তৈরির অধিকার দেয়। এই রেলপথ তৈরি হলে সে-চুয়ান প্রদেশ হ্যাংকাও বন্দরের সঙ্গে সংযুক্ত হত এবং হ্যাংকাও বন্দরে জাহাজ ভিড়িয়ে ইওরোপীয় বণিকরা সে-চুয়ানের সম্পদ লুট করে রেলযোগে হ্যাংকাও বন্দরে বয়ে নিত। এজন্যে এই রেলপথের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ দেখা দেয়। (২) এই রেলপথ তৈরির জন্যে চীনের সর্বাপেক্ষা উর্বরা জমিগুলি বিদেশী কোম্পানির হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। (৩) রেলপথ তৈরির ব্যয়নির্বাহের জন্যে সে-চুয়ানের অধিবাসীদের $\frac{১}{৩}$ ভাগ বাড়তি কর দিতে বাধ্য করা হয়। ফলে সে-চুয়ান প্রদেশে বিদ্রোহ এবং বিক্ষোভ দেখা দেয়। চীং সরকার শক্ত হাতে তা দমন করলেও গোপনে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ ছড়াতে থাকে।

সে-চুয়ান প্রদেশে বৈদেশিক ঋণে রেলপথ নির্মাণের প্রতিবাদ

চীং সরকারের সহযোগিতায় বিদেশী মূলধনীরা চীনে বিরাট পুঁজি খাটাতে থাকে। ১৯০০ খ্রীঃ প্রায় ১৬৫০ মিলিয়ন ডলার বিদেশী পুঁজি চীনে লগ্নী করা হয়। এই মূলধনের মুনাফা চীন থেকে ইওরোপীয়রা নিয়ে যেতে থাকে। এই মূলধন দ্বারা চীনের বিভিন্ন শিল্পগুলি বিদেশী মালিকানায় গড়ে তোলা হয়। চীনের বস্ত্রশিল্প, খনি, বন্দর, ডক সকল কিছুই বিদেশীর হাতে চলে যেতে থাকে। চীনের রেলপথগুলিও ইওরোপীয়দের হাতে চলে যায়। চীনের শিল্পগুলি বিদেশী মালিকদের হাতে থাকায় চীনা বুর্জোয়া বা মূলধনীরা শিল্পগঠনের সুযোগ পায় নি। এজন্য তারা হতাশায় ভুগতে থাকে। এদিকে চীং সরকার তার আর্থিক ঘাটতি মেটাবার জন্য নিম্নমধ্যবিত্ত বা পাতিবুর্জোয়া, কৃষক ও সেন্সি বা সরকারী কর্মচারীদের উপর প্রচুর কর চাপায়। এজন্য এইসকল শ্রেণী চীং সরকারের পতন কামনা করে।

চীনে ইওরোপীয় শক্তিগুলির অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ

এই পরিস্থিতিতে ডাঃ সান-ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে টুং-মেং-হুই চীং সরকারের পতনের জন্যে প্রয়াস চালায়। জাপানী বুদ্ধিজীবীরা চীনের বিপ্লবের জন্যে যথেষ্ট সহায়তা করে। ডাঃ সান ও অন্যান্য বিপ্লবীরা জাপানী বুদ্ধিজীবীদের সহায়তায় বিপ্লবের প্রস্তুতি চালান। "চীনের প্রজাতন্ত্রবাদের শিক্ষা জাপানের হাতেই হয়।" জাপানী চিন্তাবিদ ও রাজনীতিবিদ কাউন্ট ওকুমা তাঁর "ওকুমা নীতি" প্রচার করেন। এই নীতির দ্বারা জাপানকে প্রাচ্যদেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহনরূপে প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। জাপানের উন্নতি চীনা জাতীয়তাবাদীদের অনুপ্রাণিত করে। চীনা জাতীয়তাবাদীরা বুঝতে পারেন যে চীনের আধুনিকীকরণ না হলে চীন কখনও জাপানের মত উন্নতি করতে পারবে না। এই আধুনিকীকরণের পথে প্রধান বাধা চীং রাজবংশকে হঠাতে জনগণ বদ্ধপরিকর হয়।

দর সহায়তা : টুং-মেং-হুইয়ের ভূমিকা

চীং সরকারের মেরুদণ্ড ছিল তার অনুগত সেনাদল। কিন্তু এই সেনাদলে ভাঙ্গন ধরে। সান-ইয়াৎ সেন ও টুং-মেং-হুই-এর জাতীয়তাবাদী ভাবধারা চীং সেনাদলে অনুপ্রবেশ করে। উ-চাং-এর সেনাদল চীং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে এই বিদ্রোহ অন্যান্য প্রদেশে ছড়ায়। অবশেষে চীং সরকারের পতন হয়। ১৯১১ খ্রীঃ প্রজাতন্ত্রী বিপ্লবকে চীনারা জিন্‌হাই (Xinhai) বিপ্লব বলেন।

চীং সেনাদের সহযোগিতা

অষ্টম পরিচ্ছেদ : ৪ঠা মে-র আন্দোলন (May 4th Movement) : বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যখন তাদের নখ-দন্ত বিস্তার করে চীনের হৃদপিণ্ড অর্থাৎ তার স্বাধীনতাকে ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম করে, সেই সময় চীনের যুবশক্তি ৪ঠা মে-র ছাত্র-আন্দোলনের মাধ্যমে তাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যবাদী জাপান চীনের উপর একুশ দফা দাবি চালিয়ে চীনের বৃহৎ অঞ্চল কার্যতঃ নিজ অধিকারে আনে। ইওরোপীয় ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চীনের যুবশক্তি জেগে উঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ভার্সাই-কংগ্রেসে চীন ন্যায়বিচার পায় নি। আধুনিক চীনের ইতিহাসে ৪ঠা মের আন্দোলন বলতে ১৯১৯ খ্রীঃ ৪ঠা মে ভার্সাই-চুক্তি-বিরোধী আন্দোলন বুঝায়। কারণ এই চুক্তির দ্বারা চীনে জাপান প্রভৃতি বিদেশী শক্তিগুলির অধিকার কায়েম করার চেষ্টা করা হয়।

৪ঠা মে-র আন্দোলনের একটি পটভূমিকা ছিল। (১) চীনের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের চলতি নাম ছিল 'পেইটা'। শাই-য়ুয়ান্-কোই ছিলেন পেইটার অধ্যাপক। পরে তিনি ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের সহকর্মী ও প্রজাতন্ত্রী চীনের শিক্ষামন্ত্রী হন। তাঁর প্রচেষ্টায় পেইটা মধ্যযুগীয় অচলায়তন ও তন্দ্রা-মুক্ত হয়ে একটি জীবনমুখী বিদ্যায়তনে পরিণত হয়। (২) শিক্ষামন্ত্রী-পদে থাকার সময় শাই-য়ুয়ান কোই তাঁর প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্যে চেন-টু-শিউ নামে এক অধ্যাপককে নিয়োগ করেন। চেন ছাত্রদের কনফুসিয়াসের মতবাদ পরিত্যাগ করে আধুনিক দার্শনিকদের মত, যুক্তিবাদ, গণতন্ত্র, বিজ্ঞান, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতির আদর্শে ছাত্রদের দীক্ষা দেন। তাঁর প্রভাবে পেইটা পঠন-পাঠন, মননশীলতা, গভীর রাজনৈতিক চিন্তার উদ্ভবক্ষেত্রে পরিণত হয়।

পেইটার ভূমিকা : চেন-টু-শিউ

চেন এবং তাঁর সহকর্মী হু-শির চেষ্টায় পেইটাকে কেন্দ্র করে চীনের নব-সাহিত্যরচনার আন্দোলন আরম্ভ হয়। এর ফলে ঘটে চীনের রেনেসাঁস। এই রেনেসাঁসের আলোকে চীনা যুবকরা তাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে চিনে নিতে সক্ষম হয়। পেইটাকে কেন্দ্র করে চীনের যুবশক্তির জাগরণ ঘটে।

চীনা সাহিত্যের রেনেসাঁস

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান চীনে অবস্থিত জার্মানীর উপনিবেশগুলি যা শাং-টুং অঞ্চলে ও ওয়াই-হা ওয়েতে অবস্থিত ছিল-তা বলপূর্বক দখল করে নেয়। চীনের উপর জাপান 'একুশ দফা দাবি' সম্বলিত একটি গোপন চুক্তি চাপিয়ে দেয়। এজন্যে চীনা জাতীয়তাবাদীরা প্রতিবাদ করলেও জাপান তাতে কর্ণপাত করে নি। যুদ্ধের পর ভার্সাইয়ের শান্তিবৈঠকে জাপানের এই অসঙ্গত অধিকারগুলি নাকচ করার জন্যে চীনের ছাত্রসমাজ, চীনের জনমত প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু দেখা যায় যে, শা-টুং প্রদেশে জাপানের বিশেষ অধিকারের স্বীকৃতি জানিয়ে চীনা প্রজাতন্ত্রী সরকার জাপানের সঙ্গে গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। ইওরোপীয় শক্তিগুলিও জাপানের দাবি সমর্থন করে।

একুশ দফা দাবী

জাপানের কাছে চীনের প্রজাতন্ত্রী সরকারের এই ঘৃণ্য আত্ম-বিক্রয়ের প্রতিবাদে ৪ঠা মে, ১৯১৯ খ্রীঃ পিকিং-এর তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারে জাতীয়তাবাদী ছাত্ররা বিক্ষোভ দেখায় এবং একটি ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে। এতে বলা হয় যে—(১) চীনের ভূমিতে এভাবে বৈদেশিক শক্তিকে ছেড়ে দেওয়া বরদাস্ত করা হবে না। (২) চীনা জনসাধারণ এর বিরুদ্ধে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিবাদ করবে, কিন্তু নতিস্বীকার করবে না (৩) চীনকে ধ্বংস হতে দেওয়া হবে না। এই দাবির সমর্থনে চীনে ব্যাপক ধর্মঘট চলতে থাকে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি বিক্ষোভের ফলে বন্ধ হয়ে যায়। সাংহাই নগরের কলকারখানা, দোকানপত্রও এই ধর্মঘটের সামিল হয়। শ্রমিকশ্রেণী এই ধর্মঘটে স্বেচ্ছায় যোগ দেয়। শেষ পর্যন্ত চীনের প্রজাতন্ত্রী সরকার ভার্সাই-সন্ধি-স্বাক্ষরে বিরত থাকেন। চীনা

জাপানের দাবীর বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন

জাতীয়তাবাদের জয় হয়। ৪ঠা মে আন্দোলনে চীনের ভবিষ্যৎ নায়ক মাও-সে-তুং ছাত্র হিসাবে যোগ দেন।

নবম পরিচ্ছেদ ঃ চীনে কমিউনিস্ট আন্দোলন (The Communist Movement in China) ঃ ৪ঠা মে-র আন্দোলন আধুনিক চীনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সৃষ্টি করে। পেইটা বা পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রিয় অধ্যাপক চেন-টু-শিউ এই আন্দোলনের সময় গ্রেপ্তার হন। তিনি সাংহাই-এ থাকার সময় মার্কসবাদের ও সোভিয়েত বিপ্লবের আদর্শের প্রতি আসক্ত হন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পুঁজিবাদের লোপের দ্বারা শোষণ থেকে সমাজের বেশীসংখ্যক মানুষের মুক্তির আদর্শ চীনে প্রবর্তনের জন্যে তিনি ব্যস্ত হন। তাঁর প্রভাবে তাঁর অনুরাগী ছাত্রদল কমিউনিজম বা সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। শুধুমাত্র পুঁথিগত মার্কসবাদ অপেক্ষা মার্কসবাদের বাস্তব প্রয়োগ অর্থাৎ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ চীনা বুদ্ধিজীবীদের বেশী আকৃষ্ট করে।

চেন-টু-শিউ

ইতিমধ্যে নিউ-ইয়ুথ বা 'নব যুবশক্তি' পত্রিকায় অধ্যাপক লি-টা-চাও চীনে কৃষক-শক্তির সংগঠন দ্বারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর উদ্যোগে পিকিং ও সাংহাই-এ মার্কসীয় পাঠচক্র স্থাপিত হয়। এই পাঠচক্র স্থাপনের জন্যে হুনানের ছাত্র মাও-সে-তুং, লি-টা-চাওকে পেইন গ্রন্থাগার স্থাপনে সাহায্য করেন। অবশেষে দুই মার্কসবাদী অধ্যাপক চেন-টু-শিউ এবং লি-টা-চাও এর উদ্যোগে১৯২১ খ্রীঃ জুলাই মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপিত হয়। এই পার্টির শাখা পিকিং, চাংসা, উহান, ক্যান্টন প্রভৃতি স্থানে প্রসারিত হয়।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা, ১৯২১ খ্রীঃ

১৯২০ খ্রীঃ রুশ কমিউনিস্ট সংগঠক গ্রেগরী ভইটনস্কী সাংহাই-এ আসেন। তিনি চীনা কমিউনিস্ট পার্টিকে পত্র-পত্রিকা প্রচার ও সংগঠন পরিচালনার কাজে শিক্ষা দেন এবং চীনা কমিউনিস্ট দলের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। চীনা কমিউনিস্ট সদস্যরা কঠোর শৃঙ্খলা ও আত্মত্যাগের দ্বারা দলকে শক্তিশালী করেন। মার্ক্সীয় সাহিত্যরচনার কাজে মার্ক্সীয় বুদ্ধিজীবীরা আত্মনিয়োগ করেন। এভাবে চীনে কমিউনিস্ট আন্দোলন শক্তিশালী হয়। চীনে মার্শাল চিয়াং-কাই-শেখের উত্থান ও দক্ষিণ চীনে মার্শাল চিয়াং তাঁর সেনাদল দ্বারা কমিউনিস্টদের উৎখাত করার চেষ্টা করলে চীনা কমিউনিস্ট দল বিরাট সঙ্কটে পড়ে।

সংগঠকের হস্তক্ষেপ

১৯২৭ খ্রীঃ থেকে চিয়াং-কাই-শেখের কুয়ো-মিন-তাং-এর সঙ্গে কমিউনিস্টগোষ্ঠীর বিচ্ছেদ ঘটে। এই সময় মাও-সে-তুং নামে এক নবীন কমিউনিস্ট নেতা এই তত্ত্ব প্রচার করেন যে, যদি রাশিয়ার ক্ষেত্রে শ্রমিকরা সর্বহারা হয়, তবে চীনের ক্ষেত্রে কৃষকরাই হল সর্বহারা বা প্রলিটারিয়েট। চীনে এদের দ্বারাই বিপ্লব আনতে হবে। কারণ চীনে শিল্প-বিপ্লব ঘটতে অনেক দেরী আছে। শিল্প-শ্রমিক গড়ে উঠতে দেরী হবে। পুরাতন কমিউনিস্ট নেতারা যথা লি-লি-শান প্রভৃতি পার্টির নেতৃত্ব হারান। মাও-সে-তুং ও মার্শাল চু-তে কৃষকদের সাহায্যে 'চীনা লাল ফৌজ' গড়ে তোলেন। তাঁরা যে অঞ্চলে কর্মক্ষেত্র স্থাপন করেন, সেই অঞ্চলে নিজেরাই ভূমিসংস্কার দ্বারা কৃষকদের মধ্যে ভূমি বন্টন করেন। ইতিমধ্যে চিয়াং কাই-শেখের কুয়ো-মিন-তাং সেনাদল ১৯৩৪ খ্রীঃ চীনা কমিউনিস্ট বাহিনীকে ঘিরে ফেলে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। চীনা কমিউনিস্টদের প্রায় ১ লক্ষ লোক পরিবারপরিজনসহ বেষ্টনী ভেঙে লং মার্চ বা দীর্ঘ যাত্রা শুরু করেন। পথে কুয়ো-মিন-তাং সেনারা তাঁদের ধ্বংস করার চেষ্টা করে। বহু কমিউনিস্ট যুদ্ধে প্রাণ

মাও-সে-তুং-এর উত্থান ঃ কুয়ো-মিন-তাং- এর সঙ্গে বিরোধ ঃ লং মার্চ

দিয়ে, বহু কষ্ট সহ্য করে ১৯৩৫ খ্রীঃ সেন্সি প্রদেশে আশ্রয় নেয়। সেন্সি ছিল উত্তর-পশ্চিম চীনের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে। এই লং মার্চ চীনে কমিউনিস্ট বিপ্লবের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। কমিউনিস্ট দল দক্ষিণ চীন থেকে উত্তর-পশ্চিম চীনে লং মার্চ দ্বারা সরে যান। তার কারণ ছিল (১) জাপানী আক্রমণকারীরা দক্ষিণ চীনকে ঘিরে ফেলার উপক্রম করে (২) কুয়ো-মিন তাং বাহিনীর আক্রমণ থেকে এই আত্মরক্ষায় উত্তর-পশ্চিম চীন থেকে চীনা কমিউনিস্টরা মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে শেষ পর্যন্ত গোটা চীনে আধিপত্য বিস্তার করে। (বিস্তৃত বিবরণ দশম পরিচ্ছেদে দেখ)।

চিয়াং কাই-শেখ ও কুয়ো-মিন-তাং দল ঃ দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ ঃ ডাঃ সান-ইয়াং সেনের মৃত্যুর পর চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে War lord বা সামরিক সেনাপতিরা নিজ নিজ আধিপত্য স্থাপন করেন। শেষ পর্যন্ত সামরিক রাজনীতিবিদ ও ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের সহকর্মী মার্শাল চিয়াং-কাই-শেখ এই সকল সমরনেতাদের পরাস্ত করেন। তিনি চীনে কুয়ো-মিন-তাং প্রজাতন্ত্রের শাসন স্থাপন করেন। তিনি ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের আদর্শের প্রতি গোড়ার দিকে শ্রদ্ধা জানান। কুয়ো-মিন-তাং সরকার জাতীয়তাবাদী হলেও এই সরকার না ছিল পুরোপুরি গণতন্ত্রবাদী, না ছিল পুরা স্বৈরতন্ত্রবাদী, না ছিল সমাজতন্ত্রবাদী। চিয়াং-কাই-শেখ দেশভক্ত লোক হলেও তাঁর নীতি ছিল ভ্রান্ত। সামরিক নেতাদের বিরুদ্ধে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার এবং জাপানের আক্রমণের বিরুদ্ধে বাধাদানের জন্যে তখন তিনিই ছিলেন যোগ্য ব্যক্তি। তাঁর সেনাদল, তাঁর অনুগত কুয়ো-মিন-তাং দল এবং আমলাতন্ত্র এই তিন শক্তির সাহায্যে চিয়াং তাঁর স্বৈরতন্ত্র গঠন করেন। তিনি জনগণের স্বার্থকে উপেক্ষা করেন, চীনে ভূমিসংস্কার প্রভৃতি মৌলিক সংস্কারের কাজে অবহেলা দেখান। মার্শাল চিয়াং-এর প্রধান কাজ ছিল ভূমিসংস্কার, দারিদ্র্যদূরীকরণ এবং জাপানী অস্ত্রশস্ত্র থেকে চীনকে রক্ষা করা। কিন্তু তিনি রক্ষণশীল সেনাপতি, সামন্তশ্রেণী ও আমলাদের চাপে তাঁর কর্তব্যের কথা ভুলে যান। দেশের শত্রু জাপানের বিরুদ্ধে একমন, একপ্রাণ হয়ে যুদ্ধ না করে তাঁর ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে চীনা কমিউনিস্টদের তিনি ধ্বংস করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

চিয়াং-কাই-শেখ ও কুয়ো-মিন-তাং-এর উত্থান

ইতিমধ্যে ১৯৩১ খ্রীঃ জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে। মাঞ্চুরিয়ার যুদ্ধে চীনা সেনা জাপানকে রুখতে পারে নি। চীনাবাহিনী পিছু হঠে। জাপান মাঞ্চুরিয়ায় মাঞ্চুকুয়ো নামে এক তাঁবেদার সরকার গঠন করে। মাঞ্চুরিয়া দখলের পর জাপান চীনের উপর দৃষ্টি দেয়। ১৯৩৬ খ্রীঃ মুকডেন অঞ্চলের ঘটনাকে উপলক্ষ করে দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধের সময় মার্কিন দেশ কুয়ো-মিন-তাং সরকারকে প্রচুর সাহায্য দেয়। অপর একটি মত হল যে, মার্কিন দেশ প্রচুর মৌখিক সহানুভূতি দেখালেও, প্রকৃত সাহায্য তেমন কিছু দেয় নি। যাই হোক মার্শাল চিয়াং তাঁর সকল শক্তি জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে নিয়োজিত না করে চীনা কমিউনিস্টদের দমনে অর্ধেক শক্তি নিয়োজিত করেন। এই গৃহযুদ্ধের ফলে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দুর্বল হয়ে পড়ে। চীনের কম্যুউনিস্ট নেতারা চান যে কুয়ো-মিন-তাং ও কমিউনিস্টরা একযোগে আন্তরিকতার সঙ্গে জাপানকে প্রতিরোধ করবেন। মার্শাল চিয়াংকে এই প্রস্তাবে রাজী করাবার জন্যে তাঁকে ১৯৩৬ খ্রীঃ সিয়ানে অপহরণ করা হয়। অতঃপর শেষ পর্যন্ত জাপানের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। কিন্তু তাতে তেমন কোন ফল হয় নি। জাপান উত্তর-চীন দখল করে দক্ষিণে ঢুকে পড়ে। চীনা কমিউনিস্টগণ বিপদ বুঝে লং-মার্চ দ্বারা উত্তর-পশ্চিম চীনে চলে যান। দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে মিলিত হয়। ১৯৪৯ খ্রীঃ

কুয়ো-মিন-তাং সরকার চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে চীনা কমিউনিস্টদের দ্বারা বিতাড়িত হলে চীনে কমিউনিস্ট শাসন বলবৎ হয়।

দশম পরিচ্ছেদ ঃ মাও-সে-তুং ও চীনে সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র স্থাপন (Mao-Tse-Tung and the birth of the Republic of China) ঃ চীনের ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা বিশেষভাবে দেখা যায়। সামন্ততান্ত্রিক চীনকে ১৯১৯ খ্রীঃ আধুনিক চীনে পরিণত করেন প্রজাতন্ত্রী বিপ্লবের নায়ক ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী চীনকে সমাজতন্ত্রী চীনে পরিণত করার জন্যে প্রধান ভূমিকা নেন সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের নায়ক মাও-সে-তুং। মাও-সে-তুং-এর জন্ম হয় ১৮৯৩ খ্রীঃ চীনের হুনান প্রদেশের এক জোতদারের গৃহে। বাল্যকাল থেকে তিনি ছিলেন কবি, ভাবুক ও দার্শনিক প্রকৃতির মানুষ। চীনের অবনতি, চীনা জনগণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্যে তিনি চিন্তা করেন। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের পেইটা পাঠচক্রে অধ্যাপক লি-টা-চাওয়ের কাছে তাঁর প্রথম মার্কসবাদে দীক্ষা হয়। ১৯১৯ খ্রীঃ তিনি চাংসায় ফিরে আসেন ও কমিউনিস্ট সংগঠন গঠন করেন। ১৯১৯ খ্রীঃ ৪ঠা মে আন্দোলনে তিনি উল্লেখ্য ভূমিকা নেন।

মাও-সে-তুং-এর বাল্য ও কৈশোর জীবন

১৯৩০ খ্রীঃ লি-লি-সান এবং তাঁর সহকারী চু-এন-লাই চীনে রাশিয়ার ধরনে এক শ্রমিক-অভ্যুত্থান ঘটাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। এই সময় মাও-সে-তুং দলের পুরোভাগে আসেন। তিনি বলেন যে, চীনে শিল্প-বিপ্লব ঘটতে দেরী আছে। সুতরাং শিল্প-শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক ও শ্রেণীচেতনার জাগরণ ঘটতে বহুদিন লাগবে। চীন হল কৃষিপ্রধান দেশ। চীনে কৃষকরাই হল চীনের প্রলিটারিয়েট বা সর্বহারা। জমির মালিক ও ধনী মহাজনশ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকদের শ্রেণীবিপ্লবের দ্বারা চীনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। তিনি গ্রামাঞ্চলে গ্রামীণ সোভিয়েত বা কমিউন স্থাপনের উপর জোর দেন। চু-এন-লাই ও চু-তে নামে দুই কমিউনিস্ট নেতা মাও-এর মতবাদ মেনে নেন। চু-তে কৃষকদের সহায়তায় চীনা লাল ফৌজ তৈরি করেন। কিয়াংসি অঞ্চলে তাঁরা প্রথম সোভিয়েত মুক্তাঞ্চল গড়েন এবং জমি দখল করে কৃষকদের মধ্যে বন্টন করেন। চীনের কৃষকরা ছিল শোষিত। মাও-সে-তুং-এর বাণী তাদের মুক্তির আশ্বাস দেয়। কমিউনিস্ট সংগঠন দ্বারা গ্রামাঞ্চলে জমিদার ও মহাজনশ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গঠন করা হয়। শহরগুলিতে শ্রমিকরাও মাও-সে-তুং এর আদর্শে প্রভাবিত হয়। কৃষকদের সাহায্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব গঠন করার আদর্শ ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক পথ থেকে ভিন্ন। কারণ রাশিয়ার বিপ্লবে শিল্প-শ্রমিকরাই মুখ্য ভূমিকা নেয়। মাও-এর নব-মতবাদ গ্রহণের ফলে চীনের কমিউনিস্ট আন্দোলনের উপর সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভাব খর্ব হয়। চীনা কমিউনিস্টদের ক্ষমতাবিস্তারের ফলে কুয়ো-মিন-তাং সরকার আতঙ্কিত হন। চিয়াং-কাই-শেখ কমিউনিস্টদের উৎখাত করার জন্যে পাঁচটি অভিযান পরিচালনা করেন। তাঁর আক্রমণে দক্ষিণ ও মধ্য চীনে কমিউনিস্টদের অবস্থান বিপন্ন হয়। তাছাড়া আসন্ন জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দেয়। সুতরাং দক্ষিণ চীন হতে প্রায় ৯ লক্ষ কমিউনিস্ট নরনারী অসহনীয় কষ্ট স্বীকার করে। বিখ্যাত লং মার্চ বা দীর্ঘ যাত্রার শেষে চীনের উত্তর-পশ্চিমের সেন্সি প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলের দিকে যাত্রা করেন। এই সময় একমাত্র মাও ও তাঁর সহকারীরা ছাড়া আর কেহ এই বিপন্ন নরনারীদের পাশে ছিল না। পথে কুয়ো-মিন-তাং বাহিনীর আক্রমণে বহু কমিউনিস্ট কর্মী প্রাণ দেন। মাও-এর সংগঠন-শক্তি এই সময় তাঁকে এক বিরল ক্ষমতার অধিকারী রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। পশ্চিম চীনে ইয়েনানে

কৃষক কেন্দ্রিক কমিউনিস্ট আন্দোলন গঠন

লং মার্চ ও মাওয়ের নেতৃত্ব

রাজধানী স্থাপন করে মাও এই অঞ্চলে তাঁর ভূমিসংস্কার ও সমাজতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করেন।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ (১৯৩৬ খ্রীঃ) আরম্ভ হয়। কমিউনিস্টরা কুয়ো-মিন-তাং-এর সঙ্গে জাপানের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠনের দাবি জানায়। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ উপলক্ষে কমিউনিস্টরা চীনের বিস্তৃত অঞ্চলে ক্ষমতা বিস্তার করতে সক্ষম হয়। যে অঞ্চলগুলি কমিউনিস্টরা জাপানের হাত থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়, সেখানে মাও-এর নির্দেশে ভূমিসংস্কার দ্বারা কৃষকদের হাতে জমি পৌঁছে দেওয়া হয়। মাও চীনা লাল ফৌজকে কঠোর নির্দেশ দেন যে, কৃষকদের প্রতি মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক। লাল ফৌজ যেন শৃঙ্খলা মেনে চলে। এই মানবিক ব্যবহার কৃষকদের মন জয় করে নেয়। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কমিউনিস্ট দলের নিয়মিত এবং গেরিলাবাহিনীর সংখ্যা মাও-এর মতে ছিল ৯,১০,০০০। তারা চীনের বিরাট এলাকায় মুক্তাঞ্চল স্থাপন করে এবং মাও প্রবর্তিত ভূমি ও অন্যান্য সংস্কার প্রবর্তন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে কুয়ো-মিন-তাং সরকারের পতনের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠে। এই সময় মাও-সে-তুং দলে যেং-ফেং অর্থাৎ অ-কমিউনিস্ট ভাবধারা দূর করার জন্যে কমিউনিস্ট সংস্কার-আন্দোলন চালু করেন। এর ফলে দল আরও নিষ্ঠাবান ও সংহত হয়। চীনা কমিউনিস্ট দল থেকে সোভিয়েত প্রভাব একেবারেই দূর হয়। চীনা সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চীনে বিপ্লব চলতে থাকে। মাও চীনা কমিউনিস্টদের সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে চীনা জাতীয়তাবাদে অনুপ্রাণিত করেন। কমিউনিস্ট বাহিনীর নাম দেওয়া হয় "গণমুক্তি সেনা" বা Peoples' Liberation Army। মাও-এর এই আদর্শের নাম হয় "মাওবাদ"।

চীনে কমিউনিস্ট আন্দোলনের জয় : মাওয়ের আদর্শ

মাও সতর্ক করে দেন যে, চীনের গ্রামগুলি হল চীনেরই গ্রাম। গ্রামে মার্ক্সীয়-লেনিনীয় তত্ত্বের অবিমিশ্র প্রয়োগ চলবে না। বাস্তব অবস্থা বুঝে কাজ করতে হবে। ১৯৪৫ খ্রীঃ দলের সংবিধানে মাওবাদকেই গ্রহণ করা হয়। মাওবাদ দ্বারা কমিউনিজমের চীনাকরণ করা হয়। মার্কসবাদের মূল নীতি গ্রহণ করে চীনের কৃষকসমাজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তা প্রয়োগ করা হয়।

মাওবাদের বাস্তবতা ও তার প্রয়োগ

কুয়ো-মিন-তাং সরকার ইয়াং-সি নদীর তীরে কমিউনিস্ট লাল ফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায় এবং যুদ্ধগুলিতে প্রচণ্ড হার স্বীকার করে। কুয়ো-মিন-তাং সরকার মার্কিন সামরিক সাহায্য পেলেও চীনা জনগণের সমর্থন পায় নি। কুয়ো-মিন-তাং সরকারকে চীনা জনগণ মার্কিন সহায়তা গ্রহণ করায় সন্দেহের চোখে দেখত। এই সরকারে দুর্নীতিপরায়ণ আমলা এবং স্বার্থান্বেষী জমিদারদের প্রভাব থাকায় জনসমর্থন হারিয়ে ফেলে। গ্রামাঞ্চলে কুয়ো-মিন-তাং সরকারের অস্তিত্ব লোপ পেতে থাকে। জাপানের পতনের পর কমিউনিস্ট ফৌজ উত্তর চীনে তাদের আধিপত্য স্থাপন করে, এবং ভূমিসংস্কার দ্বারা তাদের অবস্থান দৃঢ় করে। উত্তর চীনে প্রভাব স্থাপনের পর ১৯৪৯ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে কুয়ো-মিন-তাং বাহিনীর বাধা দূর করার পরে লালফৌজ ৬টি স্থানে ইয়াং-সি পার হয়ে দক্ষিণ চীনে ঢুকে পড়ে। দক্ষিণের বিভিন্ন শহরগুলি একের পর এক দখল করে। ১৯৪৯ খ্রীঃ মে মাসে সাংহাই কমিউনিস্টরা দখল করে। ক্রমে ক্রমে ক্যান্টন ও চুং-কিং-এর পতন হয়। অবশেষে ১৯৪৯ শেষ হওয়ার আগেই কমিউনিস্ট বাহিনী কুয়ো-মিন-তাং রাজধানী নানকিং অধিকার করে। চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে চিয়াং-কাই-শেখ পলায়ন করে চীনের দক্ষিণে তাইওয়ান বা ফরমোজা দ্বীপে মার্কিন সাহায্য নিয়ে তাঁর

কুয়ো-মিন-তাং সরকার টিকিয়ে রাখেন। চীনে কমিউনিস্ট বিপ্লব জয়যুক্ত হয়। চীনে গণপ্রজাতন্ত্র বা Peoples' Republic ঘোষিত হয়। এই বিপ্লবের নেতা ছিলেন মাও-সে-তুং বা মাও-জে-ডং। তাঁর প্রধান সহকারীদের মধ্যে ছিলেন চু-এন লাই, চু-তে প্রভৃতি।

[খ] একাদশ পরিচ্ছেদ : জাপান ও তার বিচ্ছিন্নতা : জাপানে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ (Japan before 1854 : Opening up of Japan) : এশিয়ার মূল ভূখণ্ডের পূর্বদিকে একটি দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। এই দ্বীপপুঞ্জের নাম হল দাই-নিপ্পন বা জাপান। জাপানীরা তাঁদের দেশকে "সূর্যোদয়ের দেশ" (দাই-নিপ্পন) বলেন। কারণ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পূর্বভাগে এই দেশ অবস্থিত। হোক্কাইডো ও হনসু হল জাপানের দ্বীপগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ দ্বীপ। চীন ও কোরিয়ার পূর্ব দিকে জাপানের দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই সমুদ্রবেষ্টিত দেশটি বিশ্বের কাছে ছিল রুদ্ধদ্বার। চীনা, কোরিয়া প্রভৃতি প্রতিবেশী ছাড়া অন্য কোন বিদেশী জাতির লোককে জাপানে ঢুকতে দেওয়া হত না। একমাত্র কিছুসংখ্যক ডাচ-বণিকদের জন্যে বছরে কয়েক মাস জাপানের একটি বন্দর খুলে দেওয়া হত। তাদের মাধ্যমেই জাপান ইওরোপের শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করত।

জাপানের ভৌগোলিক অবস্থান : জাপানের বিচ্ছিন্নতা

জাপানীদের বিশ্বাস ও চিন্তাধারা অনুসারে জাপানের সম্রাট মিকাডো ছিলেন সূর্যবংশীয়। ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় তাঁর হাতে কোন প্রকৃত ক্ষমতা ছিল না। তিনি ছিলেন কেবলমাত্র সাংবিধানিক সম্রাট। আসল শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল শোগুন বা জাপানের বংশানুক্রমিক প্রধানমন্ত্রীর হাতে। এই যুগে জাপানের প্রধানমন্ত্রীকে 'শোগুন' বলা হত। জাপানের তোকুগাওয়া বংশ এই শোগুনের পদ ১৬০০ খ্রীঃ থেকে একাদিক্রমে অধিকার করেছিল। তোকুগাওয়া শোগুন এডো (Edo) নগর থেকে তাঁর শাসনদণ্ড পরিচালনা করতেন। সম্রাট বাস করতেন কিয়তো নগরে।

জাপানে শোগুন প্রথা

জাপানের সমাজ ছিল ঘোরতর সামন্ততান্ত্রিক। কয়েকটি সামন্ত-পরিবার জাপানের ভূস্বামী ছিল। তারাই ছিল কার্যতঃ জাপানের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এই সামন্ত-পরিবারগুলিকে বলা হত 'দাইমিও' (Daimyo)। এদের হাতে ছিল প্রচুর অর্থ ও সেনা। দাইমিওদের বিভিন্ন শ্রেণী বা গোষ্ঠী ছিল(১) যারা তোকুগাওয়া শোগুনের প্রতি আনুগত ছিল, তারা বিভিন্ন সরকারী পদ পেত। তাদের নাম ছিল "ফুদাই দাইমিও"। (২) যারা তোকুগাওয়াদের জ্ঞাতি বা আত্মীয়-বংশ ছিল এবং বিরাট জমিদারি ভোগ করত, তাদের বলা হত "শিম্পান দাইমিও"। (৩) যারা ১৬০০ খ্রীঃ পর তোকুগাওয়াদের বশ্যতা স্বীকার করে,কিন্তু তাদের স্বাধীনতারক্ষার চেষ্টা করত, তাদের নাম ছিল "তোজামা দাইমিও"। এই তোজামা দাইমিওরা ছিল কার্যতঃ তোকুগাওয়া বংশের প্রতিদ্বন্দ্বী। এদের মধ্যে নেইদা, কানাজাওয়া, চোসু, সাতসুমা প্রভৃতি তোজামা দাইমিও ছিল বিখ্যাত। জাপানের এই দাইমিও শ্রেণীর নিচে ছিল সামুরাইশ্রেণী। সামুরাইশ্রেণী ছিল ক্ষুদ্র জমিদার অথবা তারও নিচে। জনসংখ্যার ৫·৬% ভাগ ছিল সামুরাই। এই শ্রেণীর মধ্যে দেশপ্রেম, নূতন ভাবধারা গ্রহণের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা তাদের ছিল। সবার নিচে ছিল অসংখ্য কৃষক। জাপান ছিল একটি অনগ্রসর, মধ্যযুগীয় দেশ।

জাপানের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ : দাইমিও ও সামুরাইশ্রেণী

চীনের দরজা পাশ্চাত্য জাতিগুলি বলপূর্বক উন্মুক্ত করার পর স্বভাবতঃই জাপানের রুদ্ধ দরজার দিকে তারা দৃষ্টি দেয়। ১৮৫৩ খ্রীঃ মার্কিন নৌ-সেনাপতি কমোডোর পেরী তাঁর

নৌবহরসহ জাপানের এডো উপসাগরে ঢুকে পড়ে এবং মার্কিন বাণিজ্য ও নৌবহরের রসদের জন্যে জাপানের বন্দর উন্মুক্ত করার দাবি-সম্বলিত মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফিলিমোরের চিঠি জাপানের সম্রাটের হাতে দেন। তিনি এক বছর পরে ফিরে আসেন এবং ১৮৫৪ খ্রীঃ কানাগাওয়া-সন্ধি স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধির দ্বারা জাপানের দুটি বন্দর আপাততঃ আমেরিকার জন্যে খুলে দিতে হয় এবং মার্কিন বণিক ও সেনাদের অতিরাষ্ট্রিক অধিকার দিতে হয়। কানাগাওয়া-চুক্তির পর আমেরিকা ও অন্যান্য ইওরোপীয় দেশগুলি জাপানের উপর বৈষম্যমূলক বাণিজ্যিক-চুক্তি যথা হ্যারিস-চুক্তি প্রভৃতি চাপিয়ে দেয়। শোগুন তা স্বীকার করতে বাধ্য হন। এই চুক্তিগুলির ফলে জাপানের বন্দর-অঞ্চলে পাশ্চাত্য শক্তির Sub-Colony বা উপ-উপনিবেশ স্থাপিত হয়।

জাপানের বিচ্ছিন্নতা : কমোডোর পেরীর আগমন ও কানাগাওয়া সন্ধি স্থাপন

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : সম্রাটের ক্ষমতায় পুনঃ-প্রতিষ্ঠা : নূতন সরকারের সংগঠন : (The Restoration: Structure of the New Government) : জাপানে তোকুগাওয়া দাইমিও বংশ শোগুনতন্ত্র স্থাপন করলেও, তোজামা দাইমিওরা তা স্বচ্ছন্দে মেনে নিতে চান নি। তোজামা দাইমিও যথা চোসু, সাতসুমা প্রভৃতি গোষ্ঠী তোকুগাওয়া শোগুনের সংবিধান-বিরোধী ক্ষমতা ধ্বংস করে জাপান-সম্রাটের ক্ষমতাকে তার নিজমর্যাদায় প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা চালাতে থাকেন। ইতিমধ্যে পেরীর হস্তক্ষেপে জাপানের দরজা সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে খুলে দিতে হয় এবং হ্যারিস-সন্ধির মত (১৮৫৮ খ্রীঃ) বৈষম্যমূলক সাম্রাজ্যবাদী সন্ধি জাপানের উপর চাপানো হয়। জাপানে বৈদেশিক অনুপ্রবেশের জন্য চোসু ও সাতসুমা গোষ্ঠী তোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রকেই দায়ী করে এবং শোগুনের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এদিকে জাপানের বন্দরগুলি ইওরোপীয়দের জন্যে খোলায় বাধা দিলে মার্কিন ও ফরাসী নৌবহর চোসু বন্দরে এবং ব্রিটিশ নৌবহর সাতসুমার কাগোশিমা বন্দরে গোলা বর্ষণ করে। এজন্যে শোগুনের বিরুদ্ধে দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

পেরী সন্ধির জন্যে শোগুন তন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

১৮৬৭ খ্রীঃ জাপানের সম্রাট কোমেইয়ের মৃত্যু হয় এবং মুৎসুহিতো মিকাডোর বা সম্রাটের পদ অধিকার করেন। এই সুযোগে শোগুন কেইকি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী চোসু ও সাতসুমার বিরুদ্ধে অভিযান পাঠান। কিন্তু ফুসিমি ও তোবার যুদ্ধে তোকুগাওয়া বাহিনী বিধ্বস্ত হয়। সাতসুমা ও চোসু সামন্তরা শোগুনতন্ত্র উচ্ছেদ ঘোষণা করে এবং সম্রাটকে তাঁর লুপ্ত ক্ষমতা পুনরায় গ্রহণে রাজী করান। ফলে সম্রাট মুৎসুহিতো ১৮৬৮ খ্রীঃ তার লুপ্ত ক্ষমতা পুনঃ-গ্রহণ করেন। জাপানের ইতিহাসে সম্রাটের লুপ্ত ক্ষমতা পুনঃ-প্রতিষ্ঠার এই ঘটনাকে Restoration বলা হয়। জাপানের সম্রাটকে "মেইজি" আখ্যা দেওয়া হয়। ১৮৬৮ খ্রীঃ ঘটনাকে এজন্যে "মেইজি শাসনের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা" (Meiji Restoration) বলা হয়।

Restoration বা সম্রাটতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

জাপানের আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও সংগঠন (Internal Reconstruction) : জাপানে সম্রাটতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও সামুরাইশ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত আমলাতন্ত্র কিছুকাল শাসন পরিচালনা করে। কিন্তু এই শাসনব্যবস্থায় বুদ্ধিজীবীরা সন্তুষ্ট হয় নাই। জাপানে পার্লামেন্টারী শাসন প্রবর্তনের দাবি প্রবল হলে অবশেষে ১৮৮৯ খ্রীঃ জাপানে সংবিধান প্রবর্তিত হয়। কাউন্

ইটো প্রভৃতি বিজ্ঞ জাপানীরা সম্রাটের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রেখে জাপানে ক্যাবিনেট প্রথা ও পার্লামেন্টারী পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। কোজুকি ও নিহুঙ্গি প্রভৃতির প্রাচীন আদর্শের প্রচার দ্বারা জাপানের সম্রাটের বিশেষ অধিকার-তত্ত্বের প্রচার করা হয়। ফলে জনমানসে সম্রাট এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হন। (১) সেনাদল ও নৌবহরের প্রধানরা সম্রাটের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত হয়। প্রধানমন্ত্রী ও ক্যাবিনেট সম্রাটের দ্বারা নিযুক্ত হয়। নির্বাচক- মণ্ডলীর উপর সম্রাটের নৈতিক প্রভাব এবং আইনসভা বা ডিয়েটের উপর পরামর্শদানের ক্ষমতা স্বীকৃত হয়। (২) সংবিধান-রচনাকারী কাউন্ট ইটো অভিজাত পরিষদ বা হাউস অফ পিয়ারসকে ডিয়েট বা আইনসভার একটি অঙ্গে পরিণত করেন। ভূতপূর্ব সামন্তশ্রেণী বা দাইমিও ও সামুরাইদের দ্বারা এই পরিষদ গঠিত হয়। (৩) মন্ত্রিসভা প্রশাসনিক বা এক্সজিকিউটিভ (Executive) ক্ষমতার দায়িত্ব পায়। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার সদস্যরা কাজ করেন। কাউন্ট ইটো স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার নেন। ইটো ছিলেন চোসু-গোষ্ঠীর লোক। সাতসুমা-গোষ্ঠীকেও গুরত্বপূর্ণ মন্ত্রী-দপ্তরের ভার দেওয়া হয়। (৪) সুমিৎসু-ইন বা প্রিভি কাউন্সিল সম্রাটের নাম নিয়ে বিশেষ অধিকার ভোগ করত। এই সভার অনুমোদন ছাড়া কোন আইন বা সংবিধানের ধারা কার্যকরী হতে পারত না। (৫) প্রতিনিধিসভা ছিল ডিয়েটের বা পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ বা সাধারণসভা। যে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক বছরে ১৫ ইয়েন বা তদূর্ধ্ব কর সরকারকে দিত,তাদের ভোটে এই সভার সদস্য নির্বাচিত হয়। জাপানে যে-কোন আইন রচনা ও পাস করার প্রকৃত অধিকার এই প্রতিনিধিসভার হাতে ছিল। (৬) সংবিধানটিকে সম্রাটের দান হিসাবে ঘোষণা করা হয়। সম্রাট দরকার হলে সংবিধানের পরিবর্তন করতে পারতেন। ১৮৮৯ খ্রীঃ সংবিধান দ্বারা জাপানে আধুনিক উদারতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু হয়। তবে এই সংবিধানে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার না-থাকায় প্রকৃত গণতন্ত্র ছিল না।

জাপানের নূতন সংবিধান ও শাসনতন্ত্র গঠন

জাপানে শোগুনতন্ত্রের পতন ও সম্রাটতন্ত্রের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার পর জাপানের নেতৃত্ব কার্যতঃ নূতন দেশভক্ত দূরদর্শী নেতাদের হাতে বর্তায়। চীনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অনুপ্রবেশের চেহারা দেখে এরা বুঝতে পারেন যে, জাপানকে দ্রুত আধুনিক কারিগরী বিদ্যা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত করতে না পারলে জাপানের স্বাধীনতা সাম্রাজ্যবাদীরা হরণ করবে। কানাগাওয়া-চুক্তি, হ্যারিস-চুক্তি-ছিল জাপানে সাম্রাজ্যবাদী কীলকের প্রান্তভাগ মাত্র। এই যুগে চোসু গোষ্ঠীর কিদো, সাতসুমা-গোষ্ঠীর ওকুবু সম্রাটের দরবারে প্রধান কর্ণধার ছিলেন। যতদিন না সংবিধান তৈরি হয়, ততদিন ইওয়াকুরা, কিদো, ওকুবু, কাউন্ট ওকুমা প্রভৃতিই ছিলেন নবীন জাপানের গঠনকর্তা। এঁদের উদ্যোগেই জাপানের আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হয়। সম্রাটের নামেই জাপানের পশ্চিমীকরণ ও পুনর্গঠন চলে, কিন্তু সকল কিছুর অন্তরালে এই দেশভক্ত নেতাদের হাত জাপানের ভবিষ্যৎ বিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করে। জাপানের ইতিহাসে ১৮৬৮-১৮৯৪ খ্রীঃ এই ২৭ বছরকাল একটি মিরাকল বা অত্যাশ্চর্যের যুগ। অন্যান্য দেশে একশত বছরে যে অগ্রগতি সম্ভব হয়নি, মেইজি জাপান ২৭ বছরে তা সম্পন্ন করে।

জাপানের নূতন দেশভক্ত নেতৃবৃন্দ

(১) জাপানের জনগণের জন্যে সম্রাট মুৎসুহিতো, একটি ঘোষণাপত্র জারী করেন। এই ঘোষণাপত্রে জাপানীগণকে প্রতিনিধিসভাযুক্ত পার্লামেন্টারী শাসন ও জাতীয় ঐক্যরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। সকল শ্রেণীকে সমান অধিকার দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। (২) ১৮৮৯ খ্রীঃ জাপানের নূতন সংবিধান এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চালু হয়। (পৃঃ ২০৯ দ্রষ্টব্য)। (৩) নূতন সরকার প্রথমে রাষ্ট্রের অর্থসংস্থানের কাজে হাত দেন। তাঁরা নিম্নতম

বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের নীতি নেন। জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে কাগজের মুদ্রা প্রবর্তন, ব্যাঙ্ক-সংস্কার, কর-সংস্কার ও ধনী ব্যবসায়ী সংস্থাগুলিকে সরকারকে মোটা টাকা ঋণ দিতে বাধ্য করা হয়। (৪) কাউন্ট ওকুমা (Okuma) অর্থমন্ত্রীর পদে বসার পর ভূসম্পত্তিভোগীদের উপর করের হার বাড়ান। তুলনামূলকভাবে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্যে করের চাপ কমানো হয়। কর-ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করে সরকারের আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়। (৫) সম্রাটের হস্তক্ষেপে জাপানে সামন্ত-সমাজব্যবস্থা ও সামন্ত-প্রথা লোপ করা হয়। জাপানের সামন্তশ্রেণী সম্রাটের আবেদন মেনে তাদের জমিদারি ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়। দাইমিও শ্রেণীকে জমিদারির পরিবর্তে মাসিক ভাতা দেওয়া হয়। (ক) দাইমিও-শ্রেণী তাদের খেতাব ও পদমর্যাদা হারায়। (খ) কৃষকদের জমিতে স্বত্ব দেওয়া হয়। (গ) এভাবে জাপানের সামন্ততান্ত্রিক সমাজকে ভেঙে আধুনিক সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ গঠন করা হয়। (ঘ) সামুরাইশ্রেণীর কিছু অংশ শিজোকু বা ভদ্রলোকশ্রেণী, বাকী সকলে সাধারণ নাগরিকে পরিণত হয়। (ঙ) সামুরাইদের ভাতা অনেক ক্ষেত্রে লোপ করা হয়, অথবা থোক টাকা দিয়ে মাসিক ভাতা রদ করা হয়। (চ) সামুরাইশ্রেণীর সেনাদলে যোগদানের একচেটিয়া মধ্যযুগীয় প্রথা লোপ করা হয়। (ছ) জাপানের সেনাদলের আধুনিকীকরণ করা হয়। (জ) স্থল-সেনাকে নৌ-সেনা হতে পৃথক করা হয়। (ঝ) ব্রিটিশ নৌবহরের আদলে জাপানের নৌ-সংগঠন করা হয়। (ঞ) জাপানে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার চলন করা হয় এবং সকল শ্রেণীর জন্যে সেনাদলের দরজা খুলে দেওয়া হয়। (ট) জাপানের সেনাদলে সামুরাইশ্রেণীর বিশেষ আধিপত্য লোপ করা হয়। (ঠ) ফরাসী ও জার্মান স্থল বাহিনীর সম্মিলিত অনুকরণে জাপানী স্থলসেনার সংগঠন করা হয়।

জাপানের আধুনিকীকরণ ও আভ্যন্তরীণ সংগঠন :

জাপানের আধুনিকীকরণের প্রধান ধাপ ছিল জাপানের নূতন শিক্ষাব্যবস্থা ও জাপানের শিল্প-গঠন। (১) জাপানের দ্রুত আধুনিকীকরণের জন্যে মেধাবী জাপানী ছাত্রদের ইংলন্ড ও আমেরিকায় শিক্ষালাভের জন্যে পাঠানো হয়। (২) এই সকল বিদেশে শিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্ররা জাতীয় নেতা, অর্থনীতিবিদ, বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদের কাজ নেন এবং এরাই ছিলেন নবীন জাপানের নির্মাতা। জাপানের নবযুগের নেতাদের মধ্যে দুজন মাত্র ইওরোপে শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি। এই দুজন হলেন ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদ কাউন্ট ওকুমা এবং সাইগো। (৩) জাপানের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞানের উন্নয়নের জন্যে বহু বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়। জার্মানীর বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় চিকিৎসা ও শারীর বিদ্যার চর্চা জাপানে প্রসারিত হয়। শিল্পের উন্নতির জন্যে ১৩০ জন বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়। (৪) ইওরোপীয় ভাষা থেকে জাপানী ভাষায় বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ের মূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদ করা হয়। (৫) ১৮৭৭ খ্রীঃ টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং শিক্ষামন্ত্রকের দপ্তর স্থাপিত হয়। (৬) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়। (৭) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পর মধ্য-বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের নিয়ম করা হয়। ফরাসীদের আদলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠন করা হয়। (৮) সরকারী বিদ্যালয়ের সঙ্গে বেসরকারী বিদ্যালয় চালু রাখা হয়। খ্রীষ্টীয় মিশনারীরা জাপানে কয়েকটি বিখ্যাত কলেজ স্থাপন করেন। (৯) জাপানে নারীদের বিশ্ববিদ্যালয় নিহন যোকী দাইগাকু স্থাপিত হয়। এছাড়া টোকিও নারী-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। (১০) জাপানের আইনবিধি জাপানী ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 'কোড নেপোলিয়ন' বিধি অনুসারে প্রধানতঃ রচিত হয়।

নবীন জাপানের শিক্ষা ব্যবস্থা

জাপানে আধুনিক শিল্প দ্রুত গড়ে তোলা হয়। জাপানীরা বৈদেশিক শক্তির আধিপত্যকে ঘৃণা করলেও বৈদেশিক শক্তির কারিগরী ও শিল্পের অগ্রগতি থেকে শিক্ষা নিতে ভুলেনি। জাপানীরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, কারিগরী প্রভৃতি আয়ত্ত করলেও তারা মূলতঃ তাদের জাপানী সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ দেখায়। প্রথমে দেশরক্ষার উপযোগী মৌলিক শিল্পগঠনের কাজে হাত দেওয়া হয়। জাহাজনির্মাণ, বয়লার ও রেলপথনির্মাণ প্রভৃতি শিল্পের পত্তন জাপানে করা হয়। ১৮৭২ খ্রীঃ জাপানের প্রথম রেলপথ টোকিও থেকে ইয়াকোহামা তৈরি হয়। এছাড়া টেলিগ্রাফ লাইনও তৈরি করা হয়। ১৮৭০-১৯০০ খ্রীঃ-এর মধ্যে জাপানে ৪০০০ মাইল রেলপথ নির্মিত হয়। ১৯০১ খ্রীঃ-এর মধ্যে জাপানে ৫০০০ আধুনিক বাষ্পীয় ইঞ্জিনযুক্ত মালবাহী জাহাজ নির্মিত হয়।[১] জাপানের অধিবাসীদের জন্যে ভোগ্যপণ্যের শিল্পকারখানা সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়। খনিজ দ্রব্য, রেশম, যন্ত্রপাতি, সিমেন্ট, সূতী কাপড় প্রভৃতি উৎপাদনের জন্যে কারখানা স্থাপিত হয়। জাপান শীঘ্রই শিল্পে স্বাবলম্বী ও স্বয়ম্ভর হয়ে উঠে। জাপানের শিল্পপতিশ্রেণী বা জাইবাৎসু-শ্রেণী শীঘ্রই জাপানের প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী উৎপাদন আরম্ভ করে। এই জাইবাৎসু বা শিল্পপতিশ্রেণী ছিলেন জাপানী শিল্পায়নের প্রাণশক্তি। এঁরা ছিলেন জাপানের কয়েকটি পরিবারের লোক। কাজেই জাপানী বেসরকারী শিল্পের মালিকানা কয়েকটি জাইবাৎসু বা শিল্পপতি পরিবারগোষ্ঠী যথা মিৎসু, বিশী, মিৎসুই প্রভৃতির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। এই শ্রেণী বাড়তি মাল বিক্রির জন্যে তারা কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া ও চীনের দিকে দৃষ্টি দেয়। জাপান শীঘ্রই তার সংগঠন দ্বারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রগুলির অন্যতম হয়।

জাপানে আধুনিক শিল্প গঠন

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ঃ জাপানের সাম্রাজ্যবাদী প্রসারণ নীতি ঃ প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধ ঃ প্রথম পর্ব (Japan's imperial expansion: First Sino-Japanese War: Initial Phase) ঃ জাপান তার জাগরণ ও আভ্যন্তরীণ সংগঠনের পর পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অনুকরণে সাম্রাজ্যবাদী প্রসারের নীতি গ্রহণ করে। জাপানের সাম্রাজ্যবাদী নীতিগ্রহণের কয়েকটি কারণ ছিল। (১) জাপানের শিল্প-কারখানাগুলির মালিকানা ছিল একশ্রেণীর শিল্পপতির হাতে। এঁদের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়, কিন্তু এঁদের প্রভাব ছিল বিরাট। এই শিল্পপতিদের নাম ছিল জাইবাৎসু। ফলে এই জাইবাৎসুশ্রেণী মনে করতেন যে, জাপানে শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন যে হারে বাড়ছে, তার ফলে বাড়তি শিল্পদ্রব্য বিক্রির জন্যে জাপানের বাইরের বাজার দরকার হবে। জাপানী শিল্পের জন্যে খনিজ দ্রব্য ও কাঁচামালের চাহিদা মেটাতে নূতন অঞ্চল দরকার। এজন্যে কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া ও মোঙ্গোলিয়ার দিকে জাপানী শিল্পপতিরা লুব্ধ দৃষ্টি দেয়। নবীন জাপানের সাম্রাজ্যবাদী নীতি-গ্রহণের একটি বড় কারণ ছিল জাপানের বাজারের চাহিদা। (২) জাপানের লোকসংখ্যাবৃদ্ধির জন্যে একশ্রেণীর জাপানী দেশনেতা এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের বসতিবিস্তারের কথা চিন্তা করেন। তাঁরা বলেন যে, যেহেতু জাপান হল দ্বীপভূমি, তার লোকসংখ্যার বসতির জন্য বাসস্থান চাই। কাজেই ভৌগোলিক নিয়মে জাপানের উপকূলের নিকটে কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ায় লোকবসতি বিস্তার করা জাপানের ন্যায্য অধিকার বলে তাঁরা বলেন। চীন এই সকল অঞ্চল তার অধীন বলে মনে করত। কিন্তু জাপানী নেতাদের বক্তব্য ছিল যে, এই সকল অঞ্চলের আদিবাসী যেহেতু চীনা নয়, সেহেতু এই সকল অঞ্চলে চীনের দাবি মানা হবে না। (৩) জাপানের সামরিক নেতারা মনে করতেন যে, কোরিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান জাপানের উপকূলের নিকটে হওয়ায় যদি

প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধের কারণ ঃ জাপানের সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ঃ কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়ার প্রতি জাপানের দৃষ্টি

রাশিয়া প্রভৃতি কোন বৃহৎ শক্তি কোরিয়া অধিকার করে, তবে এখান থেকে জাপানের নিরাপত্তা বিপন্ন করা সহজ হবে। এই কারণে কোরিয়ার উপর জাপানের আধিপত্য বিস্তারের দাবি জাপানের সমরনেতারা করেন। (৪) ১৬শ শতক থেকে কোরিয়ার উপর আধিপত্য নিয়ে চীন-জাপানের মধ্যে ঝগড়া চলছিল। চীনের চীং রাজবংশ সামরিক শক্তির দ্বারা যোড়শ শতক থেকে কোরিয়ার উপর অধিরাজত্ব স্থাপন করেন। জাপান চীনের এই দাবি সমর্থন করত না। উনবিংশ শতকে চীং সরকার দুর্বল হয়ে পড়লে জাপান কোরিয়ার উপর পুনরায় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। (৫) পাশ্চাত্য শক্তিগুলি চীনের উপকূল অঞ্চলের অংশবিশেষ সামরিক শক্তির দ্বারা দখল করে নিজ নিজ অঞ্চলে পরিণত করে। নবজাগ্রত জাপানও পাশ্চাত্য শক্তিগুলির অনুকরণে চীনের সাম্রাজ্যভুক্ত কোরিয়া দখলের চেষ্টা চালায়। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ছিল সাম্রাজ্যবাদী জাপানের শিক্ষাগুরু।

১৮৮৫ খ্রীঃ চীনের প্রধান মন্ত্রী লি-হাং-চাং জাপানের প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট ইটোর সঙ্গে লি-ইটো চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির দ্বারা উভয় রাষ্ট্র কোরিয়ার নিরপেক্ষতা মেনে নেয়। কোন রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের অজ্ঞাতসারে ও বিনাসম্মতিতে কোরিয়ায় সেনা না পাঠাতে অঙ্গীকার করে। এই চুক্তি দ্বারা চীন কোরিয়ার উপর তা বিশেষ অধিকারের দাবি ত্যাগ করে।

কোরিয়ার সমস্যা : টং-হক বিদ্রোহ, প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধ

ইতিমধ্যে কোরিয়ায় টং-হক নামে এক সংস্কারবাদী গোষ্ঠী কোরিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কোরিয়ার এই বিদ্রোহীরা ছিল জাপানপন্থী। তারা জাপানের মতই আধুনিক সংস্কার দ্বারা কোরিয়াকে শক্তিশালী করার দাবি জানায়। কোরিয়ার শাসকরা ছিলেন রক্ষণশীল এবং চীনের অনুগত। টং-হকদের নেতা কিম-ওক-কুনকে হত্যা করা হলে টং-হক বিদ্রোহ ঘটে। এই বিদ্রোহ দমনের জন্যে চীনা ফৌজ কোরিয়ায় পাঠানো হয়। জাপান দাবি জানায় যে, চীন সেনা পাঠিয়ে লি-ইটো চুক্তি ভেঙেছে। এই অজুহাতে জাপানী সেনা কোরিয়ায় ঢুকে পড়ে। কোরিয়ার উপর আধিপত্য-স্থাপনকে কেন্দ্র করে প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধ, ১৮৯৪-৯৫ খ্রীঃ আরম্ভ হয়।

প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধে জাপানের আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সেনাদল সহজেই চীনকে পরাস্ত করে। ১৮৯৫ খ্রীঃ সিমনোসেকির সন্ধির দ্বারা এই যুদ্ধ শেষ হয়। এই সন্ধির দ্বারা জাপান

সিমনোসেকির সন্ধি, ১৮৯৫ খ্রীঃ

(১) ফরমোজা বা তাইওয়ান দ্বীপ; (২) পেস্‌কাডোরেজ দ্বীপপুঞ্জ; (৩) দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার লিয়াও-টুং উপদ্বীপ পায়। (৪) চীন কোরিয়ার স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা মেনে নিতে বাধ্য হয়। (৫) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ চীং সরকার ২০০ মিলিয়ন চীনা টাকা জাপানকে দিতে রাজী হয়। (৬) জাপানের বাণিজ্যের জন্যে চীনের আরও কয়েকটি বন্দর জাপানকে খুলে দিতে হয়।

সিমনোসেকির সন্ধি জাপান পুরোপুরি কার্যকরী করতে পারে নি। কারণ রাশিয়া নিজে লিয়াও-টুং উপদ্বীপ অধিকারের জন্য আগ্রহী ছিল। জার-শাসিত রাশিয়া, তার মিত্র ফ্রান্স ও

রুশ-জাপান প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রুশ-জাপান যুদ্ধ, ১৯০৪ খ্রীঃ

জার্মানীর সহযোগিতায় জাপানকে লিয়াও-টুং উপদ্বীপ চীনকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করে। জাপান আপাততঃ লিয়াও-টুং উপদ্বীপ ত্যাগ করে। রাশিয়া চীং সরকারের সঙ্গে লি-লোভানভ চুক্তির দ্বারা লিয়াও-টুং উপদ্বীপ গ্রাস করে। জাপানের মুখের গ্রাস রাশিয়া কেড়ে নিলে জাপান তা নীরবে সহ্য করতে রাজী হয় নি। লিয়াও-টুং উপদ্বীপে রাশিয়ার অনুপ্রবেশকে জাপান এক ঘোর বিপদের সঙ্কেত বলে গণ্য করে। কারণ এই উপদ্বীপের পোর্ট-আর্থার বন্দর থেকে জাপানের উপকূল ছিল নিকটে। লিয়াও-টুং উপদ্বীপ দখলের পর রাশিয়া এই অঞ্চলে দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথ স্থাপন করে পোর্ট আর্থার বন্দরকে এই রেলপথ দ্বারা রুশ-ট্রান্স-সাইবেরীয়

রেলপথের সঙ্গে যুক্ত করে। রুশ-নৌবহর পোর্ট আর্থারে ঘাঁটি স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। রাশিয়ার এই বিস্তারনীতি রুশ-জাপান প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি করে। বক্সার-বিদ্রোহের সময় মাঞ্চুরিয়ায় রেলপথ রক্ষার অজুহাতে রুশ সেনা মাঞ্চুরিয়ায় ঢুকে পড়ে। রুশ সেনাদলকে মাঞ্চুরিয়া ত্যাগের দাবি জাপান জানালে তাতে কর্ণপাত করা হয়নি। রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপান তার কূটনৈতিক ও সামরিক অবস্থান দৃঢ় করার জন্যে ১৯৪২ খ্রীঃ ইঙ্গ-জাপান চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির দ্বারা ইংলন্ড জাপানকে আশ্বাস দেয় যে, রাশিয়ার সহকারী হিসাবে অন্য কোন তৃতীয় শক্তি রাশিয়ার সঙ্গে যোগ দিয়ে জাপানকে আক্রমণ করলে ব্রিটেন জাপানের পক্ষ নেবে। শুধু রাশিয়া আক্রমণ করলে নিরপেক্ষ থাকবে। এই সন্ধি ছিল জাপানের কূটনৈতিক বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা। এই সন্ধির ফলে রুশ-জাপান যুদ্ধে অন্য কোন দেশ রাশিয়ার পক্ষে যোগ দিতে সাহস পায় নি। এরপর মাঞ্চুরিয়ায় রুশ-সেনার অবস্থানের অজুহাতে জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯০৪-৫ খ্রীঃ রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপান দৈত্যের আকৃতি রাশিয়াকে পরাস্ত করে। জাপানী সেনা মাঞ্চুরিয়া থেকে রুশ-সেনাদলকে বিতাড়িত করে সাইবেরিয়ায় ঢুকে পড়ে। রাশিয়া পরাজয় স্বীকার করে পোর্টস্‌মাউথের সন্ধি স্বাক্ষর করে।

জাপান তার বিজয়ের ফল এবারেও পুরো ভোগ করতে পারে নি। মার্কিন দেশ মাঞ্চুরিয়ায় তার নিজ বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার জন্যে যত্নবান ছিল। যাতে বিজয়ী জাপান মাঞ্চুরিয়ার একচেটিয়া অধিকার না পায় এজন্য মার্কিন রাষ্ট্রপতি থিওডোর রুজভেল্ট রুশ-জাপান সন্ধির শর্ত-রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। ১৯০৫ খ্রীঃ পোর্টস্‌মাউথের সন্ধির দ্বারা—(১) কোরিয়ায় জাপান তার পূর্ণ স্বার্থরক্ষার অধিকার পায়। (২) জাপান মাঞ্চুরিয়ায় চীনের অধিকার স্বীকার করে। (৩) লিয়াও-টুং উপদ্বীপে রুশ অধিকার জাপানকে হস্তান্তরিত করা হয়। (৪) দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় রুশ-নির্মিত রেলপথ জাপান ব্যবহারের অধিকার পায়। (৫) শাখালিন দ্বীপের উত্তরভাগ জাপানের দখলে আসে। মাঞ্চুরিয়ায় মার্কিন অবাধ বাণিজ্যের অধিকার জাপান মেনে নেয়।

মার্কিন হস্তক্ষেপ ঃ পোর্টস্‌মাউথের সন্ধি

রুশ-জাপান যুদ্ধে জয় জাপানকে এক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করে। ১৯১১ খ্রীঃ জাপান কোরিয়াকে পুরোপুরি অধিকার করে। এরপর মাঞ্চুরিয়ায় অনুপ্রবেশের জন্যে জাপান হাত বাড়ায়। জাপানের বিশিষ্ট রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌ ব্যারণ তানাকা এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে জাপানের সাম্রাজ্যবিস্তারের পরিকল্পনা-যুক্ত তানাকা-চার্টার রচনা করেন।

তানাকা চার্টার

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ঃ জাপান ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তার নীতি এবং ওয়াশিংটন চুক্তি (Japan's policy during World War I and Washington Conference) ঃ প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধে জয়ের দ্বারা জাপান সাম্রাজ্যের আস্বাদ পাওয়ার পর, ইওরোপীয় শিল্পায়ত জাতিগুলির মতই নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ আরম্ভ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৪-১৮ খ্রীঃ আরম্ভ হলে চীন তার নিরপেক্ষতা ঘোষণা করে, কিন্তু সুযোগ-সন্ধানী জাপান ইঙ্গ-জাপান চুক্তির অজুহাতে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জার্মানীকে শত্রু-দেশ ঘোষণার পর চীনে অবস্থিত জার্মানীর উপনিবেশগুলি যথা শাং টুং প্রদেশে জার্মান উপনিবেশ, শিং-তাও বন্দর ও ওয়াই-হা-ওয়ে জাপান অধিকার করে। আসলে রাজ্যদখলই ছিল জাপানের উদ্দেশ্য। উদারপন্থী ঐতিহাসিক কাউন্ট ওকুমা জাপানের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এক গর্হিত সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করেন। অসহায় চীনের উপর তিনি "একুশ দফা" দাবি চাপিয়ে দেন। ইওরোপীয় শক্তিগুলি ইওরোপের যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় চীনকে সাহায্য করতে পারে নি।

চীনের উপর একুশ দফা দাবী স্থাপন

এই একুশ দফা দাবির দ্বারা : (১) শাং টুং, মাঞ্চুরিয়া ও দক্ষিণ মোঙ্গোলিয়ায় জাপানের বিশেষ অধিকার চীন মেনে নেয়। (২) মধ্য-চীনের শিল্পাঞ্চলে জাপানের বিশেষ অধিকার চীন মেনে নেয়। (৩) চীনের খনিজ সম্পদ, বন্দরগুলির উপর জাপানের আধিপত্য স্থাপিত হয়। (৪) মাঞ্চুরিয়ার উপর জাপানের একান্ত অধিকার স্বীকৃত হয়। চীনের রাষ্ট্রপতি য়ুয়ান শি-কাই একুশ দফা দাবি মেনে এক গোপন-চুক্তি করেন।

একুশ দফা দাবির দ্বারা চীন কার্য্যতঃ জাপানের সামন্ত-রাজ্যে পরিণত হয়। মার্কিন সরকার জাপানের এই আগ্রাসনকে তার স্বার্থবিরোধী মনে করত। কারণ মাঞ্চুরিয়ায় মার্কিন সরকারের মাল বিক্রীর অধিকার ২১ দফা দাবির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চীনে Open Door বা মার্কিন সরকারের অবাধ বাণিজ্যের অধিকারও এতে ব্যাহত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভার্সাই-সন্ধি বৈঠকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসন একুশ দফা দাবি নাকচ করে চীনে মার্কিন বাণিজ্যিক স্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করেন। জাপানকে একুশ দফা দাবি ত্যাগ করাতে তিনি সফল হন নি। পরবর্তী মার্কিন রাষ্ট্রপতি ম্যাকবিলান জাপানকে একুশ দফা দাবি ত্যাগে বাধ্য করাতে কূটনীতি প্রয়োগ করেন। যেহেতু ইঙ্গ-জাপান সন্ধি ছিল জাপানের কূটনৈতিক জোট তিনি এই সন্ধি ভেঙ্গে জাপানকে কোনঠাসা করার চেষ্টা চালান। ব্রিটেনকে বুঝিয়ে তিনি ইঙ্গ-জাপান সন্ধি ত্যাগ করতে রাজী করান। ফলে ব্রিটেন ইঙ্গ-জাপান চুক্তি রক্ষায় অনিচ্ছা দেখায়। ব্রিটেন পাশে না থাকায় জাপান মিত্রহীন হয়ে পড়ে। ইঙ্গ-মার্কিন চাপের ফলে ওয়াশিংটন-চুক্তি ১৯১১-১২ খ্রীঃ স্বাক্ষরে জাপান বাধ্য হয়। এই চুক্তিগুলির মধ্যে (১) পঞ্চশক্তি সন্ধির দ্বারা প্রশান্ত মহাসাগরে নৌশক্তি হ্রাস করা হয়। জাপান ৩ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৫ঃ ও ব্রিটেন ৫ঃ নৌবহর রাখার অধিকার পায়। (২) চতুঃশক্তি সন্ধির দ্বারা ইঙ্গ-জাপান সন্ধি নাকচ হয়ে যায়। (৩) নবম শক্তি সন্ধির দ্বারা জাপান চীনকে শাং টুং ও অন্যান্য অঞ্চল ফেরৎ দেয়। ১৯০৫ খ্রীঃ সীমারেখায় জাপান ফিরে যায়। চীনে "খোলা দ্বার" নীতি (Open Door) জাপান মেনে নেয়। মাঞ্চুরিয়ায় বিশেষ অধিকার ত্যাগ করে। অর্থাৎ একুশ দফা দাবি দ্বারা জাপান যে সকল সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছিল, ওয়াশিংটন চুক্তিগুলির দ্বারা জাপানকে তা ছাড়তে হয়।

ওয়াশিংটন চুক্তি ১৯২২ খ্রীঃ একুশ দফা দাবী ত্যাগ : জাপানের হতাশা

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : জাপানের রাজনীতিতে জাপানের সামরিক নেতাদের হস্তক্ষেপ : মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ (Domination of Army in Politics : Invasion of Manchuria) : ওয়াশিংটন-চুক্তি (১৯২২ খ্রীঃ) জাপানের সাম্রাজ্যবাদ ও আগ্রাসন-নীতির মুখে সাময়িকভাবে লাগাম পরিয়ে দেয়। জাপানী জাতীয়তাবাদীরা ওয়াশিংটন-চুক্তিকে জাপানের ঘোর পরাজয় এবং জাপানের নিরাপত্তার বিরাট ক্ষতি বলে মনে করতে থাকেন। কারণ পঞ্চশক্তি সন্ধির দ্বারা জাপান ৩ :, ইংলন্ড ৫ :, মার্কিন দেশ ৫ : নৌশক্তি রাখার অধিকার পায়। মার্কিন দেশ ও ইংলন্ড একযোগে ৫+৫=১০ঃ হলে জাপানকে পিষে ফেলতে পারত। তদুপরি, জাপানের পূর্বদিকে হাওয়াই দ্বীপের পার্লহারবারে ও পশ্চিমে সিঙ্গাপুরে যথাক্রমে মার্কিন দেশ ও ব্রিটেন বিরাট নৌ-ঘাটি তৈরি করে। এখান থেকে নৌবহর পাঠিয়ে জাপানকে তারা ধ্বংস করতে পারত। ওয়াশিংটন চুক্তির দ্বারা মাঞ্চুরিয়া হাতছাড়া হলে জাপানের সামরিক নেতারা আপত্তি করেন। রুশ-জাপান যুদ্ধে বহু জাপানী সেনা মাঞ্চুরিয়া জয়ের জন্যে প্রাণ দেয়। তাঁরা বলেন যে তা ব্যর্থ হতে দেওয়া হবে না।

ওয়াশিংটন চুক্তির প্রতিক্রিয়া

জাপানের রাজনীতিতে নৌ ও স্থল বাহিনীর প্রভাব বাড়তে থাকে। মন্ত্রিসভায় সামরিক বিভাগের লোক যোগ দেয়। মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে কোয়াটুং-এ সেনাদলকে নিয়ন্ত্রণে রাখা কষ্টকর

হয়। ১৯২৯-৩০ খ্রীঃ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার ফলে জাপানের চূড়ান্ত ক্ষয়ক্ষতি হয়। জাপানের বহুলোক রেশমের সূতা তৈয়ারি করে জীবিকা অর্জন করত। এই রেশমের প্রধান রপ্তানি হত আমেরিকায়। অর্থনৈতিক মন্দার ফলে জাপানের রেশম রপ্তানিতে ৪৭% ঘাটতি দেখা দেয়। সুতী কাপড়ের রপ্তানিতে ৩৪% ঘাটতি দেখা দেয়। জাপানের রপ্তানি-বাণিজ্যে গড় ঘাটতি ছিল ২৭%। জাপানের মত দেশের সমৃদ্ধি তার রপ্তানি বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এই ঘাটতি পূরণের জন্যে জাপান পুনরায় মাঞ্চুরিয়ার বাজার দখলের লক্ষ্য নেয়। জাপানের লোকসংখ্যা ১৮৭৫-১৯১৪ খ্রীঃ মধ্যে দ্বিগুণ বাড়ে। জাপানের ভূখণ্ডে জনবসতির হার ছিল ভীষণ ঘন। ১৯৩০ খ্রীঃ জাপানের প্রতি বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলে জনবসতির হার ছিল চীন অপেক্ষা দ্বিগুণ। সুতরাং দাবি ওঠে যে, জাপানের বাড়তি লোকের বাসস্থান মাঞ্চুরিয়াতে চাই। কারণ মাঞ্চুরিয়ায় ছিল প্রচুর খালি জমি।

জাপানের শিল্পের জন্য কাঁচামাল ছিল না। জাপানকে লোহা, কয়লা, দস্তা বাইরে থেকে আমদানি করতে হত। যেহেতু মাঞ্চুরিয়ার খনিতে ছিল উৎকৃষ্ট মানের কয়লা এবং লোহা এবং মাঞ্চুরিয়ায় ফলত বিশ্বের ৭০% সোয়াবিন ও প্রচুর গম ও যব, জাপান মাঞ্চুরিয়া দখলে পণ করে। জাপানের শিল্পপতি বা জাইবাৎসুশ্রেণী মাঞ্চুরিয়ার সম্পদ ও বাজার দখলের জন্যে সরকারের উপর চাপ দেয়। ফলে ১৯৩১ খ্রীঃ মুকদেনের (Mukden) পুল চীনা সেনাদল ধ্বংস করার মিথ্যা অজুহাতে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে। জাপান ওয়াশিংটন-চুক্তি ভেঙে ফেলে ও লীগের নির্দেশ অমান্য করে মাঞ্চুরিয়া অধিকার করে। লীগ কর্তৃক পর্যবেক্ষক ও তদন্তকারী দল লিটন কমিশন নিযুক্ত হলে জাপান মাঞ্চুকুয়ো নামে একটি তাঁবেদার সরকার মাঞ্চুরিয়ায় গঠন করে। লিটন কমিশন জাপানকে আক্রমণকারী ঘোষণা করায় জাপান লীগের সদস্যপদ ত্যাগ করে।

জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের কারণ ও লীগ অফ নেশনসের ভূমিকা

দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ ঃ জাপানের সাম্রাজ্যবাদ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান (The Second Sino-Japanese War & Japanese Imperialism and Japan's participation in Second World War) ঃ লীগ জাপানের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়। মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ উপলক্ষে চীন-জাপান সংঘাত চলতে থাকে। কারণ জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণকে চীন মেনে নেয় নি। ইতিমধ্যে জাপানের সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধা আরও প্রবল হয়। জাপানের বুদ্ধিজীবী ব্যারণ তানাকা তাঁর তানাকা স্মারকলিপি সম্রাটের কাছে পেশ করেন। এই স্মারকলিপিতে তিনি জানান যে, চীনের মূল ভূখণ্ডের একাংশ জাপানের ভবিষ্যৎ বিস্তারের জন্য দখলে রাখা দরকার। মাঞ্চুরিয়া উপলক্ষে চীন-জাপান সংঘাত ৩১শে মে, ১৯৩৩ টাংকু যুদ্ধবিরতি দ্বারা আপাততঃ বন্ধ থাকে। এই যুদ্ধবিরতির শর্ত অনুসারে উত্তর-পূর্ব চীনের এক অংশ থেকে চীন ও জাপান সেনাদল অপসারণ করে। মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের আক্রমণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খোলাবাজার নীতির বিরোধী ছিল। ওয়াশিংটন বৈঠকের (১৯২১ খ্রীঃ) নবম শক্তি সন্ধি-এর দ্বারা জাপান ভেঙ্গে ফেলে বলে মার্কিন রাজনীতি রুজভেল্ট মনে করেন। তিনি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন স্বার্থরক্ষার জন্যে ২৩৮,০০০,০০০ ডলার ব্যয়ে নৌ নির্মাণের কাজে হাত দেন এবং কুয়োমিন তাং চীনকে ৫০ মিলিয়ন ডলার অর্থসাহায্য দেন। জাপান মনে করে যে, মার্কিন সরকারের এই নীতি ছিল জাপানের স্বার্থবিরোধী। মার্কিন সরকারকে সতর্ক করে জাপানের পররাষ্ট্র-সচিব এইজি এ্যামাও ১৯৩৪ খ্রীঃ যে ঘোষণাপত্র দেন, তার নাম ছিল এ্যামাও ঘোষণা। এই

ঘোষণাতে বলা হয় যে, (১) পূর্ব এশিয়ায় জাপানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তা অন্যান্য শক্তির স্বীকার করে নেওয়া উচিত। (২) পূর্ব এশিয়ায় শান্তিরক্ষার দায়িত্ব জাপান একাই গ্রহণ করছে এবং ভবিষ্যতে করবে। (৩) যদি চীন অন্য কোন শক্তির সহায়তা নিয়ে এই শান্তি ও শক্তিসাম্য ভাঙ্গতে চেষ্টা করে, তার ফল খারাপ হবে। (৪) যে শক্তিগুলি চীনকে অর্থ ও অস্ত্র যোগাচ্ছে, তারা পূর্ব এশিয়ার শান্তির বিঘ্ন ঘটাচ্ছে।[১] বলা বাহুল্য জাপানের এই হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় চীন ও মার্কিন দেশের প্রতি এবং অন্যান্য ইওরোপীয় জাতির প্রতি। এ্যামাও ঘোষণা ছিল জাপানী সাম্রাজ্যবাদের রণহুঙ্কার।

এরপর জাপানী সামরিক নেতারা ও জাপানী জ্যাইবাৎসুশ্রেণী উত্তর চীন আক্রমণের প্রস্তুতি নেন। চীন কুয়েসিন তাং ও কমিউনিস্টগোষ্ঠী একযোগে প্রতিরোধের লক্ষ্য নেওয়ায় জাপান চীনকে ধূলিসাৎ করার নীতি নেয়। এতদিন টাংকু যুদ্ধবিরতি চালু ছিল। ১৯৩৬ খ্রীঃ জাপান অভিযোগ করে যে, মার্কোপোলো সেতু চীনা-সেনাদল ডিনামাইট দ্বারা ধ্বংস করে সেই সন্ধি ভেঙ্গে ফেলেছে। সম্ভবতঃ জাপানী সেনারাই এই অন্তর্ঘাত করেছিল। আসল সত্য কোনদিন বলা যাবে না। যাইহোক, এই সেতু ধ্বংস ও জাপানী সেনাদের ওপর গুলিবর্ষণের অজুহাতে জাপান উত্তর চীন আক্রমণ করায় ১৯৩৬ খ্রীঃ দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ শুরু হয়। জাপান দ্রুতগতিতে উত্তর চীনের বৃহৎ অঞ্চল দখল করে নেয়। গৃহযুদ্ধে দুর্বল চীন জাপানকে সঠিকভাবে প্রতিরোধ করতে পারেনি। ক্রমে দক্ষিণ চীনেও জাপানী সেনা ঢুকে পড়ে। নানকিং, সাংহাই, ক্যান্টন,হ্যাংকাও প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলি জাপান দখল করে নেয়। কুয়োমিন তাং সরকার বাধ্য হয়ে চুং কিং শহরে রাজধানী সরিয়ে নেন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধায় মার্কিন দেশ বা অন্যান্য ইওরোপীয় জাতিগুলি চীনকে কোন সাহায্য দেয়নি। একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়া চীনা কমিউনিস্ট গেরিলাদের জাপানকে প্রতিরোধের জন্যে অস্ত্রসাহায্য দেন। জাপান দক্ষিণ চীনের বৃহৎ অংশ দখল করার পর চীনের দক্ষিণের প্রতিবেশী ইন্দো-চীন বা ভিয়েৎনাম অধিকার করে। এই সময় ইন্দো-চীন ছিল ফরাসীদের দখলে। তারা তাদের রাজ্য রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। ইন্দোচীন দখলের পর জাপানী তরুণ সামরিক অফিসাররা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়ে। জাপানের রাজনীতিবিদরা ঘোষণা করেন যে, "এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য। এশিয়া থেকে ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা যেন হাত ওঠায়"। জাপানের এই ঘোষণা ছিল কুটিল। এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্যে বলার অর্থ দাঁড়ায় এশিয়া জাপানের জন্যে। জাপানের রাজনীতিবিদ হিরোটা উত্তর চীনকে খণ্ড খণ্ড করে জাপানের কয়েকটি তাঁবেদারিতে পরিণত করার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। এদিকে মার্কিন দেশ এবং তার মিত্র ব্রিটেনের সঙ্গে জাপানের সম্পর্কের দারুণ অবনতি ঘটে। জাপান ইন্দো-চীন দখল করলে মার্কিন দেশ জাপানকে লোহা ও পেট্রোল সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। ব্রিটেন ব্রহ্মদেশের পথে ভারত থেকে কুয়োমিন তাং সরকারকে সরবরাহ পাঠাতে থাকে। এজন্য মিত্রশক্তির সঙ্গে জাপানের সম্পর্কের ভয়ানক অবনতি হয়। ওয়াশিংটন-চুক্তি দ্বারা জাপানকে যেভাবে কোণঠাসা করা হয়, জাপান সে কথা ভোলে নি।

এই সময় জাপানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নৌ-সেনাপতি ইওনাই মিৎসুমাসা। তিনি ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির মিত্রতা চান এই শর্তে যে, জাপানকে তার বিজিত স্থানগুলি পেতে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি সম্মতি দিবে। কিন্তু মার্কিন বিদেশমন্ত্রী কর্ডেল হাল এই প্রস্তাব নাকচ করেন। ফলে জাপান ১৯৪০ খ্রীঃ নাৎসী জার্মানী ও ফ্যাসিস্ট ইতালীর সঙ্গে একটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি করে রোম-বার্লিন অক্ষচুক্তিতে জাপানকে অন্তর্ভুক্ত করে।

জাপানের রোম-বার্লিন অক্ষ চুক্তিতে যোগদান

১· Toynbee—Survey of International Affairs.

পার্লহারবার আক্রমণ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের যোগদান

ইতিমধ্যে জাপানের রাজনীতিতে সামরিক বিভাগের প্রভাব দারুণ বাড়ে। তরুণ জাপানী অফিসাররা আমেরিকাকে আক্রমণ করার জন্যে চাপ দেয়। এই অবস্থায় জাপান ধাপে ধাপে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে এগিয়ে যেতে থাকে। ১৯৪১ খ্রীঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইওরোপের যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার সময় জাপানী নৌবহর মার্কিন নৌঘাঁটি পার্লহারবার আক্রমণ করে ধ্বংস করে। তারপর পশ্চিমে মুখ ঘুরিয়ে ভিয়েতনাম, মালয় ও সিঙ্গাপুরে ব্রিটেনের নৌঘাঁটি ধ্বংস করে ব্রহ্মদেশে ঢুকে পড়ে ও ভারত-সীমান্তে পৌঁছে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে মার্কিন আণবিক বোমাবর্ষণের ফলে জাপান আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়।

সারণী

[ক] চীনের মাঞ্চু বা চীং সরকার চীন দেশের দরজা বিদেশীদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে রুদ্ধ করেন। চীনে কোনো বিদেশীকে ঢুকতে হলে ট্রিবিউট বা নজরানা প্রদান এবং সম্রাটের প্রতি বশ্যতার নিদর্শন হিসাবে "কাও-তাও" করতে হত। ইওরোপীয় বণিকরা চীনের ক্যান্টন বন্দরের নির্দিষ্ট প্রাচীরের বাইরে থাকতে বাধ্য হত এবং চীং সরকারের অনুমোদিত কো-হং বণিকদের কাছ থেকে মাল খরিদ করতে বাধ্য হত। এই প্রথার নাম ছিল ক্যান্টন প্রথা।

[খ] চীনের অন্তর্বাণিজ্যে অনুপ্রবেশ, ইংলণ্ডের কারখানায় তৈরী উদ্বৃত্ত মাল চীনে বিক্রী ও চীনের সবুজ চা, রেশম খরিদের জন্যে ইংরাজ ও অন্যান্য ইওরোপীয় বণিকরা অধীর হয়। চীনের চা ও রেশমের বদলে চীনে আফিম চালান দিয়ে ইওরোপীয় বণিকরা লাভবান হয়। কিন্তু ক্যান্টন প্রথার জন্যে চীনের ভিতর প্রবেশ ইংরাজ বা ইওরোপীয় বণিকদের কাছে নিষিদ্ধ ছিল। এজন্যে ইংলণ্ড বারে বারে চীনে অনুপ্রবেশ ও সমমর্যাদায় বাণিজ্যের দাবী জানাতে থাকে। চীং সরকার আফিমের আমদানী নিষিদ্ধ করায়, বৈদেশিক অঞ্চল অবরোধ করে আফিমের পেটী দখল করে ধ্বংস করেন। এই উপলক্ষে প্রথম অহিফেন যুদ্ধ আরম্ভ হলে ইংলণ্ডের হাতে চীন পরাজিত হয়ে নানকিং-এর সন্ধি, ১৮৪০ খ্রীঃ স্বাক্ষর করে। ১৮৬০ খ্রীঃ দ্বিতীয় অহিফেন যুদ্ধের পর পিকিং-এর সন্ধির দ্বারা চীনের অনেক বন্দর ইওরোপীয়দের জন্যে খুলে দিতে হয়। ইওরোপীয়রা চীনের বন্দর অঞ্চল নিয়ে এলাকাধীন অঞ্চল গড়ে।

[গ] ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি চীনে এলাকাধীন অঞ্চল গঠন করে। জাপান, ১৮৯৪-৯৫ খ্রীঃ প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধে চীনকে পরাজিত করে সিমনোসেকির সন্ধি চীনের উপর চাপিয়ে দেয়। এর ফলে কোরিয়ার উপর চীন আধিপত্য হারায়। ১৮৯৫ খ্রীঃ পর বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি চীন ব্যবচ্ছেদের চেষ্টা করে এবং চীনে নিজ নিজ প্রভাবযুক্ত এলাকা ও রেলপথ নির্মাণ করে। মার্কিণ সরকার ১৮৯৯ খ্রীঃ খোলা দ্বারা (Open Door) নীতি ঘোষণা করে।

[ঘ] ১৮৫০-৬৫ খ্রীঃ পর্যন্ত চীনে এক বিরাট অন্তর্বিপ্লব চলে। এই বিপ্লবকে তাই-পিং বিপ্লব বলা হয়। চীনে বিদেশী শক্তির অনুপ্রবেশ, চীনা চাষী-শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সঙ্কট প্রভৃতি কারণে এই বিপ্লব দেখা দেয়। হং-সিউ-চুয়ান নামে এক চীনা বিপ্লবী মাঞ্চু সরকারের অবসানের জন্যে প্রচার চালান। এই বিপ্লব ছিল মূলতঃ কৃষক-বিপ্লব এবং তাই-পিং বিপ্লবীরা নূতন সমাজব্যবস্থা গঠন করে। এই সমাজ ব্যবস্থা আংশিক সমাজতান্ত্রিক ছিল। শেষ পর্যন্ত তাই-পিং নেতাদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও মাঞ্চু সরকারের দমন নীতির ফলে এই বিপ্লব দমিত হয়।

[ঙ] চীনে ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে এবং মাঞ্চু সরকারের কুশাসনের বিরুদ্ধে বক্সার বিদ্রোহ দেখা দেয়। চীং বিরোধিতা, বিদেশী শক্তির বিরোধিতা ও খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের বিরোধিতা এই তিন ধারা বক্সার বিদ্রোহে দেখা যায়। চীনা কৃষকরাই ছিল বক্সার বিদ্রোহের প্রধান নায়ক। সাম্রাজ্ঞী জু-সি বক্সার বিদ্রোহীদের সমর্থন করেন। শেষ পর্যন্ত বৈদেশিক শক্তিগুলি তাদের সামরিক শক্তির দ্বারা বক্সার বিদ্রোহ দমন করে। বক্সার বিদ্রোহে ভূমি-সংস্কারের কোন চেষ্টা হয়নি।

[চ] আধুনিক চীনের জনক ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন শিং-চুং-হুই নামে এক সমিতি স্থাপন করেন। তিনি সান-মিন-চু-আই নামে তিনটি নীতি যথা, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আদর্শ ঘোষণা করেন। তিনি টুং-মেং-হুই নামে এক দেশপ্রেমিক সমিতি স্থাপন করেন এবং তাঁরই উদ্যোগে ১৯১১ খ্রীঃ বিপ্লবে মাঞ্চু সরকারের পতন হয়। চীনে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়।

[ছ] চীনে মাঞ্চু সরকারকে সংস্কারের দ্বারা যুগোপযোগী করতে কাং-ইউ-ওয়া প্রভৃতি দেশপ্রেমিক ব্যর্থ চেষ্টা করেন। এদিকে বৈদেশিক ঋণের বোঝা, রেলপথ নির্মাণ নীতির জন্যে চীং সরকারের জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়। চীনের বুর্জোয়া শ্রেণী চীং সরকারের বিরুদ্ধে চলে যায়। এই পরিস্থিতিতে ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন চীনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে উদ্যোগ নিলে মাঞ্চু সরকারের পতন হয়। চীনে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়।

[জ] পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক চেন-টু-শিউ চীনা ছাত্রদের চিরাচরিত কনফুসিয় মতবাদ বর্জন করে আধুনিক দার্শনিকদের মতবাদে দীক্ষিত করেন। চীনা সাহিত্যেরও নবজাগরণ পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়কে আশ্রয় করে ঘটে। চীনা ছাত্রদের মধ্যে এইভাবে যখন জাতীয়তাবাদী জাগরণ ঘটেছিল সেই সময় চীনের উপর জাপান ২১ দফা দাবী চাপিয়ে দেয়। ভার্সাই সন্ধিতে এই দাবী নাকচ এবং জাপানের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চীনা ছাত্র সমাজ ৪ঠা মে এক ব্যাপক ধর্মঘট চালায়। এই ঘটনাকে ৪ঠা মের ঘটনা বলা হয়। ৪ঠা মে আন্দোলনে চীনা কমিউনিষ্টপন্থী ছাত্রেরাই মুখ্য ভূমিকা নেয়।

[ঝ] পেইটা বা পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক চেন-টু-শিউ তাঁব ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে মার্কসবাদী ভাবধারা প্রচার করেন। অধ্যাপক লি-টা-চাও নিউ ইয়ুথ পত্রিকায় মার্কসবাদ প্রচার করতেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন মাও-সে-তুং। ১৯২১ খ্রীঃ চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি স্থাপিত হয়। চীনা কমিউনিষ্টরা আত্মত্যাগের দ্বারা দলকে শক্তিশালী করেন। চীনা প্রজাতন্ত্রের অধিপতি চিয়াং-কাই-শেখ্ সেনাদল দ্বারা দক্ষিণ চীনে কমিউনিষ্টদের ঘিরে ফেলার চেষ্টা করলে, প্রায় ৯ লক্ষ লোক পরিবার পরিজনসহ বেষ্টনী ভেঙে লং মার্চ বা দীর্ঘ যাত্রা শুরু করেন। বহু প্রাণ বলি দিয়ে কমিউনিষ্ট কর্মী ও পরিবারগুলি ১৯৩৫ খ্রীঃ সেন্সি প্রদেশে আশ্রয় নেন। চিয়াং-কাই-শেখ দেশভক্ত হলেও নিজদল ও আমলাতন্ত্রের সাহায্যে প্রশাসন চালাতেন। তিনি ভূমি সংস্কারের কাজে অবহেলা করেন। ইতিমধ্যে জাপান চীনে দ্বিতীয় আক্রমণ চালায় এবং দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধে, কুয়ো-মিন তাং ও কমিউনিষ্ট যুক্ত ফ্রন্ট দ্বারা প্রতিরোধ করেন।

[ঞ] চীনের কমিউনিষ্ট বিপ্লবের নায়ক চিয়াং-কাই-শেখের বুর্জোয়াতন্ত্রী চীনকে সমাজতন্ত্রী চীনে পরিণত করার ব্রত নেন। মাও-সে-তুং বলেন যে চীন হল কৃষি প্রধান দেশ। এদেশে শিল্প-বিপ্লব ঘটতে দেরী আছে। সুতরাং শ্রমিকের শ্রেণীসংগ্রাম দ্বারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ চীনে নেই। চীনের জমি মালিক ও ধনী মহাজন শ্রেণীর বিরুদ্ধে কৃষকের শ্রেণী সংগ্রাম দ্বারা মাও-সে-তুং চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটান। তিনি চৌ-এন-লাই ও চু-তের সহায়তায় চীনে লাল ফৌজ গড়েন এবং এক একটি এলাকাকে কমিউনিষ্ট মুক্তাঞ্চলে পরিণত করে ভূমি-বন্টন দ্বারা কৃষকের সমর্থন পান। মাও চীনের সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিপ্লব ঘটান। তাঁর নেতৃত্বে জাপানের বিরুদ্ধে চীনা কমিউনিষ্ট ও কুয়ো-মিন-তাং যুক্ত প্রতিরোধ গঠিত হয়। অবশেষে গৃহযুদ্ধে কুয়ো-মিন-তাং সরকার পরাস্ত হলে ১৯৪৯ খ্রীঃ চীনের মূল ভূখণ্ডে কমিউনিষ্ট শাসন স্থাপিত হয়।

[ট] ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত জাপান ছিল বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন একটি পিছিয়ে পড়া দেশ। জাপানের সিংহাসনে সম্রাট বা মিকাডো অধিষ্ঠিত থাকলেও তাঁর হাতে প্রকৃত ক্ষমতা ছিল না। শোগুণ উপাধিধারী এক মন্ত্রী বংশানুক্রমিকভাবে জাপানকে শাসন করতেন। জাপানের দরজা বিদেশীদের কাছে বহুকাল বন্ধ থাকার পর ১৮৫৪ খ্রীঃ মার্কিণ সেনাপতি কমোডোর পেরী কানাগাওয়া সন্ধি জাপানের উপর চাপিয়ে জাপানকে উন্মুক্ত করেন। অন্যান্য ইওরোপীয় শক্তিগুলিও জাপানের উপর বৈষম্যমূলক সন্ধি চাপিয়ে দেয়।

[ঠ] জাপানকে বৈদেশিক শক্তির অনুপ্রবেশ থেকে রক্ষা কবতে অসমর্থ হওয়ায় শোগুণতন্ত্রের বিরুদ্ধে জাপানী সামন্ত ও জনগণের তীব্র প্রতিবাদ দেখা যায়। ১৮৬৮ খ্রীঃ শোগুণতন্ত্রের পতন ঘটে এবং মিকাডো মুৎসিহিতো তাঁর লুপ্ত ক্ষমতা লাভ করেন। জাপানের ইতিহাসে এই ঘটনাকে মেইজি শাসনের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা বলা হয়। মেইজি যুগে সম্রাট ১৮৮২ খ্রীঃ নূতন সংবিধান প্রবর্তন করেন এবং জাপানে প্রধানমন্ত্রী, ক্যাবিনেট ও পার্লামেন্ট দ্বারা শাসনের ব্যবস্থা করা হয়। জাপানে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও অভিজাত শ্রেণী থেকে যে নূতন আমলাতন্ত্র ও শাসক শ্রেণী গঠিত হয়, তাঁরা নানাবিধ সংস্কার দ্বারা অল্পকালের মধ্যে জাপানকে এক প্রধান শক্তিতে পরিণত করেন। জাপানে সামন্ত বা জমিদারী প্রথা লোপ করা হয়। কৃষককে জমিতে স্বত্ব দেওয়া হয়। জাপানে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা চালু হয় এবং সকল শ্রেণীর লোককে সেনাদলে যোগ দিতে দেওয়া হয়। জাপানে আধুনিক শিক্ষা প্রচলিত হয়। জাপানে আধুনিক শিল্প দ্রুতগতিতে গঠন করা হয়। জাইবাৎ-সু শ্রেণী নামে শিল্পপতি গোষ্ঠী একচেটিয়া পুঁজিবাদী শিল্প গঠন করেন। জাপানের সামরিক ও নৌবাহিনীর আধুনিকীকরণ করা হয়। ২৭ বছরের মধ্যে জাপান তার এই বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটায়।

[ড] জাপান তার আধুনিক সংস্কার দ্বারা বিশ্বের প্রধান রাষ্ট্রগুলির অন্যতম রাষ্ট্রে পরিণত হয়। জাপানের কারখানায় উৎপাদিত উদ্বৃত্ত মাল বিক্রির জন্যে ও তার বর্ধমান লোকসংখ্যার সমস্যা সমাধানের জন্যে প্রতিবেশী কোরিয়ার দিকে দৃষ্টি দেয়। এদিকে চীন কোরিয়াকে তার সামন্তরাজ্য বলে গণ্য করত। কোরিয়ার উপর আধিপত্য

নিয়ে চীন-জাপান বিরোধ পরিণামে ১৮৯৪-৯৫ খ্রীঃ প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধে পরিণত হয়। পরাজিত চীন সিমনোসেকির সন্ধির দ্বারা কোরিয়ার স্বাধীনতা মেনে নেয় এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার লিয়াও টুং উপদ্বীপ জাপানকে ছেড়ে দেয়। জাপান তাঁর যুদ্ধ জয়ের পুরা ফল ভোগ করতে পারে নি। রাশিয়ার দৃষ্টি ছিল মাঞ্চুরিয়ার উপর। রুশ হস্তক্ষেপের ফলে জাপানকে লিয়াও টুং উপদ্বীপ ছেড়ে দিতে হয়। এর ফলে রুশ-জাপান যুদ্ধ বাধে এবং জাপান রাশিয়াকে পরাজিত করে পোর্টসমাউথের সন্ধি ১৯০৫ খ্রীঃ স্বাক্ষর করে। লিয়াও টুং উপদ্বীপ জাপানের হাতে চলে আসে। রুশ-জাপান যুদ্ধে জয়ের পর জাপান একটি পুরা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

[ঢ] রুশ-জাপান যুদ্ধে জয়ের পর ১৯১১ খ্রীঃ জাপান কোরিয়াকে নিজ সাম্রাজ্যে পরিণত করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দেখা দিলে ইওরোপীয় শক্তিগুলি ইওরোপের যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার সুযোগে জাপান দুর্বল চীনের উপর একতরফা ভাবে একুশ দফা দাবী চাপিয়ে দেয়। এই দাবীর দ্বারা চীন শুধু জাপানের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়নি, মার্কিণ অবাধ বাণিজ্য নীতি বা Open Door নাকচ হয়ে যায়। এজন্যে জাপ-মার্কিণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। পঞ্চশক্তি সন্ধির দ্বারা জাপানের নৌশক্তি বিপুলভাবে হ্রাস করা হয়। পঞ্চশক্তি সন্ধির দ্বারা একুশ দফা দাবী নাকচ হয়ে যায়। চীনে মার্কিন খোলা দ্বার বা Open Door নীতি চালু হয়। জাপানী সাম্রাজ্যবাদ প্রতিহত হয়।

[ণ] ওয়াশিংটন বৈঠকে বিভিন্ন চুক্তির দ্বারা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জাপানের সাম্রাজ্যবাদী ঘোড়ার মুখে যে লাগাম পরিয়ে দেয়, জাপান তা শীঘ্রই ছিঁড়ে ফেলে। ইতিমধ্যে জাপানে সামরিক শ্রেণীর নেতারা ক্ষমতায় আসার পর ১৯৩১ খ্রীঃ জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে দখল করে এবং লীগের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে। ১৯৩৬ খ্রীঃ দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধে জাপান উত্তর চীনে ঢুকে পড়ে। ১৯৪০ খ্রীঃ জাপান রোম-বার্লিন অক্ষ চুক্তিতে যোগ দিয়ে তার আন্তর্জাতিক মিত্রহীনতার অবসান ঘটায়। ১৯৪১ খ্রীঃ জাপান হওয়াই দ্বীপে মার্কিণ নৌঘাটি পার্ল হারবার ধ্বংস করে ওয়াশিংটন চুক্তির প্রতিশোধ নেয় এবং ব্রিটিশ নৌঘাটি সিঙ্গাপুর দখল করে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ইন্দো-চীন, মালয়, সিঙ্গাপুর দখলের পর জাপান, ব্রহ্মদেশ দখল করে ভারতের দরজায় পৌঁছায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে মিত্রশক্তির আক্রমণে জাপানের পরাজয় ঘটে।

অনুশীলনী

১। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) কাও-তাও প্রথা কি? (খ) কো-হং কাকে বলে? (গ) ক্যান্টন প্রথা কাকে বলে? (ঘ) আমহার্স্ট দৌত্যের উদ্দেশ্য কি ছিল? (ঙ) কোন্ সন্ধির দ্বারা প্রথম অহিফেন-যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে? (চ) কোন্ সন্ধির দ্বারা দ্বিতীয় অহিফেন-যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয়? (ছ) কোন্ সালে প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধ ঘটে এবং কোন্ সন্ধির দ্বারা এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে? (জ) তাই-পিং কথার অর্থ কি? (ঝ) কার নেতৃত্বে তাই-পিং বিপ্লব ঘটে? (ঞ) বক্সার-বিদ্রোহীদের লক্ষ্য কি ছিল? (ট) ডাঃ সান-ইয়াৎ সেনের কোথায় জন্ম হয়? (ঠ) সান-মিন-চু-আই নীতি বলতে কি বুঝ? (ড) কোন সালে এবং চীনের কোন্ অঞ্চলের সেনাদল চীং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে? (ঢ) পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের চলতি নাম কি ছিল? (ণ) চীনে কোন্ সালে এবং কাদের উদ্যোগে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপিত হয়? (ত) লং মার্চ বলতে কি বুঝ? (থ) মাও-সে-তুং-এর কোথায় জন্ম হয়? (দ) চীনের কোন অঞ্চলে প্রথম সোভিয়েত ও মুক্তাঞ্চল গড়া হয়? (ধ) মাওবাদ কাকে বলে? (ন) কোন্ দেশকে দাই নিপ্পন বলা হয়? (প) জাপানে শোগুন প্রথা সম্বন্ধে কি জান? (ফ) জাপানে কাদের দাইমিও বলা হত? (ব) কোন্ সালে এবং কার দ্বারা কানাগাওয়া সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়? (ভ) জাপানের সম্রাটকে কি বলা হত? (ম) জাপানে কাদের জাইবাৎসু বলা হত? (য) কোন সালে প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হয়? (র) কোন্ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধ ঘটে? (ল) জাপানের একুশ দফা দাবি কি? (ব) কোন্ চুক্তির দ্বারা জাপানের সাম্রাজ্যবাদ বাধাপ্রাপ্ত হয়? (শ) কোন্ সালে জাপান, কোন্ মার্কিন নৌঘাটি ধ্বংস করে? (য) জাপানের কোন্ কোন্ শহরে মার্কিন আণবিক বোমা বর্ষণের ফলে জাপান আত্মসমর্পণ করে?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(ক) চীনের অবরুদ্ধ-দ্বার-প্রথা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (খ) প্রথম অহিফেন-যুদ্ধের কারণ কি ছিল এবং কোন সন্ধির দ্বারা এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে? (গ) ইওরোপীয় জাতিগুলির চীন-ব্যবচ্ছেদের প্রয়াস বর্ণনা কর। (ঘ)

তাই-পিং বিদ্রোহের কারণ কি ছিল এবং কার নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ ঘটে? (ঙ) বক্সার-বিদ্রোহ কেন ঘটে? (চ) ডাঃ সান-ইয়াৎ সেনের মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা কর। (ছ) ১৯১১ খ্রীঃ প্রজাতন্ত্রী বিপ্লবের কারণ কি ছিল? (জ) চীনে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যাপারে ৪ঠা মের আন্দোলনের ভূমিকা বর্ণনা কর। (ঝ) চীনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা ও কার্যাবলীর বিবরণ দাও। (ঞ) চীনে চিয়াং-কাই-শেখ এবং কুয়ো-মিন-তাং দলের ভূমিকা বর্ণনা কর। (ট) মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে চীনে সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র স্থাপনের বিবরণ দাও। (ঠ) জাপানের বিচ্ছিন্নতা এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিবরণ দাও। (ড) "মেইজি শাসনের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা" বলতে কি বুঝায়? (ঢ) জাপানের পশ্চিমী প্রথার আধুনিকীকরণ এবং আভ্যন্তরীণ সংস্কার বর্ণনা কর। (ণ) সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে জাপানের উত্থানের কারণ কি? (ত) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাপানের ভূমিকা এবং জাপানের ওয়াশিংটন-সন্ধির প্রতিক্রিয়া বর্ণনা কর। (থ) দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের ভূমিকার বিবরণ দাও।

দ্বাদশ অধ্যায়

ইওরোপে ফ্যাসিবাদের উত্থান : নাৎসী জার্মানী : ফ্যাসিস্ট ইতালী : স্পেনের গৃহযুদ্ধ

[ক] প্রথম পরিচ্ছেদ : ইতালীতে মুসোলিনীর উত্থান (Rise of Mussolini in Italy) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইওরোপের কয়েকটি দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পতন ঘটে এবং একনায়কতন্ত্র ও একদলীয় শাসনব্যবস্থা চালু হয়। ঐতিহাসিক গ্যাথর্ন হার্ডি মন্তব্য করেছেন যে, "মড়কে যেমন ব্যাপক লোকজন মারা যায়, সেরূপ ইওরোপে গণতন্ত্রের মড়ক দেখা দেয়।" ইতালীতে কাভ্যুরের প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইতালীতে বেনিটো মুসোলিনী নামে এক ব্যক্তি তাঁর একনায়কতন্ত্র বা ডিক্টেটরশিপ স্থাপন করেন এবং ইতালীতে তাঁর একদলীয় শাসন বা ফ্যাসিস্ট শাসন প্রবর্তন করেন। ইতালীতে ফ্যাসিস্ট বিপ্লবের কয়েকটি কারণ ছিল।

ইতালীতে ফ্যাসিবাদের উত্থানের কারণ : কাভ্যুরের গণতন্ত্রের দুর্বলতা

(১) ইতালীতে কাভ্যুরের প্রবর্তিত সংবিধান দ্বারা প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপিত হয়নি। সর্বসাধারণের ভোটাধিকার ইতালীতে ছিল না। ধনবান সম্পত্তিশালী লোকেদেরই একমাত্র ভোটদানের অধিকার ছিল। ফলে এই বুর্জোয়া-শাসনব্যবস্থার প্রতি ইতালীর জনসাধারণের আগ্রহ ছিল না। (২) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইতালী মিত্রশক্তির পক্ষে শেষ পর্যন্ত যোগ দিলেও, প্যারিসের শান্তি-বৈঠকে ইঙ্গ-ফরাসী চক্রান্তে ইতালীকে কোণঠাসা করা হয়। ইতালী শূন্যহাতে প্যারিস-কংগ্রেস ত্যাগ করে। ফলে ইতালীবাসীদের মনে হতাশা দেখা দেয়। মুসোলিনী এই হতাশাবোধকে জাগিয়ে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচার করেন। (৩) উত্তর ইতালী ছিল শিল্পায়ত, স্বচ্ছল। দক্ষিণ ইতালী ছিল অনুন্নত, দরিদ্র, মাফিয়া ও ডাকাত দলের উৎপাতে দুর্দশাগ্রস্ত। গণতান্ত্রিক সরকার উভয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমতা আনার চেষ্টা করেননি। মুসোলিনী এই বৈষম্যগুলিকে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন। (৪) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের ফলে ইতালীর ৭ লক্ষ সেনা মারা যায়, ১২ লক্ষ লোক আহত হয় এবং ১২০০ কোটি ডলার আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়। কিন্তু ইতালীর জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্যে উত্তর আফ্রিকা অথবা প্রতিবেশী যুগোস্লাভিয়ার কিছু স্থান ইতালীকে দেওয়া হয়নি। ইতালীর শিল্পগঠনের জন্যে এই স্থানগুলিকে দরকারী মনে করা হত। ইতালীর গণতান্ত্রিক সরকারের এই ব্যর্থতা গণতন্ত্র সম্পর্কে ইতালীবাসীকে হতাশ করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী অর্থনৈতিক সঙ্কটের প্রভাব

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালীয় গণতন্ত্রে দারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কট, খাদ্যাভাব, দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি ঘটে। এর ফলে জনজীবন দুর্দশাগ্রস্ত হয়। এই পরিস্থিতিতে ইতালীর সমাজতান্ত্রিক দল প্রচার করে যে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই ইতালীর মুক্তির একমাত্র পথ। সমাজতান্ত্রিক পত্রিকা "আভান্তি"র দ্বারা বিপ্লবের ডাক দেওয়া হয়। ইতালীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ধর্মঘটে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। কৃষকরা জমিদারের জমি ও শ্রমিকরা কলকারখানা দখল করতে আরম্ভ করে। ইতালীর শিল্পপতি, বুর্জোয়া-শ্রেণী এর ফলে আতঙ্কিত হয়। তারা মনে করে যে, গণতন্ত্র দেশের শাসন-পরিচালনায় অক্ষম। একটি শক্তিশালী সরকার দ্বারা তাদের কায়েমী স্বার্থরক্ষার জন্যে তারা অকাতরে অর্থব্যয় করে। ফ্যাসিস্ট দল এই অর্থের সাহায্যে তাদের শক্তি বাড়িয়ে নেয়।

বেনিটো মুসোলিনী এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নেন। তিনি যুদ্ধফেরত বেকার যুবকদের দ্বারা একটি আধা-সামরিক স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী তৈরি করেন। মিলান নগরের "ফ্যাসিও" সংগঠনের আদলে তিনি এই বাহিনীকে সংগঠিত করেন এবং নাম দেন 'ফ্যাসিস্ট'। ল্যাটিন "ফ্যাসেস" বা বল বা শক্তি কথাটি হতে 'ফ্যাসিস্ট' শব্দটি এসেছে। মুসোলিনী ছিলেন প্রাক্তন স্কুলশিক্ষক, শিক্ষিত ব্যক্তি, প্রাক্তন সমাজতন্ত্রী এবং "আভান্তি" পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক। তিনি এই তথ্য প্রচার করেন যে, রাষ্ট্রের উৎস হল "বল বা শক্তি" যার হাতে "বল", সেই রাষ্ট্র-পরিচালনার অধিকারী। তিনি ফ্যাসিস্ট স্বেচ্ছাসেবক বা স্কোয়াড্রিস্টিদের কালো রং-এর পোশাকে সাজান। ইতালীয় কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় নিযুক্ত করেন। তারা বলপ্রয়োগ দ্বারা কমিউনিস্ট ও শ্রমিকদের সভা-সমিতি ভেঙে দিত, ধর্মঘট ভেঙে দিত। বুর্জোয়া শিল্পপতিরা এজন্যে মুসোলিনীকে ত্রাণকর্তা মনে করে তাঁর দলের জন্যে প্রচুর অর্থ দেয়।

ফ্যাসিস্ট সংগঠন

১৯২১ খ্রীঃ নির্বাচনে ফ্যাসিস্ট দল ইতালীর আইনসভায় মাত্র ৩১টি আসন পায়। কিন্তু মুসোলিনীর ডাকে হাজার হাজার ফ্যাসিস্ট স্বেচ্ছাসেবক রাজধানী রোম ঘেরাও করে। শেষ পর্যন্ত বৈধ মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে, রাজা তৃতীয় ভিক্টর ইমান্যুয়েল মুসোলিনীকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেন। মন্ত্রিপদে বসার পর তিনি জরুরী ক্ষমতা প্রয়োগ করে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর নিজ নিয়ন্ত্রণে আনেন, আইনসভায় বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করেন, গুপ্তহত্যার দ্বারা প্রধান বিরোধী নেতাদের ধ্বংস করেন। বাকী বিরোধীরা ভয়ে রাজনীতি ছেড়ে দেন। এই সন্ত্রাস ফ্যাসিস্ট দলকে একচ্ছত্র ক্ষমতাদখলের সুযোগ এনে দেয়। ১৯২৪ খ্রীঃ তিনি যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন, তাতে বিরোধী দলের সমর্থকরা অবাধে ভোট দিতে পারেনি। মুসোলিনীর সমর্থক ফ্যাসিস্ট দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ১৯২৬ খ্রীঃ একটি সংবিধান চালু করা হয়। এর ফলে ইতালীতে একদলীয় শাসন চালু হয়। বিদ্যালয়, অফিস, পৌরসভা, শ্রমিকসংগঠন সকল ক্ষেত্রে ফ্যাসিস্ট প্রাধান্য স্থাপিত হয়। মুসোলিনী একনায়ক হিসাবে "ডুচে" (Duce) উপাধি নেন।

ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্রের সংগঠন ঃ ফ্যাসিস্ট ইতালীর আভ্যন্তরীণ সংগঠন (Dectatorship at home: Internal organisation of the Fascists) ঃ মুসোলিনী ক্ষমতা অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম হতে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত প্রশাসনযন্ত্রকে ফ্যাসিস্ট দলের হাতের মুঠোয় আনার ব্যবস্থা করেন। প্রশাসনের চূড়ায় থাকেন "ইল-ডুচে" বা স্বয়ং মুসোলিনী এবং একেবারে তলায় থাকে গ্রামের ফ্যাসিস্ট ইউনিটগুলি। ২০ জন বাছাই করা ফ্যাসিস্ট নেতা দ্বারা মুসোলিনী ফ্যাসিস্ট গ্র্যান্ড কাউন্সিল গড়েন। এটি ছিল কেন্দ্রীয় নির্ধারক পরিষদ যার নিয়ন্ত্রণ ছিল মুসোলিনীর হাতে। মুসোলিনী এই সর্বোচ্চ পরিষদের স্থায়ী সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। যে সকল কিশোর বা যুবক "আভান্ত গার্দিয়া" বা "জিওভানি ফ্যাসিস্ট" প্রভৃতি ফ্যাসিস্ট সংগঠনের সদস্য ছিল, একমাত্র তারাই সরকারী, আধা-সরকারী ও অন্যান্য চাকুরিতে নিযুক্ত হত। সেনাদল, পুলিশ, প্রশাসনের কাজে বিচক্ষণ পার্টি-কর্মীদের নিয়োগ করা হয়। ফ্যাসিস্ট স্কোয়াডিস্ট্রিদের সেনাদলে নিয়োগ করা হয়। মুসোলিনী ঘোষণা করেন যে, এখন থেকে ইতালীতে রাষ্ট্রই হবে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। জনসাধারণ রাষ্ট্রের অধীন থাকবে। রাষ্ট্র জনগণের অধীন থাকবে না। "রাষ্ট্রই হবে সকল ক্ষমতার আধার ও উৎস, রাষ্ট্রের বাইরে কিছুই থাকবে না, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন অধিকার স্বীকৃতি পাবে না" (All in the

ফ্যাসিস্ট প্রশাসন ব্যবস্থা গঠন

state, nothing outside the state, nothing against the state")। বলা বাহুল্য যে state বা রাষ্ট্র বলতে মুসোলিনী নিজেকে এবং তাঁর দলকেই বুঝতেন। এই রাষ্ট্রের প্রতীক হিসাবে প্রাচীন রোমের কন্‌সালদের ফ্যাসেস (Fasces) প্রতীক নেওয়া হয়। এই ফ্যাসেস ছিল "দণ্ড ও কুঠার" যার অর্থ হল 'বল বা শক্তি'। বলকেই রাষ্ট্রের উৎস বলে মুসোলিনী প্রচার করেন।

ফ্যাসিস্ট সরকার ১৯২৬ খ্রীঃ এক আইন দ্বারা ১৩টি সিন্ডিকেট বা কর্পোরেশন গঠন করেন। এর মধ্যে ৬টি ছিল মালিকশ্রেণী ৬টি শ্রমিকশ্রেণী ও ১টি বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা গঠিত। এই ১৩টি সিণ্ডিকেট ডুচে বা মুসোলিনীর নির্দেশে চলত। ১৯২৬ খ্রীঃ এক আদেশনামা দ্বারা ট্রেড ইউনিয়নগুলি ভেঙে দিয়ে শ্রমিক আদালত গঠন করা হয়। শ্রমিক আদালতে শ্রমিক-মালিক নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়। রায় না মানলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। কলকারখানায় ধর্মঘট ও লক আউট নিষিদ্ধ হয়। শ্রমিক ও মালিকের সিণ্ডিকেটগুলি বিভিন্ন শিল্পে মজুরির হার, শিল্প-নীতি, আমদানি-রপ্তানি নীতি স্থির করে। কেন্দ্রীয় ফ্যাসিস্ট শিল্প-মন্ত্রকের নির্দেশে সিণ্ডিকেটগুলি কাজ করতে থাকে। মুসোলিনী শিল্পে শৃঙ্খলা, উৎপাদনবৃদ্ধির উপর জোর দেন। তিনি অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা বা 'অটার্কির' লক্ষ্য নেন। মুসোলিনী বলেন যে, ফ্যাসিবাদ কেবলমাত্র একটি দলীয় মতবাদ নয়। ফ্যাসিবাদ সকল প্রকার দল ও আন্দোলনের বিরোধী (anti-party and anti-movement)। আন্দোলনের বিরোধিতার জন্যেই ফ্যাসিবাদ কমিউনিস্টদের তীব্র বিরোধী ছিল। বলপ্রয়োগ দ্বারা ফ্যাসিবাদ সকলের কাছে সম্মান আদায় করার নীতি নেয়। দার্শনিক বেনেদিতো ক্রোচি ও প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ফ্রান্সিস্‌কো নিত্তিও ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস থেকে রক্ষা পান নি। বিরোধী সংবাদগুলির কণ্ঠরোধ করা হয়। ফ্যাসি-বিরোধী সংগঠন নিষিদ্ধ করা হয়।

ফ্যাসিস্ট শ্রমিক ও শিল্প নীতি

মুসোলিনী কৃষিক্ষেত্রে গমের উৎপাদনবৃদ্ধির জন্যে জলপাই ও অন্যান্য ফলের চাষ কমিয়ে গমের চাষ বাড়ান। তিনি এর নাম দেন "গমের যুদ্ধ" (Battle of Wheat)। তিনি প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের উপর জোর দেন। পাঠ্যপুস্তক এমনভাবে রচিত হয় যার ফলে বালক-বালিকারা ফ্যাসিস্ট ভাবধারায় দীক্ষিত হয়। ফ্যাসিস্ট ভাবধারায় দীক্ষাগ্রহণ ও বন্দুকের যথেচ্ছ ব্যবহার শিক্ষাকেই ফ্যাসিস্ট সরকার তার উৎকৃষ্ট শিক্ষা বলে মনে করতেন। মশানাশক ঔষধ দ্বারা ইতালীতে ম্যালেরিয়া দমিয়ে ফেলা হয়। জলাজমি পরিষ্কার করে ফেলা হয়। গুণ্ডা ও সমাজবিরোধীদের দমিয়ে ফেলা হয়। সমাজজীবনে নিরাপত্তাবোধ ফিরিয়ে আনা হয়। মুসোলিনী ইতালীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হলেও, লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেন না। তিনি বলেন যে, "সংখ্যা না বাড়লে মান বাড়বে না।" অধিক সন্তানের জননীদের তিনি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। মুসোলিনী প্রথমদিকে নাস্তিকতা ও ক্যাথলিক গীর্জার বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন "আমি ইতালীতে সেই সকল নাস্তিক নাগরিক চাই যারা অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাসী নয়, যারা প্রগতিবাদী।" শীঘ্রই তিনি মত পাল্টান। গীর্জার সহায়তায় জনসাধারণের উপর প্রভাব-বিস্তারের কথা তিনি ভাবেন। ফলে ১৯২৯ খ্রীঃ ল্যাটেরান সন্ধি দ্বারা পোপের সঙ্গে তাঁর বিবাদের মীমাংসা হয়। তিনি গীর্জার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্যে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেন। বিদ্যালয়ে ক্রস ঝোলানো ও ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। ক্যাথলিক ধর্মকে ইতালীর রাষ্ট্রীয় অনুমোদন দেওয়া হয়।

ফ্যাসিস্ট শিক্ষা, কৃষি ও জনসংখ্যা নীতি

মুসোলিনীর মত ও পথ ভ্রান্ত ছিল এতে সন্দেহ নেই। প্রথমতঃ, তিনি গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে একনায়কতন্ত্র ও একদলীয় শাসন স্থাপন করেন যা কোনক্রমে সমর্থনযোগ্য নয়। নাগরিকদের ব্যক্তিস্বাধীনতা, আইনের শাসন, ন্যায়বিচার, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সরকার গঠনের অধিকার—সকল কিছু পবিত্র অধিকার বর্বর সামরিক শক্তির চাপে চূর্ণ করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, মুসোলিনী একটি টোট্যালিট্যারিয়ান বা সর্বাত্মক একনায়কতন্ত্র স্থাপন করেন। ফলে নাগরিকের বহির্জীবন, অন্তর্জীবন, স্বাধীন চিন্তার অধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়। তৃতীয়তঃ, বেনেদিত্তো ক্রোচের মতে, মুসোলিনী যে করপোরেটিভ বা পৌরশাসন ও স্বায়ত্তশাসন দেন, তা ছিল একটি ধোঁকা মাত্র, তাঁর একনায়কতন্ত্রকে আড়াল করার মুখোস। চতুর্থতঃ, তাঁর অর্থনীতি ছিল ভ্রান্ত। তিনি যে জমিতে জলপাই ফলে, সে জমিতে জোর করে গম চাষ করান। ফলে না গম, না জলপাই কিছুই হয়নি। তিনি লোকসংখ্যা বৃদ্ধি সমর্থন করেন, কিন্তু প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্য যোগান দিতে পারেন নি। শ্রমিকরা কম মজুরি, বেশী খাটুনি ও শাস্তির চাপে হতাশাগ্রস্ত হয়। ইতালী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিলে ইতালীর অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে মিত্রশক্তি ইতালী আক্রমণ করলে মুসালিনীর শাসনের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ দেখা দেয়। মুসোলিনীর শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। ইউনিটা পত্রিকার (১৯৪৫, এপ্রিল) বিবরণ থেকে জানা যায় যে জনৈক সেনাপতি ভ্যালেরিও মুসোলিনী ও তাঁর উপপত্নী ক্লারাপেত্রাচ্চিকে গুলি করে হত্যা করেন। মার্কিন সাংবাদিক শিরারের মতে ইতালীয় জনগণ মুসোলিনী ও তাঁর উপপত্নীকে গাছের ডালে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেয়। মার্কিন সেনাদল তাঁর দেহ রোমে সমাহিত করে।

ফ্যাসিস্ট নীতির সমালোচনা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ মুসোলিনীর আবিসিনিয়া আক্রমণ ঃ আফ্রিকা নীতি (Abyssinian Invasion ঃ African Policy) ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই উত্তর আফ্রিকার টিউনিস দখলের জন্যে ইতালী চেষ্টা করে। কিন্তু ফ্রান্সের কূটনীতি ও সামরিক শক্তির চাপে ইতালীকে পিছু হঠতে হয়। টিউনিস ফ্রান্সের অধিকারে চলে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়ায় ক্ষুব্ধ ইতালী ত্রিশক্তি-চুক্তির সদস্য হিসাবে ইংলন্ড-ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্মানীর পক্ষে ছিল। লন্ডনের গোপন চুক্তি ইতালীকে আফ্রিকায় কিছু স্থান যুদ্ধের পর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে ইতালী জার্মানীর পক্ষ ছেড়ে মিত্রশক্তির পক্ষে যোগ দেয়। কিন্তু প্যারিসের শান্তি-বৈঠকে উত্তর আফ্রিকার সাম্রাজ্য বেশির ভাগ ফ্রান্সের, বাকী অঞ্চল ইংলন্ডের হস্তগত হলে ইতালীর মন্ত্রী অর্ল্যান্ডো প্যারিসসম্মেলন ত্যাগ করেন। মুসোলিনী ক্ষমতায় আসার পর তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্যে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি সোমালিল্যান্ডের কিছু অংশ ছেড়ে দেন এবং ফ্রান্সের উপনিবেশের জিবুটি বন্দর ব্যবহারের অধিকার দেওয়া হয়। মুসোলিনী ক্ষমতায় আসার পর ইতালীর উপনিবেশ দখলের লক্ষ্য বলিষ্ঠ ভাষায় ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, "অন্য জাতির পক্ষে সাম্রাজ্যবাদ অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা হলেও, ইতালীর পক্ষে তা বেঁচে থাকার প্রধান শর্ত।" যেহেতু ইতালী তিনদিকে ভূমধ্যসাগর দ্বারা বেষ্টিত ছিল, সেহেতু মুসোলিনীর মতে, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের উপর ইতালীর দাবি ছিল ন্যায্য। এজন্য তিনি একদিকে যুগোশ্লাভিয়ার ফিয়ুম অধিকার করেন এবং আলবানিয়ার উপর আধিপত্য দাবি করেন। অপরদিকে ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণে অবস্থিত উত্তর আফ্রিকার উপনিবেশগুলি দখলের জন্যে লক্ষ্য নেন। এই অঞ্চলে ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য থাকায় ফ্রান্সের সঙ্গে ইতালীর তীব্র বিরোধ দেখা দেয়। আপাততঃ পূর্ব আফ্রিকার আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়া দখলের জন্যে তিনি ব্যস্ত হন। আবিসিনিয়া অধিকারের জন্যে

ইতালীর আবিসিনিয়া আক্রমণের কারণ

১৮৯৬ খ্রীঃ তৎকালীন ইতালীয় সরকার প্রথম চেষ্টা করেন। কিন্তু এড়োড়ার যুদ্ধে নগ্নপদ আবিসিনিয় সেনাদের হাতে ইতালীয় পরাজিত হয়। মুসোলিনী পুরাতন অপমানের প্রতিশোধ নিতে পুনরায় আবিসিনিয়া আক্রমণের উদ্যোগ নেন। আসলে তাঁর সাম্রাজ্যের ক্ষুধা তিনি কিছুটা প্রশমনের জন্যেই আগ্রাসন নীতি নেন। ব্রিটেন ও ফ্রান্স ফ্যাসিস্ট ইতালীকে হাতে রাখার জন্যে তাঁর আবিসিনিয়া অভিযানকে গোপনে সমর্থন জানায়।

১৯৩৫ খ্রীঃ ইতালীয় বাহিনীর সঙ্গে আবিসিনীয় সীমান্তের ওয়াল ওয়াল গ্রামে আবিসিনীয় সেনার সংঘর্ষ হলে আবিসিনিয়া লীগের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে। কিন্তু ইঙ্গ-ফরাসী হস্তক্ষেপে লীগ একটি কমিশন নিয়োগ করা ছাড়া আর কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেয় নি। ইতিমধ্যে ইতালী আবিসিনীয় সীমান্তে সেনা সন্নিবেশ করলে আবিসিনিয়া পুনরায় লীগের কাছে আবেদন করে। লীগের তদন্ত কমিশন যখন আবিসিনিয়ায় কর্তব্যরত ছিল, তখন ইতালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করলে, ইতালীর বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত ক্ষিপ্ত হয়। ফলে লীগ অফ নেশন্‌সের সভায় ইতালী আক্রমণকারী হিসাবে ঘোষিত হয়। ইতালীর বিরুদ্ধে লীগের চুক্তিপত্রের ১৬নং ধারা অনুসারে অর্থনৈতিক বয়কটের শাস্তিমূলক শর্ত প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু ইতালী তাতে পিছু না হঠে, লীগের সদস্যপদ ত্যাগ করে এবং নাৎসী জার্মানীর সহায়তায় আবিসিনিয়া জয় করে। এর পর ইতালী, নাৎসী জার্মানীর ঘনিষ্ঠ মিত্রে পরিণত হয়। ইতালী ছিল লীগ অফ নেশনসের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। লীগের আদর্শ ভেঙে ইতালীর এই আগ্রাসন সমগ্র বিশ্বে ধিকৃত হয়। ইতালী তাতে কর্ণপাত না করে আবিসিনিয়াকে নিজরাজ্যভুক্ত করে। ১৯৩৬ থেকে ইতালী স্পেনের গৃহযুদ্ধে ডিক্টেটর জেনারেল ফ্র্যাঙ্কোর পক্ষ নেয় এবং রোম-বার্লিন জোট গড়ে। ১৯৪০ খ্রীঃ ইতালী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয় এবং আফ্রিকায় ইঙ্গ-ফরাসী উপনিবেশ আক্রমণ করে।

ইতালীর আবিসিনিয়া অভিযান

[খ] চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ জার্মানীতে নাৎসী দলের উত্থান (Rise of Hilter and Nazi Party in Germany) ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে জার্মানীতে প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে কাইজার সরকারের পতন ঘটে। জার্মানীতে ভাইমার প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। ১৯৩৩ খ্রীঃ পর্যন্ত জার্মানীতে ভাইমার প্রজাতন্ত্র বহাল থাকে। ১৯৩৩ খ্রীঃ নাৎসী বিপ্লবের ফলে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পতন হয়। নাৎসীদলের অভ্যুত্থানের পশ্চাতে নাৎসী নেতা এডলফ হিটলারের প্রধান অবদান ছিল। হিটলারের জন্ম হয় অস্ট্রিয়ার লিনৎস নগরে। কিশোর বয়সে তিনি পিতাকে হারান এবং কিছুদিন বাদে তাঁর মাতাকেও হারান। তিনি লিনৎস হাইস্কুল থেকে পাস করেন এবং মাতৃভাষা জার্মান ছাড়া আর কোন ভাষা জানতেন না। তিনি ভিয়েনায় চারুকলা কলেজে ভর্তির চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তিনি ভিয়েনার সরকারী পাঠাগারে কিছুকাল নিজে নিজে পড়াশোনা করেন। এই সময় তাঁর মনে প্যান জার্মানবাদের আদর্শ জাগে। সারা জীবন প্যান জার্মানবাদ অর্থাৎ জার্মান ভাষাভাষী জাতির ঐক্য ও বৃহৎ জার্মানী প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তাঁকে প্রভাবিত করে। ইতিমধ্যে তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সৈনিকের কাজে যোগ দেন এবং বীরত্বের জন্যে 'আয়রণ ক্রস' লাভ করেন।

হিটলারের প্রথম জীবন

যুদ্ধ শেষ হলে জার্মানীর পরাজয় তাঁকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। এই পরাজয়ের জন্যে তিনি জার্মান ইহুদিশ্রেণীর চক্রান্ত এবং ভাইমার প্রজাতন্ত্রের শান্তি-নীতিকেই দায়ী করেন। ভাইমার প্রজাতন্ত্র ভার্সাই-সন্ধি স্বাক্ষর করায় তিনি এই কাজকে জার্মানীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে প্রচার চালান। আসলে হিটলার ছিলেন সুযোগ-সন্ধানী। তিনি ভার্সাই-সন্ধি স্বাক্ষরের জন্য ভাইমার সরকারের

হিটলারের ভার্সাই সন্ধি বিরোধিতা ও অন্ধ জাতীয়তাবাদ

সমালোচনা দ্বারা জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

হিটলার নাৎসীদলে যোগ দেন। ড্রেক্সলার নামে এক ব্যক্তি এই দল স্থাপন করেন। হিটলার যখন এই দলে যোগ দেন, তখন দলের ভগ্নদশাগ্রস্ত অবস্থা ছিল। তিনি দলের নেতৃত্ব নেওয়ার পর নাৎসীদলের সদস্য বাড়তে থাকে। জার্মানীতে তখন রোজা লাক্সেমবার্গের নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা বিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠে। জার্মান কমিউনিস্টদের নাম ছিল স্পার্টাশিস্ট। এই গোষ্ঠী জার্মানীর ব্যাভেরিয়া প্রদেশে একটি প্রতি-সরকার স্থাপন করে এবং কলকারখানায় ধর্মঘট চালাতে থাকে। এর ফলে ভাইমার বুর্জোয়া ও শিল্পপতিগোষ্ঠী ভয় পায় যে, দুর্বল ভাইমার প্রজাতন্ত্র জার্মান কমিউনিস্টদের রুখতে পারবে না। জার্মানীতে কমিউনিস্ট শাসন স্থাপিত হবে। তারা নাৎসীদলকে প্রচুর অর্থসাহায্য করে। হিটলার বেকার যুবক ও যুদ্ধফেরত বেকার সেনাদলের দ্বারা S. A. বা ঝটিকা বাহিনী নামে এক আধা-সামরিক বাহিনী গড়েন। তিনি সাধারণ নির্বাচনের সময় ঝটিকা-বাহিনী দ্বারা কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রী দলগুলিকে ভেঙে দেন। শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকেও তিনি ভেঙে দেন।

নাৎসী দল গঠন

ভাইমার প্রজাতন্ত্র যুদ্ধোত্তর অর্থসঙ্কট ও মিত্রশক্তির ক্ষতিপূরণের চাপে বেসামাল হয়ে পড়ে। খাদ্যাভাব ও বেকার-সমস্যা দারুণভাবে বেড়ে যায়। নাৎসী-নেতা হিটলার প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি ক্ষমতায় এলে বেকারদের চাকুরি দিবেন এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান নাকচ করে জার্মান অর্থনীতি মজবুত করবেন। সর্বোপরি, তিনি ভার্সাই-সন্ধি পরিবর্তন করতে মিত্রশক্তিকে বাধ্য করবেন। নাৎসীদলের প্রবল প্রচার এবং হিটলারের উন্মাদনাময়ী উগ্র জাতীয়তাবাদী ভাষণ নাৎসী-যুবশক্তিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ঐতিহাসিক রবার্ট এরগ্যাং (Robert Ergang)-এর মতে নাৎসীদলের সফলতার অন্যতম কারণ ছিল এই দলের মিথ্যা প্রচারের ক্ষমতা। নিরন্তর প্রচার দ্বারা নাৎসীরা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়।সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে জার্মান পার্লামেন্ট বা রাইখস্ট্যাগ অগ্নিদগ্ধ হয়। হিটলার এজন্যে মিথ্যা প্রচার দ্বারা জার্মান কমিউনিস্টদের দায়ী করেন। অর্থনৈতিক দুর্দশাগ্রস্ত জার্মানীর নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণীও হিটলারের অনুগত হয়ে পড়ে। ১৯৩০ খ্রীঃ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সঙ্কটের আঘাতে ভাইমার জার্মানীর অর্থনীতি তছনছ হয়ে যায়। এই দুর্দিনে লোকে ভাবতে থাকে যে হিটলারই তাদের রক্ষা করতে পারবেন। ইতিমধ্যে ভাইমার জার্মানীতে সাধারণ নির্বাচন এসে যায়।

হিটলার ও নাৎসী দলের উত্থান

সাধারণ নির্বাচনে নাৎসী দল ১২ জন সদস্যের স্থলে ১০৭ জন সদস্য আইনসভায় পাঠাতে সক্ষম হয়। নাৎসীদল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে রাষ্ট্রপতি হিন্ডেনবুর্গ নাৎসী-নেতা হিটলারকে চ্যান্সেলার বা প্রধানমন্ত্রী-পদে (১৯৩৩ খ্রীঃ) নিয়োগ করেন। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতি হিন্ডেনবুর্গের মৃত্যু হয়। হিটলার ভাইমার সংবিধানের ৪৬ নং ধারা প্রয়োগ করে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। তিনি সংবিধান ও পার্লামেন্ট মুলতবি করেন। হিটলার একাধারে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা নিজহাতে নিয়ে নিজেকে 'ফ্যুয়েরার' (Fuehrar) ঘোষণা করেন। এই পদটি ছিল সংবিধান-বহির্ভূত, একনায়কতন্ত্রের পদ। এইসঙ্গে নাৎসীদল সরকারের সকল ক্ষমতা নিজেহাতে নেয়। জার্মানীতে নাৎসী-বিপ্লব সম্পন্ন হয়। হিটলারের আত্মজীবনীর নাম 'মেইন ক্যাম্ফ' (Mein Kamph)। এই জার্মান কথাটির ইংরাজী অর্থ হল My Campaign, বাংলা অর্থ হল 'আমার সংগ্রাম'। এই গ্রন্থটিকে নাৎসীবাদের বাইবেল বলা যায়। গবেষকদের মতে গ্রন্থটিতে আছে ১০% আত্মজীবনী, ৯০% তত্ত্ব, সর্বমোট ১০০% প্রচার। গ্রন্থটির ৭৮২ পৃষ্ঠা জুড়ে শুধু আত্মপ্রচার ও নাৎসী-তত্ত্বের বিশ্লেষণ, জার্মানীর সমস্যা সমাধানে নাৎসীবাদের প্রয়োগের কথা আছে।

হিটলারের ক্ষমতা লাভ : নাৎসী বিপ্লব : মেইন ক্যাম্ফ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ নাৎসীদলের সংগঠন-নীতি ও জার্মানীর নাৎসীকরণ (Nazi Party and its organisation and Nazification of Germany)ঃ নাৎসী (Nazi) কথাটির ইংরাজী অর্থ National Socialist বা জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদী। নাৎসীদলের আদর্শ, সংগঠন ও কর্মধারার উদ্ভাবক ছিলেন দলনেতা এডলফ হিটলার। প্রতি নাৎসী তাঁকে 'ফ্যুয়েরার' বলে সম্বোধন করত এবং তাঁকে অসাধারণ বুদ্ধিমান ও প্রতিভার অধিকারী বলে বিশ্বাস করত। ফ্যুয়েরারের প্রতি অন্ধ এবং নির্বিচার আনুগত্য, তাঁর নির্দেশ বিনা বিচারে মেনে নিয়ে তা সফল করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়াই ছিল নাৎসীদলের সংগঠন-নীতি। নাৎসীদলের বিভিন্ন শাখা ছিল, যথা S.A. বা ঝটিকাবাহিনী, হিটলারের যুবগোষ্ঠী (Hitler's Youth), হিটলারের নারীবাহিনী S.S. বা রক্ষীবাহিনী প্রভৃতি। দলের কার্যধারা পরিচালনার জন্যে হিটলার তাঁর বিশ্বস্ত সহকারীদের উপর নির্ভর করতেন। পরে তিনি সরকার দখল করার পর এই সহকারীরা উচ্চপদে নিযুক্ত হন। নাৎসীদলে দলনেতার নির্দেশের বিরুদ্ধে কোন প্রশ্ন করা চলত না। কারণ তিনি ছিলেন 'অভ্রান্ত' (Infallible)। এজন্য তিনি ছিলেন ফ্যুয়েরার। নাৎসীবাদই একমাত্র সঠিক মতবাদ, অন্য সকল মতবাদ ভ্রান্ত; এই চিন্তাধারা নাৎসী পত্র-পত্রিকায় নিরন্তর প্রচার করা হত। বিখ্যাত জার্মান সঙ্গীতজ্ঞ ভাগনারের সঙ্গীত "জাগ্রত জার্মানী" (Germany Awake)-কে তিনি জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে বেছে নেন। নাৎসী স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীকে বাদামী রংএর পোশাক দেওয়া হয়।

নাৎসীবাদ জাতি-বৈরীতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। নাৎসীতত্ত্ববিদ কার্ল হসোফার (Karl Hausofar) প্রভৃতি বুদ্ধিজীবী ছিলেন এই তত্ত্বের প্রচারক। তাঁরা বলেন যে, বিশ্বের সকল জাতির মধ্যে শ্বেতাঙ্গজাতি শ্রেষ্ঠ। কারণ তারা সংস্কৃতি এবং সভ্যতার রচনাকারী ও রক্ষাকারী। শ্বেতাঙ্গ জাতিগুলির মধ্যে জার্মানরাই শ্রেষ্ঠ। তারা হল আর্যজাতির বংশধর। জার্মানদের মধ্যে নাৎসীরাই হল সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এলাইট (Elite)। তাঁর মতে ইহুদী ও নেগ্রোইট জাতিগুলি ছিল সংস্কৃতির ধ্বংসকারী। যদিও হিটলারের এই জাতিতত্ত্ব ছিল ভ্রান্ত, তিনি সকল নাৎসীকে এইভাবে বিশ্বাসী হতে বাধ্য করেন। হিটলার প্রচণ্ড ইহুদীবিদ্বেষী ছিলেন। জার্মানীতে ইহুদীদের অকারণ হত্যা, নির্যাতন করা হয়। বহু ইহুদী এবং স্বাধীন চিন্তাশীল, প্রতিবাদী জার্মানকে নিহত করা হয়। বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানী ইহুদী আলবার্ট আইনস্টাইন নিজদেশ জার্মানী ছেড়ে আমেরিকায় আশ্রয় নেন। জার্মানীতে নাৎসীবাদের সমালোচনাকারীদেরও নাৎসী গোপন পুলিশ 'গেস্টাপো' নিহত করে। হিটলার তাঁর নাৎসীবাহিনী, সেনাদল, সরকারী কর্মচারী সকলকে 'স্বস্তিকা' ব্যাজ পরতে বাধ্য করেন। 'স্বস্তিকা' ছিল দলের চিহ্ন। হিটলারের গোপন পুলিশবাহিনীর প্রধান ছিলেন কুখ্যাত হিমলার, আর তাঁর ইহুদী নির্যাতন বিভাগের প্রধান ছিলেন আইখ্ম্যান। হিটলারের ঘনিস্ট সহকারী ছিলেন গোয়েরিং এবং প্রচারসচিব ছিলেন দর্শনের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ গোয়েবল্স।

নাৎসী যুব ও স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর আধা-সামরিক সংগঠন ঃ নাৎসীকরণ নীতি

(১) হিটলার ক্ষমতায় আসার পর জার্মানীতে বিরোধী দলগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। ১৪ই জুলাই, ১৯৩৩ খ্রীঃ একটি আইন দ্বারা নাৎসীদলকেই একমাত্র বৈধ রাজনৈতিক দলের মর্যাদা দেওয়া হয়। জার্মানীর ১৭টি প্রদেশে হিটলার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। এঁদের সাহায্যে প্রাদেশিক শাসনযন্ত্রের নাৎসীকরণ করা হয়। নাৎসী-নেতৃত্বে শ্রমিক ফ্রন্ট তৈরি করা হয়। শ্রমিক ফ্রন্টের সাহায্যে শিল্প-উৎপাদন বাড়ানো হয়। (২) সরকারী কর্মচারীদের নাৎসীবাদের প্রতি

একনায়কতন্ত্র গঠন : নাৎসী একদলীয় শাসন প্রবর্তন : নাৎসীকরণ

আনুগত্যের শপথ নিতে হয়। (৩) ইহুদীদের সঙ্গে জার্মানদের বিবাহ নিষিদ্ধ হয়। ইহুদীদের জার্মানীতে অবাঞ্ছিত বলে ঘোষণা করা হয়। (৪) পিপল্‌স কোর্ট বা গণ-আদালত স্থাপন করে রাজনৈতিক মামলার বিচার আইনজীবীর সাহায্য ছাড়া করা হয়। (৫) নাৎসী গুপ্ত পুলিশ বা গেস্টাপো যে-কোন ব্যক্তিকে বিনাবিচারে গ্রেপ্তার ও আটক রাখার অধিকার পায়। (৬) বন্দীনিবাসে বহু লোককে বছরের পর বছর বিনাবিচারে বন্দী করে রাখা হয়। (৭) জার্মানজাতি ও তার শিক্ষাব্যবস্থাকে Nazi regimention বা নাৎসী-ছাঁচে ঢেলে ফেলা হয়। বিদ্যালয় থেকে অ-জার্মান ও ইহুদী শিক্ষকদের বিতাড়িত করা হয়। পাঠ্য-পুস্তকগুলি নাৎসী আদর্শে রচিত হয়। জার্মান-জাতির শ্রেষ্ঠত্বকে জার্মান সাহিত্য, ইতিহাসের উপজীব্য করা হয়। সর্বত্র ফ্যুয়েরারের শ্রেষ্ঠত্বের শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্যবহারিক বিজ্ঞান, কারিগরী শিক্ষা দ্রুত দেওয়া হয়। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়।

জার্মান অর্থনৈতিক সংগঠনকে ঢেলে সাজানো হয়। ডঃ শাখট নামে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদের পরামর্শক্রমে স্কুল, কলেজ, কারখানা সর্বত্র পালা-প্রথা বা শি ফ্‌ট (Shift)-প্রথা চালু হয়। ফলে আপাততঃ উৎপাদন বাড়ে এবং বেশী লোক কাজ পায়. জার্মানীর পুরুষদের কর্মসংস্থান বাড়াবার জন্যে নারীদের গৃহকর্ম করার পরামর্শ দেওয়া হয়। 'কিণ্ডার, কারশি, কুশি (Kinder, Kirche, Kuche) অর্থাৎ সন্তানপালন, ধর্মচর্চা ও রন্ধন তাঁদের প্রধান কর্তব্যকর্ম বলা হয়। ১৯৩৫ খ্রীঃ চতুর্থ বার্ষিক পরিকল্পনার দ্বারা জার্মানীতে খাদ্য, শিল্প ও অস্ত্র নির্মাণে স্বয়ম্ভরতার লক্ষ্য নেওয়া হয়। জার্মানীর সামরিক শক্তিবৃদ্ধির জন্যে ভার্সাই-সন্ধি ভেঙে জার্মান সেনাদল ও সমর-যন্ত্র গঠন করা হয়। জার্মানদের বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করতে বলা হয়।

হিটলারের ঝটিকাবাহিনী শ্রমিক ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট সংগঠনগুলি বলপূর্বক ভেঙ্গে দেয়। তার পরিবর্তে শ্রমিক ফ্রন্ট গঠন করা হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ নাৎসী জার্মানীর ভার্সাই-সন্ধি ভঙ্গ : জার্মানীর অস্ত্রসজ্জা (Nazi Germany's offensive against the Versailles Treaty: German Rearmament after 1933): ভার্সাই-সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরেই জার্মান জাতীয়তাবাদীরা এই সন্ধির কঠোর শর্তগুলির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। (অষ্টম অধ্যায় ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ পৃঃ ১৩৪ দ্রষ্টব্য)। হিটলার ক্ষমতা অধিকারের আগেই ভার্সাই-সন্ধির বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন। জার্মানীর সর্ব-নিয়ন্তা পদে বসার পর তিনি প্রচারযন্ত্র, কূটনীতি দ্বারা ভার্সাই-স্থিতাবস্থাকে ভেঙে ফেলার উদ্যোগ নেন। এ্যালান বুলক প্রভৃতি ঐতিহাসিক বলেন যে, হিটলারের বৈদেশিক নীতির মূল লক্ষ্য ছিল ইওরোপে জার্মানীকে প্রধান শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা। এই লক্ষ্যপূরণের প্রধান বাধা ছিল ভার্সাইয়ের সন্ধি। এই সন্ধির নানা বাধা-নিষেধের বেড়াজালে বন্দী থাকায় জার্মানীকে নিরস্ত্রীকৃত করায় জার্মানীর পক্ষে বিস্তার-নীতি নেওয়া সম্ভব হয় নি। এজন্যে ভার্সাই-সন্ধির দ্বারা জার্মান জাতীয়তাবাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ প্রচার করে হিটলার ভার্সাই সন্ধি ও তার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্থিতাবস্থা ভেঙে ফেলার উদ্যোগ নেন। এ·জে·পি· টেইলার (A.J.P. Taylor) নামে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এই অভিমত অগ্রাহ্য করেছেন। তিনি বলেন যে, বিশ্বব্যাপী এমনকি ইওরোপব্যাপী জার্মানসাম্রাজ্য গঠনের কোন হিটলারী পরিকল্পনার প্রমাণ পাওয়া যায় না। কারণ হিটলার বিমান ও স্থল বাহিনী গঠনে যে যত্ন নেন, নৌ-বাহিনীকে সেই তুলনায় গৌণ স্থান দেন। অথচ ইওরোপের বাইরে বিস্তারনীতি একমাত্র নৌবল দ্বারাই

নাৎসী বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য : ভার্সাই সন্ধি ভঙ্গ :

সফল করা সম্ভব ছিল। হিটলার পূর্ব ইওরোপে সাম্রাজ্যের প্রসারের লক্ষ্য নেন। জার্মানীর দুই সেনাপতি ইওরোপে জার্মান আধিপত্য স্থাপনের দুই প্রকার সামরিক পরিকল্পনা রচনা করেন। স্লিফেন (Schlieffen Plan) পরিকল্পনায় বলা হয় যে, জার্মানী পশ্চিমে ফ্রান্সের কিছু অঞ্চলে ও উত্তর-পশ্চিমে বেলজিয়াম-হল্যান্ডের উপকূল দখল করে ইওরোপে তার বিস্তার-নীতিকে সফল করতে পারে। এর বিকল্প পরিকল্পনার নাম ছিল হফম্যান পরিকল্পনা (Hoffmann Plan)। এই পরিকল্পনায় পূর্ব ইওরোপ এবং রাশিয়ার কিছু অঞ্চল দখল দ্বারা জার্মানীর বিস্তার নীতিকে সফল করার কথা বলা হয়। নাৎসী নেতারা হফম্যান পরিকল্পনাকে আঁকড়ে ধরেন বলে এ·জে·পি টেইলর ও বেশ কিছু ঐতিহাসিক মনে করেন। পূর্ব ইওরোপে জার্মান প্রসার-নীতির পথে প্রধান বাধা ছিল ভার্সাই-সন্ধির শর্তগুলি। এজন্যে তিনি ভার্সাই-সন্ধির বিরুদ্ধে জার্মান জাতীয়তাবাদের প্রতি বৈষম্যের অভিযোগ আনেন। তা ছাড়া তিনি সকল জার্মান ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করে তৃতীয় রাইখ্ (Third Reich) বা জার্মানীর তৃতীয় প্রজাতন্ত্র গঠনের লক্ষ্য ঘোষণা করেন। এই প্রজাতন্ত্রের জার্মান জনসংখ্যার "লেবেন্‌স্‌রাউম" (Lebensraum) বা বাসস্থানের এবং হেরেনফোকের বা জার্মান ভাষাভাষী শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রগঠনের লক্ষ্য তিনি গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল তাঁর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসগ্রন্থে অবশ্য হিটলারকে কেবলমাত্র ভার্সাই-সন্ধির ভঙ্গকারী বলে চিত্রিত করেন নি। তাঁর মতে ইওরোপে আধিপত্য স্থাপনের পর হিটলার বিশ্বে জার্মানীকে প্রধান শক্তি হিসাবে স্থাপনের জন্যে উপনিবেশ নীতির লক্ষ্যও নেন।এ·জে·পি টেইলার অবশ্য এইমতের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। কার্য্যক্ষেত্রে হিটলার ইওরোপের বাইরে প্রসার নীতি গ্রহণের সুযোগ পান নি। তাঁর ভার্সাই-সন্ধি ভঙ্গের নীতির ফলে তিনি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন এবং তাঁর পতন হয়।

হিটলার প্রথমে ভার্সাই-সন্ধির দ্বারা জার্মান জাতীয়তাবাদের প্রতি বৈষম্যের কথা প্রচার করে, ভার্সাই-সন্ধির নৈতিক ভিত্তি দুর্বল করে দেন। জার্মানীর প্রচারের ফলে বিশ্ব জনমত বিশ্বাস করতে থাকে যে, ভার্সাই-সন্ধির দ্বারা জার্মানীর উপর ঘোরতর অবিচার করা হয়েছে।

ভার্সাই সন্ধি বিরোধী প্রসারের উদ্দেশ্য

জার্মান লেখকরা "জবরদস্তি সন্ধি" (Peace Diktat) নামে এই সন্ধিকে অভিহিত করেন। (২) হিটলার বিশ্ব-নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন থেকে জার্মান প্রতিনিধি প্রত্যাহার করেন এই যুক্তিতে যে. এই সম্মেলনে জার্মানীর প্রতি বৈষম্য দেখানো হয়েছে। কারণ ভার্সাই-সন্ধির দ্বারা জার্মানীকে নিরস্ত্রীকৃত করলেও ফ্রান্সের অস্ত্র হ্রাস করা হয় নি। সুতরাং তিনি দাবি করেন যে, হয় জার্মানীকে ফ্রান্সের সম-পরিমাণ অস্ত্র রাখতে দিতে হবে, নতুবা ফ্রান্সের অস্ত্র হ্রাস করে জার্মানীর সমান করতে হবে। এই দাবী নাকচ হলে জার্মানী নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ত্যাগ করে।

এর পর জার্মানী পোল্যান্ডের সঙ্গে ১৯৩৪ খ্রীঃ পোল-জার্মান-চুক্তির দ্বারা পোল্যান্ডকে ১০ বছর আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি এবং পরস্পরের বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে মিটাতে প্রতিশ্রুতি দেয়। পোল-জার্মান চুক্তির দ্বারা ফ্রান্সের সঙ্গে পোল্যান্ডের জার্মান-বিরোধী জোট হিটলার ভেঙে ফেলেন। ফ্রান্স ও পোল্যান্ডকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে তিনি একে একে গ্রাস করার নীতি নেন। Allan Bullock-এর মতে, এভাবে হিটলারের one by one নীতি আরম্ভ হয়, যা ভার্সাই স্থিতাবস্থাকে ধ্বসিয়ে দেয়।

পোল-জার্মান চুক্তি

ইতিমধ্যে ভার্সাই-সন্ধির পঞ্চম অনুচ্ছেদ ভেঙে ফেলে নাৎসী জার্মানী অস্ত্রসজ্জা আরম্ভ করে। ১৯৩৫ খ্রীঃ ব্রিটেন ইঙ্গ-জার্মান নৌ-চুক্তি সম্পাদন করে ব্রিটিশ নৌবহরের ৩৫% পর্যন্ত

নৌবহর নির্মাণের অধিকার জার্মানীকে দেয়। এর ফলে ব্রিটেন নীতিগতভাবে জার্মানীর অস্ত্রসজ্জার অধিকার মেনে নেয়। গর্ডন ক্রেইগ নামে ঐতিহাসিকের মতে, ১৯৩৫ খ্রীঃ হিটলার ঘোষণা করেন যে "তিনি ভার্সাই-সন্ধির নিরস্ত্রীকরণের শর্ত আর মানবেন না।" জার্মানীর স্থল বাহিনীর শক্তি আপাততঃ ৩৬ ডিভিশনে উন্নীত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়। ক্রমে জার্মানীর বায়ু ও নৌ-বাহিনীও তৈরী হয়। জার্মান বায়ু সেনা বা লুফৎভাফে (Luftwaffe) তৎকালে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বায়ুসেনার গৌরব অর্জন করে। জার্মান স্থলবাহিনীকে যন্ত্রের সাহায্যে যান্ত্রিক বাহিনী বা প্যানৎসার (Panzer) বাহিনীতে পরিণত করা হয়। ট্যাঙ্ক ও মোটর বাহিনী, মোটর চালিত কামান দ্বারা স্থল বাহিনীকে দ্রুতগামী ও আক্রমণমুখী করা হয়। এই সঙ্গে হিটলার মুখে শান্তিনীতির প্রতি তাঁর আস্থা জানাতে থাকেন। তিনি বলেন যে, "গত একশত বৎসরের ইতিহাস থেকে ফ্রান্স ও জার্মানী এই শিক্ষা নিয়েছে যে, অস্ত্রের দ্বারা পরস্পরের সমস্যার সমাধান হবে না"। বলা বাহুল্য হিটলার মুখে যাই বলুন, তিনি মনের দিক থেকে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি নেন।

জার্মানীর অস্ত্রসজ্জা

১৯৩৫ খ্রীঃ ইতালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করলে, হিটলার তাঁকে অস্ত্রসাহায্য দেন। এর ফলে লীগের বিরুদ্ধে আগ্রাসন নীতির জন্ম হয়। ইতালীর পথ ধরে নাৎসী জার্মানীও ১৯৩৬ খ্রীঃ ভার্সাই সন্ধির শর্ত ভেঙ্গে হিটলার জার্মান বাহিনী রাইনল্যান্ডে ঢুকিয়ে দেন। এর পর তিনি ভার্সাই-সন্ধি ভাঙ্গার জন্যে ইতালীর সঙ্গে জোট গড়েন। এই জোটের নাম ছিল রোম-বার্লিন অক্ষ জোট। এই জোটের পোশাকী নাম ছিল কমিউনিস্ট প্রতিরোধ চুক্তি (Anti-Commintern Pact)। এই জোট গড়ে হিটলার তাঁর কূটনৈতিক অবস্থানকে দৃঢ় করেন। ভার্সাই-সন্ধির দ্বারা জার্মানীর মিত্রহীনতা দূর হয়। ১৯৩৮ খ্রীঃ হিটলার ব্রিটেনের পরোক্ষ সম্মতিক্রমে অষ্ট্রিয়াকে জার্মানীর সঙ্গে সংযুক্ত করেন। তিনি এই নীতির নাম দেন আনশ্লুস (Anschluss) নীতি। হিটলার অস্ট্রিয়া দখলের পশ্চাতে যুক্তি দেখান যে অস্ট্রিয়া ও জার্মানী দুটি দেশের অধিবাসীরা হল জার্মান। কাজেই হেরেনাফোক বা প্যান-জার্মান তত্ত্ব অনুসারে জার্মান জাতীয়তাবাদের স্বার্থে অস্ট্রিয়ার জার্মানীর সঙ্গে মিলনের দরকার। তাহলে জার্মানরা তাদের বাঁচবার জায়গা বা লোবেনস রাউম পাবে। ভার্সাই ও সেন্ট জার্মেইন চুক্তি দ্বারা দুই দেশের পৃথকীকরণকে তিনি নস্যাৎ করেন। একই জাতীয়তাবাদী দোহাই দিয়ে তিনি চেকোস্লোভাকিয়ার কাছ থেকে মিউনিক চুক্তি (১৯৩৮) দ্বারা সুদেতেন জেলা দখল করেন। কারণ সুদেতেন জেলার বেশির ভাগ অধিবাসী ছিল জার্মান। ভার্সাই সন্ধির দ্বারা এই জেলা চেকোস্লোভাকিয়াকে দেওয়া হয়। হিটলারের যুদ্ধং দেহি মনোভাব দেখে এবং সুদেতেন জেলার জার্মানদের পিতৃভূমিতে ফিরিয়ে দিতে দাবি করায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেইন বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে মিডনিখ্-চুক্তি দ্বারা সুদেতেন জেলা জার্মানীকে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। অবশিষ্ট চেকোস্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে হিটলার প্রতিশ্রুতি দেন। চেম্বারলেইনের এই নীতিকে নাৎসী-তোষণনীতি বলা হয়। কিছুদিন বাদে তিনি মিডনিখ্-চুক্তি ভেঙে গোটা চেকোস্লোভাকিয়া গ্রাস করেন। এর পর তিনি ১৯৩৯ খ্রীঃ পোল্যান্ড আক্রমণ করলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে ভার্সাই-সন্ধি একতরফা ভাবে ভাঙার জন্যে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ রোম-বার্লিন অক্ষচুক্তি ঃ ১৯৩৬ খ্রীঃ জাপানের যোগদান (Rome-Berlin Axis 1936: Japan joins it) ঃ ১৯৩৫ খ্রীঃ ফ্যাসিস্ট ইতালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করার পর ফ্যাসিষ্ট ইতালী ও নাৎসী জার্মানীর মধ্যে মিত্রতার সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তা রোম-বার্লিন অক্ষ-চুক্তিতে পরিণত হয়। ঐতিহাসিক এ· জে· পি·

টেলরের মতে, "হিটলার ছিলেন জার্মানীর তৃতীয় বিসমার্ক"।[১] তিনি চিন্তা করে দেখেন যে, ভার্সাই-সন্ধির দ্বারা জার্মানীকে মিত্রহীন অবস্থায় রেখে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি জার্মানীকে কোণঠাসা করেছে। তিনি জার্মানীর এই মিত্রহীনতা ভেঙে ইঙ্গ-ফরাসী জোটের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট জোট হিসাবে জার্মানী ও ইতালীর মৈত্রী-চুক্তি গড়ার পরিকল্পনা করেন। দ্বিতীয়তঃ, ইতালী ছিল ফ্রান্সের শত্রু। সুতরাং ফ্রান্স জার্মানীকে আক্রমণ করলে পিছন থেকে ইতালীর দ্বারা ফ্রান্সকে আক্রমণ করার সম্ভাবনার কথা হিটলার চিন্তা করেন। তৃতীয়তঃ, জার্মানীর মতই ইতালী ছিল ভার্সাই-শান্তি-চুক্তিগুলির বিরোধী। কারণ এই চুক্তির দ্বারা ইতালীকে কোন স্থান ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া হয় নি। তাছাড়া, ফ্যাসিবাদী ইতালীর সঙ্গে নাৎসীবাদী জার্মানীর আদর্শগত মিল ছিল।সুতরাং ইতালীর সহায়তায় হিটলার ভার্সাই সন্ধি ভেঙে ফেলার কথা বিবেচনা করেন।

রোম-বার্লিন অক্ষ চুক্তির উদ্দেশ্য

১৯৩৫ খ্রীঃ ইতালীর বিরুদ্ধে লীগের বয়কট ঘোষিত হলে জার্মানী এই বয়কট অগ্রাহ্য করে ইতালীকে আবিসিনিয়া যুদ্ধে সামরিক সাহায্য দেয়। এর ফলে মুসোলিনী নাৎসী জার্মানীর প্রতি আকৃষ্ট হন। স্পেনের গৃহযুদ্ধে জার্মান বিমানবহরের কার্যকারিতা দেখে তিনি চমৎকৃত হন। জার্মানী পরিদর্শনের সময় জার্মানীর সমরসজ্জা দেখে মুসোলিনীর বিশ্বাস জন্মায় যে, যুদ্ধ বাধলে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির বিরুদ্ধে জার্মানীর জয়লাভ সুনিশ্চিত। ভূমধ্যসাগরে ও উত্তর আফ্রিকায় ইতালীর আধিপত্যবিস্তারের দাবি সম্পর্কে তিনি জার্মানীর সহায়তার আশ্বাস পেয়ে সন্তুষ্ট হন। ১৯৩৬ খ্রীঃ ফ্যাসিস্ট ইতালী ও নাৎসী জার্মানী **এ্যান্টি-কমিন্টার্ন প্যাক্ট** বা **কমিউনিজম-বিরোধী চুক্তি** স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি ছিল দৃশ্যতঃ সোভিয়েত রাশিয়ার কমিউনিজমের বিরুদ্ধে। এই মৈত্রী ক্রমে ঘনীভূত হয়ে রোম-বার্লিন অক্ষচুক্তিতে পরিণত হয়। ইতালী ও জার্মানী এই চুক্তির দ্বারা এক রাজনৈতিক ও সামরিক জোট তৈরি করে। উভয় দেশ দ্রুত সমরসজ্জা চালাতে থাকে এবং পারস্পরিক সহায়তায় প্রতিবেশী-রাষ্ট্রের উপর আগ্রাসন চালায়। এই জোট আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্থিতিকে বিপদগ্রস্ত করে।

রোম-বার্লিন এ্যান্টি-কমিন্টার্ণ চুক্তি

এদিকে দূরপ্রাচ্যে জাপান ১৯৩১ খ্রীঃ মাঞ্চুরিয়া অধিকারের পর চীনের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের জন্যে প্রস্তুত হয়। ১৯৩৬ খ্রীঃ জাপান দ্বিতীয়বার চীন আক্রমণ করে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মিত্রহীনতা দূর করার জন্যে এবং ইংলন্ড ও আমেরিকা যাতে সহসা মিত্রহীন জাপানকে বাধা দিতে সাহসী না হয়, এজন্যে জাপান ইংলন্ডের বিরোধী রোম-বার্লিন অক্ষজোটে সেপ্টেম্বর ১৯৪১ খ্রীঃ যোগ দেয়। ফলে দূরপ্রাচ্যেও অক্ষ-জোটের প্রভাব পড়ে। এই জোটের সদস্য নাৎসী জার্মানী, ফ্যাসিস্ট ইতালী ও জাপান কোন আন্তর্জাতিক আইন মান্য করত না। বাহুবলকেই শ্রেষ্ঠ মনে করত। তারা সাম্রাজ্যবাদী ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির দ্বারা স্থাপিত ১৯১৯ খ্রীঃ চুক্তিগুলি ও তার স্থিতাবস্থাকে যুদ্ধের ও আগ্রাসনের দ্বারা ভেঙে ফেলে নিজ নিজ স্বার্থ স্থাপনের নীতি নেয়। জাপান দূরপ্রাচ্যে চীনকে আক্রমণ করে ও স্থিতাবস্থা ভেঙ্গে ফেলে। বিশ্বযুদ্ধের দিকে পৃথিবী এগিয়ে যেতে থাকে।

জাপানের অক্ষ চুক্তিতে যোগদান : অক্ষ চুক্তির আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া

অষ্টম পরিচ্ছেদ : নাৎসী-তোষণ নীতি : মিউনিক-চুক্তি : ইঙ্গ-ফরাসী ও ইওরোপের অন্যান্য শক্তিগুলির নাৎসী-জার্মানী সম্পর্কে নীতি (Anglo-French Policy of Appeasement towards Nazi Germany : Munich pact : the Policy of European Powers

---

১· A.J.P. Taylor.

towards Nazi Germany) : নাৎসী জার্মানীর অস্ত্রসজ্জা এবং নাৎসী নেতা হিটলারের জার্মান জাতীয়তাবাদের পরিপূর্ণতার দাবিপূরণের জন্যে রণহুঙ্কার ইওরোপের শান্তি ও স্থিতিকে বিপন্ন করে। জার্মানীর প্রতিবেশী দেশগুলি বিশেষতঃ ফ্রান্স ও সোভিয়েত রাশিয়া যথাক্রমে জার্মানীর পশ্চিম ও পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত হওয়ায় জার্মান আগ্রাসনের ভয়ে বিশেষ বিপন্ন বোধ করে। ফ্রান্স তার নিরাপত্তার জন্যে ১৯৩৫ খ্রীঃ রাশিয়ার সঙ্গে ফ্রাঙ্কো-রুশ চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির দ্বারা দুই স্বাক্ষরকারী কোন তৃতীয় শক্তি অর্থাৎ জার্মানীর দ্বারা আক্রান্ত হলে পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে আসতে অঙ্গীকার করে। ফ্রাঙ্কো-রুশ চুক্তির অপর শর্ত ছিল যে, জার্মানী তার পূর্ব-সীমান্তে চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ করলে উভয় শক্তি চেকোশ্লোভাকিয়াকে রক্ষার জন্যে এগিয়ে যাবে।

ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েত চুক্তি, ১৯৩৫ খ্রীঃ

নাৎসী নেতা হিটলার ছিলেন অত্যন্ত ধূর্ত ও কূটবুদ্ধি-সম্পন্ন লোক। তিনি মনে যা স্থির করতেন, মুখে তা বলতেন না এবং মুখে যা বলতেন কাজে তা করতেন না। প্রথমতঃ, রোম-বার্লিন কমিন্টার্ন বিরোধী চুক্তির দ্বারা তিনি রাশিয়াকে ভীতি প্রদর্শন করেন। (বিশদ বিবরণ পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) দ্বিতীয়তঃ, তিনি ব্রিটেনের রক্ষণশীল বা টোরী দলের প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেইনকে একথা বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, জার্মানীর সামরিক শক্তিবৃদ্ধি হলে তা রুশী কমিউনিজমের বিরুদ্ধে জার্মানী ব্যবহার করবে। ঐতিহাসিক শিরার (Shirer) তাঁর "তৃতীয় রাইখের উত্থান-পতন" গ্রন্থে বলেছেন যে, ১৯৩৭ খ্রীঃ হিটলার জার্মান পার্লামেন্ট ভবন বা রাইখ্স্ট্যাগে একটি ঐতিহাসিক বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি রুশী কমিউনিজমের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন এবং পশ্চিমী গণতন্ত্র, বিশেষতঃ ব্রিটেনের প্রতি তাঁর সমর্থন জানান। এই বক্তৃতা ব্রিটেনের টোরী নেতাদের প্রভাবিত করে। আসলে হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটেন যাতে ফ্রাঙ্কো-রুশ জোটে যোগ না দেয়। তিনি আশঙ্কা করেন যে, ব্রিটেন এই জোট যোগ দিলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যেমন জার্মানীর বিরুদ্ধে ত্রিশক্তি-আঁতাত গঠিত হয়, সেইরকম একটি জার্মানবিরোধী আঁতাত গড়ে উঠলে জার্মানীর বিপদ হবে। তাঁর অপর লক্ষ্য ছিল কমিউনিস্ট রাশিয়া-বিরোধী প্রচারের দ্বারা ফ্রাঙ্কো-রুশ জোটকে দুর্বল করা। ফ্রান্সকে রুশ-জোট থেকে বিচ্ছিন্ন করা। এই কূটনীতির জন্যে ঐতিহাসিক টেইলার হিটলারকে "তৃতীয় বিসমার্ক" বলেন।

হিটলারের কমিন্টার্ন বিরোধী চুক্তি

হিটলারের রুশ-বিরোধিতা ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেইনের সহানুভূতি আদায় করে। রুশ লেখকদের মতে ব্রিটেনের রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী সোভিয়েত রাশিয়াকেও তাঁর শত্রু মনে করতেন। সম্ভবতঃ এজন্য তিনি মনে করেন যে, সোভিয়েত কমিউনিজমের বিরুদ্ধে নাৎসী জার্মানীর দ্বারা ব্যালান্স বা ভারসাম্য স্থাপন করে ইওরোপে ও বিশ্বে ব্রিটেনের সাম্রাজ্য ও আধিপত্য রক্ষা করবেন। এজন্য সোভিয়েত বিদেশমন্ত্রী ম্যাক্সিম লিটভিনভ ব্রিটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েত রাশিয়ার জোট বা সহযোগিতা (Collaboration) গড়ার জন্যে বারবার প্রস্তাব দিলেও ব্রিটেন তাতে কোন আগ্রহ দেখায় নি। চেম্বারলেইন মনে করতেন যে, ভার্সাই-সন্ধির বিরুদ্ধে জার্মানীর যে সকল ন্যায্য অধিকার আছে তা দূর করে জার্মানীকে মজবুত করলে জার্মানী সম্ভাব্য সোভিয়েত আগ্রাসনের প্রতিরোধে সক্ষম হবে। এজন্য তিনি নাৎসী জার্মানীর আগ্রাসন নীতিকে সমর্থন করেন। ব্রিটেনের এই নীতিকে উইনস্টন চার্চিল নাৎসী-তোষণনীতি বলে অভিহিত করেন। ব্রিটিশ বিদেশমন্ত্রী লর্ড হ্যালিফ্যাক্স হিটলারকে ব্রিটিশ দূত দ্বারা জানিয়ে দেন

ব্রিটেনের নাৎসী তোষণ-নীতি ও সোভিয়েত সহযোগিতা প্রত্যাখ্যান

যে, জার্মানী যদি শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভার্সাই-সন্ধির শর্ত পরিবর্তন করে, তবে ব্রিটেনের আপত্তি নেই। কিন্তু বলপ্রয়োগে ব্রিটেনের আপত্তি আছে। অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও ডানজিগ সম্পর্কে জার্মানীর দাবির প্রতি ব্রিটেনের নৈতিক সমর্থন আছে।[১] কারণ ব্রিটেন মনে করে যে, এ সকল ক্ষেত্রে জার্মানীর জাতীয়তামূলক দাবিগুলি সমর্থনযোগ্য—চেম্বারলেইনের এই তথাকথিত নাৎসী-তোষণনীতি তাঁর দলের অন্যতম নেতা উইনস্টন চার্চিল দ্বারা ও রুশ ঐতিহাসিকদের দ্বারা বহু নিন্দিত হয়েছে। চার্চিলের মতে চেম্বারলেইনের উচিত ছিল গোড়া থেকে হিটলারকে বিশ্বাস না করা এবং বাধাদান করা। কারণ হিটলার মুখে কমিউনিস্ট-বিরোধিতা দেখালেও তিনি ফ্রান্স ও ব্রিটেনকেই ১৯৩৯-৪০ খ্রীঃ প্রথম আক্রমণ করেন। রুশ লেখকদের মতে চেম্বারলেইন জার্মানীর সহায়তায় রাশিয়াকে ধ্বংস করার কূটচক্রান্ত করেন। চেম্বারলেইনের তথাকথিত জার্মান-তোষণনীতি বিফল হয়। চেম্বারলেইন অবশ্য তাঁর আত্মজীবনীতে আত্মপক্ষ সমর্থনে বলেছেন যে, তাঁর সম্পর্কে চার্চিল জার্মান-তোষণনীতির অভিযোগ এনে অন্যায় করেছেন। কারণ তিনি জার্মানীকে কখনও তোষণ করেন নি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভার্সাই-সন্ধির দ্বারা জার্মানীর ন্যায্য স্থানগুলি যা হরণ করা হয়, তা বিনাযুদ্ধে ফেরতের ব্যবস্থা করা। তাঁর বিশ্বাস ছিল জার্মানীর ক্ষোভ দূর হলে জার্মানী যুদ্ধনীতি ছেড়ে শান্তির পথ ধরবে। হিটলার মিউনিক সম্মেলনে সেইসব কথা দেন। তিনি যদি তা রক্ষা না করেন, তবে চেম্বারলেইন দোষী হতে পারবেন না। যাই হোকএখনও পর্যন্ত বেশির ভাগ ঐতিহাসিক চেম্বারলেইনের এই নীতিকে ভ্রান্ত বলে মনে করেন।

অস্ট্রিয়া অধিকার আনস্লুশ নীতি :

ব্রিটেনের সবুজ সঙ্কেত পাওয়ার পর নাৎসী জার্মানী অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী শুশ্‌নিগ্‌কে অস্ট্রিয়ার অর্থ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে অস্ট্রিয়ার নাৎসী-নেতাদের নিয়োগ করতে বাধ্য করে। ১৯৩৮ খ্রীঃ নাৎসীবাদী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিয়েস ইন্‌কার্টের আহ্বানে নাৎসী-জার্মানীর সেনাদল অস্ট্রিয়ায় ঢুকে পড়ে। এক কৃত্রিম গণভোট দ্বারা জার্মানীর সঙ্গে অস্ট্রিয়ার সংযুক্তি পাকা করা হয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলি কাঠের পুতুলের মত নাৎসী-জার্মানীর এই আগ্রাসনের নীরব সাক্ষী হয়ে থাকে। ফ্যাসিস্ট ইতালী, জার্মানীকে প্রত্যক্ষ সমর্থন জানায়। কারণ রোম-বার্লিন অক্ষচুক্তি দ্বারা ইতালী জার্মানীর মিত্রতা-নীতি নেয়।

সুদেতেন সমস্যা : ফ্রাঙ্কো-রুশ বাধা

অস্ট্রিয়ার পর হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ায় জার্মান অধ্যুষিত সুদেতেন জেলার উপর দাবি চাপান। ভার্সাই-সন্ধির আগে এই জেলা জার্মানীর অন্তর্গত ছিল। জার্মান জাতীয়তাবাদের দাবিতে হিটলার সুদেতেন জেলাকে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করেন। সুদেতেন জেলার নাৎসী নেতা হেন্‌লিয়েন দাবি করেন যে, সুদেতেন জার্মানদের পিতৃভূমি জার্মানীকে ফিরিয়ে দিতে হবে। হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগের হুমকি দিলে ফ্রাঙ্কো-রুশ চুক্তির শর্ত অনুসারে, ফ্রান্স ও রাশিয়া জার্মানীকে সতর্ক করে যে, চেকোশ্লোভাকিয়ায় নাৎসী হস্তক্ষেপ সহ্য করা হবে না। রুশ-নেতা স্ট্যালিন বলেন যে, ফ্রাঙ্কো-রুশ চুক্তি অনুসারে ফ্রান্স যদি অগ্রে জার্মানসীমান্তে সেনা সন্নিবেশ করে, তবে সোভিয়েত রাশিয়া পিছিয়ে থাকবে না।

কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়া রক্ষার জন্যে ফ্রাঙ্কো-রুশ গ্যারান্টিকে কার্যকরী করা যায় নি। প্রথমতঃ, ফ্রান্সের নেতাদের মধ্যে ঐকমত্য ছিল না। অনেকেই সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে যোগ দিয়ে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তাঁরা জার্মানী অপেক্ষা

১· Allan Bullock.

কমিউনিস্ট রাশিয়াকে বেশী ক্ষতিকর মনে করতেন। তাঁরা ধ্বনি তোলেন "স্ট্যালিন অপেক্ষা হিটলার বাঞ্ছনীয়।" দ্বিতীয়তঃ, জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রথমে সেনা-সন্নিবেশের দায়িত্ব ফ্রান্স নিতে ভয় পায়। ফ্রান্স সেনা-সন্নিবেশ করার পর চুক্তিমত যদি সোভিয়েত রাশিয়া সেনা-সন্নিবেশ না করে, তবে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের একক দায়িত্ব ফ্রান্সের উপর পড়ার সম্ভাবনা ছিল। এমতাবস্থায় ব্রিটেনের সহায়তা ছাড়া ফ্রান্স আর না আগাতে সিদ্ধান্ত নেয়।

ফ্রান্সের পশ্চাদপসরণ ও জার্মান তোষণ

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেইন মনে করতেন যে, সুদেতেন জেলা জার্মানীরই প্রাপ্য। লয়েড জর্জ ও উইনস্টন চার্চিল প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেইনকে এই পরিস্থিতিতে রাশিয়ার সঙ্গে জোট তৈরি করে জার্মানীকে বাধাদানের পরামর্শ দিলে তিনি তা অগ্রাহ্য করেন। চেম্বারলেইন নিজে দুইবার জার্মানীতে গিয়ে হিটলারকে সুদেতেন জেলা নিয়ে মীমাংসা করতে রাজী করান। তারপর ১৯৩৮ খ্রীঃ মিউনিখ্ শহরে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী ও জার্মানী মিউনিখ্-চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির দ্বারা জার্মানীকে সুদেতেন জেলা ছেড়ে দেওয়া হয়। চেকোশ্লোভাকিয়া এই চুক্তি মেনে নেয়। হিটলার প্রতিশ্রুতি দেন যে, "সুদেতেন জেলা হল ইওরোপের কাছে তাঁর শেষ দাবি"। তিনি অবশিষ্ট চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করেন। মিউনিখ্-চুক্তি ছিল চেম্বারলেইনের নাৎসী-তোষণ-নীতির পরাকাষ্ঠা। নাৎসী জার্মানী কেবলমাত্র হুমকির দ্বারা ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে সুদেতেন জেলা ছেড়ে দিতে বাধ্য করে। জার্মানীর দাবিতে সোভিয়েত রাশিয়াকে মিউনিখ্ বৈঠক থেকে বাইরে রাখায় সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে পশ্চিমী দেশগুলির বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়। সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের জার্মান-বিরোধী মহাজোট গঠনের সম্ভাবনা দূর হয়।

চেম্বারলেইনের মিউনিখে আত্মসমর্পণ

মিউনিখ্-চুক্তিকে হিটলার ছেঁড়া কাগজের মতই ব্যবহার করেন। কিছুদিন পরেই অরাজকতার অজুহাতে তিনি অবশিষ্ট চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করেন।

নবম পরিচ্ছেদ ঃ রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি (The Russo-German Non-Agression Pact) ঃ নাৎসী জার্মানী মিউনিখ্ চুক্তি ভেঙে অবশিষ্ট চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করলে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেইন নিজের ভুল বুঝতে পারেন। চেম্বারলেইনের আশা ছিল যে, সুদেতেন জেলা ফেরত পাওয়ার পর জার্মানীর ক্ষুধার্ত জাতীয়তাবাদ প্রশমিত হবে। জার্মান ভাষাভাষী অঞ্চল আর চেকোশ্লোভাকিয়াতে ছিল না। কিন্তু মিউনিখ্-চুক্তি ভেঙে চেক ও শ্লাভ জাতির বাসভূমি চেকোশ্লোভাকিয়া হিটলার দখল করায় একথা স্পষ্ট হয় যে, হিটলার শুধু অতৃপ্ত জার্মান জাতীয়তাবাদকে পূরণ করতে চান নি। তিনি ইওরোপে জার্মানীর আধিপত্য চান। এজন্য চেম্বারলেইন জার্মানী-তোষণনীতি ত্যাগ করেন। অতঃপর জার্মানী পোল্যান্ড আক্রমণের উদ্যোগ নিলে জার্মান-বিরোধী মহাজোট গঠনের জন্যে তিনি মস্কোতে একটি ব্রিটিশ মিশন পাঠান। চেম্বারলেইন ত্রিশক্তি আঁতাতের মতই ব্রিটেন-ফ্রান্স-রাশিয়ার মধ্যে জোট গড়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু এই মিশনকে ব্রিটিশ সরকার আলাপ-আলোচনা চালাবার ক্ষমতা দেন। এই মিশনকে সন্ধি-স্বাক্ষর করার পূর্ণ ক্ষমতা না দেওয়ায় রুশ-নেতারা ব্রিটেনের সদিচ্ছার প্রতি সন্দিহান হন। রুশ বিদেশমন্ত্রী মলোটোভ রাশিয়াকে অগ্রাহ্য করে, রাশিয়ার স্বার্থের বিরুদ্ধে মিউনিক-চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্যে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে সন্দেহ পোষণ করতেন। ব্রিটেন রাশিয়ার প্রকৃত মিত্রতা চাইত কিনা এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল। সুতরাং তিনি স্ট্যালিনের নির্দেশে ব্রিটিশ মিশনকে বাতিল করে দেন।

ব্রিটেনের নাৎসী তোষণ নীতি ত্যাগ

রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি, ১৯৩৯ খ্রীঃ ও তার গুরুত্ব

এদিকে ব্রিটিশ মিশন যখন মস্কোতে কথাবার্তা চালাচ্ছিল সেই সময় হিটলার মস্কোতে একটি জার্মান মিশন পাঠিয়ে দেন। জার্মানীর পশ্চিমীশক্তির সঙ্গে যুদ্ধের সময় রাশিয়ার কাছে তিনি নিরপেক্ষতা ও মিত্রতা চান। জার্মান মিশনের সঙ্গে আলোচনার পর রুশ-নেতারা রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি (১৯৩৯ খ্রীঃ) স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির দ্বারা—(১) দুই স্বাক্ষরকারী দেশ পরস্পরকে ১০ বছর আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়। (২) পরস্পরের বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে মিটিয়ে নিতে রাজী হয়। (৩) এই সন্ধির গোপন শর্ত দ্বারা পোল্যান্ডকে দুই স্বাক্ষরকারী ভাগ করে নিতে অঙ্গীকার করে। (৪) দুই স্বাক্ষরকারী পূর্ব ইওরোপে নিজ নিজ প্রভাবযুক্ত এলাকা ভাগ করে নিতে স্থির করে। (৫) জার্মানী কোন তৃতীয় শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হলে রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকার প্রতিশ্রুতি দেয়। রুশ-জার্মান অনাক্রমণ, চুক্তির দ্বারা জার্মানী তার বিরুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী-রুশ মহাজোট গঠনের সম্ভাবনা দূর করে। এই চুক্তি ছিল হিটলারের কূটনীতির পরাকাষ্ঠা। রাশিয়াকে নিরপেক্ষ রেখে পশ্চিমী দেশগুলিকে তিনি বিচ্ছিন্ন করে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেন। পশ্চিমী দেশগুলির পতন হলে তারপরে তিনি রাশিয়াকে আক্রমণ করেন। হিটলারের one by one policy বা নীতির নিদর্শন ছিল রুশ-জার্মান অনাক্রমণ-চুক্তি।

রুশ-জার্মান আক্রমণ চুক্তি, ১৯৩৯ খ্রীঃ ও তার গুরুত্ব

দশম পরিচ্ছেদ ঃ জার্মানীর পোল্যান্ড আক্রমণ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা, ১লা—৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ খ্রীঃ (German Invasion of Poland and the beginning of Second World War, Sept. 1—3rd, 1939) ঃ চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকারের পর হিটলার জার্মানীর পূর্ব সীমান্তে পোল্যান্ডের দিকে দৃষ্টি দেন। ভার্সাই-সন্ধির ফলে পোল্যান্ডের সঙ্গে জার্মানীর বহুবিধ গন্ডগোল দেখা দেয়। হিটলারের অভিযোগ ছিল যে, জার্মানীর পশ্চিম প্রাশিয়া অঞ্চল, ডানজিগ বন্দর পোল্যান্ডকে এই সন্ধির দ্বারা দেওয়া অন্যায় কাজ ছিল। তা ছাড়া জার্মানীর ভিতর দিয়ে পোল্যান্ডকে সমুদ্রের উপকূলে যোগাযোগের পথ দেওয়া ছিল জার্মানীর প্রতি ঘোর অবিচার। তিনি আবার জার্মান জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে পোল্যান্ড আক্রমণের উদ্যোগ নেন। তিনি আপাততঃ ডানজিগ বন্দর দাবি করেন এবং মেমেল দখল করেন। ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি ভার্সাইসন্ধি অনুসারে পোল্যান্ডের স্বাধীনতারক্ষার গ্যারান্টি দেয়। জার্মানীকে পোল্যান্ডে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেয়। হিটলার তাতে কর্ণপাত করেন নি। রুশ-জার্মান অনাক্রমণ-চুক্তির ফলে রাশিয়া থেকে আক্রমণের কোন ভয় তার ছিল না। সুতরাং ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ খ্রীঃ জার্মানবাহিনী পোল্যান্ড আক্রমণ করে। রুশ-জার্মান অনাক্রমণ-চুক্তির ফলে রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকে। ৩রা সেপ্টেম্বর ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি জার্মানীর বিরুদ্ধে পোল্যান্ড আক্রমণের জন্যে যুদ্ধ ঘোষণা করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়।

[গ] একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ স্পেনের গৃহযুদ্ধ (Spanish Civil War, 1936—39) ঃ ইওরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত স্পেন ১৯৩৬ খ্রীঃ থেকে ইওরোপের আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঝটিকাকেন্দ্রে পরিণত হয়। স্পেনে দীর্ঘকাল ধরে রাজতান্ত্রিক শাসন চলত। স্পেনের প্রধানমন্ত্রী প্রিমে-ডি-রিভেরো ১৯৩০ খ্রীঃ পর্যন্ত একনায়কের মত শাসন চালান। ১৯৩০ খ্রীঃ তাঁর পতন ঘটলে রাজা আলফানসো স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা করেন। ১৯৩১ খ্রীঃ নির্বাচনে প্রজাতন্ত্রীরা জয়লাভ করলে তারা রাজতন্ত্র ধ্বংস করে স্পেনে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করে।

স্পেনের প্রজাতন্ত্রের সমাজতান্ত্রিক সংস্কার নীতি

স্পেনের প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রপতি জামোরা ও প্রধানমন্ত্রী মানুয়েল আজানার নেতৃত্বে জমিদারি উচ্ছেদ, কৃষকদের মধ্যে জমিবন্টন, বৃহৎ শিল্পগুলির রাষ্ট্রীয়করণ প্রবর্তন করে। ক্যাটালোনিয়া প্রদেশকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেয়। ফ্যাসিবাদী জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে ক্যানারি দ্বীপে নির্বাসনে পাঠানো হয়। এভাবে নানা প্রগতিশীল সংস্কার প্রজাতন্ত্র চালু করে।

প্রজাতন্ত্রী সরকারের এই সকল সমাজতন্ত্রী সংস্কারের ফলে জমিদার, সামন্তশ্রেণী, বুর্জোয়া ও দক্ষিণপন্থীরা অসন্তুষ্ট হয়। ১৯৩৫ খ্রীঃ সাধারণ নির্বাচনে সরকারে বামপন্থী সমাজতন্ত্রীদের প্রাধান্য বাড়লে এই দক্ষিণপন্থীরা ঘোষণা করে যে, প্রজাতন্ত্র কমিউনিজমের বা সাম্যবাদের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। স্পেনে প্রকৃতপক্ষে একটি পপুলার ফ্রন্ট বা বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীদের কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। এই সরকারকে উচ্ছেদের জন্যে দক্ষিণপন্থীরা চক্রান্ত করে। মরক্কোয় অবস্থিত স্পেনের সেনাদল সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। নির্বাসিত সেনাপতি ফ্রাঙ্কো ক্যানারি দ্বীপ হতে মরক্কোয় এসে এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন এবং একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার ঘোষণা করেন। তিনি মরক্কো থেকে দক্ষিণ স্পেনে সেনাদল সহ নেমে পড়লে প্রজাতন্ত্রী সরকারের সঙ্গে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। স্পেনের গৃহযুদ্ধের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, একটি বৈধ ও নির্বাচিত সরকারকে বলপূর্বক কিছুসংখ্যক লোক সামরিক শক্তির দ্বারা উৎখাতের চেষ্টা করে। কারণ এই সংখ্যালঘুশ্রেণী এই সরকারের কাজকর্ম পছন্দ করত না এবং এরা নিজহাতে ক্ষমতা নিতে চায়। দ্বিতীয়তঃ, প্রজাতন্ত্রী সরকারের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ও সংস্কার বুর্জোয়াশ্রেণীর অপছন্দ ছিল। সুতরাং, গণতন্ত্রের আদর্শ অর্থাৎ জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারই বৈধ এই আদর্শ স্পেনে বিপন্ন হয়। তৃতীয়তঃ, সরকার জাতির বৃহত্তর প্রয়োজনে স্বাধীনভাবে সংস্কার করার অধিকারী কিনা এই প্রশ্নও স্পেনের গৃহযুদ্ধে দেখা দেয়। যদি মুষ্টিমেয় কিছু লোক সামরিক শক্তির দ্বারা বৈধ ও নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করার অধিকার পায় তবে গণতন্ত্রের কোন মূল্যই থাকে না। স্পেনের গৃহযুদ্ধে এই নীতিগুলির পরীক্ষা হয়।

প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থীদের বিদ্রোহ

"স্পেনের গৃহযুদ্ধ একটি ক্ষুদ্র বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়।"[১] এই গৃহযুদ্ধে বৈদেশিক শক্তিগুলি নিরপেক্ষ না থেকে জড়িয়ে পড়ে। স্পেনের প্রজাতন্ত্রী সরকারে কমিউনিস্টদের প্রাধান্য থাকায় ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলি মনে করে যে, স্পেনে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সুতরাং বৈধ প্রজাতন্ত্রী সরকারকে ন্যায্য সাহায্য করা থেকে তারা বিরত থাকে। এদিকে ফ্যাসিস্ট ইতালী ও নাৎসী জার্মানী স্পেনে ফ্রাঙ্কোর ডিক্টেটরশিপ বা একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দ্বারা ইওরোপে একনায়ক শাসনব্যবস্থার প্রসার ঘটাতে চায়। স্পেনে মিত্র ফ্রাঙ্কোর শাসন স্থাপন করে শত্রু ফ্রান্সকে পশ্চিম দিক থেকে তারা ঘিরে ফেলতে চায়। এজন্যে ফ্যাসিস্ট ইতালীয় সেনাদল ও নাৎসী জার্মানীর বায়ুসেনা ফ্রাঙ্কোর সমর্থনে স্পেনের গৃহযুদ্ধে অংশ নেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রী পপুলার ফ্রন্ট সরকারকে সমর্থন জানায়। বিশ্বের নানা স্থান থেকে ফ্যাসী-বিরোধী ও কমিউনিস্ট স্বেচ্ছাসেবকেরা পপুলার ফ্রন্ট সরকারের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করতে আসে। বিখ্যাত মার্কিন ঔপন্যাসিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে স্পেনে পপুলার ফ্রন্টের পক্ষে যুদ্ধ করেন। এই পটভূমিকায় তাঁর ভুবনবিখ্যাত উপন্যাস "And for Whom the Bell Tolls"-রচিত হয়। ব্রিটেন ও ফ্রান্স স্পেনের গৃহযুদ্ধে বৈদেশিক শক্তির হস্তক্ষেপ বন্ধের জন্যে একটি আন্তর্জাতিক সমিতি স্থাপন করে। কিন্তু তা কার্যকরী হয় নি। ইতালী ও জার্মানী এই সমিতির নির্দেশ অমান্য করে ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য পাঠায় এবং

স্পেনে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ : ইতালী, জার্মানী সোভিয়েত রাশিয়া

১. Langsham.

সোভিয়েত সরকারও প্রজাতন্ত্রী সরকারকে সাহায্য দেয়। শেষ পর্যন্ত ফ্রাঙ্কো বৈধ প্রজাতন্ত্রী সরকারকে পরাস্ত করে রাজধানী মাদ্রিদ দখল করেন ও তাঁর একনায়কতন্ত্র স্থাপন করেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধে লীগ অফ নেশন্‌সের ক্লীবত্ব প্রতিপন্ন হয়। বলপ্রয়োগ দ্বারা আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের নীতি ইওরোপে প্রবল হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দেয়।

সারণী

[ক] কাভুরের প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের দুর্বলতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উপনিবেশ লাভে ব্যর্থতার জন্যে হতাশার ফলে ইতালীতে ফ্যাসিবাদের উত্থান ঘটে। ১৯৪১ খ্রীঃ ফ্যাসিষ্ট নেতা মুসোলিনী নির্বাচনে সফল না হলেও বল প্রয়োগ ও চাপের দ্বারা সরকার দখল করে, ইতালীতে ফ্যাসিবাদী সরকার গড়েন।

[খ] ক্ষমতা দখলের পর মুসোলিনী দেশের সকল স্তরে ফ্যাসিষ্ট সংগঠন স্থাপন করেন। শ্রমিক ইউনিয়ন ও শিল্প কারখানাগুলিতেও ফ্যাসিষ্ট আধিপত্য স্থাপিত হয়। শিক্ষা ব্যবস্থায় ফ্যাসিবাদ প্রয়োগ করে বালক-বালিকাকে ফ্যাসিবাদে দীক্ষিত করা হয়। ফ্যাসিষ্ট অর্থনীতি ও সমাজবাদ ছিল ভ্রান্ত।

[গ] ফ্যাসিষ্ট নেতা মুসোলিনী ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী। ১৯৩৫ খ্রীঃ তিনি ইথিওপিয়া বা আবিসিনিয়া আক্রমণ করেন। লীগের নির্দেশ অমান্য করায় লীগ ইতালীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বয়কট ঘোষণা করে। কিন্তু ইতালী লীগের সদস্যপদ ত্যাগ করে।

[ঘ] কাইজারের পতনের পর জার্মানীতে ভাইমার প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। ১৯৩৩ খ্রীঃ নাৎসী বিপ্লবের ফলে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটে। নাৎসী দল জার্মানীর আইনসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হলে হিটলার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি সংবিধানের ৪৬ নং ধারা প্রয়োগ করে সংবিধান ও পার্লামেন্ট মুলতুবী করেন। হিটলার ডিক্টেটর হয়ে নাৎসী দলের একদলীয় শাসন স্থাপন করেন।

[ঙ] নাৎসী শাসনকালে হিটলার ছিলেন জার্মানীর সর্বেসর্বা। সকলকে তাঁর নির্দেশ নির্বিচারে মানতে বাধ্য করা হয়, হিটলার জাতিবৈরতা প্রচার করতেন এবং জার্মানদের শ্রেষ্ঠ জাতি বলতেন। তিনি ইহুদী বিদ্বেষের পরাকাষ্ঠা দেখান। জার্মানীতে বিরোধী দলগুলিকে নিশ্চিহ্ন করায়, জার্মানীর শিক্ষাব্যবস্থা নাৎসী ছাঁচে ঢেলে ফেলা হয়। জার্মানীর অর্থনৈতিক সংগঠনও নাৎসী ছাঁচে তৈরী করা হয়। জার্মানীতে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়।

[চ] বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে নাৎসী নেতা হিটলার জার্মানীর প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা ও অবিচারের অভিযোগে ভার্সাই সন্ধি ভেঙ্গে ফেলেন। তিনি জার্মানীর অস্ত্র ও সমরশক্তিকে সর্বাধুনিকভাবে সাজান এবং ১৯৩৮ খ্রীঃ অস্ট্রিয়াকে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৯৩৮ খ্রীঃ মিউনিখ চুক্তির দ্বারা তাকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেইন চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেন জেলা দেন। কিন্তু হিটলার মিউনিখ চুক্তি ভেঙ্গে ফেলেন এবং ১৯৩৯ খ্রীঃ ১লা সেপ্টেম্বর পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়।

[ছ] ১৯১৯ খ্রীঃ ভার্সাই চুক্তির দ্বারা জার্মানীর আংশিক ব্যবচ্ছেদ ছাড়াও জার্মানীকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোণঠাসা করা হয়। ১৯৩৬ খ্রীঃ হিটলার ফ্যাসিষ্ট নেতা মুসোলিনীর সঙ্গে এ্যান্টি কমিন্টার্ণ প্যাক্ট দ্বারা এই কূটনৈতিক মিত্রহীনতার অবসান ঘটান। এই চুক্তি অবশেষে রোম-বার্লিন অক্ষ জোটে পরিণত হয় এবং দুই শক্তি পরস্পরের সহায়তায় আগ্রাসন চালায়। জাপান এই জোটে যোগ দিলে এই জোট রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষ জোটে পরিণত হয়।

[জ] নাৎসী জার্মানীর উত্থানের ফলে ইওরোপের শক্তিসাম্য বিপন্ন হয়। ফ্রান্স তার পূর্বতন রুশ বিরোধিতা ছেড়ে ১৯৩৫ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-রুশ চুক্তি দ্বারা উভয় দেশের আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। কিন্তু ইংলণ্ডের টোরী প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেইন নাৎসী তোষণ নীতি দ্বারা জার্মানীকে শক্তিশালী করে জার্মানীকে সন্তুষ্ট রাখার নীতি নেন। রুশ মন্ত্রী ম্যাক্সিম লিটভিনভ ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সাহায্যে জার্মান বিরোধী শিবির গঠনের এবং লীগের সহায়তায় স্থিতাবস্থা রক্ষার চেষ্টা করলেও, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এই প্রচেষ্টার সামিল হন নি। ব্রিটেনের সমর্থনপুষ্ট হয়ে হিটলার ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলি ভেঙ্গে ফেলতে থাকেন। তিনি ১৯৩৮ খ্রীঃ অস্ট্রিয়া এবং মিউনিখ চুক্তির দ্বারা সুদেতেন জেলা পান। ব্রিটেন মিউনিখ চুক্তির দ্বারা নগ্ন জার্মান তোষণ নীতি দেখায়। কিন্তু এই তোষণ নীতির দ্বারা জার্মানীকে শান্ত রাখা যায়নি। মিউনিখ চুক্তি তীব্র আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ব্রিটেনে চার্চিল মিউনিখ চুক্তিকে ধিক্কার জানান।

[ঝ] মিউনিখ চুক্তির পর সোভিয়েত সরকার বুঝতে পারেন যে, সম্ভাব্য জার্মান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ও ফরাসী সমর্থন ও জোট গড়া যাবে না। হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণে উদ্যত হলে ব্রিটেন তার নীতি বদল করে রুশ

সহায়তা চাইলেও রুশ নেতারা ব্রিটেনকে বিশ্বাস করতে পারেন নি। জার্মানীর সঙ্গে রাশিয়া ১৯৩৯ খ্রীঃ অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকার নীতি নেয়। হিটলার ১৯৩৯ খ্রীঃ ১লা সেপ্টেম্বর পোল্যাণ্ডকে প্রদত্ত ফ্রাংকো-ব্রিটিশ গ্যারান্টি ভেঙ্গে পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়।

[ঞ] ১৯৩১ খ্রীঃ নির্বাচনে স্পেনে প্রজাতন্ত্রীরা জয়লাভ করে স্পেনে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। এই সরকার জমিদারী উচ্ছেদ, ভূমি বণ্টন, শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ নীতি নেওয়ায় রক্ষণশীলরা অসন্তুষ্ট হয়। তারা স্পেনের সেনাপতি ফ্রাঙ্কো ও সেনাদলকে হাত করে এই প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী সরকারকে উচ্ছেদের জন্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ করে। স্পেনে সমাজতান্ত্রিক সংস্কার পছন্দ না হওয়ায় ফ্যাসিষ্ট ইতালী ও নাৎসী জার্মানী বিদ্রোহী সেনাপতি ফ্রাঙ্কোর পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নৈতিক ও কার্যকরী সমর্থন পুষ্ট হলেও প্রজাতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটে। ফ্রাঙ্কো জয়লাভ করে স্পেনে ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠা করেন।

অনুশীলনী

১। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) ফ্যাসিস্ট বলতে কি বুঝায়? (খ) ইতালীতে কে ফ্যাসিস্ট শাসন প্রবর্তন করেন? (গ) মুসোলিনী একনায়ক হিসাবে কি উপাধি নেন? (ঘ) ইতালীতে "গমের যুদ্ধ" বলতে কি বুঝায়? (ঙ) কোন্ সালে ইতালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করে? (চ) হিটলারের কোথায় জন্ম হয়? (ছ) কে নাৎসী দল স্থাপন করেন? (জ) নাৎসী কথার অর্থ কি? (ঝ) নাৎসীরা হিটলারকে কি বলে সম্বোধন করত? (ঞ) নাৎসী দলের চিহ্নের নাম কি? (ট) নাৎসী দলের গোপন পুলিশবাহিনীর নাম কি? (ঠ) "লেবেনসরাউম" ও "হেরেনফোক" বলতে কে বুঝ? (ড) কোন্ সালে এবং কাদের মধ্যে এ্যান্টিকমিটার্ন প্যাক্ট স্বাক্ষরিত হয়? (ঢ) কোন্ সালে ফ্রাঙ্কো-রুশ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়? (ণ) কাকে "জার্মানীর তৃতীয় বিসমার্ক" বলা হয়? (ত) কোন্ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জার্মান-তোষণনীতি গ্রহণ করেন? (থ) কোন্ সালে রুশ-জার্মান অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়? (দ) কোন্ সালে জার্মানবাহিনী পোল্যান্ড আক্রমণ করে? (ধ) কোন্ সালে স্পেনে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়? (ন) কে মরক্কোয় স্পেনের প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার ঘোষণা করেন? (প) কোন্ কোন্ বৈদেশিক শক্তি স্পেনের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(ক) ইতালীতে মুসোলিনীর নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট দলের উত্থানের কাহিনী বর্ণনা কর। (খ) মুসোলিনীর আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও সংগঠন সম্বন্ধে যা জান লিখ। (গ) মুসোলিনীর আফ্রিকা অভিযান ও তার ফলাফল বর্ণনা কর। (ঘ) জার্মানীতে নাৎসীদলের উত্থান ও তার কার্যাবলী সম্বন্ধে যা জান লিখ। (ঙ) জার্মানীতে নাৎসীদলের নীতি ও জার্মানীর নাৎসীকরণের বিবরণ দাও। (চ) নাৎসী-জার্মানীর বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য কি ছিল? (ছ) রোম-বার্লিন অক্ষচুক্তির উদ্দেশ্য কি ছিল? জাপান কেন অক্ষচুক্তিতে যোগ দেয়? (জ) কেন চেম্বারলেইন জার্মান-তোষণনীতি গ্রহণ করেন এবং তার ফল কি হয়? (ঝ) রুশ-জার্মান অনাক্রমণ-চুক্তি ও তার ফলাফল বর্ণনা কর। (ঞ) স্পেনের গৃহযুদ্ধের কারণ কি ছিল? এই যুদ্ধে বৈদেশিক শক্তিগুলি কেন জড়িয়ে পড়ে?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঃ এর কারণ ও যুদ্ধের বিস্তৃতি

[ক] প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ (Causes of the World War II) ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৪—১৯১৮ খ্রীঃ পর্যন্ত চলে। ১৯১৯ খ্রীঃ ভার্সাইয়ের শান্তি-চুক্তির দ্বারা এই যুদ্ধের শেষে জার্মানীর সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত হয়। কিন্তু ভার্সাই-সন্ধির দুই দশকের মধ্যে এই সন্ধি ভেঙে যায় এবং ১৯৩৯ খ্রীঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। এত স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ভার্সাই-সন্ধির পতন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার জন্যে অনেকে ভার্সাই-সন্ধির ত্রুটিগুলিকেই দায়ী করেন। ভার্সাই-সন্ধির বিরুদ্ধে জার্মানীর বহু অভিযোগ ছিল। জার্মানী মনে করত যে, জার্মানীর জাতীয় স্বার্থ নষ্ট করে জার্মানীকে কোন আলোচনার সুযোগ না দিয়ে মিত্রশক্তি একতরফাভাবে এই সন্ধি জার্মানীর উপর চাপায়। সুতরাং "জবরদস্তি সন্ধি" (Peace Diktat) হিসাবে জার্মানী ভার্সাই-সন্ধির নিন্দা করে। জার্মানীকে নিয়ন্ত্রীকৃত করে, জার্মান উপনিবেশগুলি কেড়ে নিয়ে, জার্মান প্রদেশগুলি জার্মানী থেকে কেটে নিয়ে প্রতিবেশী দেশকে দিয়ে এবং জার্মানীর উপর ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপিয়ে বহু অবিচার করা হয়। ফলে জার্মানী ভার্সাই-সন্ধির পরিবর্তন অথবা ভঙ্গ যে-কোন ভাবে এই সন্ধিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। এর ফলে আন্তর্জাতিক অশান্তি এবং শেষ পর্যন্ত ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির সঙ্গে বিরোধ দেখা দেয়, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়। সুতরাং বলা হয় যে "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ ভার্সাই-সন্ধির মধ্যেই নিহিত ছিল।"

ভার্সাই সন্ধির ত্রুটি ও জার্মানীর অসন্তোষ

ভার্সাই-সন্ধির ফলে জার্মানীর সীমান্ত অঞ্চলের স্থানগুলি নিয়েও জার্মান জাতীয়তাবাদ-সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দেয়। জার্মানীর আপত্তি ছিল যে জার্মান ভাষাভাষী অঞ্চলকে জার্মানদের পিতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রতিবেশী রাজ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া ছিল ঘোরতর অবিচার। এর ফলে এই জার্মানরা স্বাধীনতা হারিয়ে প্রতিবেশী দেশে সংখ্যালঘু হতে বাধ্য হয়। এইভাবে জার্মানীর সুদেতেন জেলাকে চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে, পশ্চিম প্রাশিয়া ও করিডর অঞ্চল পোলান্ডের সঙ্গে জুড়ে দিলে জার্মান জাতীয়তাবাদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জার্মান সংখ্যালঘু সমস্যা দেখা দেয়। এজন্য জার্মান-চেক, জার্মান-পোল বিরোধ দেখা দেয়। মিউনিখ-চুক্তির দ্বারা চেক-জার্মান বিরোধ মেটাবার বৃথা চেষ্টা করা হয়। এই বিরোধকে উপলক্ষ করে জার্মানী পোলান্ড আক্রমণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়।

জার্মানীর সীমান্ত ও জার্মান সংখ্যালঘু সমস্যা

ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন মনে করেন যে, ১৯১৯ খ্রীঃ শান্তি-চুক্তিগুলির দ্বারা ইওরোপের যে মানচিত্র তৈরি হয়, তা ছিল দূরদৃষ্টিহীন এবং জোড়াতালিযুক্ত কাজ। ল্যাংসামও বলেছেন যে, "ভার্সাই-সন্ধির দ্বারা জার্মানীর প্রতিবেশী পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতিকে ক্ষুদ্র ও দুর্বল করে গড়ার ফলে জার্মানীর পক্ষে সহজে প্রতিবেশী দেশগুলিকে গ্রাস করা সম্ভব হয়।" ডেভিড টমসনের মতে জার-শাসিত রাশিয়া কাইজার-শাসিত জার্মানী ও হ্যাপ্‌সবার্গ এই তিন সাম্রাজ্য ভেঙে শান্তি-চুক্তির দ্বারা যে রাজ্যগুলি গড়া হয়, তাদের না ছিল প্রাকৃতিক সীমারেখা, না ছিল আত্মরক্ষার ক্ষমতা। এই নবগঠিত রাজ্যগুলিকে জার্মানী ও রাশিয়া—এই দুই ভার্সাই-বিরোধী রাষ্ট্রের মাঝখানে স্থাপন করা হলে শীঘ্রই এই দুই দেশ তাদের গ্রাস করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্যে নাৎসী নেতা হিটলারের ক্রুর ও পাশবিক কূটনীতি (Brutal diplomacy) এবং নগ্ন আগ্রাসন-নীতি অনেক পরিমাণে দায়ী ছিল। চার্চিল তাঁর "গ্যাদারিং

স্টর্ম" (Gathering Storm) নামক গ্রন্থে নাৎসী আগ্রাসন এবং ইওরোপে নাৎসী আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টাকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ বলেছেন। তিনি জানতেন যে, অস্ত্র-প্রতিযোগিতায় ১৯৩৯ খ্রীঃ জার্মানী তার প্রতিপক্ষ পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলি ও রাশিয়া অপেক্ষা ৫ বছর এগিয়ে ছিল।[১] হিটলার ছলে, বলে, কৌশলে একের পর এক প্রতিবেশী রাজ্য গ্রাস করতে থাকেন। ১৯৩৮ খ্রীঃ মিউনিখ-চুক্তি স্বাক্ষরের সময় তিনি বলেন যে—"জার্মানীর আর কোন সীমান্ত-সমস্যা নেই। ইওরোপের কাছে তাঁর কোন ভৌগোলিক দাবি নেই।" সন্ধির কাগজের কালি শুকোবার আগেই তিনি মিউনিখ-সন্ধি ভেঙে অবশিষ্ট চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার করেন। তিনি রুশ-জার্মান অনাক্রমণ-চুক্তির দ্বারা জার্মান-বিরোধী জোট গঠন রদ করে পশ্চিমী দেশগুলিকে রাশিয়ার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। তারপর তিনি পোল-জার্মান অনাক্রমণ-চুক্তি ও ভার্সাই চুক্তি ভেঙে পোলান্ড আক্রমণ করেন। হিটলার অক্ষ শক্তির চুক্তির দ্বারা ইওরোপে নাৎসীবাদী ও আফ্রিকায় ফ্যাসিবাদী সাম্রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা চালান। হিটলার ছিলেন উগ্র জাতীয়তাবাদী, ক্রূর ও নিষ্ঠুর। মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধকে তিনি হেয় জ্ঞান করতেন। তাঁর এই পাশবিক নীতির ফলেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়।

নাৎসী নেতা এডলফ হিটলারের ধূর্ত কূটনীতি ও যুদ্ধের জন্যে দায়িত্ব

নাৎসী জার্মানী ছাড়া ফ্যাসিস্ট ইতালীর বিস্তার-নীতি ও জাপানের সাম্রাজ্যবাদী ও যুদ্ধবাদী নীতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে। জাপান ১৯৩১ খ্রীঃ মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ এবং ১৯৩৬ খ্রীঃ চীন আক্রমণ দ্বারা এশিয়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করে। পরে অক্ষচুক্তিতে যোগ দিয়ে জাপান এশিয়ায় তার একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা চালায়। অবশেষে ১৯৪১ খ্রীঃ মার্কিন নৌঘাটি পার্লহারবার আক্রমণ দ্বারা এশিয়ার ভূখণ্ডে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে দেয়। ফ্যাসিস্ট ইতালী ১৯৩৫ খ্রীঃ আবিসিনিয়া আক্রমণ এবং স্পেনের গৃহযুদ্ধে যোগ দিয়ে লীগ অফ নেশনসের পতন ত্বরান্বিত করে। রোম-বার্লিন অক্ষচুক্তির দ্বারা ফ্যাসিস্ট ইতালী ইওরোপে সন্ত্রাস এবং সঙ্কট সৃষ্টি করে।

ফ্যাসিষ্ট ইতালী জাপান প্রভৃতির আগ্রাসন নীতি

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নাৎসী জার্মানীকে তোষণনীতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্যে বিশেষ দায়ী ছিল। ব্রিটেনের টোরী প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেইন কমিউনিস্ট বিপ্লবে পশ্চিম ইওরোপের ধনতন্ত্রবাদী সমাজব্যবস্থা ধসে যাওয়ার ভয় করতেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, সোভিয়েত রাশিয়া পশ্চিম ইওরোপে কমিউনিস্ট বিপ্লব ঘটাতে আগ্রহী। রাশিয়াকে দমিয়ে ফেলার জন্যে তিনি জার্মান সামরিক শক্তিকে রাশিয়ার সীমান্তের দিকে বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ করে দেন। জার্মানীর অস্ত্রসজ্জা, লোকার্নো-চুক্তি ভঙ্গ, অস্ট্রিয়া অধিকার প্রভৃতি আগ্রাসী নীতিকে তিনি পরোক্ষ সমর্থন করেন। মিউনিখ্ বৈঠকের সোনার থালায় তিনি চেকোশ্লোভাকিয়াকে হিটলারের নিকট ডালি দেন। ইংলন্ডের বহুনেতা যথা উইনস্টন চার্চিল, প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেইনের এই নীতিকে জার্মান-তোষণনীতি বলে নিন্দা করেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তাতে কর্ণপাত করেন নি। ইংলন্ডের এই তোষণনীতির ফলে হিটলারের ধারণা হয় যে, তাঁর আগ্রাসী নীতিতে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি বাধা দিবে না। সোভিয়েত রাশিয়া ১৯৩৩—১৯৩৮ খ্রীঃ পর্যন্ত জার্মান-বিরোধী জোট গঠনের জন্যে ইংলন্ডের কাছে বারে বারে আবেদন জানালেও ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী জার্মান-তোষণনীতির জন্যে এই প্রস্তাবকে আমল দেন নি। পরে যখন পোল্যান্ড উপলক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন সোভিয়েত রাশিয়া ইংলন্ডের জোট গড়ার প্রস্তাবে রাজী হয় নি।

ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির ভ্রান্ত নীতি ও যুদ্ধের জন্যে দায়িত্ব

১· Allan Bullock.

লীগ অব নেশনসের অকার্যকারিতা, লীগের যুদ্ধ-নিরোধক সংবিধানের ত্রুটি লীগকে একটি মূল্যহীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। মার্কিন দেশ প্রভৃতি শক্তিশালী দেশগুলি লীগের সদস্য ছিল না। ইংলন্ড ও ফ্রান্স লীগের আদর্শ সমর্থন করা অপেক্ষা নিজ নিজ স্বার্থরক্ষায় যত্ন নেয়। এদিকে জাপান, ইতালী লীগের আদর্শ ভেঙে মাঞ্চুরিয়া ও আবিসিনিয়া আক্রমণ করে। এর ফলে লীগ হীনবল হয়ে যায়। নাৎসী জার্মানী লীগকে গ্রাহ্য না করার সাহস পায়।

লীগ অফ নেশনসের বিফলতা

ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি বিশ্বের বাজারে একচেটিয়া অধিকার স্থাপনের জন্যে উপনিবেশ দখলে ব্যস্ত হয়। ইংলন্ড ছিল তখনকার যুগে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ঔপনিবেশিক দেশ। ব্রিটেনের দখলে ছিল বিশ্বের $\frac{1}{8}$ ভূভাগ। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যান্ডও উপনিবেশ দখল করে ছিল। ফলে নবোদিত জার্মানী, ইতালী ও জাপানী অক্ষশক্তির জন্যে অবশিষ্ট তেমন কোন উপনিবেশ ছিল না। এদিকে ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অবাধ বাণিজ্য চালু ছিল না। প্রতি দেশ ইওরোপের অন্যদেশ থেকে আমদানি মালের উপর চড়া হারে শুল্ক চাপাতে থাকে। প্রতি রাষ্ট্র নিজ দেশের উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য যাতে নিজ দেশের নাগরিকরা খরিদ করে এজন্য উৎসাহ দেয়। উপনিবেশগুলিতেও অন্য দেশের মাল আমদানিতে বাধানিষেধ আরোপ করা হয়। ১৯৩০ খ্রীঃ বিশ্ব-আন্তর্জাতিক সঙ্কটের পর থেকে প্রতি ইওরোপীয় দেশ আমদানি কমিয়ে রপ্তানি বাড়াতে চেষ্টা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এজন্য হাওলি-স্মুট শুল্ক-প্রথা চালু করে। ফ্রান্স কোটা-প্রথা চালু করে। ব্রিটেন তার মুদ্রার মূল্য বাড়িয়ে আমদানি বন্ধের নীতি নেয়। উপনিবেশগুলি যাতে একমাত্র ব্রিটিশ মাল খরিদ করে এজন্য অটোয়া-চুক্তি ব্রিটেন স্থাপন করে। এর ফলে জার্মানী ইতালী, জাপান প্রভৃতি নবোদিত শিল্প-দেশগুলি কোণঠাসা হয়। তারা নতশিরে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শুল্ক-নীতি ও একচেটিয়া উপনিবেশ-নীতি মেনে নেয় নি। ১৯৩১ খ্রীঃ জাপান মাঞ্চুরিয়া, ১৯৩৬ খ্রীঃ উত্তর চীন অধিকার করে তার কাঁচামাল যোগাড় ও শিল্পদ্রব্য বিক্রির বাজার গঠনের চেষ্টা করে। ১৯৩৫ খ্রীঃ ইতালী একই কারণে ইথিওপিয়া আক্রমণ করে। জার্মানী ১৯৩৮ খ্রীঃ অস্ট্রিয়া দখলের পর পূর্ব ইওরোপে তার উপনিবেশ ও বাজার দখলের জন্যে চেকোস্লোভাকিয়া অধিকারের পর, পোল্যান্ড আক্রমণ করে। এই সকল আগ্রাসনের মূলে ছিল অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রভাব

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিস্তৃতি : সোভিয়েত রাশিয়া, জাপান ও মার্কিন দেশের যোগদান (Spread of the World War II : Involvement of Soviet Russia, Japan, U. S. A.) : ১৯৩৯ খ্রীঃ ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানবাহিনী পোল্যান্ড আক্রমণ করে। কামানে-বিমানে সজ্জিত জার্মানবাহিনীর অগ্রগতি পোলরা রোধ করতে পারে নি। এদিকে ১৭ই সেপ্টেম্বর সোভিয়েত রুশবাহিনী পূর্ব পোল্যান্ড অধিকার করে। পোল সরকারের পতন হলে, এই সরকার ইংলন্ডে আশ্রয় নেয় এবং নির্বাসনে সরকার চালাতে থাকে। সোভিয়েত রাশিয়া রুশ-জার্মান অনাক্রমণ-চুক্তির গোপন শর্ত অনুসারে পূর্ব পোল্যান্ড দখল করে। তারপর রাশিয়া তিন বাল্টিক রাজ্য ও ফিনল্যান্ড অধিকার করে। এদিকে জার্মান ডুবোজাহাজ আটলান্টিক মহাসাগরে বিখ্যাত ব্রিটিশ রণতরী "কারেজার্স" ও "রয়্যাল ওক"-কে ডুবিয়ে দেয়। জার্মানবাহিনী উত্তর ইওরোপে ঝটিকা-আক্রমণ দ্বারা ডেনমার্ক ও নরওয়ে অধিকার করে। বাধাদান নিষ্ফল দেখে এই সকল দেশের সরকার সেনাদলকে

পূর্ব ও উত্তর ইওরোপে জার্মানীর জয়

আত্ম-সমর্পণের নির্দেশ দেন। নরওয়ের বন্দর থেকে জার্মান ডুবোজাহাজ ও নৌবহর উত্তর সমুদ্র, ইংলিশ চ্যানেল ও আটলান্টিক মহাসাগরে ব্রিটিশ, ফরাসী ও মার্কিন নৌবাহিনীকে বিপন্ন করে। এখানে বলা দরকার যে ১৯৩৯ খ্রীঃ ৩১শে আগস্ট শান্তির একেবারে শেষ মুহূর্তে ইতালীর ফ্যাসিস্ট নেতা মুসোলিনী যুদ্ধ এড়াবার জন্যে ব্রিটেন ও জার্মানীর কাছে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান দ্বারা আন্তর্জাতিক বিরোধগুলি মেটাবার প্রস্তাব দেন। ব্রিটেন ও ফ্রান্স এই প্রস্তাবে সাড়া দেয় এই শর্তে যে শান্তি-বৈঠক ডাকার আগে জার্মানীকে পোল্যান্ডের অধিকৃত স্থান থেকে সেনা তুলে নিতে হবে। এই শর্তে হিটলার রাজী না হলে যুদ্ধ তুমুল হয়ে ওঠে। হিটলার আশা করেন যে তিনি শীঘ্রই ইওরোপের অধীশ্বরে পরিণত হবেন।

উত্তর ইওরোপ দখলের পর হিটলার জার্মানবাহিনীর মুখ পশ্চিমে ঘুরিয়ে দেন। এবার জার্মান-সেনা ও যান্ত্রিকবাহিনী, বিমানবাহিনী প্রবল পরাক্রমে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সকে আক্রমণ করে। এই সময় জার্মান সমরনায়করা তাঁদের রণ-পরিকল্পনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে বিশ্বকে হতবুদ্ধি করে দেন। যদিও ১৯৩৭ খ্রীঃ হিটলার বেলজিয়াম ও হল্যান্ডের নিরপেক্ষতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন, তা ছিল তাঁর কপট প্রতিশ্রুতি মাত্র। তিনি এখন এই প্রতিশ্রুতি ভেঙে বেলজিয়াম ও হল্যান্ডের ভিতর দিয়ে ফ্রান্সে ঢুকে পড়ার জন্যে এক বিশাল বাহিনীকে নিযুক্ত করেন। তাছাড়া জার্মানবাহিনী রাইন পার হয়ে মধ্য ফ্রান্সে এবং অপর এক বাহিনী দক্ষিণ ফ্রান্সে আক্রমণ চালায়। জার্মানবাহিনী কামানে, বিমানে, ট্যাঙ্কে তিন দিনের মধ্যে হল্যান্ড দখল করে। বেলজিয়াম রক্ষার জন্যে বিরাট ব্রিটিশ সৈন্য প্রস্তুত ছিল। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দ্বারা বেলজিয়াম জার্মানরা অধিকার করে। এদিকে ফ্রান্সের ভিতর তিন দিক দিয়ে জার্মান যান্ত্রিকবাহিনী সাঁড়াশী আক্রমণ চালায়। বেলজিয়াম উপকূলে ডানকার্কে ব্রিটিশ সেনা তাদের শেষ ঘাঁটিতে বেষ্টিত হওয়ার উপক্রম হয়। ফ্রান্সের পতন আসন্ন হয়। এই অবস্থায় জার্মান বোমারু বিমান ও কামানের আক্রমণ অগ্রাহ্য করে ৩৩০ হাজার ইঙ্গ-ফরাসী সেনা বেলজিয়ামের ডানকার্ক থেকে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ইংলন্ডে চলে যায়। জার্মান সেনাপতিদের মধ্যে রেষারেষি ও হিটলারের উপস্থিতবুদ্ধির অভাবে এই বিরাট ইঙ্গ-ফরাসী সেনাদল জার্মানব্যূহের বেষ্টনী এড়িয়ে ইংলন্ডে সরে পড়ে। এই সেনাদল চলে আসায় ইংলন্ড সুরক্ষিত হয় এবং জার্মান-আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। ইতিমধ্যে ফ্রান্সের পতন (১৯৪০ খ্রীঃ) হয়। এখন জার্মানীর দরকার ছিল ব্রিটেন দখল করা। তাহলে পশ্চিম ইওরোপে জার্মানীর নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হত। আর কোন শক্তির পক্ষে পশ্চিম ইওরোপে জার্মানীর বিরুদ্ধে পা রাখার মত জায়গা থাকত না। কিন্তু ইংলন্ডের নৌবহরের বাধা পার হয়ে জার্মান স্থলসেনার ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়া সম্ভব হয় নি। জার্মানীর এমন নৌবল ছিল না যাতে এই বাধা ভেঙ্গে ফেলা যায়। ইংলন্ডের প্রতিরোধ ভাঙ্গার জন্যে হিটলার বিমান-আক্রমণ শুরু করেন। ইংলন্ডের উপর ১৯৪০ খ্রীঃ ১৫ই আগস্ট থেকে জার্মান বিমানবহর বৃষ্টির মত বোমাবর্ষণ করতে থাকে এবং আকাশপথে সেনা নামাবার পরিকল্পনা করে। কিন্তু ব্রিটিশ জনগণের দৃঢ়তা, মনোবল এবং ব্রিটিশ বিমানবহরের পাল্টা আঘাতের ফলে ব্রিটেনে জার্মানীর বিমান-আক্রমণ ও আকাশযুদ্ধ বিফল হয়। ব্রিটেন জয়ে ব্যর্থতা ছিল হিটলারের পক্ষে মারাত্মক। ব্রিটেন এরপর পাল্টা আঘাত হানার প্রস্তুতি নেয়। ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনের পক্ষ নেয় এবং ব্রিটেন রক্ষার জন্যে বাহিনী পাঠায়।

পশ্চিম রণাঙ্গণের যুদ্ধ : হল্যান্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্সের পতন : ব্রিটেনের আকাশ যুদ্ধ

Battle of Britain বা ব্রিটেন আক্রমণের জন্যে যুদ্ধ বিফল হলে হিটলার পূর্ব ইওরোপের দিকে তাঁর সেনাদলের মুখ ফিরিয়ে সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণের উদ্যোগ করেন। রাশিয়ার

সঙ্গে জার্মানীর ১৯৩৯ খ্রীঃ দশ বছরের জন্যে অনাক্রমণ-চুক্তি ছিল। কপট হিটলার কয়েকটি মিথ্যা অজুহাতে এই চুক্তি ভেঙে ফেলেন। হিটলারের রাশিয়া আক্রমণের জন্য কয়েকটি কারণ ছিল। (১) রাশিয়া তার আত্মরক্ষার জন্যে রুমানিয়া ও তিন বাল্টিক রাজ্য অধিকার করায় জার্মানী রাশিয়ার উপর বিরক্ত হয়। (২) রাশিয়ার অস্ত্রসজ্জা ও ক্ষমতাবৃদ্ধি হিটলার সন্দেহের চোখে দেখতেন। সুতরাং রাশিয়ার ক্ষমতা আর বাড়ার আগেই তিনি এই দেশ আক্রমণ করেন। (৩) আসলে রাশিয়াকে আক্রমণ ও ধ্বংস করা হিটলারের অন্যতম মূল লক্ষ্য ছিল। এল্যান বুলকের মতে, ধূর্ত হিটলার one by one নীতি নিয়ে পশ্চিম ইওরোপে যুদ্ধের সময় রাশিয়াকে নিরপেক্ষ রাখেন। পশ্চিমের যুদ্ধ প্রায় শেষ হলে তিনি রাশিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। ২২শে জুন, ১৯৪১ খ্রীঃ, জুন মাসের যেদিন নেপোলিয়ন রাশিয়া আক্রমণ করেন, হিটলারও সেইদিন রাশিয়া আক্রমণ করেন। প্রথমদিকে জার্মানবাহিনী দ্রুত রাশিয়ার ভিতর এগিয়ে যেতে থাকে। কিয়েভ, ওডেসা দখলের পর, লেনিনগ্রাডকে জার্মান-সেনা কামানের পাল্লায় এনে ফেলে। ১৯৪১ খ্রীঃ বসন্তকালে জার্মানবাহিনী বিপুলবেগে ডন উপত্যকায় রোস্টোভ দখলের পর স্ট্যালিনগ্রাড অবরোধ করে। রাশিয়া জার্মান প্যানাৎসার ও ট্যাঙ্ক-বাহিনীর আক্রমণে ধরাশায়ী হওয়ার উপক্রম করে। এই সঙ্কটের সময় রুশ-সেনাপতি মার্শাল জুকভ যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব নিলে রুশ সেনাদের মনোবল বেড়ে যায়। তারা মরিয়া হয়ে স্ট্যালিনগ্রাডে মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত মার্শাল জুকভ জার্মান ১৪নং বাহিনীকে ঘিরে ফেলায় স্ট্যালিনগ্রাডে জার্মান সেনাদের পরাজয় হয়। স্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধে ৩,৩৮,০০০ জার্মান-সেনার মধ্যে মাত্র ৮০ হাজার জীবিত ছিল। স্ট্যালিনগ্রাডের জয়ের পর রুশবাহিনী জার্মানদের রাশিয়া থেকে ঠেলে বের করে দেয়। পিছু-হটা জার্মানবাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করে লাল ফৌজ পূর্ব ইওরোপ পার হয়ে, বার্লিনে ঢুকে পড়ে।

নাৎসী জার্মানীর রাশিয়া অভিযান ও স্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধ : জার্মানীর পরাজয়

এদিকে ব্রিটেন থেকে ফ্রান্সের নর্মাণ্ডি উপকূলে অবতরণ করে জার্মানীকে পাল্টা আঘাত হানার জন্যে ব্রিটেনে ব্রিটিশ, মার্কিন, কানাডিয়ান বাহিনী জড় হয়। ব্রিটেন থেকে নিরন্তর বিমান-হানার দ্বারা হ্যামবুর্গ, কোলন সহ জার্মান শিল্পশহরগুলিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়। লন্ডনে জার্মান বোমা বর্ষণের প্রতিশোধ নেওয়া হতে থাকে। স্ট্যালিনগ্রাডে জার্মানীর পরাজয়ের পর ইঙ্গ-মার্কিন-কানাডিয়ান সেনা ফ্রান্সের ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ফ্রান্সের নর্মাণ্ডি উপকূলে নেমে পড়ে। জার্মানসেনা ফ্রান্স দখল করার পর ফ্রান্সের দেশপ্রেমিকরা মুক্তিযুদ্ধ চালাচ্ছিল। মিত্রশক্তি ফ্রান্সে নামলে তারা উৎসাহ বোধ করে। এইসময় দেশপ্রেমিক ফরাসী সেনাপতি দ্য গল আফ্রিকা থেকে সংগঠিত ফরাসী বাহিনী নিয়ে ফ্রান্সে ঢুকে পড়েন ও ফ্রান্স থেকে জার্মানদের হটান। মিত্রশক্তির সেনা পশ্চিম দিক থেকে তীব্র যুদ্ধের দ্বারা জার্মানীতে ঢুকে পড়ে। পূর্বদিক থেকে রুশ লালফৌজ জার্মানীতে ঢুকে বার্লিনে পৌঁছে যায়। এর আগে আফ্রিকার যুদ্ধে মিত্রশক্তির হাতেই ইতালীর পরাজয় ঘটে। মিত্রবাহিনী আফ্রিকার এল-আলামিনের যুদ্ধে ইতালীয়দের বিধ্বস্ত করে দেয়। মিত্রবাহিনী মার্কিন সেনাপতি জেনারেল প্যাটনের নেতৃত্বে ভূমধ্যসাগর পার হয়ে ইতালীর কয়েক জায়গায় নেমে পড়ে রোম দখল করে নেয়। মুসোলিনী দেশপ্রেমিক ইতালীয়দের হাতে নিহত হন। লাল ফৌজ বার্লিনে ঢুকলে হিটলার ভূগর্ভস্থ বাঙ্কারে আশ্রয় নেন। সেখানেই তিনি তাঁর একদা উপপত্নী এখন সদ্য-বিবাহিতা পত্নী ইভা ব্রাউনসহ আত্মহত্যা করেন। জার্মান সেনাদল আত্মসমর্পণ করে।

দূরপ্রাচ্যে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের বিস্তৃতি : জাপানের পার্ল হারবার আক্রমণ : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের সফলতা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি জাপান ১৯৪১ খ্রীঃ অক্ষচুক্তির স্বাক্ষরকারীরূপে যুদ্ধে নেমে পড়ে। ওয়াশিংটন-চুক্তির (১৯২২ খ্রীঃ) দ্বারা জাপানকে যেরূপ কোণঠাসা করা হয়, জাপান তার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে মার্কিন নৌঘাটি পার্লহারবার ধ্বংস করে। তারপর চীনের দক্ষিণে ভিয়েতনাম অধিকারের পর মালয়ে ব্রিটিশদের পরাজিত করে মালয় ত্যাগে বাধ্য করে। এই সময় প্রিন্স-অব-ওয়েল্‌স ও রিপাল্‌স নামে খুব বড় দুই ব্রিটিশ রণতরীকে জাপান ডুবিয়ে দেয়। জাপান মালয়, ইন্দোনেশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অধিকারের পর ব্রহ্মদেশ জয় করে এবং ভারতের সীমান্তে আঘাত হানে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান-আক্রমণে ব্রিটেনের পতনের সম্ভাবনা দেখা দিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক শক্তিসাম্য ভেঙে পড়ার সম্ভাবনায় আশঙ্কা বোধ করে। মার্কিন নেতারা মনে করতেন যে, ফ্রান্স ও ব্রিটেন হল মার্কিন দেশের আত্মরক্ষার প্রথম ব্যূহ। যদি এই দুই দেশের পতন হয়, তবে জার্মানী মার্কিন দেশকে মিত্রহীন করে আক্রমণ করতে পারবে। দ্বিতীয়তঃ, আদর্শগত দিক থেকে ব্রিটিশ ও ফরাসী গণতন্ত্রের প্রতি মার্কিন গণতন্ত্রের জোর সমর্থন ছিল। এখন জার্মান-আক্রমণে ব্রিটেনের পতন আসন্ন হলে এবং দূরপ্রাচ্যে জাপান মার্কিন নৌঘাটি পার্লহারবার ধ্বংস করলে মার্কিন দেশ নিরপেক্ষতা ছেড়ে ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রশক্তির পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে যোগ দেয়। মার্কিন দেশের যোগদানের ফলে যুদ্ধের মোড় মিত্রশক্তির অনুকূলে ঘুরে যায়। মার্কিন দেশের বিরাট অস্ত্রবল, নৌবল ও জনবলের সাহায্যে অক্ষশক্তিকে পরাজিত করা সহজ হয়। ব্রিটেন ও মার্কিন দেশ সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে। জার্মান-আক্রমণের বিরুদ্ধে এই ত্রিশক্তি একযোগে যুদ্ধ চালায়।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র শক্তির পক্ষে যোগদান

[খ] তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ফ্যাসিস্ট ইতালীর পতন : মিত্রশক্তির ইতালী আক্রমণ ও ইতালী অধিকার (Fall of Fascist Italy : Allied invasion of Italy and Allied occupation of Italy) : ১৯৪০ খ্রীঃ নাৎসী জার্মানীর আক্রমণে ফ্রান্সের পতন আসন্ন হলে ফ্যাসিস্ট ইতালী অক্ষচুক্তির সদস্য হিসাবে ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইতালীর লক্ষ্য ছিল উত্তর আফ্রিকায় ইঙ্গ-ফরাসী উপনিবেশগুলি দখল করে ভূমধ্যসাগরকে ইতালীয় হ্রদে পরিণত করা। জার্মানী ইওরোপ মহাদেশে বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করায়, ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি হতবল হয়ে পড়ে। সেই সুযোগে ইতালীর প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল গ্রাৎসিয়ানী উত্তর আফ্রিকার ইংরাজ, ফরাসী উপনিবেশগুলি দখলের জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। গোড়ার দিকে ইতালীয় বাহিনী দারুণ সফলতা পেলেও শেষ রক্ষা হয় নি। মিশর-অভিযানকারী ইতালীয় বাহিনীকে ইংরাজ সেনাপতি লর্ড ওয়াভেল ভারতীয় জাঠ ও রাজপুত সেনার সাহায্যে ধ্বংস করেন। প্রধান সেনাপতি গ্রাৎসিয়ানী সহ ১৪০,০০০ ইতালীয় সেনা বন্দী হয়।

ফ্যাসিষ্ট ইতালীর আফ্রিকার যুদ্ধ

ইতালীকে চূড়ান্ত পরাজয় থেকে রক্ষার জন্যে হিটলার তাঁর কনিষ্ঠতম প্রতিভাবান সেনাপতি রোমেলকে আফ্রিকায় পাঠান। রোমেলের রণকৌশলের জন্যে মিত্রশক্তি তাঁকে "মরুভূমির শৃগাল" (Desert Fox) নামে ভূষিত করে। তিনি ব্রিটিশ ঘাঁটি তোব্রুক অধিকার করে ইংরাজ সেনাকে প্রায় মিশর ছাড়া করেন। ব্রিটিশ সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল মন্টগোমারী এল-আলমিন

নামক স্থানে সমুদ্রে পিঠ দিয়ে কোনক্রমে মাটি কামড়ে পড়ে থাকেন। ইতিমধ্যে এল-আলমিনে কামান, রসদ পৌঁছলে মিত্রবাহিনী পাল্টা আক্রমণের উদ্যোগ নেয়। এল-আলমিনের বিখ্যাত কামানের যুদ্ধে মিত্রশক্তি ইতালো-জার্মান বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে। মার্কিন সেনাপতি প্যাটন তাঁর সাঁজোয়া ও ট্যাঙ্ক বাহিনীর দ্বারা উত্তর আফ্রিকা থেকে ইতালীয়দের নিশ্চিহ্ন করেন।

জার্মান সেনাপতি রোমেলের ভূমিকা : ইঙ্গ-মার্কিণ বিজয়

এর পর ইঙ্গ-মার্কিন মিত্রবাহিনী উত্তর আফ্রিকা থেকে জাহাজযোগে উত্তর ইতালীতে নেমে পড়ে। এর আগে ১৯৪৩ খ্রীঃ মিত্রশক্তির নৌবহর সিসিলী দ্বীপ অধিকার করেছিল। দক্ষিণ ইতালী রক্ষার জন্যে প্রচুর ফ্যাসিস্ট সেনা ও ঘাঁটির সমাবেশ থাকায় মিত্রশক্তি দক্ষিণ ইতালীতে অবতরণ এড়িয়ে যায়। মিত্রশক্তির আগমনে ইতালীর নিপীড়িত জনসাধারণ ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মুসোলিনীর কুশাসনে ইতালীবাসী অতিষ্ঠ হয়েছিল। গণতন্ত্রের হত্যা, স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রের স্বেচ্ছাচার ইতালীয়দের জীবনকে বিষাক্ত ও ম্রিয়মাণ করেছিল। এখন মিত্রবাহিনী উপস্থিত হলে মুসোলিনীর বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান ঘটে। হিটলার তাঁর ছত্রী সেনা পাঠিয়ে মিত্র মুসোলিনীকে রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। মিত্রবাহিনী যতই যুদ্ধ দ্বারা রাজধানী রোমের দিকে আগাতে থাকে, ততই মুসোলিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রবল হয়। শেষ পর্যন্ত ক্রুদ্ধ জনতা মুসোলিনী ও তাঁর রক্ষিতা ক্লারা পেত্রার্চ্চিকে হত্যা করে গাছের ডালে মৃতদেহ ঝুলিয়ে দেয়। রোমগামী মার্কিন সেনা সেই দেহগুলি নিয়ে রোমে সমাহিত করে। হিটলার ইতালী রক্ষার জন্যে জার্মান সেনা পাঠালে মিত্রশক্তিকে প্রচুর রক্তক্ষয় করে রোম দখল করতে হয়। অবশেষে ফ্যাসিস্ট ইতালীর পতন হয়। ইতালীতে গণতন্ত্র স্থাপিত হয়।

ইঙ্গ-মার্কিণ ইতালী অভিযান : মুসোলিনীর পতন

[গ] চতুর্থ পরিচ্ছেদ : "ডি" দিবস ৬ই জুন, ১৯৪৪ খ্রীঃ : মিত্রশক্তির পশ্চিম ইওরোপে অবতরণ (D. Day: Allied Invasion of Europe) : জার্মানী সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করার পর সোভিয়েত রাশিয়ার উপর জার্মানীর চাপ কমাবার জন্যে ফ্রান্সের উপকূলে জার্মানীর বিরুদ্ধে একটি দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার জন্যে রুশ নেতারা ইঙ্গ-মার্কিন মিত্রশক্তিকে অনুরোধ করেন। ইঙ্গ-মার্কিন মিত্রশক্তিও উপলব্ধি করেন যে, জার্মান-অধিকৃত ফ্রান্সে মিত্রবাহিনীর অবতরণ করে ফ্রান্সকে শত্রুর অধিকারমুক্ত করা দরকার। জার্মানীর উপর পাল্টা চাপ দিয়ে পূর্বে রাশিয়া, পশ্চিমে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি, সাঁড়াশীর এই দুই বাহুর চাপে জার্মানীকে গুঁড়িয়ে ফেলা উচিত। এজন্যে তেহরান-বৈঠকে চার্চিল, রুজভেল্ট ও স্ট্যালিনের মধ্যে মতৈক্য স্থাপিত হয়। উত্তর ফ্রান্সের কোন এক স্থানে মিত্রবাহিনীর অবতরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাশিয়া আশা করে যে, এর ফলে রাশিয়ার উপর জার্মানী সর্বশক্তি নিয়োগ করে যে বিরাট চাপ সৃষ্টি করেছে, তা কিছুটা কমবে। জার্মানী তার পশ্চাদ্দেশ রক্ষার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

দ্বিতীয় রণাঙ্গন

রাশিয়া দীর্ঘদিন অপেক্ষা করলেও ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি ফ্রান্সে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলতে বহু বিলম্ব করে। রাশিয়ার মতে এই বিলম্ব ছিল ইচ্ছাকৃত। জার্মানীর আক্রমণে যাতে রাশিয়া গুঁড়িয়ে যায় সেজন্য পশ্চিমী নেতারা আক্রমণ বিলম্বিত করেন। অবশ্য তা সত্যি না-ও হতে পারে। রাশিয়া যখন প্রায় সঙ্কট কাটিয়ে উঠে এবং পাল্টা আঘাত জার্মানীর উপর দিতে আরম্ভ করে, সেই সময়

৬ই জুন, ১৯৪৪ খ্রীঃ (মতান্তরে ৫ই জুন) বিশাল ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইংলন্ড থেকে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে রাতের অন্ধকারে ফ্রান্সের নর্মান্ডি উপকূলে নামতে আরম্ভ করে। ১৯৪০ খ্রীঃ ডানকার্ক থেকে ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনী জার্মানীর সাঁড়াশী আক্রমণের চাপে তাড়া খেয়ে পালায়। এখন দ্বিগুণ উদ্যমে তারা হৈ-হট্টগোল করে ফিরে আসে। জার্মানবাহিনী আক্রমণকারীদের হটিয়ে দিতে কামান ও সাঁজোয়া গাড়ী নিয়ে ছুটে এলে, জার্মানসেনার পিছনে এক হাজার ইঙ্গ-মার্কিন বিমান বিরাট সংখ্যক ছত্রীসেনা নামিয়ে দেয়। জার্মানদের সামনে পিছনে দুই দিকে ঘিরে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়। এদিকে ৪ হাজার জাহাজ ইংলন্ড থেকে মিত্রসেনা এনে নর্মান্ডি উপকূলে বারেবারে উগরে দিতে থাকে। জার্মানদের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন ও ফরাসী মুক্তিফৌজ যে লড়াইয়ে মত্ত হয়, তাকে কবিগুরুর ভাষায় বলা যায়, "মরণ আলিঙ্গনে, কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি, দুই জনা, দুই জনে। সেদিন কঠিন রণে।"

মিত্রশক্তির উত্তর ফ্রান্সের নর্মাণ্ডিতে অবতরণ : মিত্রশক্তি বনাম জার্মানী

পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানরা প্রতি ইঞ্চি জমির জন্যে লড়াই চালায়। কিন্তু উন্নত অস্ত্রে সজ্জিত সংখ্যাগুরু মিত্রসেনা ফ্রান্সের তুলোঁ, মার্সাই, নিস, লায়নস বিমানক্ষেত্র ও সামরিক ঘাঁটিগুলি একে একে দখল করে নেয়। ইঙ্গ-মার্কিন সেনা জার্মান-সীমান্তের দিকে আগালে জার্মানদের মনোবল ভেঙে পড়ে। অবশেষে প্যারিস নগরী জার্মানদের কবলমুক্ত হয়। মিত্রবাহিনীর একাংশ সেনাপতি প্যাটনের নেতৃত্বে জার্মান-সীমান্তে উপনীত হয়। ব্রিটিশ-কানাডীয় বাহিনী বেলজিয়াম থেকে জার্মান সেনাকে হটিয়ে এই পথে জার্মানীতে ঢুকে। মিত্রপক্ষের মূল সেনাপতি আইজেনহাওয়ার রাইনল্যান্ডে ঢুকে পড়ার উপক্রম করেন। এই সময় প্রবীণ জার্মান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল রুন্ডস্টেড এক অপূর্ব রণকৌশল দ্বারা পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে মিত্রবাহিনীকে ৫০ মাইল পিছু হটিয়ে দেন। জার্মানীর এই প্রতি-আক্রমণের নাম ছিল "বুলগের যুদ্ধ"। ইঙ্গ-মার্কিন সেনা রাইন নদী বরাবর পিঠ রেখে মাটি কামড়ে লড়াই চালিয়ে আত্মরক্ষা করে। দীপ নেভার আগে যেমন একবার উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠে, জার্মানীর চূড়ান্ত পতনের আগে 'বুলগের যুদ্ধ' ছিল নাৎসী জার্মানীর প্রাক-মরণ সঙ্গীত। এর পর জার্মানীর সকল রণাঙ্গনে ধ্বস নামতে থাকে। জার্মানীর পতন আর দূরে ছিল না।

ইঙ্গ-মার্কিণ বাহিনীর অগ্রগতি : জার্মানীর প্রত্যাঘাত বুলগের যুদ্ধ

[ঘ] পঞ্চম পরিচ্ছেদ : জার্মানীর আত্মসমর্পণ, ৮ই মে, ১৯৪৫ খ্রীঃ (Nazi Germany Surrenders, 8 May, 1945) : পূর্বে রুশ লাল ফৌজ এবং পশ্চিমে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর আক্রমণে নাৎসী জার্মানী দিশাহারা হয়ে পড়ে। স্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধের সময় জার্মানীর যে ক্ষয়ের চিহ্ন দেখা দেয়, এখন তা দিনের আলোর মতই স্পষ্ট হয়ে উঠে। স্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধে পরাজয়ের পর রুশ লাল ফৌজ পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে জার্মান-সেনাকে রুশ-সীমান্তের বাইরে বের করে ক্ষান্ত থাকে নি। শিকারী কুকুরগুলি যেমন শিকারের পিছু নেয়, সেইরূপ বীর্যবান তেজী লাল ফৌজ পিছু-হঠা জার্মান সেনার পশ্চাদ্ধাবন করে। এই প্রক্রিয়ায় তারা পোল্যান্ড প্রভৃতি অঞ্চল মুক্ত করে পূর্ব জার্মানীতে ঢুকে পড়ে এবং বার্লিনের দরজায় উপস্থিত হয়। এদিকে পশ্চিম রণাঙ্গনে মিত্রবাহিনী একযোগে ৮টি স্থানে আক্রমণ দ্বারা জার্মানীর আত্মরক্ষা-প্রাচীর 'সিগফ্রীড' লাইন ভেঙে ফেলে। এর পর ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী বার্লিনের দিকে ছুটে চলে।

রুশ লাল ফৌজের জার্মানী প্রবেশ

এখন প্রশ্ন দেখা দেয়, কোন বাহিনী আগে বার্লিন অধিকার করবে। জার্মান সমরদপ্তর পশ্চিমী মিত্রশক্তিকে বার্লিন অধিকারের সুযোগ দিতে প্রস্তাব দেয়। কিন্তু ভূতপূর্ব মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট রুশনেতা স্ট্যালিনকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, লাল ফৌজকেই প্রথমে

বার্লিনে ঢোকার সুযোগ দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে রুজভেল্টের অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। নতুন মার্কিন রাষ্ট্রপতি হ্যারি ট্রুম্যান সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার আশঙ্কায় ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে বার্লিনে না-ঢোকার আদেশ দেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল অবশ্য মিত্রবাহিনীর প্রধান সেনাপতি আইজেনহাওয়ারকে বার্লিন দখলের পরামর্শ দেন। যাই হোক, মিত্রবাহিনী এলব নদী বরাবর দাঁড়িয়ে যায়। লাল ফৌজ বার্লিন দখল করে। নাৎসী জার্মানী ৮ই মে, ১৯৪৫ খ্রীঃ অস্ত্র ত্যাগ করে আত্মসমর্পণ করে। এর ফলে ইওরোপের যুদ্ধ শেষ হয়।

লাল ফৌজের বার্লিন দখল

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : হিটলারের আত্মহত্যা (Hitler commits suicide) : নাৎসী জার্মানীর পতন হলে, নাৎসী জার্মানীর নায়ক এডলফ হিটলারের ভাগ্যে কি ঘটে তা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক। স্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধে পরাজয়ের পর থেকেই ফ্যুয়েরার বা হিটলার অনেকটা মনোবল হারিয়ে ফেলেন। তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতিদের মধ্যে কয়েকজন আত্মহত্যা করেন। লাল ফৌজের অগ্রগতি রোধ করা সম্ভব নয় দেখে তিনি হতাশাগ্রস্ত হন। এদিকে পশ্চিম রণাঙ্গনে মিত্র-বাহিনীর অগ্রগতি তাঁর শেষ আশার দীপ নিভিয়ে দেয়। শেষের দিকে তিনি জার্মান সেনাপতিমণ্ডলী ও প্রশাসনযন্ত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। জার্মানীকে এক সর্বনাশা যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলার জন্যে এবং প্রতিবাদীদের নির্বিচারে হত্যার জন্যে তিনি ঘৃণার পাত্রে পরিণত হন। হিটলার শেষ রক্তবিন্দু দেহে থাকা পর্যন্ত সেনাদলকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার আদেশ দেন, কিন্তু জার্মানীর দেশভক্ত সেনাপতিরা বাধাদান নিষ্ফল বুঝে জার্মানীর ধন, প্রাণের অযথা ক্ষতি না করার জন্যে সেনাদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন।

হিটলারের হতাশা : সেনাদলের উপর নিয়ন্ত্রণ লুপ্তি

লাল ফৌজ বার্লিনে ঢুকে পড়লে হিটলার ভূগর্ভস্থ লোহার ঘরে আশ্রয় নেন। এই সময় তাঁর অধিকাংশ সহকারী নাৎসী নেতা ও কর্মচারী তাঁকে পরিত্যাগ করে পলায়ন করেন। একমাত্র প্রচারমন্ত্রী দর্শনের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ গোয়েবল্‌স ও তাঁর পরিবারবর্গ, হিটলারের বিশ্বস্ত উপপত্নী ইভা ব্রাউন, তাঁর গাড়ির চালক ও তাঁর দোভাষী তাঁকে ত্যাগ করেন নি। হিটলার ভূগর্ভস্থ লৌহবাসরে তাঁর জীবনসঙ্গিনী তাঁর উপপত্নীকে আইনমতে পুরোহিত ডেকে বিবাহ করে পত্নীর মর্যাদা দেন। তারপর এক রুদ্ধদ্বার কক্ষে উভয়ে ৩০শে এপ্রিল, ১৯৪৫ খ্রীঃ আত্মহত্যা করেন। ডঃ গোয়েবল্‌সও আত্মহত্যা করেন। হিটলারের দোভাষী ও গাড়ির চালক হিটলার দম্পতির দেহ পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে দেন। এভাবেই নাৎসী নেতার জীবনের উপর নাটকীয়ভাবে মৃত্যুর যবনিকা নেমে আসে। বিশ্বের ইতিহাসে নাৎসী-ফ্যাসিস্ট স্বৈরতন্ত্রের যুগের অবসান হয়। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র জয়যুক্ত হয়।

হিটলারের আত্মহত্যা

সপ্তম পরিচ্ছেদ : নাৎসী জার্মানীর পতনের কারণ (Causes of Nazi defeat in World War II) : নাৎসী জার্মানীর পরাজয়ের প্রধান সামরিক কারণগুলির মধ্যে ছিল হিটলারের ব্রিটেন আক্রমণে ব্যর্থতা। ফ্রান্স জয়ের পর হিটলারের একমাত্র শত্রুদেশ ছিল ব্রিটেন। ব্রিটেনকে জয় না করায় জার্মানীর জয়লাভ ক্ষণস্থায়ী হয়। কিন্তু ইংলিশ চ্যানেল ব্রিটিশ নৌবহর দ্বারা সুরক্ষিত থাকায় জার্মানীর পক্ষে এই জলভাগ পার হয়ে ইংলন্ডে অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। জার্মানীর নৌশক্তি দুর্বল থাকায় ব্রিটিশ নৌবহরকে পরাস্ত করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং হিটলার আকাশপথে বায়ুসেনা দ্বারা ব্রিটেন অভিযান করার ব্যর্থ পরিকল্পনা করেন। তা কার্যকরী করা যায় নি। গোটা ব্রিটিশজাতি রাতদিন আকাশসীমায় চোখ রেখে পাহারাদারি করায়

ব্রিটেনের যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়

একটি মাছির পক্ষেও সেই পাহারা গলে যাওয়া সম্ভব ছিল না। যদিও হিটলার ব্রিটেনের উপর নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করেন, তাতে কোন ফল হয় নি। ব্রিটিশ বিমানবহর জার্মানীর উপর পাল্টা আঘাত হেনে শিল্পকেন্দ্র, নগরগুলি ধ্বংস করে। ব্রিটিশ জঙ্গী বিমানগুলি আকাশের বুকে "কুকুরের লড়াই" (Dog fighting) চালিয়ে বহু জার্মান বিমান ধ্বংস করায় জার্মানীকে পিছু হটতে হয়। ব্রিটেন এর পর মার্কিন দেশের ও সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে অক্ষশক্তি-বিরোধী জোট গড়ে তুলে। ১৯৪৪ খ্রীঃ বসন্তকালে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ফ্রান্সের উপকূলে অবতরণ করে জার্মানীকে পাল্টা আঘাত দ্বারা ভূ-পাতিত করে। যদি হিটলার ব্রিটেনের যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারতেন, তাহলে যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতে থাকত। দুর্ভাগ্যক্রমে তা সম্ভব হয় নি।

হিটলারের রাশিয়া অভিযান ছিল তাঁর পতনের প্রধান কারণ। নেপোলিয়নও এই ভুল করেন এবং এজন্যে তাঁর পতন হয়। হিটলার ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেন নি। অনেকে হিটলারের সমর্থনে বলেন যে, রাশিয়া অভিযান ছিল নাৎসী জার্মানীর "অবধারিত নিয়তি" (Manifest destiny)। যদি হিটলার রাশিয়া আক্রমণ না করতেন, তবে রাশিয়া নাৎসী জার্মানীকে আক্রমণ করত। ঐতিহাসিকরা ভবিষ্যতের কথা বিচার করেন না। যা ঘটেছে তার কথা বিচার করেন। তা ছাড়া রাশিয়া জার্মানীকে আক্রমণ করত কিনা সে সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। যাই হোক, রাশিয়া অভিযান দ্বারা হিটলার নিজের ধ্বংসের পথ তৈরি করেন। যতদূর সম্ভব কম সময়ের মধ্যে রুশ অভিযান শেষ করার পরিকল্পনা তিনি গোড়ায় করেন, কিন্তু তিনি তাঁর গোঁয়ার্তুমির জন্যে এই পরিকল্পনা রক্ষা করতে পারেন নি। স্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধে রুশবাহিনীর প্রবল বাধা ভেঙে শহর দখল করা অসম্ভব হয়। এজন্য জার্মান সেনাপতিমণ্ডলী শহরটিকে অবরোধে রেখে রাশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল দখল করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু হিটলার তা নাকচ করে স্ট্যালিনগ্রাড দখলের জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগের নির্দেশ দেন। তিনি স্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধকে একটি মর্যাদার লড়াইয়ে পরিণত করে মহাভুল করেন। রুশ-সেনাপতি মার্শাল জুকভ জার্মানদের এই দুর্বলতা বুঝে ফেলে স্ট্যালিনগ্রাডে মাটি কামড়ে লড়াই চালাতে থাকেন। স্ট্যালিনগ্রাডের প্রতি গৃহ একটি দুর্গে পরিণত হয়। স্ট্যালিনগ্রাডের রক্তক্ষয়ী দীর্ঘ লড়াই চালাতে জার্মানীর দম ফুরিয়ে যায়। ইতিমধ্যে রাশিয়া তার প্রচুর জনবল ও সম্পদের দ্বারা প্রতিরোধের দুর্গ তৈরি করে। ক্রমে জার্মানীর আক্রমণের তীব্রতা নষ্ট হয়। জার্মানী হীনবল হয়ে পরাজয় বরণ করে। রুশ অভিযানের বিফলতা জার্মানীর পতনের ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়।

হিটলারের রাশিয়া অভিযানে বিপর্যয় : স্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধ

জার্মানী যে অস্ত্রসজ্জা ও সেনাদল তৈরি করে তার দ্বারা জার্মানী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে তার শ্রেষ্ঠত্ব রেখেছিল। কিন্তু মার্কিন দেশ মিত্রপক্ষে যোগ দিলে এবং ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলি থেকে সেনাদল ব্রিটেনের পক্ষে যোগ দিলে অস্ত্রবল, সেনাবল ও শক্তিসাম্য মিত্রশক্তির অনুকূলে চলে যায়। মিত্রশক্তির বিরাট লোকবল, সম্পদ, নৌবলের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা জার্মানীর ছিল না। কারণ জার্মানীর জনবল ও সম্পদ ছিল সীমিত। গোড়ার দিকে আক্রমণমুখী যুদ্ধে শত্রুকে ভূপাতিত করলে জার্মানীর জয়লাভ ছিল সুনিশ্চিত। এজন্যে জার্মানী আক্রমণমুখী রণপরিকল্পনা অনুসরণ করে। কিন্তু ব্রিটেনের ও রাশিয়ার যুদ্ধে তা সফল না হয়ে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে জার্মানীর দম ফুরিয়ে যায়। জার্মানীর ভিতর শত্রুসেনা ঢুকলে জার্মানীর পিছু হটে শত্রুকে বাধাদানের মত বৃহৎ প্রান্তর বা ভূমিখণ্ড ছিল না। সুতরাং জার্মানীর আত্মসমর্পণ ছাড়া পথ ছিল না।

জার্মানীর বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন জোটের শক্তি সাম্যের প্রবণতা

জার্মানীর মিত্রশক্তি যথা ফ্যাসিস্ট ইতালী ছিল দুর্বল ও অযোগ্য। জার্মানীকে উপযুক্ত সাহায্য করার ক্ষমতা ইতালীর ছিল না। বরং ইতালী ছিল জার্মানীর গলায় ভারী পাথরের বেড়ির মতই।

জার্মানীর : মিত্রশক্তি : দুর্বলতা

[ঙ] সপ্তম পরিচ্ছেদ : জাপানের আত্মসমর্পণ (The Surrender of Japan) : আগেই বলা হয়েছে যে, ১৯৪১ খ্রীঃ ৭ই ডিসেম্বর জাপানী নৌ ও বিমানবহর হাওয়াই দ্বীপে মার্কিন নৌঘাঁটি পার্লহারবার ধ্বংস করে। তারপর গুয়াম, ওয়েক, মিডওয়ে ও ফিলিপিন অধিকার করে জাপানের বিরুদ্ধে মার্কিন-বলয় ভেঙে ফেলে। তারপর পশ্চিমে মুখ ঘুরিয়ে চীনের দক্ষিণে ভিয়েতনাম দখলের পর ব্রিটিশ ঘাঁটি হংকং দখল করে। এরপর স্থলপথে ও সমুদ্রপথে জাপান ব্রিটিশ উপনিবেশ মালয় আক্রমণ করে এবং ১৯৪২ খ্রীঃ সিঙ্গাপুর ও মালয় অধিকার করে। সিঙ্গাপুর থেকে জাপানী সেনার একাংশ মার্তামান উপসাগর পার হয়ে ডাচ উপনিবেশ সুমাত্রা, জাভা, বালি দখল করে। এটি ছিল একটি তৈলসমৃদ্ধ অঞ্চল। এর ফলে জাপানের তেলের অভাব অনেকটা দূর হয়। অপর জাপানী বাহিনী মালয় থেকে ব্রহ্ম আক্রমণ করে এবং ১৯৪২ খ্রীঃ ৮ই মার্চ রেঙ্গুন অধিকার করে। তারা ভারতের আরাকান ও মণিপুর সীমান্তে আঘাত করে। কলকাতায় জাপানী বিমান বোমাবর্ষণ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের অগ্রগতি

ইতিমধ্যে ইওরোপে জার্মানীর পরাজয় হলে মিত্রশক্তি জাপানের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। মার্কিন সেনাপতি ম্যাক আর্থারের কম্যান্ড দ্বারা পূর্বদিক থেকে এবং ব্রিটিশ সেনাপতি এ্যাডমিরাল লুইস মাউন্টব্যাটেনের কম্যান্ড দ্বারা পশ্চিমদিক থেকে জাপানকে পিষে ফেলার ব্যবস্থা হয়। জাপানের সামুদ্রিক আধিপত্য ভেঙে ফেলার জন্যে মার্কিন নৌ-সেনাপতি এ্যাডমিরাল নিমিৎস মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করেন। তারপর, তিনি জাপানের নিকটবর্তী ওকিনাওয়া দ্বীপ হাতাহাতি লড়াই দ্বারা অধিকার করেন। ওকিনাওয়ার যুদ্ধে ৭২৮৩ জন মার্কিন সেনা মারা পড়ে। এর পর জাপানে অবতরণের জন্যে মার্কিনবাহিনী প্রস্তুত হয়।

জাপানের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির পাল্টা আক্রমণ

জাপানের প্রতিরোধের শক্তি লক্ষ্য করে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সাহায্য চান। বিনিময়ে বহির্মোঙ্গোলিয়া ও দক্ষিণ শাখালিন, কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ রাশিয়াকে দেওয়ার কথা বলা হয়। রাশিয়া এই প্রস্তাবে রাজী হয়। কিন্তু মার্কিন সেনাপতিমন্ডলী জাপানে রুশ-সেনার অনুপ্রবেশের পক্ষপাতী ছিল না। রাশিয়ার দ্বারা জাপান আক্রমণের নির্দিষ্ট দিনের ১৩ দিন আগেই ব্রিটেন ও মার্কিন সরকার জাপানকে শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণের জন্যে একটি চরমপত্র দেয়। জাপান আত্মসমর্পণ করতে রাজী হয় কেবলমাত্র একটি শর্তে যে, জাপানের সম্রাটের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রতিশ্রুতি ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিকে দিতে হবে। কিন্তু এই দাবি নাকচ করা হয়। মার্কিন সরকারের নির্দেশে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি বন্দরে মার্কিন বিমান থেকে দুটি আণবিক বোমা নিক্ষেপ করা হয়। এই বোমার মারাত্মক ও ভয়ঙ্কর ধ্বংসকারী ক্ষমতা দেখে বিশ্ববাসী স্তম্ভিত হয়। মার্কিন সরকার জাপানী সরকারকে ভীতি প্রদর্শন করে যে, জাপান যদি অবিলম্বে আত্মসমর্পণ না করে, তবে আরও আণবিক বোমা জাপানের উপর নিক্ষেপ করা হবে। জাপানের দম ফুরিয়ে এসেছিল। জার্মানীর পরাজয়ের পর মিত্রশক্তি তাদের পুরো সামরিক শক্তি জাপানের বিরুদ্ধে নিয়োগ করেছিল। আর যুদ্ধ চালানো নিষ্ফল বুঝে এবং আণবিক বোমার আক্রমণে নিরীহ প্রজার প্রাণহানির আশঙ্কায় জাপান সম্রাট হিরোহিতো

মার্কিন সামরিক দপ্তরের আনবিক বোমা ব্যবহার

জাপানী সেনাদের আত্মসমর্পণের আদেশ ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ খ্রীঃ দেন। জাপানীরা তাদের সম্রাটের আদেশকে সকল কিছুর উপর স্থান দেয়। সুতরাং জাপানী সেনারা ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ খ্রীঃ আত্মসমর্পণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়।

সারণী

[ক] ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জার্মানীর উপর অন্যায় ও বৈষম্যমূলক শর্ত আরোপন, জার্মানীর জার্মান অধ্যুষিত অঞ্চল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অধীনে স্থাপন ও জার্মানীর নিরস্ত্রীকরণের জন্যে জার্মানীতে তীব্র ক্ষোভ দেখা দেয়। নাৎসী নেতা হিটলার ক্ষমতা লাভের পর এই ক্ষোভ কাজে লাগিয়ে ভার্সাই সন্ধি ভেঙে ফেলার নীতি নেন। তিনি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ফ্যাসিস্ট ইতালীর আবিসিনিয়া আক্রমণ ও লীগের নির্দেশ অমান্য ইওরোপে আগ্রাসনের পথ খুলে দেয়। দূর প্রাচ্যে জাপান ওয়াশিংটন চুক্তি ভেঙে ১৯৩১ খ্রীঃ মাঞ্চুরিয়া ও ১৯৩৬ খ্রীঃ চীন আক্রমণ করে। ১৯৪১ খ্রীঃ মার্কিণ নৌ ঘাঁটি পার্লহারবার আক্রমণ দ্বারা জাপান বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয়। ব্রিটেনের তোষণ নীতি, লীগের নিষ্ক্রিয়তাই বিশ্বযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্যবাদও যুদ্ধের কারণ ছিল।

[খ] জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে তার অর্দ্ধাংশ দ্রুত অধিকার করে। অপর অংশ সোভিয়েত রাশিয়া অধিকার করে। এরপর জার্মানী ডেনমার্ক, নরওয়ে অধিকারের পর, পশ্চিম দিকে মুখ ঘুরিয়ে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্স আক্রমণ করে। বেলজিয়ামে ডানকার্কের যুদ্ধে বিরাট ব্রিটিশবাহিনী পরাজিত হয়ে ইংলণ্ডে পালায় এবং ১৯৪০ খ্রীঃ ফ্রান্সের পতন হয়। জার্মান বিমানবহর কিছুকাল ব্রিটেনে ভয়াবহ বোমা বর্ষণের পর, পুনর্বার পূর্বদিকে মুখ ফিরিয়ে রাশিয়া আক্রমণ করে। বন্যার জলের মত অগ্রসরমান জার্মান বাহিনীকে ষ্ট্যালিনগ্রাডে রুশ মার্শাল জুকভ রুখে দেন। এই যুদ্ধে জার্মান সেনা ধ্বংস হয় ও তার শোচনীয় পরাজয় হয়। দূর প্রাচ্যে জাপান ১৯৪১ খ্রীঃ পার্লহারবার আক্রমণ দ্বারা যুদ্ধে যোগ দেয় এবং সিঙ্গাপুর, মালয়, ব্রহ্মদেশ দখল করে ভারত সীমান্তে এসে যায়। যুদ্ধের এই সংকট সময়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধে সায় দেয়।

[গ] এদিকে ফ্যাসিষ্ট ইতালী জার্মানীর মিত্র হিসাবে যুদ্ধে যোগ দিয়ে উত্তর ইতালী অভিযান করে। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির পাল্টা আক্রমণে ইতালীর পতন হয়। মুসোলিনী নিহত হন।

[ঘ] জার্মানীর রুশ অভিযানে পরাজয় আসন্ন হলে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে জার্মান অধিকৃত ফ্রান্সের উত্তর ভাগে নর্ম্যাণ্ডি উপকূলে নেমে পড়ে। ডানকার্কের পশ্চাদ অপসারণের পর পুনরায় ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিণ মিত্রশক্তি পাল্টা আঘাত হানে। জার্মানরা প্রতি ইঞ্চি জমির জন্যে লড়াই দিলেও শেষ রক্ষা হয় নি।

[ঙ] পূর্বদিক থেকে রুশ লালফৌজ ও পশ্চিম থেকে ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসী আক্রমণের সাঁড়াশীর চাপে পড়ে জার্মানী আত্মসমর্পণ করে। এলব নদী বরাবর জার্মানী ভাগ হয়ে পূর্বদিকে লাল ফৌজ ও পশ্চিমে ইঙ্গ-মার্কিণ ফৌজ জার্মানী দখল করে। হিটলার আত্মহত্যা করেন।

[চ] নাৎসী জার্মানীর যুদ্ধে পরাজয়ের কারণগুলির মধ্যে প্রধান ছিল ব্রিটেন আক্রমণে জার্মানীর ব্যর্থতা, রাশিয়া অভিযানে জার্মানীর শোচনীয় পরাজয় ও লোকক্ষয়। দীর্ঘ যুদ্ধে জার্মানীর দম ফুরিয়ে যায় এবং মিত্রশক্তির বিশাল সামরিক বলের কাছে জার্মানী নতি স্বীকারে বাধ্য হয়।

[ছ] ইওরোপের যুদ্ধে অক্ষ শক্তির দুই শক্তি ইতালী ও জার্মানীর পতনের ফলে মিত্রশক্তি জাপানের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগে সক্ষম হয়। পূর্বদিক থেকে মার্কিণ সেনাপতি ম্যাক আর্থার ও পশ্চিম দিক থেকে ব্রিটিশ নৌ-সেনাপতি এ্যাডমিরাল লুইস মাউন্টব্যাটেন এবং মধ্যভাগে মার্কিণ নৌ-সেনাপতি এ্যাডমিরাল নিমিৎসের আক্রমণে জাপান পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে মার্কিণ বিমানবহর জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি বন্দরে বোমা বর্ষণ করলে জাপান ১৯৪৫ খ্রীঃ আত্মসমর্পণ করে।

অনুশীলনী

১। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

(ক) কোন্ সন্ধিকে "জবরদস্তি সন্ধি" বলা হয়? (খ) কোন্ জেলাকে কেন্দ্র করে জার্মান-চেক বিরোধ দেখা দেয়? (গ) চার্চিল কোন্ গ্রন্থে নাৎসী আগ্রাসনের কথা বলেন? (ঘ) জাপান প্রশান্তমহাসাগরে কোন্ মার্কিন নৌঘাঁটি

আক্রমণ করে? (ঙ) কোন্ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নাৎসী জার্মানীকে তোষণ করেন? (চ) কোন্ সালে ইতালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করে? (ছ) কোন্‌দিন জার্মানবাহিনী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে? (জ) জার্মান ডুবোজাহাজ কোন্ কোন্ ব্রিটিশ রণতরী ডুবিয়ে দেয়? (ঝ) কোন্ সালে ফ্রান্সের পতন হয়? (ঞ) কোন্ সালে হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেন? (ট) রাশিয়ার কোথায় জার্মানবাহিনীর পরাজয় ঘটে? (ঠ) জাপান কোন্ কোন্ ব্রিটিশ রণতরীকে ডুবিয়ে দেয়? (ড) জাপান কোন্ ব্রিটিশ নৌঘাটি ধ্বংস করে? (ঢ) কোন্ সেনাপতিকে "মরুভূমির শৃগাল" বলা হয়? (ণ) কোন্ যুদ্ধে ইতালো-জার্মান বাহিনী বিধ্বস্ত হয়? (ত) কোন্ দিন ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ফ্রান্সের কোথায় অবতরণ করে? (থ) মিত্রশক্তির প্রধান সেনাপতির নাম কি ছিল? (দ) কোন্ যুদ্ধে জার্মানী শেষ জয়লাভ করে? (ধ) কোন্ সালে জার্মানী আত্মসমর্পণ করে? (ন) কোন্ সালে হিটলার আত্মহত্যা করেন? (প) কোন্ রুশ-সেনাপতি কোন্ যুদ্ধে জার্মানদের পরাজিত করেন? (ফ) জাপান কোন্ কোন্ ডাচ উপনিবেশ দখল করে? (ব) ভারতের কোথায় জাপানীরা হানা দেয়? (ভ) জাপানের কোন্ কোন্ শহরে আণবিক বোমা ফেলা হয়? (ম) কোন্ সালে জাপান আত্মসমর্পণ করে?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

(ক) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্যে ভার্সাই-সন্ধি কতখানি দায়ী ছিল? (খ) হিটলারের ধূর্ত কূটনীতি ও ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির জার্মান তোষণ-নীতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্যে কতখানি দায়ী ছিল? (গ) নাৎসী জার্মানীর উত্তর ও পশ্চিম ইওরোপ বিজয়ের কাহিনী বর্ণনা কর। (ঘ) নাৎসী জার্মানীর রাশিয়া অভিযান ও স্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধের বিবরণ দাও। (ঙ) ফ্যাসিস্ট ইতালীর আফ্রিকা অভিযান এবং তার ফলাফল বর্ণনা কর। (চ) মিত্রশক্তির জার্মানী অভিযানের বিবরণ দাও। (ছ) নাৎসী জার্মানীর পতনের কারণ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (জ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের সামরিক সাফল্য এবং শেষে আত্মসমর্পণের বিবরণ দাও।

চতুর্দশ অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী চুক্তিগুলি ও তার সমস্যা : ঠাণ্ডা লড়াই : সাম্রাজ্যবাদের পতন : সমাজতন্ত্রবাদের জয়

[ক] প্রথম পরিচ্ছেদ : ইয়াল্টা চুক্তি, ১৯৪৫ খ্রীঃ (The Yalta Agreement, 1945) : ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি ও রাশিয়ার যৌথ আক্রমণে জার্মানীর পতন প্রত্যাসন্ন হলে জার্মানীর উপর বিজয়ী মিত্রবাহিনীর অবস্থান কিভাবে করা হবে এবং যুদ্ধোত্তর ইওরোপের পুনর্গঠন কিভাবে হবে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে ১৯৪৫ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে তিন প্রধান স্ট্যালিন, রুজভেল্ট ও চার্চিল রাশিয়ার ক্রিমিয়া প্রদেশের ইয়াল্টায় মিলিত হন। তিন প্রধান ছিলেন প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ভাগ্য-নিয়ন্তা। ফ্লেমিং নামে ঐতিহাসিকের মতে, ইয়াল্টা বৈঠকে তিন প্রধান অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা করেন। চার্চিল তাঁর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থে বলেছেন যে, "রুশ সরকার তাঁর প্রতি অসাধারণ সৌজন্য ও আতিথেয়তা দেখান।" ঐতিহাসিক রবার্ট এরগ্যাং-এর মতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রাষ্ট্রপতি উইলসন প্রভৃতি যেভাবে আদর্শবাদের ফানুস ওড়ান, ইয়াল্টা বৈঠকের প্রাক্কালে তিন প্রধানের কেহ সেরকম কোন আদর্শবাদের কথা বলেন নাই। তাঁরা ঠাণ্ডা মাথায় বাস্তব অবস্থার মোকাবিলার চেষ্টা করেন।

ইয়াল্টা চুক্তির দ্বারা জার্মানী সম্পর্কে স্থির করা হয় যে— (১) জার্মানীর পতন হলে জার্মানীকে প্রধানতঃ তিন শক্তি ব্রিটেন, আমেরিকা, রাশিয়া তিন অঞ্চলে ভাগ করে দখল নেবে। (২) ফ্রান্সকে একটি চতুর্থ অংশ দেওয়া হবে। (৩) স্ট্যালিন অবশ্য শর্ত আরোপ করেন যে, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকৃত অঞ্চল থেকে জায়গা কেটে নিয়ে চতুর্থ অঞ্চল তৈরি করে তা ফ্রান্সকে দিতে হবে। সোভিয়েত-অধিকৃত অঞ্চল হতে কোন স্থান ফ্রান্সকে দেওয়া হবে না। (৪) চার শক্তির অধিকৃত ৪টি অঞ্চলে একই প্রকার আইন, শাসন প্রবর্তন করতে হবে। (৫) জার্মানীর রাজধানী বার্লিন নগরীর শাসনের জন্যে একটি যৌথ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন গড়া হবে। এই যৌথ কমিশনে ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত প্রতিনিধি থাকবেন। (৬) স্ট্যালিন দাবি করেন যে, জার্মানীকে যুদ্ধের জন্যে ২০ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং এই ক্ষতিপূরণের অর্ধাংশ রাশিয়া পাবে। চার্চিল ও রুজভেল্ট ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে নীতিগত সম্মতি দিলেও ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পর্কে আপত্তি জানান। রুজভেল্ট প্রস্তাব দেন যে, একটি ক্ষতিপূরণ কমিশন ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ধার্য করবে।

জার্মানী সম্পর্কিত শর্ত

ইয়াল্টা বৈঠকে পোল্যান্ড সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে— (১) জার্মানীর পতনের পর স্বাধীন পোল্যান্ড রাজ্য গড়া হবে। (২) পোল্যান্ডের পূর্ব সীমা কার্জন লাইন বরাবর স্থির করা হবে। এর ফলে প্রাক্-যুদ্ধকালীন পোল্যান্ডের প্রায় ৪৭% ভাগ রাশিয়ার হাতে চলে যায়। (৩) স্ট্যালিন পোল্যান্ডের পশ্চিম সীমান্ত জার্মানীর ওডার-নিসি নদী বরাবর দাবি করেন। কিন্তু চার্চিল ও রুজভেল্ট এই সীমান্তের দাবীতে নীতিগত আপত্তি রাখেন। প্রশ্নটি ভবিষ্যৎ মীমাংসার জন্যে মুলতুবি থাকে। (৪) পোল্যান্ডে অবাধ ও স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করার নীতি স্থির করা হয়। (৫) সর্বসাধারণের গোপন ব্যালট-ভোটে জনমত স্থির করা হবে বলা হয়। (৬) স্ট্যালিন শর্ত জুড়ে দেন যে, পোল্যান্ডে যে সরকার গঠিত হবে, তা সোভিয়েত রাশিয়ার গ্রহণযোগ্য হওয়া চাই এবং রাশিয়ার প্রতি মিত্রতাপূর্ণ হওয়া চাই।

পোল্যান্ড সম্পর্কিত শর্ত

দূরপ্রাচ্য সম্পর্কে ইয়াল্টা বৈঠকে স্থির হয় যে—(১) রাশিয়া মিত্রশক্তির পক্ষে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিবে। (২) এজন্যে কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ; দক্ষিণ শাখালিন রাশিয়াকে ছেড়ে দেওয়া হবে। (৩) মাঞ্চুরিয়ায় রুশ-অবস্থান স্বীকার করা হবে। (৪) মাঞ্চুরিয়ায় চীনের সার্বভৌম অধিকার রাশিয়া মেনে নিবে। (৫) বহির্মোঙ্গোলিয়ায় রুশ-প্রাধান্য স্বীকৃত হবে। ইয়াল্টা-সম্মেলনে পূর্ব ইওরোপের জার্মান অধিকার-ভুক্ত রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে স্থির হয় যে, জার্মান-শাসন থেকে মুক্ত হলে আটলান্টিক সনদের নীতি অনুসারে এই রাষ্ট্রগুলিকে পুনর্গঠন ও শাসনের ব্যবস্থা করা হবে। এই শাসন হবে গণতান্ত্রিক।

দূরপ্রাচ্য সম্পর্কিত গোপন শর্ত

ইয়াল্টা বৈঠকে স্থির হয় যে, তিন প্রাধান সান্‌-ফ্রান্সিস্‌কো সম্মেলনে সমবেত হয়ে জাতিপুঞ্জের সনদের নীতি স্থির করবেন। স্ট্যালিন শর্ত দেন যে, জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় বাইলোরাশিয়া ও ইউক্রেনের স্বতন্ত্র ভোটাধিকার থাকবে। ব্রিটেন ও আমেরিকা এই শর্ত মেনে নেয়। রুজভেল্ট ইয়াল্টা-সম্মেলন থেকে ফিরে ঘোষণা করেন যে—"ক্রিমিয়ার সম্মেলন হতে আমরা শান্তিস্থাপনের পথে শুভযাত্রা শুরু করেছি।" এই সম্মেলনের স্বল্পকালের পরেই রুজভেল্টের অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। হ্যারি ট্রুম্যান মার্কিন রাষ্ট্রপতির পদে বসেন। রুজভেল্টের শুভেচ্ছা আন্তর্জাতিক ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উত্তাপে বাষ্পীভূত হয়ে উবে যায়। রবার্ট শেরউডের মতে, "জার্মানী ও জাপানের পরাজয়ের ফলে যে সকল সমস্যা দেখা দেয়, তা অধিকাংশ ইয়াল্টা-চুক্তির ফলে।" এক শ্রেণীর উগ্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ইয়াল্টা-চুক্তিকে রুজভেল্টের স্ট্যালিনের নিকট আত্মসমর্পণ বলে মনে করতেন। তাঁরাই ইয়াল্টা-চুক্তির তীব্র সমালোচনা করেন। একথা অবশ্য সত্য যে, ইয়াল্টা-চুক্তির পর থেকে যুদ্ধকালীন তিন মিত্রের কাছে অবিশ্বাস ও সন্দেহের মেঘ ঘনিয়ে ওঠে। মার্কিন রাষ্ট্র থেকে অভিযোগ উঠে যে স্ট্যালিন ইয়াল্টা-চুক্তির শর্তগুলি অমান্য করছেন। তিনি পোল্যান্ডে অবাধ নির্বাচন না করে লাল ফৌজের ছত্রছায়ায় রুশপন্থী লুবালন সরকার গঠন করেছেন। অপরদিকে রাশিয়ার পক্ষ থেকে পাল্টা অভিযোগ উঠে যে, জার্মানীর পুনর্গঠনে ও জার্মানীর ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি কথার খেলাপ করছেন। মোট কথা ইয়াল্টার পর যুদ্ধকালীন মিত্রজোট ভাঙ্গতে থাকে।

গুরুত্ব

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : পটসডাম চুক্তি, ১৯৪৫ খ্রীঃ (The Potsdam Agreement, August, 1945) : জার্মানীর পতন হলে জার্মানীকে দখল ও শাসন করা সম্পর্কে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। তাছাড়া, জার্মানীর মিত্রশক্তিগুলির সঙ্গে শান্তিচুক্তি রচনার প্রশ্ন দেখা দেয়। এই সকল সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্যে জার্মানীর পটসডাম নগরে তিন প্রধানের এক শীর্ষ-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে যুদ্ধকালীন নেতাদের মধ্যে একমাত্র মার্শাল স্ট্যালিন ছিলেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান ছিলেন নবনিযুক্ত এবং ব্রিটেনের নবনিযুক্ত প্রধান মন্ত্রী এটলী নির্বাচনের ফলে নিযুক্ত হন। নির্বাচনে ব্রিটেনের যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের পরাজয় ঘটে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের মৃত্যু হয়। পুরাতন নেতাদের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে যে পারস্পরিক বিশ্বাস এবং বোঝাপড়ার মনোভাব জন্মেছিল, তা নূতন নেতাদের মধ্যে ছিল না। ট্রুম্যান পটসডাম সম্মেলনে আসার আগে স্ট্যালিন সম্পর্কে মনে ঘোর অবিশ্বাস নিয়ে আসেন। মার্কিন যুদ্ধবাজ সেনাপতিদের পরামর্শে তিনি এই ধারণা নেন যে, ইয়াল্টা-সম্মেলনে ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। সুতরাং তিনি স্ট্যালিনের প্রভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করে ইয়াল্টা চুক্তি স্বাক্ষর

নূতন নেতাদের মধ্যে অবিশ্বাস : পটসডাম সম্মেলনে মতানৈক্যের উদ্ভব

করেন। ট্রুম্যানের এই দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে পটসডাম সম্মেলনে কোন গুরুত্বপূর্ণ মতৈক্য হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

পোল্যান্ড ও রুমানিয়ায় কমিউনিস্ট সরকার গঠনের ফল

এদিকে রুমানিয়া ও পোল্যান্ডে কমিউনিস্ট প্রভাবিত সরকার স্থাপিত হলে ট্রুম্যান মনে করেন যে, এর পিছনে সোভিয়েত হস্তক্ষেপ ছিল। ইয়াল্টা-চুক্তি অনুসারে পোল্যান্ডে অবাধ ও স্বাধীন নির্বাচন দ্বারা সরকার গঠনের কথা বলা হয়। তার স্থলে লাল ফৌজের উপস্থিতির সুযোগে পোলিশ কমিউনিস্ট পার্টি সরকার গঠন করায় ট্রুম্যান উত্তেজিত হন।

জার্মানী সম্পর্কে ও অন্যান্য বিষয়ে পটসডাম সিদ্ধান্ত

এই পরিবেশে পটসডাম বৈঠক অনুষ্ঠিত হলে স্বভাবতঃই মতভেদ তীব্র হয়ে উঠে। জার্মানী ও তার মিত্রদেশগুলির সঙ্গে শান্তিচুক্তি রচনার ব্যাপারে নেতাদের মধ্যে গভীর মতভেদ দেখা দেয়। (১) শেষ পর্যন্ত স্থির হয় যে, তিন বিজয়ী দেশের পররাষ্ট্র-মন্ত্রীদের সম্মেলনে এই শান্তি-চুক্তিগুলির খসড়া আলাপ-আলোচনার দ্বারা রচনা করা হবে। (২) আপাততঃ জার্মানীকে আশ্বাস দেওয়া হয় যে, শান্তিচুক্তির দ্বারা জার্মানীর স্বাধীনতা রক্ষা করা হবে। (৩) জার্মানীর অ-নাৎসীকরণ, অ-সামরিকীকরণ, গণতান্ত্রীকরণ এবং জার্মানীর বড় শিল্প-কারখানা বা কার্টেলগুলিকে ভেঙে ফেলার নীতি ঘোষণা করা হয়। জার্মানীকে পুরোপুরি নিরস্ত্রীকৃত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। (৫) জার্মানীর সোভিয়েত অধিকৃত অঞ্চল থেকে শিল্পকেন্দ্র ও যন্ত্রপাতি রাশিয়াকে তুলে নিয়ে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে নিতে সম্মতি দেওয়া হয়। পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির দ্বারা অধিকৃত জার্মানী থেকে ২৫% যন্ত্রাংশ ক্ষতিপূরণ বাবদ রাশিয়া নিতে পারবে বলা হয়। (৬) পূর্ব প্রাশিয়ার একাংশ ও ডান্‌জিগ বন্দর পোল্যান্ডকে দেওয়া হয়। জার্মানীর কোনিগ্‌গ্রাৎস শহর রাশিয়াকে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

জাপানে আণবিক বোমার ব্যবহার : ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূত্রপাত

পটসডাম-সম্মেলন চলার সময় ওয়াশিংটন থেকে ট্রুম্যান বার্তা পান যে, আণবিক বোমার পরীক্ষা সফল হয়েছে। এখন ইচ্ছা করলে এই বোমা জাপানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে জাপানকে ঘায়েল করা যাবে। এই বার্তা পাওয়ার পর আর জাপানের বিরুদ্ধে রুশ-সাহায্যের দরকার নেই একথা ট্রুম্যান বুঝে ফেলেন। ইয়াল্টা চুক্তি দ্বারা ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়ার যোগানের প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। এখন আর সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের দরকার নেই দেখে ট্রুম্যান তাঁর কথাবার্তার নরম সুর হঠাৎ চড়া করে দেন। মার্কিন সেনাপতিমণ্ডলী কার্যতঃ ঠিক করে ফেলে যে, জাপানের মাটিতে রাশিয়াকে আর পা রাখতে দেওয়া হবে না। সুতরাং হিরোসিমা-নাগাসাকির উপর বোমা ফেলে জাপানকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হয়। আণবিক বোমা ব্যবহার দ্বারা রাশিয়াকেও ভাবিত, ভীতিগ্রস্ত ও পরোক্ষভাবে শাসানো হয়। এভাবে পটসডাম-সম্মেলন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ শীর্ষ-সম্মেলন হিসাবে এক বিষাদপূর্ণ ও বিদ্বেষময় পরিবেশে শেষ হয়। নেতারা সম্মেলনের সফলতা সম্পর্কে যথারীতি গালভরা প্রশস্তি দেন। কিন্তু তাঁদের মতভেদ এর দ্বারা চাপা থাকে নি। বিশ্বে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূত্রপাত হয়।

[খ] তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ অর্থনৈতিক পুনর্বাসন (The Economic Rehabilitation : The U.N.B.R.A.) ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল এমন একটি দাবানল যা বিজয়ী ও বিজিত উভয় পক্ষকে দগ্ধ করে ফেলে। বিজিত অক্ষশক্তি সামরিক,

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সকল দিক থেকে ধসে পড়ে। বিজয়ী ব্রিটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েত রাশিয়ারও ক্ষয়-ক্ষতি কম হয় নি। ফ্রান্সের ক্ষতির সীমা ছিল না। জার্মানী ফ্রান্সে দখলদারি রাখার সময় ফ্রান্সের সম্পদ শুষে নিয়ে দেশটিকে ছোবড়ায় পরিণত করেছিল। পরে যখন সেনাপতি দ্য গল ফ্রান্সের শাসনভার নেন, তখন এক পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ তাঁর হাতে আসে। খাদ্যাভাব, বেকার-সমস্যায় জর্জরিত ফ্রান্সে কমিউনিস্ট দল প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে। ব্রিটেনের অবস্থা ছিল করুণ। ব্রিটেনে যুদ্ধজনিত ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে নেমে এসেছিল বেকার-সমস্যা ও খাদ্য-সঙ্কট। ১৯৪৬-৪৭-এর গোড়ায় প্রচণ্ড শীতে ব্রিটেনে ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়। ব্রিটেনের এমন দূরবস্থা দেখা দেয় যে, সিগারেটের তামাক আমদানি করার মত অর্থ সরকারের হাতে ছিল না। কয়লা-সঙ্কটে ব্রিটেন কাঁপতে থাকে।

ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির যুদ্ধকালীন ক্ষয়ক্ষতি

ব্রিটেনের দুরবস্থা

বিজয়ী শক্তির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল তরতাজা, যৌবনের খরতেজে উদ্দীপ্ত। যুদ্ধের আঁচড় প্রত্যক্ষভাবে ভৌগোলিক দিক থেকে মার্কিন দেশের গায়ে লাগে নি। আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের নীল জলের বেষ্টনীর কোলে নিরাপদ আশ্রয়ে মার্কিন দেশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিনগুলি কাটায়। একমাত্র কিছু মার্কিন যুবক বিশ্বের বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয় এবং বিভিন্ন রণাঙ্গনে মার্কিন সেনাকে যুদ্ধে যোগ দিতে হয়। সুতরাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সংগঠনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার নিজস্ব ধ্যান-ধারণা প্রয়োগের চেষ্টা করবে তাতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না।

মার্কিন দেশের অর্থনৈতিক দৃঢ়তা

মার্কিন দেশ প্রথমেই তার ঘনিষ্ঠ মিত্র ব্রিটেন, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়ামের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে মেরামত করার জন্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও রসদের সাহায্য দেয়। অর্থনৈতিক সংস্থা, I.M.F. বা ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড, I.B.R.D. বা ইন্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর রিকন্‌স্ট্র্যাকশন এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বা ওয়ার্ল্‌ড ব্যাঙ্ক, G.A.T.T. বা জেনারেল এগ্রিমেন্ট অফ ট্যারিফ এ্যান্ড ট্রেড প্রভৃতির মাধ্যমে প্রদত্ত সাহায্য যথেষ্ট ছিল না। শুধু ব্রিটেনকেই এক কিস্তিতে ৩·৫ বিলিয়ন ডলার ঋণ মার্কিন সরকার দেয়। এই ঋণ-ব্যবস্থার নাম দেওয়া হয় ইওরোপের পুনর্গঠন পরিকল্পনা বা ইওরোপীয়ান 'রিকোভারী প্রোগ্রাম'। এই ঋণদানের পশ্চাতে মার্কিন দেশের শুধুমাত্র মিত্র হিতৈষণা ও পরোপকারী মনোবৃত্তি ছিল একথা ভাবা ভুল। যদিও মার্কিন সরকার "মানবিকতাবোধ", "আন্তর্জাতিক শান্তি, সৌভ্রাত্র" প্রভৃতি গালভরা আদর্শের কথা বলেন, আসলে দুটি প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে পশ্চিম ইওরোপে ঢালাওভাবে মার্কিন অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া হয়। প্রথমতঃ, সাধারণভাবে ইওরোপে মার্কিন বাণিজ্য-দ্রব্য ও অর্থ লগ্নী করতে হলে যে দেশে এই অর্থ লগ্নী হত সেই দেশকে শুল্ক ও কর দিতে হত। নানা বাধা-নিষেধ মেনে লগ্নী করতে হত। এখন Aid বা সাহায্যের বা ঋণের নাম করে অর্থ, শিল্পদ্রব্য, রসদপত্র পশ্চিম ইওরোপের পুনর্গঠনে পাঠালে বিনা-শুল্কে, বিনা-করে তা লগ্নী করা সম্ভব হয়। এর ফলে পশ্চিম ইওরোপে মার্কিন অবাধ বাণিজ্য Aid-এর বা সাহায্যের নামে চলতে থাকে। সাহায্যপ্রাপ্ত দেশগুলিও রাজনৈতিক দিক থেকে মার্কিন-দেশের কাছে কৃতজ্ঞ থাকে। দ্বিতীয়তঃ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইংলন্ড, ফ্রান্স, ইতালীতে দুর্দশা, খাদ্যসঙ্কটের দরুন কমিউনিজমের বা সাম্যবাদের প্রভাব বাড়তে থাকে। নির্বাচনে কমিউনিস্টরা বেশী ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়। মার্কিন ঋণ পেয়ে এই সকল দেশের সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়ে সাম্যবাদের অগ্রগতি রোধ করতে পারে। এই দ্বিবিধ গূঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে পশ্চিম ইওরোপে মার্কিন অর্থনৈতিক

অর্থনৈতিক পুনর্বাসন নীতি

পুনর্বাসনের পরিকল্পনাকে চালু করা হয় এবং তা ফলপ্রসূ হয়। এই পটভূমিকায় ট্রুম্যান-নীতি ও মার্শাল-পরিকল্পনাকেও বিচার করা উচিত।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : ট্রুম্যান নীতি (The Truman Doctrine): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ইংলন্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি মিত্রদেশের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্যে মার্কিন ঋণ-দানের কথা আগের পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে মার্কিন প্রশাসন আরও গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইওরোপে ও এশিয়ার সদ্য স্বাধীনতা-প্রাপ্ত দেশগুলিতে সোভিয়েত প্রভাব ও সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিস্ময়কর প্রতিরোধ, সোভিয়েত ইউনিয়নের সাম্যবাদী সমাজ ও সংগঠন বিশ্ববাসীর প্রশংসা পায়। যুদ্ধের শেষদিকে পূর্ব ইওরোপের অধিকাংশ অঞ্চল লাল ফৌজের দখলে চলে যায়। লাল ফৌজের আশ্রয়ে পোল্যান্ড, রুমানিয়া, যুগোস্লাভিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশে কমিউনিস্ট দল শক্তিশালী হয়ে সরকার দখল করার উপক্রম করে। অর্থনৈতিক দুর্দশাগ্রস্ত ব্রিটেন-ফ্রান্স-ইতালী সরকারের পক্ষে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না। ইওরোপের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে সামরিক অঞ্চলগুলিতে যথা গ্রীস ও তুরস্কে কমিউনিজম থাবা বসাবার চেষ্টা চালায়। গ্রীসের কমিউনিস্ট গেরিলারা ব্রিটিশ সাহায্যপুষ্ট গ্রীসের রাজতন্ত্রী সরকারকে উচ্ছেদের জন্যে গৃহযুদ্ধ চালায় এবং প্রায় সফলতার দরজায় এসে যায়। তুরস্কের উপর সোভিয়েত সরকার মস্ক্রো-চুক্তি পরিবর্তন করে নূতন চুক্তিস্বাক্ষরের জন্যে চাপ দিতে থাকেন। ইরান থেকে যুদ্ধকালীন দখলদারী রুশ সেনা অপসারণের শর্ত হিসাবে রাশিয়া আজেরবাইজান অঞ্চল দাবি করে এবং ইরানের তৈল-সম্পদের একাংশ দাবি করে।

ইওরোপের যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক দুর্দশা : সোভিয়েত অগ্রগতির ভীতি

ইওরোপে সোভিয়েত রাশিয়ার আধিপত্য বৃদ্ধি এবং ইওরোপের বাইরে এশিয়ার দেশগুলিতেও সোভিয়েত প্রভাব বাড়ায় আমেরিকা সহ পশ্চিমী দেশগুলি উদ্বেগবোধ করে। ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নেতা উইনস্টন চার্চিল মার্কিনদেশ পরিদর্শনে আসেন। তিনি ফুলটন শহরে (Fulton speech) এক ঐতিহাসিক বক্তৃতা দেন। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ছিলেন এই বক্তৃতার অন্যতম শ্রোতা। অনবদ্য ইংরাজীতে চার্চিল বলেন যে : ইওরোপের এক বড় অংশ রাশিয়ার লৌহ যবনিকার (Iron Curtain) আড়ালে চলে গেছে। সেখানে লোকজনের কি অবস্থা আমরা জানি না। বাকী যে অংশ এখনও স্বাধীন, তা অতিকায় পক্ষীর মত সোভিয়েত দেশ গ্রাস করতে উদ্যত। এখনও বাকী ইওরোপকে রক্ষা করার সময় আছে। ফুলটন বক্তৃতা আমেরিকার নেতাদের আতঙ্কিত করে।

মার্কিন বণিকমহল ও অস্ত্রনির্মাণ-কারখানাগুলির চাপ ট্রুম্যান প্রশাসনের উপর পড়ে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার ফলে যাতে মার্কিন বাণিজ্যে মন্দা না দেখা দেয় এবং মার্কিন অস্ত্র-কারখানাগুলিতে ছাঁটাই না হয়, উৎপাদন ও রপ্তানি অব্যাহত থাকে, তার ব্যবস্থা করার জন্যে ট্রুম্যান প্রশাসনকে চিন্তা করতে হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, সোভিয়েত কমিউনিজমের তথাকথিত আগ্রাসন থেকে বিশ্বকে মুক্ত রাখার জন্যে ট্রুম্যানের তথাকথিত নীতির আড়ালে লুকিয়েছিল মার্কিন অবাধ বাণিজ্যের পরিকল্পনা। বিভিন্ন দেশে Aid বা সাহায্য বা ঋণদানের নাম করে মার্কিন সরকার বিনাশুল্কে ও বিনাবাধায় অর্থলগ্নী ও শিল্পদ্রব্য, অস্ত্র বিক্রি করার ব্যবস্থা করে।

মার্কিন ডলার সাম্রাজ্যবাদ, বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার চেষ্টা

১৯৪৭ খ্রীঃ গোড়ায় ব্রিটেনের অবস্থা বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ব্রিটেন এজন্যে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে তার সেনাদল ও আর্থিক সংগঠন গুটিয়ে নিতে থাকে। ১৯৪৭ খ্রীঃ ব্রিটেনের পররাষ্ট্র

দপ্তর মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টে গোপন নোট পাঠিয়ে জানায় যে, ১৯৪৭ খ্রীঃ ৩১শে মার্চের পর গ্রীস ও তুরস্ক থেকে ব্রিটিশ সেনা তুলে নেওয়া হবে এবং এই দুই দেশকে ব্রিটেনের আর্থিক সাহায্য বন্ধ করা হবে। ব্রিটেনের পক্ষে আর এই ভার বহন করা সম্ভব নয়। এই নোটে ব্রিটেন সতর্ক করে দেয় যে, যদি গ্রীস কমিউনিস্টদের হাতে যায় তবে গোটা পূর্ব ভূমধ্যসাগর ও বলকান অঞ্চল মিত্রশক্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। ইরানে এখনই রুশ- সমর্থিত তুদে দল গোলমাল করছে।

মার্কিন সরকারকে ব্রিটেনের গোপন নোট; গ্রীসের সমস্যা

ব্রিটেনের এই নোট পাওয়ার পর মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যদের কাছে মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রসচিব ডীন একেশন বলেন যে, একটি পচা আপেল ঝুড়িতে থাকলে যেমন ঝুড়িতে সব আপেলে পচন ধরে, তেমনভাবে গ্রীসের পচন তিনটি মহাদেশে ছড়িয়ে পড়বে। গ্রীস থেকে তুরস্ক ও মিশরের মধ্য দিয়ে কমিউনিজম ছড়িয়ে পড়বে উত্তর আফ্রিকায়, ইরানের মধ্য দিয়ে প্রাচ্যে, আর উত্তর আফ্রিকা থেকে ফ্রান্স ও ইতালীতে।

গ্রীসের গুরুত্ব

এই পটভূমিকায় সোভিয়েত রাশিয়ায় নিযুক্ত প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত জে· এফ· কেনান (J. F. Kenan) পরামর্শ দেন যে, মার্কিন সরকারের উচিত এখন কমিউনিস্ট রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি না নেওয়া। কারণ রাশিয়া এখনই যুদ্ধের জন্যে ইচ্ছুক নয়। এখন মার্কিন সরকারের উচিত সোভিয়েত অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যেই সোভিয়েত অধিকারকে বেড়া দিয়ে সীমাবদ্ধ রাখা। তার বাইরে আসার চেষ্টা করলে স্থানীয় যুদ্ধের দ্বারাসীমার ভিতর ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়া। ট্রুম্যান এই পরামর্শকে স্বীকার করে নেন। এরই ভিত্তিতে তাঁর ট্রুম্যান নীতি বা (Containment Policy) সীমাবদ্ধ রাখার নীতি ঘোষিত হয়।

এই ট্রুম্যান নীতিতে (১৯৪৭ খ্রীঃ) বলা হয় যে—(১) পৃথিবী এখন দুটি জীবনধারায় বিভক্ত, যথা মুক্ত, গণতান্ত্রিক দুনিয়া এবং সাম্যবাদী দুনিয়া। (২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য হল মুক্ত জাতিগুলির স্বাধীনতা ও জাতীয় অখণ্ডতা রক্ষা করা ও আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। (৩) সুতরাং কোন মুক্তজাতি বা তার সরকার যদি সশস্ত্র সংখ্যালঘুদের অথবা বিদেশী আগ্রাসনের প্রতিরোধের চেষ্টা করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে সমর্থন করবে। আপাততঃ ট্রুম্যান গ্রীস ও তুরস্কে সাহায্যের জন্যে ৪০০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেন এবং মার্কিন কংগ্রেস তা অনুমোদন করে। ক্রমে ট্রুম্যান-নীতি অনুসারে বহু দেশে মার্কিন সামরিক, আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য দেওয়া হয়। এভাবে ইওরোপ ও এশিয়ার এক বিরাট অঞ্চলে মার্কিন সাহায্য (Aid) দেওয়া হয়। মার্কিন রাষ্ট্রপতি বলেন যে, বিশ্বের নিরাপত্তা ও মার্কিন নিরাপত্তা একই মুদ্রার এপিঠ ও ওপিঠ। বিশ্বে মার্কিন মূল্যবোধ অর্থাৎ গণতন্ত্র, অবাধ বাণিজ্য, মুক্তসমাজ, ধনতন্ত্রী ব্যবস্থা না থাকলে মার্কিন দেশ রক্ষা পাবে না। সেই মূল্যবোধ রক্ষা করা মার্কিন নীতির লক্ষ্য। ট্রুম্যান প্রধানতঃ আর্থিক সাহায্য দেওয়ার উপর জোর দেন। প্রয়োজন হলে সামরিক সাহায্যও দেওয়া হয়।

ট্রুম্যান নীতি

[গ] পঞ্চম পরিচ্ছেদ : মার্শাল পরিকল্পনা (The Marshall Plan) :

ট্রুম্যান-নীতি ঘোষিত হওয়ার পর মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব জন মার্শাল পশ্চিম ইওরোপের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে বিশেষ নজর দেন। এজন্যে মার্কিন প্রশাসন যে পরিকল্পনা রচনা করে, তার নাম ছিল মার্শাল পরিকল্পনা। ১৯৪৭ খ্রীঃ জুন মাসে জন মার্শাল আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত একটি ভাষণে তাঁর পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেন। মার্শাল বলেন যে—(১) যেখানে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য,

পশ্চিম ইওরোপের অর্থনৈতিক উন্নয়ন

সেখানেই কমিউনিজমের উদ্ভব। (২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায় যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইওরোপের ভাঙা অর্থনীতিকে গড়ে তোলায় সাহায্য করতে। (৩) এক্ষেত্রে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও অর্থনৈতিক স্বার্থ পরস্পরের পরিপূরক। যদি ইওরোপে অর্থনৈতিক দুর্দশা থাকে, তবে সোভিয়েত আগ্রাসনের সম্ভাবনা থেকে ইওরোপকে রক্ষা করা যাবে না।

ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির কাছে মার্শাল তাঁর অর্থনৈতিক সাহায্যের পরিকল্পনা পাঠান। এই পরিকল্পনার শর্ত ছিল যে—(১) মার্শাল সাহায্য-গ্রহণকারী দেশগুলিকে মূল মার্কিন পরিকল্পনা মেনে নিয়ে সাহায্য বাবদ প্রদত্ত অর্থ খরচ করতে হবে। (২) সাহায্য-গ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলি মার্কিন সরকার কর্তৃক রচিত এক অখণ্ড পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হবে। (৩) সাহায্যপ্রাপ্ত দেশগুলির নিজস্ব রাজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী করতে হবে। (৪) দ্রুত অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা লাভ হবে এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য।

মার্শাল পরিকল্পনা

যুদ্ধোত্তর পশ্চিম ইওরোপ ছিল অর্থনৈতিক সঙ্কটে দারুণভাবে দুর্দশাগ্রস্ত। এজন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল। ইওরোপের কয়লা উৎপাদন, লোহার উৎপাদন বিশেষভাবে কমে যায়। ভোগ্যপণ্যের দারুণ অভাব দেখা দেয়। এর সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতি ও খাদ্য-সঙ্কট যুক্ত হয়। সুতরাং পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলি অর্থাৎ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতি আগ্রহ সহকারে মার্শাল পরিকল্পনার শর্ত মেনে নিয়ে তা গ্রহণ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার পক্ষভুক্ত দেশগুলি মার্শাল-পরিকল্পনা গ্রহণ করবে কিনা তা প্রথমে অনিশ্চিত ছিল। মার্কিন সরকার এবং তার মিত্র ব্রিটেনও মনে মনে চাইত না যে, সোভিয়েত রাশিয়া এই পরিকল্পনার ভিতর যোগ দিক।

মার্শাল পরিকল্পনার রাজনৈতিক দিক : সোভিয়েত বিরোধিতা

ইতিমধ্যে রুশ পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মলোটোভ প্যারিসে এসে মার্শাল-পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি আক্ষেপ করেন যে, পশ্চিমী মিত্ররা রাশিয়ার সঙ্গে কোন আলোচনা না করেই মার্শাল-পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। (২) এই পরিকল্পনা গ্রহণ করায় সাহায্য গ্রহণকারী রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকার বিনষ্ট হবে। (৩) ইওরোপের দেশগুলি মার্কিন বাণিজ্য-সংস্থার বা বিরাট কোম্পানিগুলির শোষণের কবলে পড়বে। এই মার্কিন কোম্পানির পরিচালকরা সাহায্য-গ্রহণকারী দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে। মার্শাল-পরিকল্পনা হল মার্কিন "ডলার সাম্রাজ্যবাদের" পরিবর্তিত রূপ।

সোভিয়েত প্রতিক্রিয়া

যাই হোক, পশ্চিম জার্মানী সহ ইংলন্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি পশ্চিমী দেশগুলি মার্শাল-পরিকল্পনা অনুযায়ী তিন বছরে ১২,০০০,০০০,০০০ (বার শত কোটি) ডলার সাহায্য পায়। এই সাহায্যের নাম ছিল ইওরোপের পুনরুজ্জীবন কর্মসূচী (European Recovery Programme)। এই সাহায্য বিফলে যায় নি। এই সাহায্যের ফলে ব্রিটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইতালী, নেদারল্যান্ডস যুদ্ধোত্তর সঙ্কট কাটিয়ে অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা পায়। মৃতপ্রায় রোগী যেমন প্রকৃত ঔষধে প্রাণ ফিরে পায়, পশ্চিম ইওরোপের শিরায় প্রাণের স্পন্দন আবার ফিরে আসে। ভূমিশয্যা ছেড়ে পশ্চিমী গণতন্ত্র আবার যৌবনের খরতেজে জ্বলে উঠে। নির্বাচনে গণতান্ত্রিক দলগুলি কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের পরাজিত করে সরকার দখল করে। সোভিয়েত প্রভাবযুক্ত পূর্ব ইওরোপে মার্শাল পরিকল্পনাকে বয়কট করা হয়। চেকোস্লোভাক সরকার এই সাহায্যগ্রহণে আগ্রহ দেখালে সেই সরকার ভেঙে দেওয়া হয়। পূর্ব ইওরোপের দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার পরিকল্পনামত অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। এই পরিকল্পনার নাম ছিল, কমেকন (Comecon) বা কমিউনিস্ট ইকনমিক ইউনিয়ন। এই

পরিকল্পনা অনুযায়ী পোল্যান্ড, পূর্বজার্মানী প্রভৃতি দেশের পুনর্গঠন করা হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ পূর্ব-পশ্চিম ঠাণ্ডা লড়াই (The Cold War) ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে যুদ্ধকালীন মিত্র সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র ব্রিটেন প্রভৃতির প্রবল মতভেদ, বিদ্বেষ ও কূটনৈতিক বিরোধ আরম্ভ হয়। এই বিরোধকে ঠাণ্ডা লড়াই বা Cold War বলা হয়। ঠাণ্ডা লড়াই বলতে দুই প্রতিপক্ষ মুখোমুখি লড়াই না করলেও পথে, পরোক্ষভাবে বা Proxy অর্থাৎ প্রতিনিধির মাধ্যমে যুদ্ধ চলে। ঠাণ্ডা কারণ হিসাবে অনেকে মার্কিন গণতন্ত্রবাদ বনাম রুশী সমাজতন্ত্রবাদের সংঘাত বলে থাকেন। দুই পক্ষের পরস্পরবিরোধী আদর্শবাদকেই অনেকে ঠাণ্ডা লড়াই-এর মূল কারণ বলেন। মার্কিন নেতারা বলেন যে, রুশী সর্বগ্রাসী একনায়কতন্ত্র থেকে তাঁরা পৃথিবীকে মুক্ত রাখতে চান এবং গণতন্ত্র রক্ষা করতে চান। এজন্য মার্কিন প্রচারদপ্তর বিশ্বকে Free অর্থাৎ কমিউনিস্ট অধিকারমুক্ত unfree অর্থাৎ সোভিয়েত কবলিত অঞ্চলে ভাগ করেন। তাঁরা বলেন যে, তাঁরা free world অর্থাৎ মুক্ত দুনিয়াকে রক্ষা করতে চান, গণতন্ত্র, অনিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, ব্যক্তির অধিকার রক্ষা প্রভৃতির মাধ্যমে। এর জবাবে সোভিয়েত প্রচারযন্ত্র যুক্তি দেখান যে ঃ—(১) এই তথাকথিত স্বাধীনতা হল ভুয়া। এই freedom বা স্বাধীনতা হল অনশন ও মৃত্যুবরণের স্বাধীনতা। (২) কারণ মার্কিন আদর্শে ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বাধীনতার স্বীকৃতি নেই। সম্পত্তির অধিকারকে রক্ষা করার ফলে ধন বণ্টনের ব্যবস্থা নেই। কাজেই গরীব ও ধনীর প্রভেদ থাকায় গরীবরা শোষিত হয়। (৩) সমাজতন্ত্রে কর্মের অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় ব্যক্তির জীবিকা অর্জনের অধিকার স্বীকার করা হয়। (৪) ধনতান্ত্রিক সমাজ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। পুঁজিবাদ শুধু স্বদেশের লোকেদের শোষণ করে মুনাফা লোটে না, উপনিবেশ বা সাম্রাজ্যের মাধ্যমে তা ব্যাপক সম্পদ লুট করে আনে। সুতরাং পশ্চিমী গণতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদ কায়েম করতে চায়। সোভিয়েত রাশিয়া নিপীড়িত জাতিকে সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্তি দিতে চায়। এই প্রচার দ্বারা সোভিয়েত রাশিয়া তা সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে বিশ্বে জনপ্রিয়তা দানের চেষ্টা করে। কার্যত ভিয়েতনামে, চীনে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে রাশিয়া সাহায্য দিয়ে এই আদর্শকে বাস্তব আকৃতি দিতে চেষ্টা করে। মার্কিন প্রচারযন্ত্র সোভিয়েত প্রচারের জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে এই প্রচারকে সোভিয়েত রাশিয়ার আদর্শবাদী আগ্রাসন (Indeological Imperialism) বলে অভিহিত করে। মার্কিন দেশ বলে যে, পূর্ব ইওরোপে অধিকৃত দেশগুলির উপর রুশ একনায়কতন্ত্র ও জবরদস্তি প্রমাণ করে, যে, রাশিয়া প্রকৃতপক্ষে যা প্রচার করে তার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। রাশিয়া প্রকৃত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয় বলে অভিযোগ করা হয়। এই ধরনের আদর্শবাদী বিরোধ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রকৃত কারণ ছিল কিনা সন্দেহ। আসলে আদর্শবাদকে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের স্বার্থে ব্যবহার করা হয়। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পশ্চাতে পারস্পরিক ক্ষমতাবাদ, অর্থনৈতিক স্বার্থ ও সামরিক স্বার্থবাদই বড় কারণ ছিল। দুই শক্তি যুদ্ধোত্তর বিশ্বে নিজ নিজ প্রভাববিস্তারের জন্যেই ঠাণ্ডা লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হয়। আদর্শ এবং জাতীয় স্বার্থের মধ্যে বিরোধ হলে প্রত্যেকে স্বার্থকেই বড় করে দেখে।

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সঙ্গে আদর্শবাদের সম্পর্ক

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে ইয়াল্টা-সম্মেলনের পর থেকেই রুশ-মার্কিন মতান্তর দেখা দেয়। এই মতান্তরের প্রধান কারণ ছিল ঃ (১) রাশিয়ার উপর জার্মানীর আক্রমণের চাপ কমাবার জন্যে জার্মানীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা, সোভিয়েত প্রস্তাবকে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি ঝুলিয়ে রাখে। এদিকে জার্মানীর আক্রমণের চাপে রাশিয়ার গুঁড়ো হওয়ার মত অবস্থা হয়। শেষ পর্যন্ত রাশিয়া এই বিপদ কাটিয়ে উঠে এবং পাল্টা

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের কারণ

আঘাত হানে। তখন ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি ফ্রান্সে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলে দেয়। দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা নিয়ে এজন্যে একটি গভীর অবিশ্বাস দেখা দেয়। (২) এই অবিশ্বাস এত তীব্র হয় যে, ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি সন্দেহ করে যে, রাশিয়া নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে আলাদা সন্ধি করে যুদ্ধ শেষ করার চেষ্টা করছে। এদিকে, রুশ নেতারাও অনুরূপ সন্দেহ করতে থাকেন। (৩) যাই হোক, এই পরিস্থিতিতে ইয়াল্টায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রুজভেল্ট, চার্চিল, স্ট্যালিন একটি কাজ চলা সমাধানে পৌছাতে সক্ষম হন। (৪) কিন্তু ইয়াল্টার সদিচ্ছা শীঘ্রই উবে যায়। ট্রুম্যান রাষ্ট্রপতির পদে বসার পর রুশ-নীতি সম্পর্কে মার্কিন প্রশাসনের সন্দেহ তীব্রতর হয়। ঐতিহাসিক ফ্রেমিং-এর মতে, ট্রুম্যান বৈদেশিক নীতিতে কাঁচা ছিলেন। মার্কিন পেন্টাগন বা সামরিকমণ্ডলীর প্রতিনিধি এ্যাডমিরাল লিহি (Leahy) তাঁকে পরামর্শ দেন যে, রুজভেল্ট ইয়াল্টায় স্ট্যালিনের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি পূর্ব ইওরোপ ও মাঞ্চুরিয়ায় রুশ-প্রাধান্য মেনে নেন। এই ভুল সংশোধন করা উচিত।

দ্বিতীয় রণাঙ্গণ সম্পর্কিত অবিশ্বাস : ইয়াল্টা চুক্তির অপব্যাখ্যা

ইতিমধ্যে পোল্যান্ডে ও রুমানিয়ায় কমিউনিস্টরা সরকারী ক্ষমতা অধিকার করে। এই দুই দেশ লাল ফৌজের দখলে ছিল। সুতরাং ট্রুম্যান মনে করেন যে, রাশিয়া ইয়াল্টা-চুক্তির শর্ত অনুযায়ী পোল্যান্ডে স্বাধীন ও অবাধ নির্বাচনের ব্যবস্থা না করে নিজ-তাঁবেদার সরকার গঠন করেছে। পোল্যান্ডের মুক্তিবাহিনীর সেনাদের মৃতদেহ কাটিনার অরণ্যে আবিষ্কৃত হলে সন্দেহ করা হয় যে, রুশ লাল ফৌজ তাদের হত্যা করেছে। এজন্যে পশ্চিমী দেশে উত্তাপ সৃষ্টি হয়। ট্রুম্যান রুশ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটোভের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় কঠিন ভাষা প্রয়োগ করেন। মলোটোভ ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করেন যে, "ট্রুম্যান আমেরিকার মিজুরী প্রদেশের খচ্চর তাড়কদের ভাষায় তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন।" এজন্যে স্ট্যালিন একটি প্রতিবাদপত্র পাঠান। ট্রুম্যান রাশিয়াকে ল্যান্ড-লিজ চুক্তি অনুযায়ী সাহায্যদান বন্ধ করে দেন।

পোল্যান্ড সম্পর্কে ট্রুম্যান প্রশাসনের রুশ বিরোধী ক্ষোভ

এই পরিবেশে ১৯৪৫ খ্রীঃ আগস্ট মাসে পটসডাম-সম্মেলন চলার সময় ট্রুম্যানের কাছে সংবাদ আসে যে, মার্কিন বিজ্ঞানীরা সাফল্যের সঙ্গে আণবিক বোমার পরীক্ষা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সম্মেলনে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নমনীয় ব্যবহার ত্যাগ করে কর্কশ বাক্য ব্যবহার করেন। ফলে স্ট্যালিনও দৃঢ় মনোভাব দেখাতে থাকেন। কারণ, পূর্ব ইওরোপে তখন লক্ষ লক্ষ ফৌজ দখল নিয়ে বসেছিল। যুদ্ধের শেষ কথা হল জমিনের দখলকারী। সেই দিক থেকে সোভিয়েত রাশিয়া পূর্ব ইওরোপে সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। কাজেই আমেরিকা নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসতে থাকে। জার্মানী ও তার মিত্র শক্তিগুলির সঙ্গে সন্ধির শর্ত কিভাবে স্থির করা হবে এবিষয়ে তিন প্রধানের তীব্র মতভেদ হলে শেষ পর্যন্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের হাতে সন্ধির খসড়া রচনার ভার দিয়ে পটসডাম-সম্মেলন শেষ হয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে বিভেদ আরও তীব্রতর হয়।

মার্কিন আনবিক বোমা ও পটসডাম সম্মেলনে মতভেদ

ইতিমধ্যে ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, পশ্চিমী জগতের প্রভাবশালী নেতা উইনস্টন চার্চিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফুলটনে ৫ই মার্চ, ১৯৪৬ খ্রীঃ একটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতা Fulton Speech নামে খ্যাত। চার্চিল এই বক্তৃতায় মার্কিন দেশকে সতর্ক করে দেন যে, বাল্টিকের স্টেটিন (Stettin) থেকে আড্রিয়াটিকের ট্রিয়েস্ট (Triest) পর্যন্ত পুরা ইওরোপ সোভিয়েত লৌহ যবনিকার (Iron curtain) অন্তরালে চলে গেছে। ইওরোপের ঐতিহাসিক নগরী ও রাজধানীগুলি আজ সোভিয়েত লৌহ যবনিকার আড়ালে। এখনও যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সতর্ক না হয়, তবে গোটা ইওরোপ

চার্চিলের ফুলটন বক্তৃতা —লৌহ যবনিকা তত্ত্ব

সোভিয়েত রাশিয়া গ্রাস করবে ঠিক প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় পক্ষী যেমন তার শিকার গলা-ধঃকরণ করে, সেভাবে। চার্চিলের ফুলটন বক্তৃতা মার্কিন শাসকমহলে দারুণ উদ্বেগ সৃষ্টি করে।

এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর গ্রীস, তুরস্ক থেকে ব্রিটেনের হাত গুটিয়ে নেওয়ার সতর্কবাণী পাঠায়। (ট্রুম্যান নীতি পৃঃ ২৫৭ দ্রষ্টব্য)। গ্রীস, তুরস্ক ও ইরানে রুশ-অনুপ্রবেশের আশঙ্কা দেখা দিলে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান ১৯৪৭ খ্রীঃ মার্চে, তাঁর বিখ্যাত ট্রুম্যান-নীতি ঘোষণা করেন। ট্রুম্যান-নীতিতে বলা হয় যে, মুক্ত বিশ্বের কোন স্থানে সংখ্যালঘু সশস্ত্র গোষ্ঠী অথবা বৈদেশিক শক্তি, গণতান্ত্রিক বৈধ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করলে সেই বৈধ সরকারকে মার্কিন সাহায্য দেওয়া হবে। ট্রুম্যান-নীতির দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে অ-কমিউনিস্ট সরকারগুলিকে কমিউনিস্ট আক্রমণ থেকে রক্ষার পুলিশী দায়িত্ব নিজস্কন্ধে নেয়। আপাততঃ গ্রীস ও তুরস্কে ৪০০ মিলিয়ন ডলার আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। এর পরেই মার্শাল-পরিকল্পনা অনুসারে পশ্চিম ইওরোপের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১২,০০০,০০০,০০০ ডলার ব্যয় করে। সোভিয়েত রাশিয়া এবং পূর্ব ইওরোপীয় দেশগুলিকে এই সাহায্যের আওতা থেকে কৌশলে বাদ দেওয়া হয়। মলোটোভ মার্শাল-পরিকল্পনাকে যথেষ্ট নিন্দা-মন্দ করেন এবং 'ডলার-সাম্রাজ্যবাদ' নামে অভিহিত করেন। তিনি আশঙ্কা করেন যে, এর ফলে পশ্চিম জার্মানীর উত্থান ঘটবে।

গ্রীক, তুরস্ক ও ইরাণের সমস্যা : ট্রুম্যান নীতি : মার্শাল পরিকল্পনা

মার্শাল-পরিকল্পনার পর সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী দেশগুলির সম্পর্ক যারপরনাই খারাপ হয়ে যায়। জার্মানীকে উপলক্ষ করে ঠাণ্ডা লড়াই তুঙ্গে চলে যায়। Trizonia পরিকল্পনা অনুযায়ী মার্কিন দেশ, ব্রিটেন, ফ্রান্সের অধিকৃত জার্মানীকে একত্র করে F. R. G. (Federal Republic of Germany) বা জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র বা পশ্চিম জার্মানী গঠিত হয়। এর জবাবে সোভিয়েত অধিকৃত পূর্ব জার্মানী নিয়ে G.D.R. (German Democratic Republic) বা জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়। ১৯৪৮ খ্রীঃ জুন মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন বার্লিন অবরোধ ঘোষণা করে। মিত্রশক্তির অধিকৃত পশ্চিম বার্লিন ছিল সোভিয়েত অধিকৃত অঞ্চলের ভিতর অবস্থিত। সুতরাং পশ্চিম বার্লিনে যাতায়াতের পথ ছিল সোভিয়েত অধিকৃত এলাকার মধ্য দিয়ে। বার্লিন অবরুদ্ধ হলে ইঙ্গ-মার্কিন বিমানবহর আকাশপথে খাবার ও অন্যান্য দ্রব্য ফেলে পশ্চিম বার্লিনকে রক্ষা করে। শেষ পর্যন্ত অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

জার্মানীর সমস্যা : বার্লিন অবরোধ

১৯৪৯ খ্রীঃ সোভিয়েত ইউনিয়ন পরমাণু বোমা তৈরি করে ফেলে। এর ফলে মার্কিন দেশের একচেটিয়া পরমাণু বোমার অধিকার নষ্ট হয়। এরপর উভয় পক্ষ নিজ নিজ স্থলবাহিনী, বায়ুবাহিনী বাড়াবার দিকে নজর দেয়। ১৯৪৯ খ্রীঃ এই উদ্দেশ্যে মার্কিন নেতৃত্বে পশ্চিম ইওরাপের দেশগুলি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডাকে নিয়ে N.A.T.O. বা উত্তর আটলান্টিক চুক্তি-সংস্থা তৈরি হয়। এই জোটের হাতে এক বিরাট স্থলবাহিনী থাকে, যা ছিল সোভিয়েত লাল ফৌজ অপেক্ষা শক্তিশালী। এই বাহিনীর দ্বারা পশ্চিম ইওরোপে সম্ভাব্য সোভিয়েত আক্রমণ ঠেকাবার ব্যবস্থা করা হয়। সোভিয়েত রাশিয়া এর প্রত্যুত্তরে পূর্ব ইওরোপের দেশগুলিকে নিয়ে-'ওয়ারশচুক্তি' জোট (Warshaw Pact) গড়ে। ফলে ইওরোপে স্থিতাবস্থা দেখা দেয়।

N.A.T.O. চুক্তি গঠন : পাল্টা ওয়ারশ চুক্তি গঠন

ইওরোপের বাইরে ১৯৪৯ খ্রীঃ চীনে কমিউনিস্ট বিজয় মার্কিন প্রশাসনকে বিপর্যস্ত করে। ১৯৫০ খ্রীঃ কমিউনিস্টশাসিত উত্তর কোরিয়া ৩৮° অক্ষাংশ পার হয়ে দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ

করলে জাতিপুঞ্জের পতাকার নিচে প্রধানতঃ মার্কিন সেনা দক্ষিণ কোরিয়ার হয়ে যুদ্ধে নেমে পড়ে। ওদিকে কমিউনিস্ট চীন উত্তর কোরিয়ার হয়ে যুদ্ধে নামে। বহু রক্তক্ষয়ের পর কোরিয়ার ৩৮° অক্ষাংশ বরাবর স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনা হয়। ১৯৫৩ খ্রীঃ কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি হয়।

কোরিয়ার যুদ্ধ

[গ] সপ্তম পরিচ্ছেদ : জাতীয়তাবাদের জয় : সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে অধীন জাতিগুলির মুক্তি (Spread of Nationalism and Winding up of Empires) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের পতনের ঘন্টা বেজে যায়। ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দীর্ঘকাল ধরে যে স্বাধীনতা-আন্দোলন চলছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তা সফলতার দরজায় পৌঁছে যায়। প্রথমতঃ, ১৯৪২ খ্রীঃ আগস্ট আন্দোলন বা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ব্রিটিশ সরকারের ভিত নড়িয়ে দেয়। দ্বিতীয়তঃ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের হাতে বন্দী ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীকে নিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু 'আজাদ হিন্দ বাহিনী' ও 'আজাদ হিন্দ সরকার' গড়েন। এই বাহিনী জাপানের সঙ্গে যোগ দিয়ে ভারতের মুক্তির জন্যে "দিল্লী চলো", 'জয়হিন্দ" ধ্বনি উচ্চারণ করে ভারতের সীমান্তে মণিপুরের ইম্ফল পর্যন্ত চলে আসে। আজাদ হিন্দ বাহিনীর কীর্তি সারা ভারতকে অনুপ্রাণিত করে। তৃতীয়তঃ, ব্রিটিশ সেনা ও ব্রিটিশ ভারতীয় পুলিশের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যে ফাটল ধরে। চতুর্থতঃ, বোম্বাইয়ে, করাচীতে ব্রিটিশ ভারতীয় নৌবাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। যদিও এই বিদ্রোহ প্রশমিত হয়, সরকার অনুভব করেন যে, তাঁরা আর ভারতীয় বাহিনীর আনুগত্যের উপর নির্ভর করে এ দেশ শাসন করতে পারবেন না। আর একটি গণ-আন্দোলনের ডাক কংগ্রেস দিলেই তার ধাক্কায় ব্রিটিশকে ভারত ছাড়তে হবে। এমতাবস্থায় ১৯৪৭ খ্রীঃ ১৫ই আগস্ট ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে যায়। যাওয়ার আগে ভারত মহাদেশকে ভারত ও পাকিস্তান এই দুই আলাদা দেশে ভাগ করে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের পতনের আরও কতকগুলি কারণ ছিল। (১) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে নাৎসী আক্রমণের ফলে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির শোচনীয় পরাজয় ঘটে। তারপর ১৯৪১-৪২ খ্রীঃ থেকে প্রাচ্য-শক্তি জাপানের আক্রমণে মার্কিন দেশ ও ব্রিটিশ শক্তি ধরাশায়ী হলে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যে আসলে কাগুজে বাঘ তা এশিয়াবাসী বুঝে ফেলে। (২) যদিও শেষ পর্যন্ত জার্মানী ও জাপানের পরাজয় ঘটে, ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলি তাদের হৃত মর্যাদা আর কখনও ফেরত পায়নি। (৩) জাপানীরা পূর্ব এশিয়ায় ডাচ, ফরাসী ও ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে প্রচার চালায়। এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্যে এই প্রচার জাতীয়তার বীজকে সারবান করে। জাপানীরা ইন্দো-চীন বা ভিয়েৎনাম ছাড়ার সময় স্থানীয় জাতীয়তাবাদীদের হাতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে যায়। এগুলির সাহায্যে ইওরোপীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো সম্ভব হয়। (৪) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরাজ, ফরাসী ও ডাচ প্রভৃতি শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। ফ্রান্স যুদ্ধের সময় জার্মানসেনার দখলে থাকায় হীনবল হয়। যুদ্ধের পর ফ্রান্স স্বাধীনতা ফিরে পেলেও তার প্রাক্তন শক্তি ফিরে পায়নি। ফ্রান্স নিজের অর্থনৈতিক দুর্দশা ও অন্তর্বিরোধে হীনবল হলে ফরাসী উপনিবেশ আলজেরিয়া ও ইন্দো-চীনে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ দেখা দেয়। ব্রিটিশও যুদ্ধের পর তার বিশ্বজোড়া উপনিবেশ রক্ষায় সক্ষম ছিল না। ভারতবর্ষ ছিল ইংরাজের শক্তির উৎস। ভারত হাতছাড়া হলে এবং ভারতীয় সেনার সহায়তা হাতছাড়া হলে ইংরাজের পক্ষে আর অন্যত্র সাম্রাজ্য ধরে রাখার ক্ষমতা ছিল না।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন:আজাদ হিন্দ আন্দোলন : ভারতের স্বাধীনতা লাভ

ভারতবর্ষই ছিল ব্রিটিশের বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের নাভিকেন্দ্র। ব্রিটিশ ভারত ছাড়ার ফলে এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের

স্বাধীনতা-আন্দোলনের ফলে ব্রহ্মদেশেও ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির জন্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আরম্ভ হয়।[১] ব্রহ্মের প্রধান উপজাতি শান, কারেন, চিন, কাচিন সকল উপজাতির মধ্যেই কমবেশি জাতীয়তাবাদী ঢেউ দেখা দেয়। ১৯৩৫ খ্রীঃ ভারত-শাসন আইন দ্বারা ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ থেকে পৃথক করার পর এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্র হয়। রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রসংঘ দোবাম আসিয়োন স্থাপিত হয়। এই সঙ্ঘের দুই প্রধান নেতা থাকিন-নু ও থাকিন আয়ুংশান ব্রহ্মের যুবশক্তি ও জাতীয়তাবাদীদের সঙ্ঘবদ্ধ করেন। এই নেতারা ছিলেন মূলতঃ জাতীয়তাবাদী যদিও এরা মার্ক্সীয় ভাবাদর্শে বিশ্বাস করতেন। ব্রহ্মের বয়োজ্যেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন ডঃ বা-ম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানেব হাত থেকে ব্রিটিশ ব্রহ্মের অধিকার ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু ভারতবর্ষ হাতছাড়া হওয়ার পর ব্রহ্মদেশ হাতে রাখা অসম্ভব দেখে ব্রিটেনের শ্রমিক মন্ত্রিসভা ১৯৪৭ খ্রীঃ ক্ষমতাহস্তান্তরে রাজী হন। কিন্তু উ-আউং-শান ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী হত্যা করায় উ-নু ক্ষমতা নেন। ব্রহ্মদেশ স্বাধীনতা পায়। কমিউনিস্ট গেরিলাদের বিদ্রোহ ও কারেন গেরিলা আক্রমণে নবগঠিত ব্রহ্ম-প্রজাতন্ত্র বিপন্ন হয়। এই অবস্থায় সেনাপতি নে-উইন ব্রহ্মে ক্ষমতা দখল করেন।

ব্রহ্মের স্বাধীনতা লাভ

ব্রিটেন মালয়ে তার দখল রাখার জন্যে কিছুকাল চেষ্টা চালায়। মালয়ী-অধ্যুষিত মালয় উপদ্বীপ ও চীনা-অধ্যুষিত সিঙ্গাপুর নিয়ে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৮ খ্রীঃ মালয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন করেন এবং মালয়কে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে চান। রুশ কমিন্‌টার্নের নির্দেশে ১৯৪৮ খ্রীঃ মালয়ে প্রচণ্ড কমিউনিস্ট অভ্যুত্থান ঘটে। ৩ লক্ষ চীনা অনুপ্রবেশকারী মালয়ের জঙ্গল থেকে হানাদারী দ্বারা জন-জীবন বিপর্যস্ত করে। শেষ পর্যন্ত মালয়ী সরকারী ও ব্রিটিশ সেনার মিলিত চাপে হানাদারী বাহিনী পরাস্ত হয়। মালয় একটি যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে প্রধানমন্ত্রী টেংকু আবদুল রহমানের নেতৃত্বে স্থাপিত হয়। ইংরাজ মালয় থেকে চলে যায়। সিঙ্গাপুর একটি স্বতন্ত্র স্বয়ং-শাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত সিঙ্গাপুর ও মালয় যুক্ত হয়ে 'মালয়েশিয়া' রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

মালয়ের স্বাধীনতা লাভ

সুমাত্রা, জাভা, বালি প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে ছিল ডাচ সাম্রাজ্য, যার এখনকার নাম ইন্দোনেশিয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদীরা স্বাধীনতালাভের জন্যে আন্দোলন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই দ্বীপপুঞ্জ জাপানীদের দখলে চলে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ইন্দোনেশীয় জাতীয়তবাদীরা সুকার্নো, ডাঃ হাত্তা প্রভৃতি নেতার নেতৃত্বে জাপানের হাত থেকে তাঁদের দেশের ভার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। ইন্দোনেশিয়া ছিল একটি সমৃদ্ধিশালী দেশ। বিশ্বের বৃহত্তম কুইনাইন উৎপাদন এখানে হয়। বিশ্বের গোলমরিচের ৮৩%, রবারের ৩৭% এখানে উৎপাদন হয়। তাছাড়া খনিজ তেল, বিটের তৈরী চিনি ও প্রচুর ধান এখানে উৎপন্ন হয়। কাজেই জাপান এই দেশ ছেড়ে গেলে ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদীরা এই দেশের স্বাধীনতালাভের জন্যে আন্দোলন চালায়। জাপান জাতীয়তাবাদীদের হাতে অস্ত্র দিয়ে যায়। জাতীয়তাবাদীরা একটি আগাম সংবিধান রচনা করে। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সেনার সহযোগিতায় ডাচরা ইন্দোনেশিয়ায় ফিরে আসে। ডাচ সরকার ইন্দোনেশিয়া ছেড়ে যেতে অস্বীকার করে এবং আধুনিক মারণাস্ত্রের সাহায্যে তারা ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদকে দমিয়ে ফেলার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালায়। ১৯৪৮ খ্রীঃ মার্কিন রণতরী রেন ভিলের উপর ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে ডাচ সরকারের যে চুক্তি হয়-পরে ডাচ সরকার তা ভেঙে ফেলে। এমন কি জাতিপুঞ্জের নির্দেশ অমান্য করে তারা ইন্দোনেশীয় জাতীয় নেতা

ইন্দোনেশীয় স্বাধীনতা : ডাচ সাম্রাজ্যবাদের পতন

১· Fair Bank—History of the Far East and South East Asia.

সুকার্নো, মহম্মদ হাত্তা প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করে। শেষ পর্যন্ত মার্কিন হস্তক্ষেপ, ভারতবর্ষের তীব্র প্রতিবাদ প্রভৃতির ফলে ডাচ সরকার ১৯৪৯ খ্রীঃ হেগ সম্মেলনে ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দেয়। সুকার্নো, মহম্মদ হাত্তা নূতন প্রজাতন্ত্রের যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী হন। ইন্দোনেশিয়ার ১৬টি দ্বীপ নিয়ে ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ফরাসী উপনিবেশ ছিল ইন্দোচীন বা ভিয়েতনাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ইন্দো-চীন ৫টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল; যথা, আনাম, কোচিন চীন, ক্যাম্বোডিয়া, লাওস ও টংকিং। ইন্দোচীনের লোকসংখ্যা ছিল ২$\frac{১}{২}$ কোটি। ইন্দোচীন প্রচুর চাল ও রবার উৎপাদনকারী দেশ হিসাবে পরিগণিত ছিল। উনবিংশ শতকে ফ্রান্স ইন্দো-চীন অধিকার করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান ইন্দোচীন বা ভিয়েতনাম দখল করে। পটসডাম-সম্মেলনে স্থির হয় যে, জাপানের হাত থেকে ইন্দোচীন মুক্ত হলে ফরাসীরা ফিরে এসে ইন্দোচীনের দখলদারি নিবে। যুদ্ধ শেষ হলে ১৯৪৯ খ্রীঃ ৫০ হাজার ফরাসী সেনা ইন্দোচীনে নেমে পড়ে। ফরাসীরা আসার আগে জাতীয়তাবাদী ইন্দোচীনারা ডাঃ হো চি মিনের নেতৃত্বে জাপানের বিরুদ্ধে ইন্দোচীনের স্বাধীনতার লড়াই ১৯৪২ খ্রীঃ থেকে চালায়। তারা ইন্দোচীনের নাম বদল করে এই দেশের প্রাচীন নাম 'ভিয়েতমীন' নাম ব্যবহার করে। এখন ফরাসীরা নেমে পড়লে তারা দেখে যে, পুরাতন সাম্রাজ্যবাদীরা আবার ফিরে এসেছে। জাপানীরা ইন্দোচীন ছাড়ার সময় ভিয়েতমীনদের হাতে প্রচুর অস্ত্র দিয়ে যায়। তার সাহায্যে তারা ফরাসীদের ব্যতিব্যস্ত করলে ১৯৪৬ খ্রীঃ ফরাসী সরকার ভিয়েতমীনের সঙ্গে চুক্তি করেন যে—(১) হো-চি-মিনের প্রজাতন্ত্র ভিয়েতমীন বা ভিয়েতনামকে ফ্রান্স স্বীকৃতি দেবে। (২) উত্তর ইন্দোচীনের কিছু অংশ নিয়ে এই প্রজাতন্ত্র থাকবে। (৩) এই প্রজাতন্ত্র ইন্দোচীন ফেডারেশনে যোগ দিয়ে ফরাসী ইউনিয়নের ভিতর থাকবে' ১৯৪৬ খ্রীঃ তার অবস্থা একটু ভাল হলে ফ্রান্স এই চুক্তি ভেঙে ফেলে। তারা আনামের রাজবংশের লোক বাও-দাইকে ইন্দোচীনের 'পুতুল-সম্রাট' বানিয়ে তার আড়ালে সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করে। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা মার্কিন অস্ত্র ও অর্থসাহায্য নিয়ে মারাত্মক যুদ্ধ দ্বারা ভিয়েতনাম সরকারকে ধ্বংস করার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করে।

ডাঃ হো-চি-মিন ছিলেন ভিয়েতনামের জাতীয়তার প্রতীক। পাশ্চাত্য জগতে তাঁকে উগ্রপন্থী কমিউনিস্ট গেরিলা সেনাপতি ও সন্ত্রাসবাদী রূপে মিথ্যা প্রচার করা হয়। ডাঃ হো-চি-মিন ছিলেন অকৃতদার সমাজতন্ত্রী দেশপ্রেমিক। তাঁকে প্রকৃত অর্থে জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রী (Nationalist Communist) বলা চলে। তিনি আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের তাঁবেদার বা কমিন্টার্নের এজেন্ট ছিলেন না। নিজ দেশ ভিয়েতনামের স্বাধীনতা অর্জন এবং সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার দ্বারা ভিয়েতনামকে ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও দরিদ্র-দশা থেকে মুক্ত করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এশিয়ার অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতার মতই ডাঃ হো ছিলেন উদার, মানবতাবাদী লোক। ভিয়েতনামীদের কাছে তিনি ছিলেন পিতৃপ্রতিম। ডাঃ হো-চি-মিনের পূর্বজীবন ছিল বহু ঘটনা-কণ্টকিত বর্ণবহুল। গোড়ায় তিনি রুশ নেতা বোরোডিনের কাছেই কমিউনিজমের দীক্ষা নেন এবং কিছুকাল মস্কোতে কাটান। তারপর তিনি লন্ডনের কার্লটন হোটেলে কিছুকাল পরিচারকের কাজ করেন। লণ্ডন থেকে তিনি প্যারিসে আসেন। প্যারিসে তিনি বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং ফ্রান্সের বিখ্যাত বামপন্থী নেতা লিওব্লমের সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ হন। এই সময় তিনি লেপ্যারিয়া পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন। এই সময় থেকে তিনি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং ভিয়েতনামের স্বাধীনতার দাবি জানাতে থাকেন। এই সময় থেকেই তিনি একাধারে জাতীয়তাবাদী ও সমাজতন্ত্রী হিসাবে পরিচিতি পান। ফরাসী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁকে বিশ্ব-ক্ষমতা বিস্তারের জন্যে মস্কোর এজেন্ট হিসাবে

মিথ্যা প্রচার চালায়। কিন্তু ঐতিহাসিকদের নিরপেক্ষ বিচারে তিনি ছিলেন নিপীড়িত ভিয়েতনামীদের মুক্তিদাতা ও ভিয়েতনামে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা।

যাই হোক ভিয়েতনামীরা তাদের দেশের স্বাধীনতার জন্যে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে মরণ-পণ লড়াই চালায়। গ্রামাঞ্চলগুলি সবই ভিয়েতনামীদের হাতে চলে যায়। ১৯৫৪ খ্রীঃ ফরাসীরা হ্যানয় ও হাইফং-এর ব-দ্বীপ অঞ্চলে পিছু হটে আসে। ১৯৫৪ খ্রীঃ দিয়েন-বিয়েন-ফু-তে ফ্রান্সের যান্ত্রিক ও প্যারাসুট বাহিনীর সঙ্গে ভিয়েতনামীদের এক প্রবল যুদ্ধ হলে ফ্রান্সের সেরা সেনারা হয় মারা যায়, নয় বন্দী হয়। ১৫ হাজার ফরাসী সেনা অবরুদ্ধ হয়। দিয়েন-বিয়েন-ফুর যুদ্ধে ভিয়েতনামী সেনাপতি জেনারেল গিয়াপ (Giap) ফরাসী বাহিনীকে বিধ্বস্ত করেন।

ভিয়েতনামে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ : ভিয়েতনাম জাতীয়তাবাদ

অবশেষে জেনেভা-সম্মেলনে ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী মঁদে ফ্রাঁস জেনিভা-চুক্তি ১৯৫৪ খ্রীঃ দ্বারা ভিয়েতনাম থেকে ফরাসী সেনা অপসারণ করেন। ভিয়েতনামকে ১৭° অক্ষাংশ বরাবর ভাগ করা হয়। এর উত্তরদিকে থাকে হো-চি-মিনের প্রজাতন্ত্র, দক্ষিণে ফরাসী সাহায্যপুষ্ট বাও-দাই সরকার। যত শীঘ্র সম্ভব ইন্দোচীনে সাধারণ নির্বাচন দ্বারা কোন্ সরকার লোকে চায় তা স্থির করে ভিয়েতনামের সংযুক্তি করার শর্ত স্থির করা হয়। ভারত-কানাডা ও পোল্যান্ডকে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে ফ্রান্স ইন্দোচীন থেকে তার সেনা সরায়। কিন্তু মার্কিন প্রভাবে নির্বাচন বন্ধ হয় এবং দ্বিতীয় ভিয়েতনাম-যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলার পর মার্কিন সেনা পরাজিত হয়। এই যুদ্ধের শেষে ১৯৭১ খ্রীঃ ঐক্যবদ্ধ ভিয়েতনাম গঠিত হয়।

জেনিভা চুক্তি : ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের পতন

ভারতের গোয়া-দমন-দিউ ছিল পর্তুগীজ উপনিবেশ। ভারতসরকার গোয়া বলপূর্বক দখল করে নিলে এই পর্তুগীজ উপনিবেশের পতন ঘটে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : ইওরোপে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সমাজতন্ত্রবাদের জয় এবং স্থিতিলাভ (Triumph and consolidation of Socialistic forces in Europe and South East Asia) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইওরোপ এক ভগ্নদশাগ্রস্ত অবস্থায় উপনীত হয়। ইওরোপের প্রধান শিল্প-সমৃদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি যথা ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অপরদিকে বিজিত জার্মানী, ফ্যাসিস্ট ইতালী ও তাদের মিত্র শক্তিগুলিও দারুণ দুর্দশাগ্রস্ত হয়। পূর্ব ইওরোপের রাজ্যগুলি জার্মান আক্রমণে ও শোষণে বিধ্বস্ত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মান আক্রমণে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল একমাত্র রাষ্ট্র যা তখনও নিজশক্তির উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়েছিল এবং পূর্ব ইওরোপের বৃহৎ অঞ্চলকে লাল ফৌজ দ্বারা নাৎসী ও ফ্যাসিস্টবাহিনীর দখলদারি থেকে মুক্ত করেছিল।

ইওরোপে লাল ফৌজের অগ্রগতি; পূর্ব ইওরোপে পুরাতন তন্ত্রের পতন

এই পরিস্থিতিতে পূর্ব ইওরোপের প্রাক-যুদ্ধকালীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। জমির উপস্বত্বভোগী জমিদার ও সামন্ত অভিজাতশ্রেণী জার্মানীর পতনের পর দেশ ছেড়ে পালায়। বাকী লোকেরা সমাজব্যবস্থার ভিতর নিজেদের মিশিয়ে দেয়। অনেকে যুদ্ধে মৃত্যুমুখে পড়ে। বেশিরভাগ কলকারখানা সোভিয়েত রাশিয়া যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ তুলে নেয়।

যুদ্ধোত্তর পূর্ব ইওরোপের এই ভাঙন-ধরা পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্রের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ স্বভাবতই দেখা দেয়। পূর্ব ইওরোপের দেশগুলিতে যথা পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া,

হাঙ্গেরী, রুমানিয়া প্রভৃতি দেশে একের পর এক সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হয়। এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক পূর্ব ইওরোপের এই সমাজতন্ত্রীকরণের জন্যে রুশ লাল ফৌজের হস্তক্ষেপ ও রুশ সরকারের সক্রিয় সমাজতন্ত্রীকরণ নীতিকে দায়ী করেন। তাঁরা বলেন যে, রাশিয়া পূর্ব ইওরোপকে জার্মান শাসন থেকে লাল ফৌজ দ্বারা মুক্ত করার পর লাল ফৌজের ছত্রছায়ায় এই অঞ্চলগুলিতে তাঁবেদার কমিউনিস্ট দলের সাহায্যে তাঁবেদারী সরকার স্থাপন করে। রাশিয়া এই অঞ্চলে অবাধ নির্বাচনের ব্যবস্থা করে নি। উইলফ্রিড ন্যাপ (Wilfried Knapp) প্রভৃতি এই মত প্রচার করেন। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে বুঝা যাবে যে, এই দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক বিকাশ প্রায় অবশ্যম্ভাবী ছিল। কারণ প্রাক্-যুদ্ধকালীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছিল ইতিহাসের ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দেওয়ার মত ব্যাপার। যে সমাজব্যবস্থা ভেঙে গেছে, তাকে আর জোড়াতালি দিয়ে ফিরিয়ে আনা সম্ভব ছিল না। অপর দিকে পশ্চিম ইওরোপের আদর্শে বুর্জোয়া-গণতন্ত্র স্থাপন করাও এই দেশগুলিতে আর সম্ভব ছিল না। কারণ পশ্চিম ইওরোপের শিল্পকেন্দ্রিক বুর্জোয়া-সমাজে শ্রমিকদের দুর্দশার কথা সকলেই জানত। তা ছাড়া মুনাফার জন্যে পশ্চিমী শক্তিগুলির উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা ও তজ্জনিত যুদ্ধের সমস্যা কারও অজানা ছিল না। এই অবস্থায় সমাজতন্ত্রই ছিল পূর্ব ইওরোপীয়দের একমাত্র মুক্তির পথ।

পূর্ব ইওরোপের জনগণের সমাজতন্ত্রের প্রতি আগ্রহ

১৯৪৪ খ্রীঃ সোভিয়েত লাল ফৌজ পোল্যান্ডে ঢোকার পর সোভিয়েত ইউনিয়নে গঠিত পোল কমিউনিস্টদের দল পি· সি· এন· এল· বা পোল জাতীয় মুক্তিসমিতি পোল্যান্ডের লুবলিনে তাদের সরকার গঠন করে। এই সরকার 'লুবলিন সরকার' নামে পরিচিত হয়। এরা লন্ডনে নির্বাসিত প্রাক-যুদ্ধকালীন পোল সরকারকে অস্বীকার করে। লুবলিন সরকার কার্যতঃ মুক্ত পোল্যান্ডের অস্থায়ী সরকারে পরিণত হয়। এই সরকারের উপ-প্রধানমন্ত্রী গোমূলকার নেতৃত্বে পোল্যান্ডে কমিউনিস্টরা ওয়ার্কার্স পার্টি বা কমিউনিস্ট দল ক্ষমতা অধিকার করে। ভূমিসংস্কার, মজুরি-হার বৃদ্ধি, খাদ্যদ্রব্যের ন্যায্য বন্টন প্রভৃতি দ্বারা গোমূলকা সরকার সমাজতন্ত্রকে মজবুত করে। ১৯৪৭ খ্রীঃ ১৯শে জানুয়ারী পোলিশ পার্লামেন্টের নির্বাচন হলে পোলিশ পেজেন্টস পার্টি বা পি· এন· এল· ৮০% ভোট পেয়ে সরকার গঠন করে। গোমূলকা উপ-প্রধানমন্ত্রী হন, বিয়েরুট রাষ্ট্রপতি হন। ১৯শে ফেব্রুয়ারী পোলিশ সংবিধান গৃহীত হয়। স্ট্যালিনীয় যৌথ খামার ব্যবস্থা পোল্যান্ডে প্রবর্তনের বিরোধিতা করায় ১৯৪৮ খ্রীঃ গোমূলকা পোলিশ ওয়ার্কার্স পার্টির সেক্রেটারী পদ হারান। বিয়েরুট তাঁর পদে বসেন। ১৯৪৮ খ্রীঃ ১৫ই ডিসেম্বর ওয়ার্কার্স পার্টি (পি· পি· আর·) ও পেজেন্টস পার্টি (পি· পি· এল·) যুক্ত হয়ে পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টি গঠন করে এবং সরকার গঠন করে।

পোল্যাণ্ডে সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠন

পোল্যান্ডের পাশাপাশি রুমানিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সরকার স্থাপিত হয়। ইয়াল্টা-সম্মেলনের পর রুমানিয়ায় দক্ষিণপন্থী রোডস্কি সরকারের বিরুদ্ধে রুমানিয়ার কমিউনিস্টরা জাতীয় ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট গঠন করে এবং নির্বাচনে আইনসভার ৪০% সদস্য পদ অধিকার করে। এর পর মন্ত্রিসভার উপযুক্তসংখ্যক মন্ত্রী-পদ লাভের দাবিতে অবরোধ ও প্রতিবাদ-মিছিল চালাতে থাকে। মস্কো রেডিও ও প্রাভদা পত্রিকাতেও রুমানিয় কমিউনিস্টদের সমর্থনে প্রচার চালানো হয়। অবশেষে রুশমন্ত্রী আন্দ্রেই ভিসিনিস্কি রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টে আসেন। তিনি রুমানিয়ার রাজা মাইকেলকে দক্ষিণপন্থী রোডস্কি সরকার বরখাস্ত করে রুমানিয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতা পিটার গ্রোজাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ

রুমানিয়ায় কমিউনিষ্ট বিপ্লব

করতে বাধ্য করেন। গ্রোজা তাঁর পছন্দমত লোকদের মন্ত্রী নিয়োগ করেন। গ্রোজা রুমানিয়ায় ভূমিসংস্কার ও বাড়তি ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন।

১৯৪৭ খ্রীঃ মার্শাল-পরিকল্পনা ঘোষিত হলে চেকোশ্লোভাকিয়ায় বিভিন্ন দলের সমবায়ে গঠিত গণতন্ত্রী সরকারের পতন হয় এবং একদলীয় কমিউনিস্ট সরকার গঠিত হয়। ১৯৪৩ খ্রীঃ চেক প্রেসিডেন্ট বেনেস রুশ সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এই চুক্তির দ্বারা সোভিয়েত নির্বাসিত বেনেস সরকারকে চেকোশ্লোভাকিয়া জার্মানদের হাত থেকে মুক্ত করার পর দেশে ফিরে আসতে দিতে রাজী হন। ইতিমধ্যে লাল ফৌজ চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার করে এবং তার ছত্রছায়ায় N. K. V. D. বা চেক কমিউনিস্ট দলকে গ্রাম ও শহরগুলিতে তার সংগঠন তৈরি করার সুযোগ করে দেয়। এর পর ইয়াল্টা-সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে রুশ লাল ফৌজ প্রাগ্ অধিকার করে জার্মানদের হাত থেকে শহরকে মুক্ত করে এবং বেনেস সরকারকে রাজধানীতে ফিরে আসার সুযোগ দেয়। ইতিমধ্যে চেক কমিউনিস্ট ও লাল ফৌজদের দাপটে জার্মান, ইহুদি ও অস্ট্রিয়ান সম্পত্তিভোগী ধনী ও জমি মালিকশ্রেণী চেকোশ্লোভাকিয়া ত্যাগ করে। সেই জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে N. K. V. D. বণ্টন করে। ৩ লক্ষ সুদেতেন জার্মানকে বহিষ্কার করে সেই জমিও কমিউনিস্টদের সমর্থকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় কমিউনিষ্ট বিপ্লব

১৯৪৬ খ্রীঃ নির্বাচনে স্বভাবতঃই N. K. V. D. ৩৮% ভোট পায় এবং মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রীসহ পুলিশ, কৃষিমন্ত্রীর পদ অধিকার করে। চেকোশ্লোভাকিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সংস্কার হলেও গণতান্ত্রিক নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ১৯৪৬-৪৮ খ্রীঃ বহাল থাকে। ১৯৪৭ খ্রীঃ চেকোশ্লোভাক মন্ত্রিসভা রাশিয়ার অজ্ঞাতে মার্শাল পরিকল্পনায় যোগ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। পরে তারা মত পাল্টায়। কিন্তু রুশ নেতারা চেক গণতন্ত্রের চিত্তচাঞ্চল্যে আশঙ্কিত হন। ১৯৪৮ খ্রীঃ কমিউনিস্ট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৮ জন উচ্চ অ-কমিউনিস্ট পুলিশ কর্মচারীকে অযথা বরখাস্ত করার প্রতিবাদে চেক মন্ত্রিসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ ১২ জন অ-কমিউনিস্ট মন্ত্রী পদত্যাগপত্র পেশ করেন। তাঁরা আশা করেন নি যে, কমিউনিস্ট প্রধানমন্ত্রী তাঁদের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করবেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী গোটওয়াল্ড এই পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করার জন্যে রাষ্ট্রপতি বেনেসের কাছে সুপারিশ করেন। বেনেস এই সুপারিশ গ্রহণ করেন এবং তা কার্যকর করেন। গোটওয়াল্ড এই খালি পদে কমিউনিস্টদের মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। ফলে চেকোশ্লোভাকিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সরকার স্থাপিত হয়। এর আগেই যুগোশ্লাভিয়ায় মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক সরকার স্থাপিত হয়েছিল। সোভিয়েত-শাসিত পূর্ব জার্মানী G. D. R.-এ সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গঠত হয়। হাঙ্গেরীতেও সমাজতন্ত্রী সরকার স্থাপিত হয়। হাঙ্গেরীর কমিউনিস্ট পার্টি রাকোসি প্রভৃতির নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শাসন গঠন করে। এভাবে ইওরোপের বৃহত্তর অংশে সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

পূর্ব জার্মানী, যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরীতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

এশিয়াতেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজতন্ত্রের ঢেউ এসে যায়। (১) চীনে ১৯৪৯ খ্রীঃ মাও-সে-তুং (মতান্তরে মাও-জে-ডং)-এর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট বিপ্লব জয়যুক্ত হয়। (বিশদ বিবরণ একাদশ অধ্যায় দশম পরিচ্ছেদ পৃঃ ২০৫ দ্রস্টব্য)। (২) উত্তর কোরিয়ায় কিম ইলসুনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গঠিত হয়। দক্ষিণে মার্কিন সাহায্য-পুস্ট সিংম্যানরী সরকার ৩৩° ডিগ্রী অক্ষাংশের নিচে টিকে থাকে। (৩) ভিয়েতনামে ১৯৫৪ খ্রীঃ জেনিভাচুক্তির দ্বারা ভিয়েতনামের সংযুক্তির জন্যে গণভোট মার্কিন হস্তক্ষেপে বন্ধ হয়ে যায়।

চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, উত্তর কোরিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠন

ফলে ১৭° অক্ষাংশের অপর পারে হো-চি-মিন সরকারের সঙ্গে দক্ষিণে দিয়েম, পরে হিউ সরকারের সংঘাত দেখা দেয়। ভিয়েতনামী জনগণ উত্তরের সমাজতন্ত্রী সরকারের পক্ষে থাকায় মার্কিন সেনা, বিমান, নৌবহর দীর্ঘ আক্রমণ দ্বারা উত্তরের হ্যানয় সরকারকে ধ্বংস করার ব্যর্থ প্রচেস্টা চালায়। প্রায় সহায়সম্বলহীন ভিয়েতনামীরা সামান্য রুশ, চীনা সাহায্য সম্বল করে গর্বিত মার্কিন সেনা, বিমানের আক্রমণকে ব্যর্থ করে দক্ষিণের একের পর এক শহর অধিকার করে। শেষ পর্যন্ত মার্কিন সেনা ভিয়েতনাম ত্যাগ করে। তাই ভিয়েতনাম এক হয়, ভিয়েতনামী সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত জয় হয়।

সারণী

[ক] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পতন আসন্ন হলে তিন প্রধান চার্চিল, রুজভেল্ট ও স্ট্যালিন ইয়াল্টায় (১৯৪৫ খ্রীঃ) মিলিত হয়ে ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন ও রাশিয়া এই চারশক্তির জার্মানীর অধিকৃত অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য স্থির করেন। পোল্যাণ্ডকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে এবং অবাধ ও স্বাধীন নির্বাচন দ্বারা পোলিশ সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাশিয়া মিত্রশক্তির পক্ষে জাপানের বিরুদ্ধে দূর প্রাচ্যের যুদ্ধে যোগ দিতে রাজী হয়। বিনিময়ে কিউরাইল ও শাখালিন দ্বীপপুঞ্জ রাশিয়াকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে ইয়াল্টার চুক্তিকে উপলক্ষ করে পূর্ব-পশ্চিম ঠাণ্ডা লড়াই দেখা দেয়।

[খ] ইয়াল্টা চুক্তির পর রাশিয়ার সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটে। পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়ায় কমিউনিষ্ট শাসন স্থাপিত হওয়ায় নূতন মার্কিণ রাষ্ট্রপতি হ্যারী ট্রুম্যান বিশেষ ক্ষুব্ধ হন। তিনি মনে করেন যে, ইয়াল্টা চুক্তি অনুযায়ী পোল্যাণ্ডে অবাধ নির্বাচন করা হয় নি। এই পরিস্থিতিতে পটসডামে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলে (১৯৪৫ খ্রীঃ) বিরোধ তীব্র হয়। জার্মানীর নিরস্ত্রীকরণ, অনাৎসীকরণ, গণতান্ত্রিকরণ সম্পর্কে মতৈক্য হলেও, অন্যান্য বিষয়ে তীব্র মতভেদ হয়। পটসডাম ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ শীর্ষ সম্মেলন।

[গ] যুদ্ধোত্তর ইওরোপ অর্থনৈতিক দিক থেকে বিধ্বস্ত হওয়ায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্র দেশ ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ডকে অর্থনৈতিকভাবে পুনর্গঠিত করার জন্যে বিপুল পরিমাণ ঋণ ও সহায়তা বা এইড দেয়। এই অর্থ ও মালপত্র প্রদান দ্বারা মার্কিণ দেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রভূত লাভবান হয় এবং পশ্চিম ইওরোপে সাম্যবাদের অগ্রগতি রুখতে পারে।

[ঘ] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন এক মহাশক্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পূর্ব ইওরোপে সোভিয়েত প্রভাব স্থাপিত হওয়ার পর পশ্চিম ইওরোপে, ফ্রান্স, পারস্যে ও তুরস্কে সোভিয়েত প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে রুশ অগ্রগতি ও সাম্যবাদের লাল বন্যাকে রোধ করার জন্যে মার্কিণ রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান তাঁর বিখ্যাত ট্রুম্যান নীতি (১৯৪৭ খ্রীঃ) ঘোষণা করেন। পৃথিবীর স্বাধীন দেশগুলিতে রুশ হস্তক্ষেপ বা সাম্যবাদী বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে মার্কিণ সামরিক সহায়তা দ্বারা আক্রান্ত রাষ্ট্রকে রক্ষা করার নীতি ঘোষিত হয়। মার্শাল পরিকল্পনা দ্বারা পশ্চিম ইওরোপের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে মার্কিণ অর্থনৈতিক সাহায্য দ্বারা মজবুত করার নীতি ঘোষিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিণ সরকারের এই নীতিকে ডলার সাম্রাজ্যবাদ নামে অভিহিত করে।

[চ] ইয়াল্টা ও পটসডাম সম্মেলনের পর পূর্ব-পশ্চিম বিরোধ তীব্র হয়ে উঠে। পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়ায় অবাধ-নির্বাচন না করে লালফৌজের সহায়তায় স্থানীয় কমিউনিষ্টরা ক্ষমতা দখল করায় মার্কিন রাষ্ট্রপতি হ্যারী ট্রুম্যান রুশ ভাবায় রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটোভের সঙ্গে কথা বলেন। ইতিমধ্যে প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্কিন দেশে ফুলটন শহরে প্রদত্ত বক্তৃতায় রুশ আগ্রাসন সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করেন। এই পরিস্থিতিতে গ্রীস, পারস্য ও তুরস্কে রুশ অনুপ্রবেশের আশঙ্কা দেখা দিলে মার্কিণ রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান তাঁর ট্রুম্যান নীতি (১৯৪৭ খ্রীঃ) ঘোষণা করেন। অকমিউনিষ্ট সরকারগুলিকে কমিউনিষ্ট আগ্রাসন থেকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন। মার্শাল পরিকল্পনা দ্বারা পশ্চিম ইওরোপকে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ম্ভর করার জন্যে অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া হয়। জার্মানীকে উপলক্ষ করে ঠাণ্ডা লড়াই তীব্রতর হয় এবং রাশিয়া বার্লিন অবরোধ করলে মিত্রশক্তি আকাশ পথে পশ্চিম বার্লিনে সাহায্য পাঠায়। পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলি ও কানাডাকে নিয়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র N.A.T.O. গঠন করে। প্রত্যুত্তরে পূর্ব ইওরোপের কমিউনিষ্ট দেশগুলির সহায়তায় রাশিয়া ওয়ারশ চুক্তি সম্পাদন করে। ১৯৫০ খ্রীঃ কোরিয়ার যুদ্ধে রুশ সমর্থিত উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিণ দেশ সমর্থিত দক্ষিণ কোরিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করে। ১৯৫৩ খ্রীঃ কোরিয়ায় যুদ্ধ বিরতি ঘটে।

[ছ] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেন ও ফ্রান্স দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ায়, ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৭ খ্রীঃ ১৫ই আগষ্ট ভারত ত্যাগ করেন। তাঁরা ভারতকে, ভারত ও পাকিস্তান এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর এশিয়া ও আফ্রিকায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্র হয়। ব্রহ্মদেশ থেকে ইংরাজ চলে যায়। ১৯৪৮ খ্রীঃ মালয় একটি স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৪৯ খ্রীঃ ইন্দোনেশিয়া ডাচ সাম্রাজ্যবাদী শাসন মুক্ত হয়। ভিয়েতনামে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধের ফলে ১৯৫৪ খ্রীঃ জেনিভা চুক্তির দ্বারা ভিয়েতনাম থেকে ফরাসীরা সরে যায়। ভিয়েতনামে সাধারণ নির্বাচন দ্বারা সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু মার্কিণ হস্তক্ষেপে নির্বাচন বন্ধ হলে দ্বিতীয় ভিয়েতনাম যুদ্ধে জাতীয়তাবাদীদের হাতে মার্কিণ সেনা পরাস্ত হয়। ভিয়েতনাম ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন দেশে পরিণত হয়। ভারতে গোয়া, দমন, দিউ পর্তুগীজ উপনিবেশ ভারত সরকার দখল করে নেন।

[জ] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব ইওরোপে রুশ লাল ফৌজ দখলদারী নেয়। এই সুযোগে ১৯৪৭ খ্রীঃ পোল্যাণ্ডে গোসলকার নেতৃত্বে পোলিশ কমিউনিষ্ট সরকার গঠিত হয়। রুমানিয়ায় পিটার ক্রোজা একটি সমাজতান্ত্রিক সরকার গড়েন। চেকোশ্লোভাকিয়ায় N.K.V.D. নামে স্থানীয় কমিউনিষ্ট দল সমাজতান্ত্রিক সরকার স্থাপন করে। পূর্ব জার্মানীতে G.D.R. বা জার্মান সমাজতান্ত্রিক সরকার এবং হাঙ্গেরীতে রাকোসীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়। এই সরকারগুলি সমাজতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করে। ১৯৪৯ খ্রীঃ চীনে মাঁও-সে-তুং চীনের মূল ভূখণ্ডে কমিউনিষ্ট সরকার গঠন করেন। উত্তর কোরিয়ায় কিউ-উল-সুন এবং ভিয়েতনামে ডাঃ হো-চি-মিনের নেতৃত্বে উত্তর ভিয়েতনামে কমিউনিষ্ট সরকার গঠিত হয়।

অনুশীলনী

১। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) ইয়াল্টা-সম্মেলনের তিন প্রধানের নাম কি? (খ) জার্মানীর পতনের পর কোন্ সম্মেলনে মিত্রশক্তির তিন প্রধান মিলিত হন? (গ) জার্মানী-মুক্ত ফ্রান্সের শাসনভার কে নেন? (ঘ) U. N. B. R. A. কি? (ঙ) ট্রুম্যান ডকট্রিন কি উদ্দেশ্যে ঘোষিত হয়? (চ) মার্শাল-পরিকল্পনা কাকে বলে? (ছ) ঠাণ্ডা লড়াই বা Cold War কাকে বলে? (জ) Fulton Speech কি? (ঝ) N. A. T. O. কাকে বলে? (ঞ) কার নেতৃত্বে ওয়ারশ-চুক্তি জোট গড়ে উঠে? (ট) কোন্ সালে ব্রিটিশ ভারতবর্ষ ছেড়ে যায়? (ঠ) ব্রহ্মের জাতীয়তাবাদী নেতার নাম কি? (ড) স্বাধীনতার পর ব্রহ্মের শাসনভার কে গ্রহণ করেন? (ঢ) কোন্ সালে ব্রহ্মদেশ স্বাধীনতা লাভ করে? (ণ) কার নেতৃত্বে মালয় একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হয়? (ত) কোন্ কোন্ দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে বর্তমান ইন্দোনেশিয়া গঠিত হয়? (থ) ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতাদের নাম লিখ। (দ) কোন্ সালে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা লাভ করে? (ধ) ইন্দোচীন বা ভিয়েতনামের প্রাচীন নাম কি ছিল? (ন) কার নেতৃত্বে ইন্দোচীনারা জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই করে? (প) কার নেতৃত্বে পোল্যান্ডে সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়? (ফ) কার নেতৃত্বে রুমানিয় কমিউনিস্ট বিপ্লব সাফল্য লাভ করে? (ব) N. K. V. D. কাকে বলে? (ভ) কে যুগোশ্লোভিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠন করেন? (ম) G. D. R. বলতে কি বুঝ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(ক) ইয়াল্টা-চুক্তির প্রধান শর্তগুলির বিবরণ দাও। (খ) পটসডাম-সম্মেলনে জার্মানী ও অন্যান্য বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তার বর্ণনা দাও। (গ) কি উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক পুর্নবাসন ঘোষণা করে? (ঘ) ট্রুম্যাননীতির মূল উদ্দেশ্য কি ছিল? (ঙ) মার্শাল-পরিকল্পনা ও ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির প্রতিক্রিয়ার বিবরণ দাও। (চ) ঠাণ্ডা লড়াই বা Cold War-এর উৎপত্তির কারণ এবং ফলাফল সম্বন্ধে যা জান লিখ। (ছ) সাম্রাজ্যবাদের কবল হতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মুক্তি-সংগ্রামের বিবরণ দাও। (জ) ইওরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রবাদের বিস্তৃতির বিবরণ দাও।

পঞ্চদশ অধ্যায়

জাতিপুঞ্জ

[ক] প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ আটলান্টিক সনদ ঃ সান্-ফ্রান্সিস্কো সম্মেলন ঃ জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা (The Atlantic Charter : The San-Francisco Conference and the foundation of the U.N.O.) ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বারা লীগ অফ নেশনস বা জাতিসঙ্ঘের পতন ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান আসন্ন হলে বিজয়ী শক্তিরা উপলব্ধি করে যে, যুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি রক্ষা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমন, নিরস্ত্রীকরণ, শ্রমিককল্যাণ, মানবজাতির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতির উৎকর্ষসাধনের সহায়তাদানের জন্যে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। লীগ অফ নেশন্সের যে সকল ত্রুটি ছিল তা দূর করে আরও উন্নততর ভিত্তিতে এই প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়। লীগের পতনের ফলে যে শূন্যতা দেখা দেয়, তা পূরণ করার প্রয়োজনীয়তা সকলেই বুঝেন।

১৯৪১ খ্রীঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইন্স্টন চার্চিল আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে আগাস্টা জাহাজে মিলিত হয়ে 'আটলান্টিক সনদপত্র' ঘোষণা করেন। এই সনদে প্রতি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথা ঘোষণা করা হয়। এই সঙ্গে একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ গঠনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়। ১৯৪২ খ্রীঃ সম্মিলিত জাতির ঘোষণাপত্রে আটলান্টিক সনদের প্রতি আস্থা জানানো হয় এবং "জাতিপুঞ্জ" বা United Nations কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করা হয়। ১৯৪৩ খ্রীঃ মস্কো-সম্মেলনে চীন সহ চার বৃহৎ শক্তি আন্তর্জাতিক সম-মর্যাদার ভিত্তিতে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ঘোষণার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। এরপর ডাম্বারটনওকস ও ইয়াল্টা বৈঠকে জাতিপুঞ্জ গঠনের প্রস্তাব অগ্রগতি পায়।

আটলান্টিক সনদ বা চার্টার, ১৯৪১ খ্রীঃ

১৯৪৫ খ্রীঃ সান্-ফ্রান্সিস্কো-সম্মেলন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্মেলনে সোভিয়েত রাশিয়া জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন প্রভৃতি পশ্চিমী ধনতন্ত্রী দেশগুলির সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিপূর্ণ সহযোগিতা প্রদর্শন করে। এই সহযোগিতার ফলে সোভিয়েত রাশিয়া ও তার প্রভাবযুক্ত দেশগুলি জাতিপুঞ্জের সনদ রচনায় খোলা মনে যোগ দেয় এবং জাতিপুঞ্জের সদস্যপদে যোগ দেয়। নতুবা জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য সফল হত না। সোভিয়েত সহযোগিতা এতই দ্বিধাহীন ছিল যে, এজন্যে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় সোভিয়েত রাশিয়া ও তার মন্ত্রী মলোটোভের প্রশংসাসূচক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সান্-ফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে প্রথমে যে সকল রাষ্ট্র অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিরত ছিল, তাদের আহ্বান করা হয়। প্রথমে ৪৬টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি যোগ দেয়। পরে আরও ৪টি রাষ্ট্র যোগ দিলে মোট ৫০টি রাষ্ট্র যোগ দেয় তবে এই সম্মেলনে চার প্রধান যথা—মার্কিন দেশ, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া নেতৃত্ব দান করে নিজ নিজ আধিপত্য রক্ষার জন্যে চার প্রধান ও কুয়োমিন তাং চীন সহ মোট পাঁচ প্রধান ভেটোর (Veto) অধিকার পায়। জাতিপুঞ্জ বা U.N.O.-র সংবিধানের মূল নীতিগুলি চার প্রধান আগেই ঠিক করে নেয়, পরে সাধারণ সভায় তা পাকা করানো হয়। যাই হোক, দীর্ঘ আলোচনার পর সান্-ফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে জাতিপুঞ্জের সংবিধান বা সনদ (Charter) গৃহীত হয়। ২৪শে অক্টোবর, ১৯৪৫ খ্রীঃ U.N.O. বা জাতিপুঞ্জ নিউইয়র্ক নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সান্-ফ্রান্সিস্কো সম্মেলন ১৯৪৫ খ্রীঃ জাতিপুঞ্জের পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন এবং জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য (The Organs or Organisation of the U.N.O. and its objects) :

জাতিপুঞ্জের কাজকর্ম পরিচালনার জন্যে জাতিপুঞ্জের সনদ অনুসারে ছয়টি সংস্থা (Organ) গঠন করা হয়। এই ছয়টি সংস্থা হল—(১) সাধারণ সভা (General Assembly) ; (২) নিরাপত্তা পরিষদ (The Security Council) ; (৩) জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দপ্তর (Economic, Social and Cultural Council) ; (৪) অছি পরিষদ (Trusteeship Council) ; (৫) আন্তর্জাতিক আদালত (International Court of Justice) ; (৬) জাতিপুঞ্জের কার্য- নির্বাহক দপ্তর (The Secretariat of U.N.O.)।

জাতিপুঞ্জের সংগঠন

জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা বছরে অন্ততঃ একবার বসে। বিশেষ জরুরী কারণে নিরাপত্তা পরিষদ চাইলে অথবা সাধারণ সভার সদস্যরা ইচ্ছা করলে এই সভার বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়ে থাকে। সকল সদস্য সাধারণ সভায় যোগ দিতে অধিকারী। প্রতি সদস্যের একটি ভোট আছে। জাতিপুঞ্জের এক্তিয়ারভুক্ত যে কোন বিষয়ে সাধারণ সভায় আলোচনা হতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদ কোন বিষয় ইচ্ছা করলে সাধারণ সভায় উত্থাপন করতে পারে। ১৯৫০ খ্রীঃ কোরিয়া যুদ্ধের সময় Unite for Peace নামে এক প্রস্তাব দ্বারা জাতিপুঞ্জের সংবিধান সংশোধন করা হয়। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, বিশ্ব শান্তি বিপন্ন হতে পারে এমন বিষয়ের সমাধানে নিরাপত্তা পরিষদ ব্যর্থ হলে বিষয়টি সাধারণ সভায় আনা যেতে পারে এবং সাধারণ সভার $\frac{2}{3}$ ভোটে গৃহীত প্রস্তাব সদস্যরা মানতে বাধ্য থাকবে। সাধারণতঃ সাধারণ সভায় আন্তর্জাতিক উত্তেজনাকর বিষয়, বর্ণবৈষম্য অথবা আগ্রাসন সম্পর্কে আলোচনা ও প্রস্তাব নেওয়া হয়। তবে সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাবকে কার্যকরী করতে হলে নিরাপত্তা পরিষদের উপর সাধারণ সভাকে নির্ভর করতে হয় এবং নিরাপত্তা পরিষদের সম্মতি ছাড়া সাধারণ সভা কোন বিষয়ে প্রস্তাব নেয় না।

সাধারণ সভা

জাতিপুঞ্জের হৃদপিণ্ড হল নিরাপত্তা পরিষদ। জাতিপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা রক্ষার প্রধান দায়িত্ব এই সভার। এই সভার ১১ জন সদস্যের মধ্যে ৫ জন স্থায়ী সদস্য, যথা—ব্রিটেন, ফ্রান্স, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া। এই ৫ সদস্যের ভেটো বা বিশেষ ক্ষমতা আছে। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরা একমত হলেও কোন স্থায়ী সদস্য ভেটো দ্বারা সেই প্রস্তাব রুখে দিতে পারে। তবে Procedural অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিষদের কার্যধারা-সংক্রান্ত ব্যাপারে ভেটো দেওয়া যায় না। রাজনৈতিক ও অন্যান্য ব্যাপারে ভেটো প্রদান করা যায়। নিরাপত্তা পরিষদের বাকী ৬ জন অস্থায়ী সদস্য ২ বছরের জন্যে সাধারণ সভার দ্বারা নির্বাচিত হয়। নিরাপত্তা পরিষদের ১১ সদস্যের মধ্যে ৭ সদস্য একমত হলে নিরাপত্তা পরিষদ কার্যধারা-সংক্রান্ত ব্যাপারে কাজ করতে সক্ষম। কিন্তু বিশ্ব শান্তি, রাজনৈতিক গোলযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে ৫ স্থায়ী সদস্যের সম্মতি ছাড়া নিরাপত্তা পরিষদ কাজ করতে পারে না। বছরের সকল সময় নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন চলে এবং জাতিপুঞ্জের যাবতীয় রাজনৈতিক কাজের কেন্দ্র হল নিরাপত্তা পরিষদ।

নিরাপত্তা পরিষদ

জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে মানব-অধিকার রক্ষা এবং মানবসমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এজন্যে এই পরিষদ শিক্ষাবিস্তারের কর্মসূচী, স্বাস্থ্যরক্ষা, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে কর্মসূচী নেয়। সাধারণ সভা ১৮ জন সদস্যকে তিন বছরের জন্যে এই পরিষদের দায়িত্ব দেয়। জাতিপুঞ্জের

জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংস্থা: অছি পরিষদ

অছি পরিষদ বা ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিলের কাজ হল লীগের ম্যান্ডেটভুক্ত দেশগুলির এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শত্রুপক্ষের কাছ থেকে দখল করা স্থানগুলির এবং যদি কোন বিবাদী স্থান জাতিপুঞ্জ হাতে নেয় তার নিরপেক্ষতা রক্ষা ও এই সকল স্থানের প্রশাসন গঠন প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করা।

আন্তর্জাতিক আদালত; কার্যনির্বাহক দপ্তর

জাতিপুঞ্জের সনদে আন্তর্জাতিক বিবাদ নিষ্পত্তির জন্যে একটি আন্তর্জাতিক আদালত গঠনের কথা বলা হয়েছে। এই শর্ত অনুযায়ী একটি আন্তর্জাতিক আদালত (I.C.J.) স্থাপিত হয়েছে। দুই বা ততোধিক বিবদমান পক্ষ তাদের বিবাদনিষ্পত্তির জন্যে স্বেচ্ছায় এই আদালতের দ্বারস্থ হলে অথবা বিরোধ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আইন কি তা জানতে চাইলে এই আদালত তার কর্তব্য পালন করে এবং প্রয়োজনে রায় অথবা পরামর্শ দেয়। জাতিপুঞ্জের কার্যনির্বাহী দপ্তর বা সেক্রেটারিয়েট জাতিপুঞ্জের যাবতীয় রিপোর্ট রচনা করা, নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন ডাকা ও তার আলোচনার জন্যে কাগজপত্র তৈরি করা, সাধারণ সভার অধিবেশন আহ্বান করা ও তার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করে। বিভিন্ন সদস্য-রাষ্ট্রের সঙ্গে চিঠিপত্র বিনিময় করা ও সেক্রেটারী জেনারেলের নির্দেশ অনুযায়ী সাধারণ সভার জন্যে রিপোর্ট রচনা, নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশ কার্যকরী করা প্রভৃতি গুরুদায়িত্ব এই সেক্রেটারিয়েটের উপর ন্যস্ত। স্বয়ং সেক্রেটারী জেনারেল এই দপ্তর পরিচালনা করেন।

জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

জাতিপুঞ্জের সনদে জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের বর্ণনা করা হয়েছে। জাতিপুঞ্জের সনদের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, "আমরা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যরা এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমরা পরবর্তী প্রজন্মকে যুদ্ধের মড়ক হতে, যে যুদ্ধ দু'বার মানবজাতির অশেষ দুঃখ-দুর্দশা সৃষ্টি করেছে, রক্ষা করার জন্যে একটি আন্তর্জাতিক সংঘ, যার নাম 'জাতিপুঞ্জ' তা গঠন করলাম।" (১) সুতরাং জাতিপুঞ্জের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হল আন্তর্জাতিক যুদ্ধনিরোধ, উত্তেজনা প্রশমন এবং আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি। (২) আন্তর্জাতিক শান্তিস্থাপন ছাড়া মানবজাতির শিক্ষা, সংস্কৃতির উন্নয়ন এবং তার অর্থনৈতিক উন্নয়নও জাতিপুঞ্জের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। (৩) জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার সময় যে সকল জাতি তাতে অংশ নেয়,তাদের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য বলা হয়। এরপর যে সকল নবীন জাতির উদ্ভব হয়, জাতিপুঞ্জের দরজা তাদের জন্যেও উন্মুক্ত করা হয়। তবে নবীন সদস্য-পদপ্রার্থীকে শান্তিকামী, জাতিপুঞ্জের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনে হলে তবেই সদস্য-পদ দেওয়া হয়, নতুবা নয়। কোন নূতন প্রার্থীকে সদস্য-পদ দিতে হলে সাধারণ সভার সদস্যদের ভোট এবং নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের সর্বসম্মতি দরকার। কোন সদস্য ভেটো দিলে প্রার্থীর দরখাস্ত নাকচ হয়ে যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ জাতিপুঞ্জের সঙ্গে জাতিসঙ্ঘের প্রভেদ ঃ জাতিপুঞ্জের সাফল্য ও ব্যর্থতা (The difference between the U.N.O. and the League of Nations : Its success and failures) ঃ জাতিসঙ্ঘ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসঙ্ঘের পরিষদ বা কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসঙ্ঘে যোগদান না করায় জাতিসঙ্ঘ দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে একমাত্র ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মত দুই বৃহৎ শক্তির সহযোগিতায় জাতিসঙ্ঘকে কার্যকরী করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্স জাতিসঙ্ঘের লক্ষ্যপূরণ অপেক্ষা নিজ নিজ স্বার্থ বড় করে দেখার ফলে জাতিসঙ্ঘ বিফল হয়। জাতিপুঞ্জের সদস্য-পদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া সহ বিশ্বের প্রায় সকল শক্তি যোগ দেওয়ার ফলে জাতিপুঞ্জ লীগ বা জাতিসঙ্ঘের তুলনায় অনেক বেশী

শক্তিশালী হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বের কোন রাষ্ট্র লীগের সদস্য না হলে অথবা সদস্য-পদ ত্যাগ করলে তার উপরে লীগের এক্তিয়ার ছিল না। কিন্তু জাতিপুঞ্জের সনদে এই দুর্বলতা দূর করা হয়েছে। যদি কোন রাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের সদস্য না হয়ে জাতিপুঞ্জের আদর্শ লঙ্ঘন করে, তবে সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাতিপুঞ্জ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকারী। তৃতীয়তঃ, আক্রমণকারী বা অপরাধী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লীগের সদস্যরা এক মত হলে বাধ্যতামূলক অর্থনৈতিক অবরোধ করতে পারত, কিন্তু সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ ঐচ্ছিক ছিল। জাতিপুঞ্জের সনদে এই ত্রুটি দূর করা হয়েছে। সনদে একথা বলা হয়েছে যে, যদি নিরাপত্তা পরিষদ শান্তিপূর্ণ উপায়ে আগ্রাসন রদ করতে অসমর্থ হয়, তবে প্রয়োজনে আগ্রাসনকারীর বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি ব্যবহার করবে। নিরাপত্তা পরিষদ আগ্রাসনকারীর বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলে মহাসচিব সদস্য-দেশগুলিকে প্রয়োজনীয় সেনা, অস্ত্র পাঠাতে নির্দেশ দিতে পারেন। জাতিপুঞ্জের পতাকার নিচে জাতিপুঞ্জের সামরিক দপ্তর আগ্রাসনকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক যুদ্ধ চালাতে পারে। জাতিপুঞ্জ পরিদর্শকদল পাঠিয়ে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা ক'রে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে পারে। যুদ্ধবিরতি সীমারেখার দায়িত্ব জাতিপুঞ্জের পর্যবেক্ষকদল বা সেনারা নিতে পারে। এই সকল ক্ষমতা লীগের ছিল না।

জাতিসঙ্ঘের তুলনায় জাতিপুঞ্জের শক্তি বৃদ্ধি

জাতিপুঞ্জের সামরিক শক্তি

তবে লীগের চুক্তিপত্রের ১৫নং ধারায় ছিল যে, কোন আন্তর্জাতিক বিরোধের বিষয়ে লীগ পরিষদকে কাজ করতে হলে সদস্যদের একমত হওয়া দরকার ছিল। লীগের পরিষদের সদস্যদের সব সময় একমত হওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি ছিল সুদূরপরাহত। জাতিপুঞ্জের ক্ষেত্রেও এরূপ বাধা রাখা হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যের ঐকমত্য ছাড়া জাতিপুঞ্জ কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম। যদি কোন স্থায়ী সদস্য ভেটো প্রদান করে,তাহলে প্রস্তাব নাকচ হয়। এ বিষয়ে আর আগানো যায় না। এর ফলে জাতিপুঞ্জের ক্ষেত্রেও অচল অবস্থা দেখা যায়। সাধারণ সভাকে কার্যতঃ কোন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতাই সনদে দেওয়া হয় নি।

জাতিসঙ্ঘের পরিষদ ও জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের বিশেষ ক্ষমতা

যদিও জাতিপুঞ্জ সুয়েজ আগ্রাসন, আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ, কঙ্গো আক্রমণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সফলতার সঙ্গে কাজ করে এবং দ্রুত সংঘর্ষ বন্ধ ক'রে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে, অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। কাশ্মীর প্রশ্নে, ভিয়েতনামের যুদ্ধ বন্ধে, আরব-ইসরায়েল সংঘাতে, অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জ কোন ন্যায়সঙ্গত সমাধানে পৌঁছাতে পারে নি। বৃহৎ শক্তিগুলির স্বার্থ যে সকল বিষয়ে জড়িত, সে সকল ক্ষেত্রে—যথা হাঙ্গেরীর সমস্যা, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বৈষম্যমূলক সমস্যা প্রভৃতির ক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তির ভেটো প্রদানের ফলে জাতিপুঞ্জ কোন সমাধানে আসতে পারে নি।

জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতা

সারণী

[ক] ১৯৪১ খ্রীঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রুজভেল্ট ও চার্চিল আটলান্টিক সনদ দ্বারা আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ গঠনের ইঙ্গিত দেন। ১৯৪৫ খ্রীঃ সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে সোভিয়েত সহযোগিতা সহ জাতিপুঞ্জ গঠনের পরিকল্পনা করা হয়। এই সম্মেলনে মোট ৫০টি রাষ্ট্র যোগ দেয় এবং জাতিপুঞ্জের সনদ গৃহীত হলে ২৪শে অক্টোবর ১৯৪৫ খ্রীঃ U.N.O. স্থাপিত হয়।

[খ] জাতিপুঞ্জের কাজ কর্ম পরিচালনার জন্যে সাধারণ সভা; নিরাপত্তা পরিষদ; অর্থনৈতিক, সামাজিক ও

সাংস্কৃতিক দপ্তর; অছি পরিষদ; আন্তর্জাতিক আদালত; জাতিপুঞ্জের কার্যনির্বাহক দপ্তর। নিরাপত্তা পরিষদ হল জাতিপুঞ্জের হৃৎপিণ্ড। আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব এই সভার। ৫ জন স্থায়ী ভেটোধারী সদস্য ও ৬ জন অস্থায়ী সদস্য নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হয়। সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব কার্যকরী করার দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের। সাধারণ সভায় সকল সদস্যের একটি করে ভোট আছে। জাতিপুঞ্জের প্রধান লক্ষ্য হল আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা, উত্তেজনা প্রশমন ও বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি।

[গ] জাতিপুঞ্জের সঙ্গে জাতিসঙ্ঘের পার্থক্য এই যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জাতিসঙ্ঘের সদস্য ছিল না; এই রাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের উদ্যোগী সদস্য। নিরাপত্তা পরিষদের ৫ স্থায়ী সদস্যের ভেটো ক্ষমতা আছে। লীগ পরিষদের সদস্যদের ঐক্য মতের দ্বারা কাজ করার ব্যবস্থা ছিল। জাতিপুঞ্জ অপকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বাধ্যতামূলক সামরিক শাস্তি দিতে পারে; জাতিসঙ্ঘের এই ক্ষমতা ছিল না।

অনুশীলনী

১। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) কারা আটলান্টিক সনদপত্র ঘোষণা করেন? (খ) কোন্ সম্মেলনে জাতিপুঞ্জের সনদ রচিত হয়? (গ) ঐ সম্মেলনে চার প্রধানের নাম কি? (ঘ) জাতিপুঞ্জের কোন্ পরিষদকে হৃৎপিণ্ড বলা হয়? (ঙ) ঐ পরিষদের মোট সদস্য কতজন এবং তার মধ্যে কতজন স্থায়ী সদস্য? (চ) ভেটো বলতে কি বুঝ? (ছ) আন্তর্জাতিক আদালত কাকে বলে? (জ) জাতিপুঞ্জের সদস্য হতে হলে কি কি শর্ত পূরণ করতে হয়?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(ক) আটলান্টিক সনদ ও সান্‌-ফ্রান্‌সিস্কো সম্মেলনের বিবরণ দাও। (খ) জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন সংস্থা ও তাদের কার্যাবলীর বর্ণনা দাও। (গ) জাতিপুঞ্জের সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে যা জান লিখ।

পরিশিষ্ট
ঘটনাপঞ্জী

১৭৪০-৪৮—অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ

১৭৪৮—এ-লা-শাপেলের সন্ধি

১৭৫৬—কূটনৈতিক বিপ্লব

১৭৫৬-৬৩—সপ্তবর্ষের যুদ্ধ

১৭৬৩—প্যারিসের সন্ধি ও হিউবার্টসবার্গের সন্ধি

দার্শনিক লকের প্রধান রচনা : (ক) Two Treaties on Government; (খ) Essay Concering human Understanding.

দার্শনিক মন্তেস্কুর প্রধান রচনা :

(ক) দি পার্শিয়ান লেটারস (The Persian Letters); (খ) দি স্পিরিট অব ল'জ (The Spirit of Laws)

ভলতেয়ারের প্রধান রচনা :

(ক) ফিলজফিক্যাল ডিক্সনারি (Philosophical Dictionary); (খ) কাঁদিদ (Candide); (গ) ব্যাবিলোনিয়ান লেটারস (Babylonian Letters)

রুশোর প্রধান রচনা :

(ক) সামাজিক চুক্তি তত্ত্ব (The Contract Sociale); (খ) ওরিজিন অব ইনইকোয়ালিটি (The Origin of Inequality); আলোকপ্রাপ্ত স্বৈরাচারী শাসক ফ্রেডারিক দি গ্রেট—১৭৪০-৮৬ খ্রীঃ।

১৭৬০-৮০—ইংলন্ডের শিল্প-বিপ্লবের উড্ডয়ন কাল।

১৭৬৫—স্পিনিং জেনির আবিষ্কার।

১৭৬৯—জেমস ওয়াটের বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার।

১৭৭৩—বোষ্টন টি পার্টি।

১৭৭৬—আমেরিকার উপনিবেশের স্বাধীনতা ঘোষণা।

১৭৮৩—ভার্সাইয়ের সন্ধি : আমেরিকার স্বাধীনতার স্বীকৃতি।

১৭৮৯—(ক) ফ্রান্সে জাতীয় সভার আহ্বান; (খ) ফরাসী বিপ্লবের প্রকৃত সূচনা; (গ) ১৪ই জুলাই, ১৭৮৯ খ্রীঃ, বাস্তিলের পতন।

১৭৮৯—(ক) ২০শে জুন, টেনিস কোর্টের শপথনামা গ্রহণ ও (খ) সংবিধান সভার সূচনা; (গ) মানবজাতির অধিকারের ঘোষণা-পত্র; (ঘ) ৪ঠা ও ১২ই আগষ্টের ঘোষণা দ্বারা পুরাতনতন্ত্র বিলোপ।

১৭৯১—প্রথম বিপ্লবী সংবিধান প্রবর্তন।

১৭৯২—(ক) দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লব; (খ) বুর্জোয়া সংবিধান নাকচ; (গ) ফ্রান্সে গণভোট ও প্রজাতন্ত্র ঘোষণা; (ঘ) ন্যাশনাল কনভেনশনের শাসন প্রবর্তন; (ঙ) বিপ্লবী ফ্রান্সের বৈদেশিক যুদ্ধে যোগদান।

১৭৯৩-৯৪—(ক) সন্ত্রাসের রাজত্ব; (খ) রোবসপিয়ারের শাসনকাল; (গ) জিরন্ডিষ্টদের পতন; (ঘ) জ্যাকোবিনদের উত্থান।

১৭৯৫-১৮০৪—ডাইরেক্টরীর শাসনকাল

১৭৯৯-১৮০৪—কনসুলেটের শাসন।

১৭৯৭—ক্যাম্পো-ফোর্মিওর সন্ধি।

১৮০২—এ্যামিয়েন্সের সন্ধি।

১৮০৫—ট্রাফালগারের নৌযুদ্ধ : অষ্টারলিৎসের যুদ্ধ : ম্যাৎসিনীর জন্ম।

১৮০৬—বার্লিন ডিক্রী, মহাদেশীয় অবরোধের সূচনা : অর্ডারস ইন কাউন্সিল।

১৮০৭—টিলসিটের সন্ধি।

১৮৪৮—জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট।

১৮৫০—ক্রে চুক্তি : তাই-পিং বিপ্লব।

১৮৫২—২রা ডিসেম্বর, ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

১৮৫৩—জাপানের কমোডোর পেরীর আগমন।

১৮৫৪-৫৬—ক্রিমিয়ার যুদ্ধ।

১৮৫৬—প্যারিসের সন্ধি।

১৮১২—পেনিনসুলার যুদ্ধের সূচনা।
১৮১৩—ভিত্তোরিয়ার যুদ্ধ।
১৮১২—(ক) ২৪শে জুন, নেপোলিয়নের রাশিয়া অভিযানের সূচনা; (খ) বোরোডিনোর যুদ্ধ।
১৮১৩—লাইপজিগের যুদ্ধ।
১৮১৫—ভিয়েনার সন্ধি স্থাপন।
১৮১৮—কার্ল মার্কসের জন্ম।
১৮১৯—পিটারলুর হত্যাকাণ্ড।
১৮২০—ট্রপোর ঘোষণাপত্র গ্রহণ: মিজুরী চুক্তি।
১৮২৩—মনরো নীতি ঘোষণা।
১৮২৯—এ্যাড্রিয়ানোপলের সন্ধি।
১৮৩০—জুলাই বিপ্লব।
১৮৩১—বেলজিয়ামের স্বাধীনতা লাভ।
১৮৩২—ইংলন্ডে প্রথম ফ্যাক্টরী আইন।
১৮৩৩—ইংলন্ডে প্রথম ভোটাধিকার আইন।
১৮৩৩—ইংলন্ডে গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কনসুলিডেটেড ট্রেড ইউনিয়ন।
১৮৩৪—ইংলন্ডে প্রথম দরিদ্র সহায়তা আইন।
১৮৩৪—জার্মানীতে জোলভেরাইন গঠন।
১৮৩৮—পিপল্‌স চার্টার।
১৮৪০—নানাকিং-এর সন্ধি।
১৮৪৮—২২শে ফেব্রুয়ারী, ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সূচনা।
১৮৪৮-৫২—ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র।
১৮৫৮—প্লোমবিয়ারের চুক্তি।
১৮৬০—পিকিং-এর সন্ধি।
১৮৬১—রাশিয়ায় ভূমিদাস মুক্তি আইন।
১৮৬২—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধ আরম্ভ।
১৮৬৩—পোল বিপ্লব: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রীতদাসদের মুক্তি ঘোষণা।
১৮৬৬—অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধ: প্রাগের সন্ধি।
১৮৬৭—কার্লমার্কসের ড্যাস ক্যাপিটালের প্রকাশ।
১৮৬৮—ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা।
১৮৬৮—জাপানে মেইজী বিপ্লব।
১৮৭০—ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধ: সেডানের যুদ্ধ: ফ্রাঙ্কফুর্টের সন্ধি: দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের পতন: ফ্রান্সে তৃতীয় প্রজাতন্ত্র ঘোষণা: প্যারী কমিউন।
১৮৭৬—তরুণ তুর্কী গোষ্ঠী গঠন।
১৮৭৮—বার্লিনের সন্ধি: নারোদনিক আন্দোলনের সূচনা।
১৮৯৫—সিমনোসেকির সন্ধি।
১৯০৫—পোর্টসমাউথের সন্ধি।
১৯১১—চীনে প্রজাতন্ত্রী বিপ্লব।
১৯১২-১৩—প্রথম ও দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ।
১৯১৪-১৮—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

১৯১৭—রুশ বিপ্লব: ব্যালফ্যুর ঘোষণা: ৮ই জানুয়ারী, ১৯১৮ খ্রীঃ উইলসনের ১৪ দফা ঘোষণা।
১৯১৯—ভার্সাইয়ের সন্ধি।
১৯১৯—৪ঠা মে, চীনে চতুর্থ আন্দোলন।
১৯২১—লেনিনের নব অর্থনীতি: ইতালীতে ফ্যাসিষ্ট বিপ্লব।
১৯২২—মিশরের স্বাধীনতা ঘোষণা: তুরস্কে কামাল পাশার সংস্কার।
১৯২২—ওয়াশিংটনের সন্ধি।
১৯২৩—ল্যাসেনের সন্ধি।
১৯২৪—নূতন সোভিয়েত সংবিধান গ্রহণ।
১৯২৪—লেনিনের মৃত্যু।
১৯২৮—প্রথম সোভিয়েত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।
জাপানের পার্ল হারবারআক্রমণ: জাপানের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান: ষ্টালিনগ্রাডের যুদ্ধ: আটলান্টিক সনদের ঘোষণা।
১৯৪৩—মিত্রশক্তির ইতালী অভিযান।
১৯৪৪—৬ই জুন, ডি দিবস: ফ্রান্সে মিত্রশক্তির অবতরণ।
১৯৪৫—৮ই মে, নাৎসী জার্মানীর আত্মসমর্পণ: পটসডাম সম্মেলন: ২রা সেপ্টেম্বর, জাপানের আত্মসমর্পণ।
১৯৪৫—ইয়াল্টা চুক্তি।
১৯৪৫—২৪শে অক্টোবর, জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা।
১৯৪৬—৫ই মার্চ, চার্চিলের ফুলটন বক্তৃতা।
১৯৪৭—ট্রুম্যান নীতি ঘোষণা: ভারতের স্বাধীনতা লাভ।

১৯৩১—জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ।
১৯৩৩—জার্মানিতে নাৎসী বিপ্লব।
১৯৩৪-৩৫—চীনের কমিউনিষ্ট গোষ্ঠীর লং মার্চ।
১৯৩৫—ইতালীর আবিসিনিয়া আক্রমণ।
১৯৩৬—রোম-বার্লিন অক্ষচুক্তি সম্পাদন : স্পেনের গৃহযুদ্ধ আরম্ভ।
১৯৩৯—রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি : ১লা সেপ্টেম্বর নাৎসী জার্মানীর পোল্যান্ড আক্রমণ : ৩রা সেপ্টেম্বর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ।
১৯৪০—নাৎসী আক্রমণে ফ্রান্সের পতন : ডানকার্কে ব্রিটেনের পরাজয় : ফ্যাসিষ্ট ইতালীর যুদ্ধে যোগদান।
১৯৪১—নাৎসী জার্মানীর রাশিয়া আক্রমণ :
১৯৪৮—বার্লিন অবরোধ : ইস্রায়েল রাষ্ট্র ঘোষণা।
১৯৪৯—চীনে কমিউনিষ্ট প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা : সোভিয়েত ইউনিয়নের পরমাণু বোমা তৈয়ারী : ন্যাটো চুক্তি গঠন : ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার স্বীকৃতি।
১৯৫০-৫৩—কোরিয়ার যুদ্ধ।
১৯৫৪—জেনেভা চুক্তি : প্রথম ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান।

নির্ধারিত পুস্তকসূচী

প্রথম অধ্যায়

১। কার্লটন হেইজ—পলিটিক্যাল, সোস্যাল এ্যান্ড কালচারাল হিষ্ট্রি অব ইওরোপ
২। হ্যাসাল—ব্যালান্স অব পাওয়ার
৩। ম্যারিয়ট এ্যান্ড রবার্টসন—রাইজ এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব প্রাশিয়া
৪। রাইকার—আউটলাইন অব দি হিষ্ট্রি অব ইওরোপ
৫। কেমব্রিজ হিষ্ট্রি অব ইওরোপ—অষ্টম খণ্ড
৬। ফিশার—হিষ্ট্রি অব ইওরোপ
৭। ফিলিস ডীন—ফার্ষ্ট ইন্ডাষ্ট্রিয়াল রেভোল্যুশন
৮। মরিসন এ্যান্ড কোমাজার—আমেরিকার ইতিহাস—প্রথম খণ্ড
৯। বিয়ার্ড—ইকনমিক ইন্টারপ্রিটেশন অব আমেরিক্যান রেভোল্যুশন
১০। লর্ড এ্যাক্টন—লেকচারস ইন মডার্ন হিষ্ট্রি

দ্বিতীয় অধ্যায় [ক]

১। লেফেভার—ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশন
২। গুডউইন—ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশন
৩। মর্সষ্টিফেনস—রেভোল্যুশনারি ইওরোপ
৪। সেভিল—হিষ্ট্রি অব ইওরোপ
৫। হ্যানসন—সোস্যাল এ্যাস্পেক্ট অব ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশন
৬। মাদেলাঁ—ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশন
৭। কোবান—হিষ্ট্রি অব ফ্রান্স
৮। মাতিয়ে—রোবসপিয়ের টেররিষ্ট
৯। জোয়ারেস—হিষ্ট্রি অব ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশন
১০। ওলার—হিষ্ট্রি অব ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশন
১১। জর্জ রুডে—রেভোল্যুশনারী ইওরোপ

দ্বিতীয় অধ্যায় [খ]

১। ম্যার্কহ্যাম—নেপোলিয়ন এ্যান্ড এওকেনিং অব ইওরোপ
২। কোবান—হিষ্ট্রি অব ফ্রান্স
৩। ক্রোনিন—নেপোলিয়ন
৪। এমিল লুডভিগ—নেপোলিয়ন
৫। টম্পসন—নেপোলিয়ন বোনাপার্টি—হিজ রাইজ এ্যান্ড ফল

তৃতীয় অধ্যায়

১। গর্ডন ক্রেইগ—ইওরোপ সিন্স ১৮১৫
২। জেকুইস ড্রোজ—ইওরোপ বিটুইন টু রেভোল্যুশন
৩। ডেভিড টমসন—ইওরোপ সিন্স নেপোলিয়ন
৪। হার্নশ—এরা অব কংগ্রেস
৫। টেমপারলে—কেমব্রিজ হিষ্ট্রি অব ব্রিটিশ ফরেন পলিসি
৬। কেটেলবি—হিষ্ট্রি অব মডার্ন টাইমস
৭। ফিলিপস—মডার্ন ইওরোপ
৮। সি· ডি· হ্যাজেন—ইওরোপ সিন্স ১৮১৫
৯। নিউ কেমব্রিজ হিষ্ট্রি অব ইওরোপ—দশম খণ্ড

১০। গর্ডন রাইট—মডার্ন ফ্রান্স
১১। সেটন ওয়াটসন—মেটারনিখ এ্যান্ড ইন্টারন্যাল অষ্ট্রিয়ান পলিসি
১২। জে· প্লামানেৎস (Plemanetz)—রেভোল্যুশনারী মুভমেন্ট ইন ফ্রান্স
১৩। জি· এম· টম্পসন—লুই নেপোলিয়ন এ্যান্ড সেকেন্ড এম্পায়ার
১৪। এ· জে· পি· টেইলর—ষ্ট্রাগল ফর মাষ্টারী অফ ইওরোপ
১৫। কোবান—হিষ্ট্রি অব ফ্রান্স
১৬। ম্যারিয়েট—দি ফ্রেইঞ্চ রেভোল্যুশন অব ১৮৪৮ এ্যান্ড ইটস ইকনমিক আসপেক্টস
১৭। সাফিরো—লিবার‍্যালিজম এ্যান্ড দি চ্যালেঞ্জ অব ফ্যাসিজম

চতুর্থ অধ্যায়

১। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা—শিল্প-বিপ্লব সম্পর্কে প্রবন্ধ
২। ফিলিস ডীন—ফ্রান্স ইন্ডাষ্ট্রিয়াল রেভোল্যুশন
৩। হবস বম—ইন্ডাষ্ট্রি এ্যান্ড এম্পায়ার
৪। ফান্টানা—ইকনমিক হিষ্ট্রি অব ইওরোপ
৫। লেনিন—ইম্পিরিয়ালিজম হাইয়েষ্ট ষ্টেজ অব ক্যাপিট্যালিজম
৬। মানতো (Mantoux)—দি ইন্ডাষ্ট্রিয়াল রেভোল্যুশন ইন দি এইটিন্থ সেঞ্চুরী
৭। টি· এস· এ্যাষ্টন—আয়রণ, ষ্টীল এ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রিয়াল রেভোল্যুশন
৮। নোলেস (Knowles)—দি ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এ্যান্ড কমার্শিয়াল রেভোল্যুশন ইন গ্রেট ব্রিটেন
৯। গর্ডন ক্রেইগ—ইওরোপ সিন্স ১৮১৫
১০। ডেভিড টমসন—ইওরোপ সিন্স নেপোলিয়ন
১১। হ্যালেডি—ইকনমিক হিষ্ট্রি অব ইওরোপ
১২। কেমব্রিজ—ইকনমিক হিষ্ট্রি অব ইওরোপ
১৩। কোবান—হিষ্ট্রি অব ফ্রান্স
১৪। জে· কুজিনিস্কি (Kuevynski)—শর্টহিষ্ট্রি অব লেবারকন্ডিশনস আন্ডার ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ক্যাপিটালিজম
১৫। হোভেল—চার্টিষ্ট মুভমেন্ট
১৬। কোল (Cole)—লাইফ অব উইলিয়াম কোবেট
১৭। ঐ — ,, ,, রবার্ট আওয়েন
১৮। এ্যালেন—দি ইকননিক হিষ্ট্রি অব ব্রিটেইন
১৯। মেহরিং (Mehring)—কার্ল মার্কস
২০। ক্যার হান্ট—থিওরিজ অব মার্ক্সিজম
২১। মার্কস—কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো
২২। কোল—হিষ্ট্রি অব সোস্যালিস্ট থট

পঞ্চম অধ্যায়

১। ডেনিস ম্যাক স্মিথ—কাভ্যুর এ্যান্ড গ্যারিবল্ডী
২। এডগার হোল্ট—রিসঅর্গিমেন্টো
৩। বোল্টন কিং—হিষ্ট্রি অব ইটালিয়ান ইউনিটি
৪। স্যালভেমিনি—ম্যাৎসিনী
৫। গ্রেইনভিল—ইওরোপ রিশেপড
৬। এ· জে· পি· টেইলর—ষ্ট্রাগল ফর মাষ্টারী অব ইওরোপ
৭। আগাথা র‍্যাম—জার্মানী
৮। নিউ কেমব্রিজ মডার্ন হিষ্ট্রি—দশম খণ্ড

৯। আইখ্—বিসমার্ক
১০। রবার্টসন—বিসমার্ক
১১। ল্যাঙ্গার—বিসমার্ক এ্যান্ড হিজ পলিটিক্যাল এ্যালায়েন্সেস
১২। আর· এইচ· লর্ড—দি ওরিজিনস অব দি ওয়ার অব ১৮৭০

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। মরিসন কোম্যাজার—হিষ্ট্রি অব ইউ· এস· এ·
২। বেমিস—ডিপ্লোমেটিক হিষ্ট্রি অব ইউ· এস· এ·
৩। জন ড্রিঙ্ক ওয়াটার—লাইফ অব আব্রাহাম লিঙ্কন
৪। কেটেলবি—হিষ্ট্রি অব মডার্ন টাইমস
৫। এইচ· বি· ষ্টৌ—আঙ্কল টমস কেবিন

সপ্তম অধ্যায়

১। ম্যারিয়ট—ইস্টার্ন কোয়েশ্চন
২। টেম্পারলে—ইংল্যান্ড এ্যান্ড দি নিয়র ইস্ট
৩। এ· জে· পি· টেইলর—ষ্ট্রাগল ফর মাষ্টারি অব ইওরোপ
৪। সেটন ওয়াটসন—ডিসরেইলী, গ্ল্যাডষ্টোন এ্যান্ড দি ইষ্টার্ণ কোয়েশ্চন
৫। ডেভিস—হিষ্ট্রি অব দি নিয়র ইষ্ট
৬। লিপসন—ইওরোপ ইন দ্য নাইনটিন্থ এ্যান্ড টোয়েন্টিগেথ সেনচুরি

অষ্টম অধ্যায়

১। ফে—ওরিজিনস অব দি ওয়ার্ল্ড ওয়ার
২। ল্যাঙ্গার—ইওরোপিয়ান এ্যালায়েন্সেস এ্যান্ড এ্যালাইনমেন্টস
৩। এ· জে· পি· টেইলর—ষ্ট্রাগল ফর মাষ্টারী অব ইওরোপ
৪। উডওয়ার্ড—গ্রেট ব্রিটেন এ্যান্ড দি জার্মান নেভী
৫। গুচ—ষ্টাডিজ ইন ডিপ্লোমেসী
৬। ক্রাটওয়েল—হিষ্ট্রি অব গ্রেইট ওয়ার
৭। নিকলসন—পিইস মেইকিং
৮। জেসপ—ট্রিটি অব ভার্সাই
৯। ই· এইচ· কার—ইন্টারন্যাশন্যাল রিলেইশনস বিটুইন দি টু ওয়ার্ল্ড ওয়ারস
১০। কেইনস—দি ইকনমিক কনসিকোয়েন্সেস অব পিইস
১১। জিমারণ—দি লীইগ অব নেশনস এ্যান্ড দি রুল অব ল
১২। ওয়াল্টারস—এ হিষ্ট্রি অব লীইগ অব নেশনস
১৩। সেটন ওয়াটসন—এ ষ্টাডি অব দি অরিজিনস অব দি গ্রেইট ওয়ার
১৪। টেম্পারলে—হিষ্ট্রি অব দি পিইস কনফারেন্স

নবম অধ্যায়

১। ম্যানসফিল্ড—দি এ্যারাবস
২। টেম্পারলে—ইংল্যান্ড এ্যান্ড দি নিয়র ইষ্ট
৩। এস· এফ· বেমিস—দি এ্যাভোরিক্যাল সেক্রেটারীজ অব স্টেট এ্যাণ্ড দেয়ার ডিপ্লোমেসী
৪। এ্যালফ্রেইড এডি—এ্যামেরিকান ফ্রেইন্ডস ইন দি নিয়ার ইষ্ট
৫। ইলিজ এলাহ—ইস্রায়েল এ্যান্ড হার নেবারস
৬। হার্বার্ট ফিইজ—দি বার্থ অব ইস্রায়েল
৭। পি· গ্রেভস—মেমোয়ারস অব কিং আবদুল্লাহ অব জর্ডন

৮। পার্কস—হিষ্ট্রি অব প্যালেষ্টাইন ফ্রম ১৩৫ খ্রীঃ টু মডার্ণ টাইমস
৯। নেহরু—গ্লিম্পসেস অব ওয়ার্ল্ড হিষ্ট্রি

দশম অধ্যায়

১। রবিনসন—রুর‍্যাল রাশিয়া আণ্ডার দি ওল্ড রেজিম
২। সেটন ওয়াটসন—দি ডিক্লাইন অব ইম্পিরিয়েল রাশিয়া
৩। লিপসন—ইওরোপ ইন দ্য নাইনটিনথ্ এ্যান্ড টোয়েন্টিয়েথ সেনচুরিস
৪। ই· এইচ· কার—দি বলশেভিক রেভোল্যুশন
৫। মরিস ডব—সোভিয়েত ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট সিন্স ১৯১৭

একাদশ অধ্যায়

১। ভিন্যাক—হিষ্ট্রি অব দি ফার ইষ্ট
২। ফেয়ার ব্যাঙ্ক—হিষ্ট্রি অব ইষ্ট এশিয়া
৩। ওকুমা—হিষ্ট্রি অব জাপান
৪। এ্যালেন—হিষ্ট্রি অব জাপান
৫। ম্যাকলারেন—মডার্ণ চায়না

দ্বাদশ অধ্যায়

১। স্যালভেমিনি—আন্ডার দি এ্যাক্স অব ফ্যাসিজম
২। বিঙ্কি—চার্চ এ্যান্ড ষ্টেট ইন ইতালী
৩। এ্যালান বুলক—হিটলার
৪। শিয়ার—রাইজ এ্যান্ড ফল অব থার্ড রাইখ
৫। এ· জে· পি· টেইলর—ওরিজিনস অব দি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার
৬। ই· এ· পিয়ার্স—দি স্প্যানিশ ট্র্যাজেডি

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১। সি· ফলস—দি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার
২। উইনষ্টন চার্চিল—দি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার
৩। ট্রেভর রোপার—দি লাস্ট ডেইজ অব হিটলার
৪। এ· ভার্থ (Werth)—দি ইয়ার অব ষ্টালিনগ্রাড

চতুর্দশ অধ্যায়

১। টি· কোল (Cole)—ইওরোপিয়ান পোলিটিক্যাল সিষ্টেম
২। ফ্লেমিং—কোল্ড ওয়ার
৩। হরোউইৎস—ইয়াল্টা টু ভিয়েতনাম
৪। লুইস হাল—কোল্ড ওয়ার

পঞ্চদশ অধ্যায়

১। গুডরিচ এ্যান্ড হ্যামব্রো—চার্টার অব ইউনাইটেড নেশনস